

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

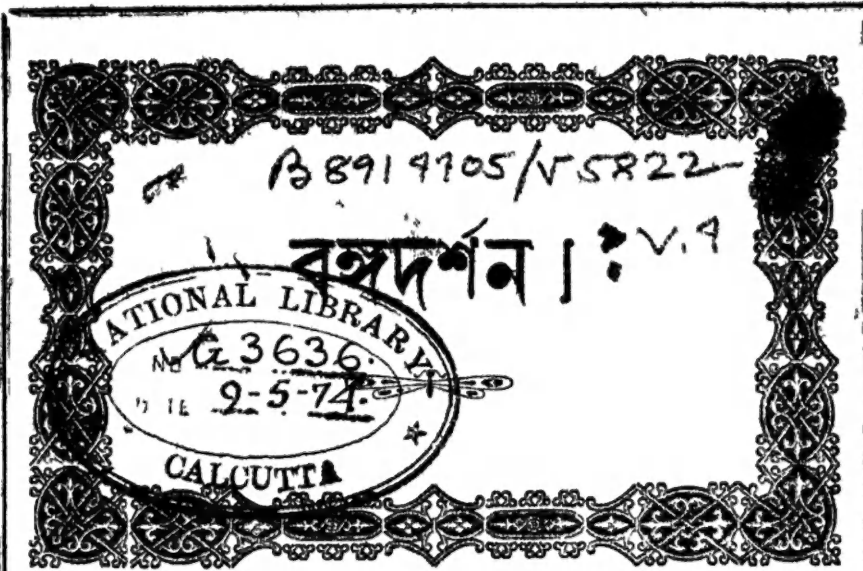
वर्ग संख्या ^B
Class No. 891.4405
पुस्तक संख्या
Book No. V5822
रा०पु०/ N.L. 38 V.4

MGIPK—11 LNLC/67—3-1-68—1,50,000.

J. C. Mookherjee Gift.

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
আদিম মনুষ্য ...	২০৫	ভাবীবসুমতী ...	২৫২
আত্মাভিমান ...	২৬১	মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ ...	১১৩
উড়িষ্যার পথে প্রভাত ...	৩১৭	মিল, ডার্বিন, এবং হিন্দুধর্ম ...	২৫
উত্তর ...	২০৩	রজনী ...	১৩, ২২৩, ২৮৬, ২৮৯, ৩৬১
ঋতুবর্ণন ...	২১	রাধারাণী ...	৩২৮, ৩৩৭
কমলাকান্তের দপ্তর ...	১০	লজ্জা কেন করি ...	২৯৫
কালিদাসের উপমা ...	৪৬৩, ৫২৭	বঙ্গদর্শনের বিদ্যায় গ্রহণ ...	৫৭৪
কুঞ্জবনে কমলিনী ...	২০৯	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ...	৩৫২
কৃষ্ণকান্তের উইল ...	৪০৯, ৪৫১, ৫১৬	বর্ষ সমালোচন ...	৩৮১
কোন “পেশিশালেব” পত্র ...	৩১৩	বনস্থলীর প্রতি মিস ইডেনের উক্তি ...	৩০১
ক্লিওপেট্রা ...	১৩৬, ১৫৬	বংশরক্ষা ...	১০৯
গঙ্গা স্তব ...	৫৩৬	বাসীলিওস্কি ...	৩৯৩
চৈতন্য ...	২৪১, ৩৪৫, ৪০২, ৪৫৮, ৫১২	বাসীলার পূর্ব কথা ...	১৮৬
জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ...	৩৮৫, ৪৪৮	বাসীলিক ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ৬৭, ৯৭, ১৭১	
দরিত্র যুবক ...	১৯১	বিদ্যাপতি ...	৭৫
দেবতত্ত্ব ...	৪১	বেদ ...	৫২০, ৫২৯
দেবীঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত ...	১৯৩	বৌদ্ধ ধর্ম ...	৪৯
দ্রোপদী ...	২৩৪	বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন ...	৪৯৭
ধাত্রীশিক্ষা ...	৪৬১	শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমনা ...	১
নাটক পরিচ্ছেদ ...	১৮২	শিবজী ...	২১৬
নির্দ্রিত প্রণয় ...	৯২	শৈশব সহচরী ১২৭, ১৬৪, ২২৮, ২৮২, ৩৭০	
নীতিকুসুমঞ্জলি ...	৪০৫, ৪৪১, ৫০৮, ৫৬৯		৪২৭
নৃত্য ...	২৭৯	অশ্বিনে ভ্রমণ ...	২৬৯
পদ্য ...	২৩৩	সাম্য ...	৩০১
পলাশিব যুদ্ধ ...	৩১৯	সাহসিক চরিত্র ...	১৫২
পালিভাষা ও তৎসমালোচন ...	৪৩৩	সুখচর ...	৩৮
প্রেমনিমজ্জন ...	৫০৫	সুখ্যমগুল ...	২৫৫
ভারতভূমির অভ্যর্থনা ...	২৭৭	সুখ্য-সঙ্গম ...	৩৭৯
ভারতমহিলা ...	৪৬৮, ৪৮১, ৫৩৮	হরিহর বাবু ...	১৪৫



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড।]

বৈশাখ ১২৮২।

[১ম সংখ্যা।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা, প্রেম্ণেবো ও বিশ্বা-
মিত্র উভয়েই বাজর্ষি। উভয়েই ঋষি-
কন্যা বলিয়া, অম'ল্লযিক সাহায্যপ্রাপ্ত।
মিরন্দা এবিয়লবক্ষিতা, শকুন্তলা অঙ্গবো-
বক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। ছুইটিই বন-
লতা—ছুইটিই নৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা
পূরাত্তা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজা-
বরোধবাসিনী গণের মনোজুত রূপ লাংগ্য
ছন্নস্তের অবগণ পথে আছিল;

গুহ্যজ্ঞহর্লভমিদংবপু বাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্ত।

দুবীকৃত্যঃ থলু গুণৈ রদ্যানলতা বন
লতাক্তি: ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ
ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard,—
and many a time
The harmony of their tongues
hath into bondage

Brought my too diligent ear : for
several virtues
Have I liked several women ;
——but you, O you
So perfect and so peerless, are
created
Of every creature's best !

উভয়েই অবশ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ;
সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভ
য়েই তাহাতে সিদ্ধ । কিন্তু মহুয়ালয়ে
বাস করিয়া, স্নন্দর সবল, বিত্তর রমণী-
প্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমার
ভাল বাসিবে, কে আমার স্নন্দর বলিবে,
কেমন করিয়া পুরুষ জয় কবিব, এই
সকল কামনা, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে,
মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাছাৰ মাধুর্য্য
কালিমাপ্রাপ্ত হয় । শকুন্তলা এবং
মিবন্দা এই কালিমা নাই, কেননা
তাহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন ।
শকুন্তলা, বহুল পৰিধান করিয়া, ক্ষুদ্র
কলসী হস্তে, আলবালে জনসিঞ্জন কবিয়া
দিনপাত কবিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণা
বিধৌত নব মল্লিকাব মত নিজেও,
শুভ্র, নিম্বলক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণ
কাৰিণী । তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব
মল্লিকার উপর, ভ্রাতৃস্নেহ সহকাৰেব
উপর ; পুত্রস্নেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর
উপর ; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগেব
কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রু-
মুখী, কাতবা, বিবশা । শকুন্তলার কথো
পকথন তাহাদিগের সঙ্গে ; কোন বৃক্ষেব
সঙ্গে বাজ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন

লজ্জার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা
মুখী । কিন্তু শকুন্তলা সবল হইলেও
অশিক্ষিতা নহেন, তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন,
তাঁহার লজ্জা । লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড়
প্রবল ; তিনি কথার কথায় ছয়স্তর
সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—
লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদয়ত প্রণয়
সখীদেব সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে
পারেন না । মিবন্দার সে রূপ নহে ।
মিবন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও
নাই । কোথা হইতে লজ্জা হইবে ?
তাঁহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন
দেখেই নাই । প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া
মিবন্দা বৃত্তিতেই পাবিল না যে, কি এ ?
Lord ! how it looks about ! Believe
me Sir,
It carries a brave form,—but
'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্ত-
লাব তাহা সকলই আছে, মিবন্দাব তাহা
কিছুই নাই । পিতাব সম্মুখে ফর্দিনন্দের
রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই
—অন্তে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা
কবে, এ তেমনি প্রশংসা,

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত জীৱিত্ত্বের যে পবিত্রতা,
যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা
মিবন্দার অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার
সবলতা অপেক্ষা মিবন্দার সবলতায় নবী-
নত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক । যখন পিতাকে

ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not too rash a trial of him,
for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দেব রূপের
নিন্দা শুনিয়া মিবন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble, I have no
ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমবা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা
সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পবিত্র-
কাতবা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিবন্দাব
লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে
পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন বাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দাব সাক্ষাৎ
হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শ-
শূন্য ছিল; কেননা ঠৈশবেব পর পিতা
ও কালিবন ভিন্ন আব কোন পুরুষকে
তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও
যখন বাজাকে দেখেন, তখন তিনিও
শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন
নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক
স্থানে কণ্ঠের তপোবন—অপর স্থানে
প্রম্পেরোর তপোবন,—অনুরূপ নায়ককে
দেখিবারাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু
কবিদিগের আশ্চর্য্য কোশল দেখ; তাঁ-
হারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা
চবিত্ত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন নাই, অথচ
একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যে

রূপ হইত, ঠিক সেই রূপ হইয়াছে।
যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করি-
তেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়
লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি
প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে,
শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্ন,
লজ্জাশীলা, অতএব, তাহার প্রণয় মুখে
অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত
হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্য, লৌ-
কিক লজ্জা কি তাহা জানেননা, অতএব
তাহার প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত
পরিষ্কৃত হইবে। পৃথক পৃথক কবি-
প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।
দুয়ন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়সক্তা;
কিন্তু দুয়ন্তেব কথা দূরে থাক, সখীদ্বয়
যত দিন না তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া,
সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া, পীড়াপীড়ি
করিয়া কথা বাতিল করিয়া লইল, ততদিন
তাহাদেব সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন
বিকাবেব একটি কথাও বলেন নাই,
কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি ন যনে বৎ

প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,

যাতং যচ্চ নিতম্বয়ো গুরুতয়া মন্দং

বিলাসাদি ব।

মাংগা ইত্যপুরুষায় বদপি তৎ সাস্বর

যুক্তা সখী,

সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণ মহো! কামঃ

স্বত্ত্বং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুয়ন্তকে ছাড়িয়া বাইতে
গেলে গাছে তাঁহার বকল বাধিয়া যায়,

পদে কুশাকুর বিধে। কিন্তু মিরন্দার সে
সকলেব প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে
সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন কালে
মিবন্দা অসঙ্কচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আ-
পন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man I e'er saw; the
first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দেব পীডনে
উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার
প্রিয়জন বলিয়া, পিতাব দ্বাব উদ্রেকেব
যত্ন কবিলেন। প্রথম অবসবেই ফর্দি-
নন্দকে আত্মসমর্পণ কবিলেন।

দ্বয়ন্তেব সঙ্গে শকুন্তলাব প্রথম প্রণয়-
সম্ভাষণ, এক প্রকাব লুকাচুবি খেলা।
“সখি, বাজাকে ধরিয়া বাথিস্ কেন?”
—“তবে, আমি উঠিয়া যাই”—“আমি
এই গাছেব আড়ালে লুকাই”—শকুন্তলার
এ সকল “বাহানা” আছে, মিবন্দাব
সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা
কুলবালাব বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জা
শীলা কুলবালা নহে—মিবন্দা বনেব
পাখী—প্রভাতাকণোদয়ে গাইয়া উঠিতে
তাহার লজ্জা করে না, বৃক্ষের ফুল,
সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটিয়া, ফুটিয়া
উঠিতে তাহার লজ্জা কবে না। নায়ককে
পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে
না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would
not wish

Any companion in the world but
you;
Nor can imagination form a
shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ:

Hence bashful cunning!
—And prompt me, plain and holy
innocence.
I am your wife, if you will marry
me.
—If not, I die your maid; to be
your fellow
You may deny me, but I will be
your servant
Whether you will or no.

আমাদিগেব ইচ্ছা ছিল, যে মিরন্দা
ফর্দিনন্দেব এই প্রথম প্রণয়লাপ, সমুদায়
উদ্ধৃত কবি, কিন্তু নিম্নবোজন। সকলেবই
ঘবে সেক্ষণীয়ব আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ
খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন
উদ্যানমধ্যে বোমি ও জুলিয়েটেব যে প্রণয়-
সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন
কালেজেব ছাত্র মাত্রেব কণ্ঠস্থ, ইহা
কোন অংশে তদপেক্ষা নানকল্প নহে।
যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন, যে
“আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার
ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর,”
মিবন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিন্তভাবে
পরিপ্লুত। ইহাব অল্পরূপ অবস্থায়,
লতামণ্ডপতলে, দ্বয়ন্ত শকুন্তলায় যে আ-
লাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবহু
হৃদয়কোবক প্রথম অভিযন্ত সূর্য্য সমীপে

ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কুলপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা “অন্ধপথে স্মরিত্য এদম্ব হৃৎসংসিণো মিণাল বলঅম্ব কদে পড়িগিবুজ্জি।” ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিণীত্ব আছে, যথা ছয়স্তের মুখে

“নম্ব কমলশ্র মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধ-মাত্রোণ।” এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, “অসন্তোষে উণ কিং করেদি?”—এই সকল ছাড়া আব বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। ছয়স্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্তি—অপ্রতিভাশাঃ; কিন্তু সঙ্গরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসথ ছয়স্তের কাছে শকুন্তলা কে? ছয়স্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভারণ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজকীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম-করী রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনকীড়ার

সাধ/মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি শ্রবণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জননিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জননিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চ-ল্য বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখি-লাম; কিন্তু রমণীর গাঙ্গীর্ষ্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধু বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনেব গ্রহি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ-ভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দে-শেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় “অসন্তোষে উণ কিং করেদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয়-মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া ছয়স্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল “অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অমুমানে সকলকে দেখ?”—সে শকুন্তলা যে, লতা-মণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকজ্ঞানুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—ছয়স্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকু-ন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা

পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণো-
দ্যতা, স্ততরাং তখন শকুন্তলা রমণী;
এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজ-
প্রসাদের অঙ্কুচিত অভিলাষিণী,—এখানে
শকুন্তলা কে? কবিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকু-
ন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে
হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য
এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা
গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে, যে
শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মির-
ন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা
চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা
চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাকি
আছে। দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা
করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা, দুই জনে
পরস্পর তুলনীয়া, এবং অভুলনীয়া।
তুলনীয়া কেননা উভয়েই গুরুজনের
অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসম-
র্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা
সম্বন্ধে হৃৎস্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন,
ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা
সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

পাবেস্ত্রিদো গুরুঅণো ইমিএণ তুএবি
পুচ্ছিদো বজ্জ।

এককং একচরিএ কিং ভণহু একং একস্ম ॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ
দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—
উভয়েরই “ছুরোরোহিণী আশালতা”
মহামহীকৃৎ অবলম্বন করিয়া উঠিয়া-

ছিল। কিন্তু বীরমন্তের যে মোহ, তাহা
দেসদিমোনার যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায়
তাদৃশ নহে। ওথেলো ক্লক্কায়ে, স্তত-
রাং স্পুরুষ বলিয়া ইতালীয় বাজার
কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ
হইতে বীর্যের মোহ নারীক্লদয়ের উপর
প্রগাঢ়তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিক
দ্রৌপদীকে অর্জুনে অধিকতম অনুরক্তা
কবিতা, তাঁহার স্বশবীবে সর্গারোহণ পথ
রোধ কবিতাছিলেন তিনি এতদ্ব জানি-
তেন, এবং যিনি দেসদিমোনার সৃষ্টি
করিয়াছেন তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ
করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকাবই
“ছুরোরোহিণী আশালতা” পবিশেষে
ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামীকর্তৃক
বিসর্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনা-
দর, অত্যাচার পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই
অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে
আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে
অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়।
ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অন্তত নহে,
কেননা মনুষ্যপ্রকৃতিতে যেসকল উচ্চা-
শয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থা-
তেই তাহা সম্যক প্রকারে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত
হয়। ইহা মনুষ্যালোকে স্বশিক্ষার বীজ—
কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেসদিমো-
নার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল
মনোবৃত্তির স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইবার অস্তিত্ব
তাহার ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই
ঘটিয়াছিল। অতএব দুইটি চরিত্র যে

পরস্পর তুলনীয়া হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া, কেননা উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী, এবং সতী, ত যে সে। আজ কাল রাম, গ্রাম, নিধু, বিধু, বাহু, মাধু যে সকল নাটক উপাশাস নবন্যাস প্রেতশাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা মাঝেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আনিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আব পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ভাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহং ভোঃ” শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, জীলোকে অসতী হইতেই পাবে না বলিয়া, দেসদিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরীয়সী। স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিত-ফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্য-পটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দস্তে, পূর্কের বিনীত, লজ্জিত, হুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অনাগি, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?” যখন তদন্তরে

রাজা, রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্রে! দুঃস্বপ্নের চরিত্র সবাই জানে,” তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঞ্জে বলিলেন, তুমি জেব পমাণং জাগধ ধুম্মখিদিঞ্চ
লোঅস্ম।

লজ্জাবিগিজ্জিদাও জাগন্তি ণ কিম্পি
মহিলাও ॥

এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেসদিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূবীকৃত করিলেন, তখন দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, “আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিবক্ত করিব না।” বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু!” বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেসদিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন।” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পবেও, পতিস্নেহে ধিক্ত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াকোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন

Alas, Iago!
What shall I do to win my lord
again?
Good friend, go to him; for, by
this light of heaven
I know not how I lost him: here
I kneel;—

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ শয্যাশায়িনী স্ত্রী

অন্ধরীর সম্মুখে, “বধ করিব!” বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অশ্রদ্ধ নাই—দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে, ঈশ্বর আমার রক্ষা করুন!” যখন দেসদিমোনা মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনেব জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবন তিচ্ছা চাহিলেন, মুঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অশ্রদ্ধ নাই। মৃত্যুকালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার্য্য কে করিল?” তখনও দেসদিমোনা বলিলেন, “কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!” তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপবাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে শকুন্তলা দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন জাতীর বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। বাহা অন্ধর, বাহা অদৃশ্য, বাহা অগন্ধ, বাহা অরস, বাহা মনোহর, বাহা অখর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপৰ্য্যাপ্ত, সুপাকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর বাহা গভীর, হৃদয়, চঞ্চল, ভীষনাদী, তাহাই

এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্সপীয়রের এই অল্পম নাটক, হৃদয়োদ্ধত বিলোল তরঙ্গমালায় সংকুচিত; হৃদয় রাগ ঘেষ ঈর্ষাদি ব্যাত্যায় সম্বাদিত; ইচ্চার প্রবল বেগ, হৃদয় কোলাহল, বিলোল উদ্গীর্ণীলা,—আবীর ইহাব মধুরনীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ; ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহাব রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসাবে হুল্লভ।

তাই বলি, দেসদিমোনা শকুন্তলার তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীর কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভাবতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যাকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য কাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমন নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য কাব্য, যথা গেটে প্রণীত কষ্ট এবং বাইরন প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই প্রণীত কাব্য, নাটকাকারে অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদ্ব্যতিরিক্ত নিকা হইল না, কেন

না একুপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেন না ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটনাছে যে দেস্দিমোনার চরিত্র যত পরিষ্কৃত হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্দিমোনা জীবন্ত, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্কের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বন্ধে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভুলগজাহু স্নানরীর স্পন্দিততার লোচনের উজ্জ্বল দৃষ্টি আমাদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা হৃদয়ের মুখে না শুনিতে বুঝিতে পারি না—যথা

ন তিৰ্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালো-
হিতং,
যচোপি পক্ষ্যাকরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।

হিমালয়ইব বেগতে সকলইব বিদ্যাবৎঃ

প্রকামবিনতে ক্রবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার হৃৎথেব বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্দিমোনার অত্যন্ত পরিষ্কৃত। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্দিমোনা ভাস্কবেব গঠিত সজীব প্রায় গঠন। দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা, ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্ধেক মিবন্দা, অর্ধেক দেস্দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্দিমোনার অহুকপিণী—অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অহুকপিণী।

সমালোচন সমাপনান্তে আমরা যদি একবার বঙ্গদর্শনেব পূর্বতন বন্ধু ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহন্নাথুল মহাশয়কে স্মরণ করি, ভরসা করি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। প্রাক্তন আচার্য্যেব মত এই যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কালিদাস সেক্সপীয়রের পরবর্তী; এবং ইংরেজিতে ব্যাংপন্ন ছিলেন। এবং মিবন্দা ও দেস্দিমোনার অহুকরণ করিয়াই শকুন্তলা প্রণয়ন করিয়াছেন।



কমলাকান্তের দণ্ডব।

১৪ সংখ্যা।

মশক।

আ বাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশা গুলা, আব এই সং সারের কোণের মশা গুলা। আজি কোথা মনে করিলাম, যে একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার Freedom এবং Free-will (অদৃষ্ট ও পৌরুষেব) তর্কটা মীমাংসা কবিব, না কোথা হইতে ছুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরেব সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রার নেশাটা এক বারে নির্মাত্ত করিল!

সংসারের ক্ষুদ্র মশক গুলা আবও বিরক্তকর। কোন একটি বিষয় কার্যেব একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড়ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুণ্ গুণ্, মৃদু গুণ্ গুণ্, ক্রমে দংশন ও শোণিতগোষণ।

পৃথিতে পড়িলাম, যে অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বাবা-গনৌহ জ্ঞানবাণীর অপূর্ণ পয়োরাশির আশ্রাদ ও আশ্রাণের কথা তখন আমাব স্মরণ হইল। হিন্দুধর্মের কল্যাণে ও আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফলে, সেই উদক এক গণ্ডব আমি উদরস্থ কবিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল সেই জ্ঞানবাণীর এক গণ্ডব জল আনিয়া এই জীব তত্ত্বের রহস্ত পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাণী কানীধামে,—আর আমি

অজ্ঞান পাণী কানীধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুঃখাপ্য। তখন মনে হইল, যে বোধ হয় কালা পাহাড়ের ভয়ে, বিবেচনাব সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাব জল ঐকণ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর শেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পুথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে, ও জল খঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদীপ হইতে লাম্বণের পলায়ন করেন তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাণী, সেই জল হইলেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেইখানে একটি মেলা বসাইতাম। নব্য বঙ্গ সন্তানগণকে একবার সেই ধূলা মাখাইয়া দিয়া বলিতাম, “বাঙ বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও, যে পথে তোমার ধার্মিক রাজাগমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।” তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিবেচনের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে এখন প্রাসন্ন্য গোশালার আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলাকান্ত অনেক বার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য্য হইতে

পারে। অমনি আমার চিরন্তন শিশিটি ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, ‘প্রসন্ন! তুমি সে দিন তোমার সেই পাড়া বেড়ান পঞ্চরসের সেই যে এক গণ্ডু দিয়াছিলে, মনে আছে ত?’ প্রসন্ন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ‘ঠাকুর মহাশয় আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, যে আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতাদের জন্য নহে। আপনার কি মন হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।’ প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, ‘আমি সেজন্য তোমাকে অহুযোগ করিতেছি না; তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্তুত কর, তাহা আমাকে এই শিশিটির এক শিশি দিতে হইবে।’ প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঠাকুর মহাশয়! ‘আমবা কি ছুধে জল দি?’ আমি বলিলাম ‘তা যাই হোক সেই জল একটু দিতে হইবে।’ আমি অনিয়াছিলাম, (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব) প্রসন্নর গোশালায় নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দূর জাতি-কুটুম্বগণকে দ্রুমে বড়ি খাওয়াইবার জন্য অল্পত মূল্যে নির্জল দুধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালায় আহঁবে পাড় করাইয়া পাতী দোহন করিত। গোশালায় কাছাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। তাহা হইলে কাঁচা গাউ চম্বা করিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল।

শিশিটি আমি বস্ত্র করিয়া রাখিয়া দিলাম। সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উঠিয়া পান্টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, উর্দ্ধ হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময়ও তেমনিই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি ক্ষীত হইতে লাগিল। একদিক কিছু স্থলতর হইল। তখন সেই দিক যুগ্ম বলিলে বলা যায়। পূর্বে সূত্রকীটগুলি নিমেষ কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন, বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্য মধ্য ভাসিয়া বেড়ায়। দুই একদিন পবে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল; কচিং কিকিং চেষ্টনা যুক্ত বোধ হয়; কখনও বা একেবারে জড়বৎ। আমাব শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পর দিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশি মধ্য উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর জলোপরি একটি ক্ষুদ্র কীটনির্মোক ভাসিতেছে। একটি, দুটি, তিন চারিটি কবিতা ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমাব বিজ্ঞানপবীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুব গৃহিণীব স্বহস্তপ্রস্তুতীকৃত পারস পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সূক্ষ্মর উদর পুষ্টি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সেদিন সন্ধ্যার পব উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিদ্যে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটি সবকার দেব ছানের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়াগেল। জীববহুতোষ হইল। এই রূপে জগৎ যে জীবের, সেই

জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানব অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation.—but na—yet!*

বাস্তবিক মনুষ্যের এই অহঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশাব কামড়েও হাস্য পায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন, যে, “বাসন্ত নারায়ণঃ স্বয়ং।” “ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিথিয়াছেন, যে,—

“গদ্যো পদ্যো অচেষ্টিত সাধন সাধিব।” আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য বিপাক বিপত্তে মধুসূদন ত্রিমধুসূদন লিখিয়াছেন, যে,

—বচিব মধুচক্র

গৌড়জনগণ যাহে আনন্দে করিবে
পান, সুধা নিরবধি;—

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন, যে, ‘মানব—সৃষ্টিব মহাপ্রভু।’ আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি! এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্যসত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টিকাত্তে একেশ্বর প্রভু? এই যে, ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র

* গুনিয়াছি এই ইংবেজি কথা কর-
টিতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। দুইটি ইংরেজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যর পারে, ভব্যর পারে না। বাতুল জ্ঞানবাণীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না। আর নবদ্বীপের ত্রিমহাপ্রভুর মেলার বেকিরূপ বিজ্ঞপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিলাম না।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

সহস্র প্রাণী আশীবিধ বিধে তাক্তিত
গতিতে শমনসদনে রপ্তানি হইতেছে,
yet man is the Lord of Creation!
এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের
দৌরাশ্য হইলে অমনি শত শত ভগ্ন
পাইক সাম্প্রতিক পক্ষে পোলিশের বি-
কল্পে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet
man is the Lord of Creation! এই
যে, বীড়ন সাহেবের বেলবিডিরর বাসে
চিত্র প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দ্-
লের পিঞ্জরবার অবস্থ ছিল বলিয়া শত
শত শ্বেত পুরুষ উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়নপর
হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই! yet
man is the Lord of Creation!
যে মানব বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অন-
বরত গুহা রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ
বিনাশের জন্য দিবারাত্রি যন্ত্র সৃষ্টি করি-
তেছে, তাহার একরূপ আত্মগবিমা ভাল
দেখায় না। সাগরের জলবুদবুদ সাগর
শাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায়
না। ভীষণ মারীভয়ে, গ্রাম, নগর,
দেশ অঞ্চল নির্মানব হইতেছে, তবু
বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! বোম
দেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে চীন হইতে পীক
উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে
মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধর-
ণীর কদম্বাবর্ত্তভরে, উদগীরিত বহি রাশি
জীব কাকলি পরিপূরিত জনপদ জলন্ত
কবরে প্রোধিত করিতেছে, তবু কি
বলিতে হইবে—যে মানব বিশ্বরাজ্যের
রাজা! আর এই মুহু মুহুর তারস্বরাহু-
করণ কারী অগুপতঙ্গে আমাকে ব্যতি-
বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তথাপি আমাকে
বলিতে হইবে যে আমি ও আমার স্বজা-
তিগণ প্রকৃত ধরাধিপ! এ অনৃত বাদে
কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্কেশ্বর
বলিলেই যদি এই হৃদয়গণ দুরীভূত

হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশাবি-
ষয়িনী গাথা প্রকটন না করিয়া, কমলা-
কান্তের স্তব রচনা করিতাম। কিন্তু এই
হৃৎকণ্ঠ হর্ষেরে ছায়শাস্ত্রের বলবত্তা
বৃদ্ধিতে পারে না। অতএব আজি আমি
বাক্সালির ছায়শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া
ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাক্সালির
ছায়শাস্ত্রের অর্থ ‘গালাগালি।’ বড়
ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি
দিবে, সমান সমানে গালাগালি চলিবে,
ইহাব নাম Argument বা যুক্তি। আমি
এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলি
মশামেধ যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান
করিলাম।

রে কীটপ্রসূত কুস্র পতঙ্গ! অভিমানী
মানবেব তুই চিব শক্র; কমলাকান্তকে
আব জ্বালাতন করিস্ না। কমলাকান্ত
সন্ন্যাসী, অভিমানের সঙ্গে ইহাব চির-
শত্রুতা। দূর হ রে! পতঙ্গ মশক। আব
দূর হ বে! মানব মশক।

কুস্রকীট তোর গুণ্ গুণ্ ধুব সমা
লোচন, তোর অকাষণ পৃষ্ঠদং প্রীরবে
শোণিতশোষণ—আব আমার হৃৎ হয়
না। তাক্সা-প্রিয়! তুই অদ্য হইতে আর
আলোকে দেখা দিস্ না। কোণ প্রিয়!
সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না

হয়। সন্ধ্যামোদি! দিনদেবের রাজত্বকালে
তুই আর কদাপি নির্গত হইস্ না।
কর্দমে, জঙ্গলে, বনে, পুতিগন্ধে, পয়ো-
নালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে, নিভৃত
লুতানিকেতনে, শয়নভলে, তোব আবাস
—পৃষ্ঠদংশনে আব শোণিত শোষণে তোর
আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষকম্পনে
মুহু গুণ্ গুণ্ বব, তোর তোষামোদ
গান। কিন্তু কে তোর এরবে মোহিত
হইবে? যে হয়, সে হউক, কমলাকান্ত
চক্রবর্তী কখন মোহিত হইবে না। তোরা
আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্। অন্নপ্রাণ
পতঙ্গ। ক্ষীণ ক্ষীণ! তুই প্রভাকরের প্র-
ভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হস্,
শীত সঞ্চাবে পলায়ন কবিস, সমীপের
ঈষদ্বয়ে কোথায় চালিত হস্, তাহার
স্থিতি নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সর্জবস
ধূমে তোব বংশধর হস্, বে কীটস্য কীট
পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর
সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়! আর
অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে
সামান্য মশা বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া
ভীষণ মহাদগ্ধবে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র কেন্দ্র
না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য
কামান পাতিলে লোকে বলিবে
কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্তী।

রজনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামসদয় মিত্রের সঙ্গে ললিতলবঙ্গল-
তার সঙ্ক হইবার আগে আমার সঙ্গে
তাহার সঙ্ক হইয়াছিল। ললিতলবঙ্গল-
তার পিজালয়, ভবানীমগরের অনতিদূর
কালিকাপুর গ্রামে। কালিকাপুরে আমার
এক পিসীর বাড়ী ছিল। পিসীকর্তৃক
এই সঙ্ক স্থির হয়। বিবাহের কথা
বার্তা অবধারিত হইয়াছিল—কিন্তু এমনত

সময়ে আমাদের সেই কুলকলঙ্ক কন্যা
কর্তার কর্ণে প্রবেশ কবিল। সঙ্ক
ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে রামসদয় মিত্র
আসিয়া ললিতলবঙ্গলতাকে ছিঁড়িয়া ল-
ইয়া গেল।

বিবাহের পূর্বে আমি ললিতলবঙ্গল-
তাকে সর্কদাই দেখিতে পাইতাম।
আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধো২
যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও

দেখিতাম—তাহার পিছালয়েও দেখিতাম। মধ্যে২ লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে “ক” রে করাত, “খ” রে থরা, শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সখ্য হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহাৰে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা যোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চকল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্ছ্বাসা যুহু এবং ত্রীভাষুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ক্ষতপতি মস্তব হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে কবিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এসৌন্দর্য্য যুবতীর আদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্ত্রতঃ অতীতশৈশব, অথচ অপ্রাপ্ত যৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অক্ষুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাষ্ট মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন ভূষণের ঘট, হাসি চহনিব ঘট, —বেণীর দোলনি, বাঁহর বলনি, শ্রীবার হেলনি, কণাব ছলনি—যুবতীর কাপের বিকাশ, এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে যৌবনের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সখ্যবৃত্ত চিত্ত তাবধে সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

কিন্তু হটুক, এই সময়ে লবঙ্গলতা সাক্ষি নিরাশ হওয়ার আমি বড় ক্লর

হইলাম—বুদ্ধ ধনকলস রামসদয়ের উপর এমন জাতক্রোধ হইলাম যে, অনেক সময়েই তাহার লম্বোদরমধ্যে ছুরিকা প্রবেশের অভিলাষ হইত। তাহার পর আর আমি বিবাহ করিতে পাইলাম না—সকল রাগ টুকু বামসদয়ের উপর বর্জিল। সে কথা আমি আর কখন ভুলিলাম না।

ইহার কর বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব, কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ কবিতাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কেন বল দেখি? আমি ক্লর, খল, ঘেবক, মন্দ—যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল—আমি সব, স্বীকার কবিতাম। কিন্তু আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ কবিতা, বাত্যা-তাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম, কেন বল দেখি? কেন আমি, আমার সেই জন্ম ভূমিতে রমা গৃহ রমা সজ্জায় সাজাটকা যাজব পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বানে হৃৎ বাক্সকে বধ করিতাম না? আমার কি দুঃখ? আমার কেহ নাই? কাজ কি কেহতে? কে কাব? কার কে? জীব নেব নদী কি একা পার হওয়া যায় না? কে বাবণ করে? কত টুকু পাড়ি? কিসের সহায়? সহায়ে কি হইবে? একা আসি-

রাছি, একা বাইব, একা থাকিবনা কেন? অড়জগৎ জগৎ, অস্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনায় রন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহুজগতে করটা সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি নাই? আমার অন্তরে বাহা আছে, তাহা তোমার বাহু জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুহুম এ মৃত্তিকার ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আগনি মাতে, তোমার বাহু জগতে তেমন কাথার?

তবে কেন, সেই নিশীথ কালে, সুবুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূব হৌক! কেন গরল খাইলাম না—কেন জলে ডুবিলাম না, কেন গলার ছুরি দিয়া মরিলাম না! আমার বড যন্ত্রণা হই তেছে—আমি মনের কথা বলি বলি, অথচ বলিতে পারিতেছি না। এক দিন নিশীথ কালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমাব চক্ষে শুক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম—আলা নিবিল না।

আবার ফিরিলাম কেন? সংসারের বন্ধন হুচ্ছেদ্য কেন? কিছুতেই এ বান্ধন কাটা যায় না কেন? আমি কাব, কে আমার? তবে আমি আবার ফিরিয়া লোকালয়ে আসিলাম কেন? লোকালয়ের জন্ত আমি এত কাতর কেন? লোক আমার কে? আমি লোকের কে? কে আমার ভাল বাসে? কে আমার জন্ত

কাতর? কে আমার জন্ত, এক দিনের সুখ অন্ন করিয়া ভোগ করে? কে আমার জন্ত এক দিনের আমোদ বন্ধ করে? সুখের সময় কে আমাকে ভাবে? এমন কে লোকালয়ে আছে? তবে আমি লোকের জন্ত কাতর কেন? আমি কাহার সুখ বাড়াইব,—কে আমার সুখ বাড়াইবে? আমি কাহার দুঃখ নিবারণ করিব—কে আমার দুঃখ নিবারণ করিবে? এমন কি পৃথিবীতে আমাব কেহ নাই? না, এই অনন্ত অসীম, সাগর নগ নগর দেশ প্রদেশ প্রান্তর কানন মণ্ডিত, বিশাল, হুশিষ্টা জগতে আমার এমন কেহ নাই। কেহ নাই! কেহই নাই! ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, খুঁজিয়া, খুঁজিয়া, দেখিলাম এমন কেহ নাই। তবে ভাবি কেন? কেন ভাবি, তাই ভাবি।

তবে, এ সংসারের মায়া বড়ই হুচ্ছেদ-নীয়া। অথবা মন বড়ই অবশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্রাট ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। হরেকৃষ্ণদাসের নিবাস যে গ্রামে, ইহারও নিবাস সেই গ্রামে। সে কথা আমি জানিতাম না। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন কালে

পুলিষের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিষের অত্যাচারে বহুজন গুলি গুলি বুলিলেন—ছুই একটা বা সত্য, ছুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দ-কান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

“হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে একজন দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি শিশু কন্যা ছিল। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটিকে আপন শ্যালীপতিকে প্রতীপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতক গুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভ বশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কার গুলি সে আমাদের ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে ‘আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবে—এখন দিলে রাজচক্র ইহা আশ্র-মাৎ করিবে।’ আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভূকী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটিবাটা পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল, যেহরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতার তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয়, তাহাকে কটু বলিয়া, আত্মা করিলেন, ‘ওয়ারেশ থাকে, হজুরে হাজির

হইবে।’ তখন, আমার ছুই একজন শত্রু স্বেবোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল, যে গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাদের তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্ত-করে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর প্রেরণিতে চালান হইবার গতিকে দেখিলাম। বলিব কি? যুঝাযুঝির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কার গুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদ পদ্মে ঢালিয়া দিলাম; তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

“বলা বাহুল্য যে দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্ডাব ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবেব কাছে তিনি বিপোর্ট করিলেন, যে ‘হরেকৃষ্ণ দাসেব এক লোটা আব এক দেবকো ভিন্ন অত্র কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত কবিয়াছে, তাহার কেহ নাই।”

যখন রামসদয়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়, তখন রামসদয়ের বাপের উই-লের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলাম। হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম এবং জানি-তাম যে কথিত লাওয়ারেশা বিপোর্টের নকল দৃষ্টি করিয়াই বিজুবান বাবু বিষয় রামসদয়ের পুত্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

“ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?”

গোবিন্দ কাঁচ বাঁধু বলিলেন, “হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?”

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, “হরেকৃষ্ণের শ্যালী পতির বাড়ী কোথা?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “কলিকাতায়। কিন্তু কোন স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।”

ইহার অন্নদিন পরেই আমি কাশী পবিত্যাগ করিলাম। লবঙ্গলতা অপহরণেব প্রতিশোধ করিব।

অনেক দিন কলিকাতায় বাজচক্র দাসেব অনুসন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রামপর্ধ্যটনে গিয়াছিলাম। একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েন সপ্ত-স্বব মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চাবিদিগে বৃক্ষবাজি; ঘন-বিন্যস্ত, কোমল শ্যাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতার পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্রাবকপের রাশি রাশি, কোথাও কলিকা, কোথাও ক্ষুটিত পুষ্প, কোথাও অগন্ধ, কোথাও হৃৎক কল। সেই বনমধ্যে আর্ত-নাদ শুনিতে পাইলাম। বনাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক জন বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্র-

মণ করিতেছে।

দেখিবা মাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতি নীচ জাতীর পাবণ—বোম্ব হর ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানেব মত।

ধীরে ২ তাহার পশ্চাচ্ছাগে গেলাম। গিয়া তাহার কঙ্কাল হইতে দা খানি টানিয়া লইলা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। ছুট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সন্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহাব দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্তব্য। একবারে তাহার গলদেশে হস্তাৰ্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্দ্বাব ধরিলাম। তাহাব বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই-নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম বে, তুমি এই সময়ে পলাও—আমি ইহাব উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল,—কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ। এখানকার পথ চিনি না।

দেখিলাম, সে বলবান পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম বে দিকে আমি না ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন ছুটকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে

এক ঘুরের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা কিবাইয়া আমার হস্তে প্রহাব করিল—আমাব হস্ত হইতে না পড়িয়া গেল। সে না তুলিয়া লইয়া, আমাকে ভিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি শুকতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভি মুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদ শঙ্কাসুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পাবিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমাব কুটুম্বের বাড়ীতে বাধিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত বহিলাম—অন্য আশ্রয়ভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, কেননা অন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেই স্থানে বহিল।

বহুদিনে, বহুকষ্টে, আমি আবোগা লাভ কবিলাম। ক্রমে যুবতীর পবিচয় পাইলাম। তাহাব নাম রজনী—পিতাব নাম বাজচন্দ্র দাস। আমি যে বাজচন্দ্র দাসের সন্ধান করিতেছিলাম এ সেই রাজচন্দ্র নহে ত?

রজনীর নিকট চট্টতে ঠিকানা জানিয়া লইলাম। ঠিকানা বলিতে রজনী নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অন্দের তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় আপনাব প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম।

রজনী আপাততঃ সেইখানেই রহিল। আমি রাজচন্দ্র দাসের অহুসন্ধানে কলিকাতায় গেলাম। তাহাব সঙ্গে কথোপকথনে জানিলাম যে, রজনী হবেক্কা দাসের কন্যা বটে।

তখন আমি রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম। এক নিভৃত গৃহে তাহাকে স্থাপিত কবিলাম। সে আমাব কাছে স্বীকৃতা হইল, যে সে গৃহ হইতে বাহির হইবে না। বা কাহাকেও দেখা দিবে না। তৎপরে আমি প্রমাণ সংগ্রহে যাত্রা কবিলাম। পুনর্বপি গোবিন্দ কান্ত বাবুর কাছে গেলাম। বালাব মোকদ্দামাব সন্ধান তাঁহাবই কাছে প্রাপ্ত হই। সে মোকদ্দামা বর্ধমানের হয়। তাঁহাব সাহায্যে অত্যন্ত প্রমাণও সংগ্রহ কবিত সক্ষম হইলাম। বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

এখন মোকদ্দামা কবিলে, রজনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত হুইলাম। আমার অতিপ্রায়, রজনীকে বিবাহ কবি। কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী, আমার অন্য প্রাণ দানেও সন্মতা, তথাপি বিবাহ কব্রিতে সন্মতা হইল না। ভাবগতিকে বুঝিলাম যে আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, তবে আত্মহত্যা কবিলে।

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহাব বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োক্তারে আমার ইষ্ট কি? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে বিষয়োক্তারেও রজনী নিতান্ত অসম্মতা। পরিশেষে, আমার অহুরোধে তাহাতে সন্মত হইল—তাহার উদ্ধারার্থে

আমি যে আহত হইরা শয়্যাগত হইরা-
ছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অতু-
রোধে সম্মত হইল। বিষয়োদ্ধাবের পর
বিবাহ করিবে, এমনত উরসাও পাইলাম।
এবং ইহাও স্বীকার করিল যে, যত দিন
না বিবাহ হয়, ততদিন সে আমার গৃহে,
আমার পক্ষীপবিচয়ে থাকিবে। বহুকষ্টে
এ সকল কথা তাহাকে স্বীকার করাইলাম।
আমাকেও স্বীকার করিতে হইল, যে
যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি
তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিব।

কেবল আমার ঋণ পবিশোধার্থ রজনী
এতদূর স্বীকার কবিতাছিল। তাহার
পবে সে কি প্রকারে যে কঁকি দিল,
তাহা বলিয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রজনীর শাস্তিপুরে যাইবার কথা
রাজচন্দ্রদাসকে কাজে কাজেই বলিতে হ-
ইল। শুনিয়া রাজচন্দ্র বলিল যে, তবে
আমি আর কি সম্বন্ধে এখানে থাকি?
আমাকেও বিদায় দিন।

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হইল।
রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ী কিনিয়া দিলাম।
কিছু মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম।
রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বাড়ীতে
গিয়া বাস করিতে লাগিল। রজনীকেও
সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সে
অনেক যত্ন করিল, কিন্তু কিছুতেই রজনী
সম্মত হইল না। সে শাস্তিপুরে গেল।

আমি তখন একা—একা কি করিলাম?
এই কষ্টকর জীবনারণ্যে ঘুরিয়া
বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলি-
কাতাতেই রহিলাম। দেখিব, লোকালয়ে
কি স্থখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে
লাগিলাম। লোকও আমার সঙ্গে
মিশিতে লাগিল। অনেক লোক আমার
বশীভূত হইতে লাগিল। কাহাকে
কথায় বশ করিলাম, শুধু মিষ্ট কথায়,
কাহাকে আলাপে; কাহাকে অর্থের
দ্বারা বশ করিলাম, অর্থাৎ কাহাকে
অল্প নগদ দিলাম, কাহাকে ঋণেব আ-
শায় রাখিলাম। কাহাকেও ঋণ দিলাম
না—কাজ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে
কেবল পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম—
কাহারেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আরও
বাধিত করিলাম। কাহাবও পীড়ার
সময়ে আত্মীয়তা কবিতা আত্মীয় করিয়া
ভুলিলাম,—কাহারও সুখের দিনে সুখ
বাড়াইয়া দিয়া অতুগত করিয়া লইলাম।
কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া দিলাম—
লোকেব কাছে প্রকাশ কবিতাম না;—
কাহারও সুখ্যাতি সম্বাদপত্রে লিখিয়া
তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম—কাহারও
শত্রুনিন্দা লিখিয়া আরও আপ্যায়িত
করিলাম। কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প
করিয়া বন্ধু করিয়া লইলাম—কাহার
অমিষ্ট গল্প নীবেবে কাণ পাতিয়া শুনিয়া
তাহাকে প্রেমডোরে বাঁধিলাম। কাহাকে
হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাম; কাহাবও
রসশূন্য পরিহাসে হাসিয়া কিনিয়া রাখি

লাম। কেহ আমাকে ধার্মিক ভাবিয়া ভাল বাসিল—কেহ আমাকে ভাটার আপনায় মত অধার্মিক বলিয়া ভাল বাসিল। কেহ কোন জাতি বা অস্ত্র শত্রুর নিন্দা করিতে ছুঁল বাসিল, আমি বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাত জাতিনিন্দা শুনিতাম;—কেহ আপনার “কুচরিত্রা পত্নী, বা কুপুত্রের, বা ততোধিক নিন্দাই কোন প্রেমাস্পদীভূত বা প্রেমাস্পদীভূতার স্মৃতি করিতে ভাল বাসিত, তাহাও কাণ পাতিয়া শুনিতাম; উভয়েরই প্রিয় হইলাম। পাণ্ডিত্যভিমানী মূর্খের কাছে কতক গুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পূজা হইলাম—যথার্থ পণ্ডিত-দিগের সারগর্ভ বাক্যের মর্মগ্রহণে যত্ন করিয়া তাহাদিগেরও শ্রদ্ধা লাভ করিলাম। অনেকই শুধু আমার গাড়ি জুড়ি বাড়ী দেখিয়া গোলাম হইল। কেহ বা সে সকলের নিন্দা করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য ইঙ্গিতে জানাইতেন, আমি সে নিন্দা প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম—সুতরাং তাহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম। কেহ কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য! অল্পদিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, অমরনাথ ঘোষ

কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধলোক—সকলেরই প্রিয়! অল্পকাল মধ্যে দেখিলাম আশ্রয় লোকের আলার আমার দানাহারেরও অবকাশ নাই।

কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড় লোক হইব—এরূপ কোন অভিপ্রেতিতে আমি এজালা পাতিলাম না। আমি বাহা হই—আমাকে, যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে তুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছে—যেদিন চাহিবে সেই দিন প্রত্যর্পণ করিতে রাজি আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করিনাই। এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না।

তবে কেন এ জালবিত্তার? কেবল লোকালয়ে কিসুখ তাহা দেখিব, এই কাম নার। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এবিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া বাহা ইচ্ছা তাহা করুক।



ঋতুবর্ণন।*

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন, ও শোধান।

এই জগৎ শোভাময়। বাহ্য দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, বাহ্য সুগন্ধ, বাহ্য সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিধি 'পরিপূর্ণ'। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য ঋজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহাব যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি কবিতে পাবি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ কবিতে পাবিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু বাহ্য সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পুতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় বাহ্য অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বুদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বুদ্ধির নিয়মানুসারে বুদ্ধি পাই-রাছে। আরো সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনা

কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনাব নিত্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আত্মবসিক অসুন্দরের বর্ণনার সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহাও প্রকৃত চিত্রের সৃজন কবিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন কবেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অকিঞ্চল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—বাহ্য সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, বাহ্য অসুন্দর তাহা বহিস্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন কবেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইজিয়গোচর করে নাই, “যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আশ্চর্য্য প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎ

কবের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অব-
ধারণ, অভাবনীর, সত্যের বিপরীত,
প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই
নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ
কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা
প্রবন্ধারম্ভে, শোধান বলিয়াছি। যে কাব্যে
এই শোধানের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য
কেবল “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” তাহা-
কেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি
কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ
করিয়া এই কথাটি স্পষ্ট করিতে চাই।
যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধান, হেম বাবু
প্রণীত “বৃন্দসংহার” তাহার উৎকৃষ্ট
উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরি-
শুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ
পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন
করিতেছে। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া
দৈব এবং আত্মরিক প্রকৃতিতে পরিণত
হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইয়া
স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে।
যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা
জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে
আলা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই
—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে
শোধান করিয়া কবি আপনার কবিত্বের
পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদা-
হরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত শতু-
বর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট

নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য
জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশ্য।
উভয়েই কৃতকার্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু
প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটা উদাহরণে
তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই
কাব্যে বিদ্যাৎ আছে—গঙ্গাচরণ বাবুর
কাব্যে বিদ্যাৎ, উৎকৃষ্ট রূপে আত্মকার্য
সম্পন্ন করে, যথা,

ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দিকে অন্ধকার, অতিভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে
অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরি-
বার কথা কিছুই নাই। যাত্রা প্রকৃত
তাহার কিছুই অভাব নাই—তাহার
অতিরিক্ত একটি কপর্দক নাই। পরে
হেম বাবুর বিদ্যাৎ দেখ,

কিষ্ণা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
কণ প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীমভজি,
শিখর শিখর লজ্জি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া হুল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অঙ্গিকুল ভরাকুল ছাড়ি ঘোর রাবে,
বেগে দীপ্ত গিরি কার,
বিদ্যাৎ আবার ধার,
ছড়াবে অলঙ্কার শিখা উল্লাসিত তাবে॥

হানান্তরে বিছাৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষিত প্রাপ্ত;—

কেমনে তুলিব বল, মেঘে যবে আশ্রয়
বসিত কাম্যুক ধরি করে।

তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটাকরি লহরে লহবে ॥

একধে গজাচরণ বাবু প্রণীত হই
একটি “আলোকচিত্র,” পাঠককে উপ-
হাব দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক
উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহ দাহ বর্ণনা
কবিতাছেন,

বাবু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখে অগ্নি বোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, বজ্র, বাঁশ শক্তি তাব পোষিছে;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্তি খেলিছে;
বশ্মভাগ বক্রবাগ পল্লিমাঝ মেলিছে;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহি মাতিছে;
শূত্রপুবি ভুবি ভুবি বিকুলিঙ্গ ভাতিছে;
ধূমবাশি ভাসি ভাসি উর্জদেগ যাইছে;
ভস্মভার অন্ধকাব অন্তবীক্ষ ছাইছে;
উচ্চবোল সোবগোল তাপতেজ বাড়িছে;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্য শব্দ ছাড়িছে;
ধেমুপাল আলখাল উরু ফুক চাহিছে;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গায়িছে;
“বাবিআন” “চালটান,” লোকপুঞ্জ হাঁকিছে;
দীনতার কাতরায় দেবতার ডাকিছে;
দুর্গা, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে,
বাস্পবারি কুস্তবারি একতায় চালিছে;
আর্জুনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে;
কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে;
মুক্ত কেশ, ছিন্ন বেশ, দৌড়াধৌড়ি ধাইছে;

তপ্তঅঙ্গ, চিত্তভঙ্গ, পানবারি চাইছে;
গেল বাস, সর্বনাশ, বাপবৃদ্ধ কাদিছে;
একি দাঘ! চোবতায় চৌর্য্যবৃত্তি সাধিছে;
বহ্নিঝাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে;
মাস, মৃগ, তৈল, পুগ, খার আর বাগিছে;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কুটিছে;
হার হার! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে;
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে;
গ্রামখণ্ড ব্রহ্মভণ্ড অগ্নিচণ্ড নাগিছে,
দাহিবাব নাহি আব ধিকি ধিকি থাকিছে,

নিয়োকৃত কয় ছত্রে বাতাব পব
প্রকৃতিব অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

দেখি গিয়া পবদিন, জনপদ শোভা হীন,
লণ্ডভণ্ড মানব বসতি;

হুবাচাব প্রভঞ্জন দৌরাঘ্যার নিদর্শন
গেছে বেবে, শোচনীয় অতি;

কতশত তরুবার মূলসহ কলেবব
মৃত্তিকায় কবেছে বিস্তার;

আব নাহি তুলি কায়, পথিকেবে দিবেছার্য,
ফল ফুলে তুষিবে না আর।

ভাহাদেব অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে গড়ে এখানে সেখানে;

কত বৃক্ষ কাণ্ড সাব, নাহি শাখা অলঙ্কার,
স্তাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে।

নরবাস আলখাল, গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে;

অনেক ইটের গেহ তাজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।

পথে চলা কষ্ট অতি, ডালে চালে রোধগতি,
হাদ্রৈ স্থানে সেতুর নিপাত;

বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে হোকান পাট,
 হানে বুদী শিরে করাধাক।
 মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে, মরে মরে আঁছেপড়ে
 যেহু নেব মহিব বিস্তর;
 কত নরভাগ্য দোবে পড়িয়া বজ্রার রোষে
 গেছে চলে শমনের ঘর।
 ভাসেশব নদীনীরে, কত বা লেগেছে তীরে,
 কত জব্য শোভে ভেসে বায়,
 উলটিয়া কত তরী ভাসিছে সলিলোপরি,
 ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
 বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
 বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
 নর নারী হতজ্ঞান, হয়ে অতি শ্রিতমাণ,
 ফেলিতেছে নরনের জল।

আমরা যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করি-
 লাম, উভরেই শোধানশূন্য উৎকৃষ্ট বর্ণ-
 নার উদাহরণ। গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা
 পড়িয়া, ইংবেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব
 (Crabbe) কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের
 সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দেশ করিতেছি
 বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনা
 কাব্য হ্রস্বতঃ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহি-
 তোশোধান এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই
 প্রাচুর্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈ-
 ঙ্গব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধানপটু।
 বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
 একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ
 দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধান কাব্যেও
 অপটু নহেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভাত
 বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মরি কি তরল অমল কিরণে,
 চল চল আভা চালিয়া ভূষনে;
 পুলকজনক আলোক ভূষনে,
 প্রাচী নতোষার উষা উপনীত,
 আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
 সে হাসি হিম্মোলে চরাচর ভাসে,
 নিশার তামস নিশার আকাশে,
 হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী মাধুরী করি দবশন
 প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
 আদরেতে কর করে প্রসাবণ,
 রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
 অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
 শান্তির সহিত শোভাব মিলন,
 সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
 জাগায় জগৎ মধুব ধ্বনিতে।

সুধীর গমনে সমীর শীতল
 চলেছে জুড়তে তাপিত ভূতল;
 প্রফুল্ল আননে প্রসন্ন সকল
 পরশনে তাব নাচে ধীরে ধীরে:
 নগিনী নিকর তাহার হিম্মোলে
 কাচসম স্বচ্ছ সবসীব কোলে
 হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
 নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা
 নির্দোষ হইতে। এই ঋতুবর্ণনে ছয় ঋতুর
 বর্ণনা নাই—আপাততঃ বসন্ত এবং নিম্না-
 ঘই প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বসন্ত
 হইতে নির্দোষ সর্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট এবং

এতদন্তর যে ভিন্ন২ সময়ের রচনা তাহা
বিলক্ষণ বুঝা যায়। নিদাঘের উৎকর্ষ
হেতু আমরা নিদাঘ হইতে উদ্ধৃত
করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা
করি যে গঙ্গাচরণ বাবু এই ঋতুবর্ণনা
সম্পূর্ণ করিয়া আমাদেরই আনন্দ বর্ধন
করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ
করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহাকে আ-
মরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না—না
বলিলেও তিনি আমাদের উপর অস-
ন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্যা
এবং মার্জিতকৃষ্টি লেখক কখনই আপ-
নার রচনাব দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হই-
বেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে
বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিতা আছে,
এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।

পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে,
ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোন২
অংশ বাদ দিলে ভাল হয়। উদাহরণ—
ইকুরস বর্ণনা ইত্যাদি।

অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কবী গুড় অপরূপ।

কিবা মিষ্ট তার তার না হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ ॥

গুড় হতে তারে তার হয় চিনি চমৎকার
মুখা সম যার আশ্বাদন।

ভোগ মুখ বাড়তে তার নানা দেশে লয়ে যার
বাগিকেরা বাগিচা কারণ ॥

এই যে ভারতবর্ষে নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধরগণ।

সেই জলে যত চাষী উৎপাদিয়া শস্তরাশি
কবে দেশ লক্ষী নিকেতন ॥

যত ধনী মহাজন বাঁধে গোলা অগণন
পুরে তার খন্দ নানা মত।

প্রতুল ঐশ্বর্য্য হয় সতত স্বাধীন রস
কত লোক হয় অমুগত ॥

গঙ্গাচরণ বাবুর পদ্যের গঠন দেখিয়া
বোধ হয়, তিনি রহস্যকাব্যে সফল হইতে
পাবেন। ঋতুবর্ণনে রহস্যের কোন
উদ্যোগ দেখিনাই—কিন্তু ভবিষ্যতে
চেষ্টা করিলে কি হয়, বলা যায় না।



মিল, ডার্বিন, এবং হিন্দুধর্ম।

প্রচলিত হিন্দুধর্মের শিরোভাগ এই
যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্২
মূর্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন
করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস
করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত।

বেদ অমূল্যসম্বল করিলে একুপ বিশ্বাসের
কিছু অমূল্য পাওয়া যাইতে পারে।
দর্শনে যে পাওয়া যায়, তদ্বিবয়ে সংশয়
নাই। কিন্তু একুপ বিশ্বাসের কোন
নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া যায় কি?

অনষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহা মধ্য একটাই সারবান। জগতের নির্মাণ কৌশল হইতে তাহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহা সঙ্কটের ছিল, এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্মাণ কৌশল সত্য হইতে পারে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমন নহে, তিনি স্বীয় প্রবন্ধ মধ্য তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নির্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যতা সত্য পরীক্ষিত এবং নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে কাল বিলম্বের প্রয়োজন। কাল-বিলম্বের সে যল তিনি পান নাট। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাট। নির্ভর করিতে পারিলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর গণিতগণ কর্তৃক

তাহার মত আবৃত্তি এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ এবং দর্শনবিদ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাত্মক, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাত্মক তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের প্রমাণনিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাণ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ একটা তত্ত্ব গ্রহণ করা যাক। জগৎ নিত্য না স্থিতি? জগতের আদি আছে না আদি নাই? যদি বল আদি আছে, সে আদির প্রমাণ কি? কিছু না। তবে আদির প্রমাণাত্মক, জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ। যদি বল আদি নাই, তাহা হইলে বা প্রমাণ কি? এখানে প্রমাণাত্মক জগতের সাদিত্ব বা স্থিতি সিদ্ধ। অতএব জগৎ সাদি এবং অনাদি—স্থিতি এবং অস্থিতি—উভয়ই প্রমাণ হইয়া উঠে। অস্তিত্বের প্রমাণাত্মক অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ শূন্য দ্বারা বলিবেন, তাহা বা বলিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণ বিরুদ্ধ বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং পণ্ডিতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক ঈশ্বর

স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর
আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার?
এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এখানে স্পষ্টীকরণ
আবশ্যিক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আ-
ছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার
করিয়াও তৎপ্রতি অষ্টা বিধাতা ইত্যাদি
পদ ব্যবহার করেন না। অল্পে বলেন,
ঈশ্বর ইচ্ছা প্রযুক্তাদি বিশিষ্ট—এই জগ-
তের নির্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের
সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শ-
নিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা
জানি না, জানিবার উপায়ও নাই;
ইহাতে কেবল জানি, যে সেই, জগৎ-
কারণ অজ্ঞেয়। হার্টস্পেন্সর এই
সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে
ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন,
তিনি একরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছা-
বিশিষ্ট, জগদ্বিশ্রীতা স্বীকার করিয়াছেন।
স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের সীমাং-
সায় প্রযুক্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা
সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষ
রূপে নির্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি,
জ্ঞান এবং দয়া।* তাঁহাদিগের মতে
ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমামূল্য—অনন্ত।
অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, এবং দয়াও

অনন্ত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ,
এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।
তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্মাণ-
কৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব
স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাঁহার
শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত
হইতেছে। কেননা যিনি সর্বশক্তিমান
তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল
কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল
ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই
কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্বশ-
ক্তিমান, ইচ্ছার সকলই করিতে পারেন,
তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না।
কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্র কৌশলের
উদ্দেশ্য কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি
মহুষ্যের একরূপ শক্তি থাকিত যে, সে
কেবল ঘড়ির ডায়াল প্লেটের উপর কাঁটা
বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিরম মত চলিত,
তবে কখন মহুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া
ঘড়ির স্প্রিংয়ের উপর স্প্রিং এবং হইলের
উপর হইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর
যে সর্বশক্তিমান নহেন, ইহা সিদ্ধ।

একথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্তু
হিন্দু ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অসুসঙ্গান
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল
কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি।
সে সকল আপত্তিও মিল সম্যক্ প্রকারে
খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর
সর্বজ্ঞ কি না তাহা বিবেচনা সন্দেহ। যে

* The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—First Principles. p. 108.

প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্মাণে কৃত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বাবণ করিতে পারেন নাট, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পীড়া হয়, এবং সেই ব্যাধিব ফলে পুনঃ সংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে, যে এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, কিন্তু সর্বশক্তিমান নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনু-

ষ্যাদি যে সর্বশক্তিমান নহে, তাহার কাবণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্বত উৎপাটন করিয়া সাগর পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক মা থাকিলে, সকলেই সর্বশক্তিমান হইত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিয়ের জন্য সর্বজ্ঞতা তাহাব অতিশ্রেষ্ঠ কৌশল নির্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পাবেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্মাতা মাত্র, তিনি যে অষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাট। তুমি তাহাব নির্মাণ প্রণালী দেখিয়াই তাহাব অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্মাণ প্রণালী হইতে কেবল নির্মাতাই সিদ্ধ হইতে পাবেন, অষ্টা সিদ্ধ হইতে পাবেন না। ঘাটের নির্মাণ দেখিয়া তুমি কুস্তকাবের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুস্তকাবকে সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর অষ্টা নহেন কেবল নির্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্বে হইতেছিল—ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। ঘট দেখিয়া কেব-

ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কৃষ্ণকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব হইতে ছিল, কৃষ্ণকাবের সৃষ্ট মর্মে, একথা বলা বিচার সম্ভব হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমা নির্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থেব এমন কোন দোষ আছে, যে তজ্জন্য উহা ঈশ্ববেবও সম্পূর্ণরূপে আবৃত্ত নহে। সেই কাবণে বহু কোশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্য সকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আব একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিবোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যেব প্রতিবন্ধকতাব চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেবও কল্পনা কবিতে পাব। পারসিক দিগের প্রাচীন ঐতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহার বলেন যে এক জন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আব এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। ত্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সন্নতানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরবতঃ স্বধর্ম্মীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন কবারই কাবণ দর্শাইবাছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত “প্রকৃতি তত্ত্ব” স্বধর্ম্মীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠপোষক করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাঁহা কোন মনুষ্যকে

কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখ ভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য্য মাত্রই কেবল দুঃখ মোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাজী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কবেক পংক্তির মর্ম্মাভুবাদ কবিতেছি। মিল বলেন—

“যদি এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা কবেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্ববেব অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তাব নাই।” যাহারা

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

“Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road.In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's every day performances. Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives, and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life,

মহুযা প্রতি ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সম-
র্থন করিতে আপনাদিগকে 'যোগ্য' বিবে-
চনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বা-
হারা মতবৈপরীত্য শূন্য, তাঁহারা এই

nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones, like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes, them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations, and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabia or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprises, and often as the direct consequence of the noblest acts; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the

সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য,
হৃদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির
করিয়াছেন যে, দুঃখ অন্ততঃ নহে।
তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলার

clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live; and nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district; a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias.....Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence.—*Mill on Nature*. p. p. 28-31.

এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের জ্ঞান তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মনুষ্যের ধর্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পবিত্রতাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে জ্ঞান কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের জ্ঞান, সৃষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টি প্রণালী, লোকের সুখের পক্ষে বেরূপ অমুপযোগী, লোকের ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অমুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম-ধর্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অনাপেক্ষা অধিকতর ছক্খিয়ারাকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যান্যগ্রন্থ সংসারে স্থান পাইত না; সর্বত্র সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় জুলা মনুষ্যজীবন অভিযাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতি যুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ, ইহলোকে যে ধর্ম-

ধর্মের সমুচিত কল থাকি থাকে, লোকা-ন্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পর-কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই সর্বতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করার অবশ্য স্বীকৃত হয়, যে ইহ জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সৃষ্টিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণ-নীয় নহে যে তিনি তাহা পুণ্যম্মার পুর-কার এবং পাপাচার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্মই পরমার্থ এবং অধর্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্মাদ্বৈত যাহাব' যেমন কর্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই† বহুলোকে সর্ব প্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ মাতৃ দোষে, সমাজের দোষে, নানা অশুভ ঘটনার দোষে, এরূপ হয়;— তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম প্রচারক বা দার্শনিক দিগের ধর্মোচ্চাঙ্গে শুভাভিত সম্বন্ধে যে কোন প্রকাব সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসন প্রণালী দয়ানু ও সর্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।”‡

এই সকল কথা বলিয়া মিল বাহা ব-

† গ্রীটান ইউবোপে একবার উক্তর নাই। পুনর্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

‡ *Mill on Nature*. p. p. 37-38

লিয়াছেন, তাহার এমন অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্মাতা বা পালন কর্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত-স্বসঙ্গত। মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

“The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good cannot at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account.”*

যদি এ কথাই কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা, এবং সংহারকর্তা স্বতন্ত্র, এমন কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি এক জন পৃথক্ সৃষ্টিকর্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে

হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্ত লিখেন নাই। তিনি নির্মাণ কৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায় বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে বাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ বায়ু বারি মৃতপ্রভৃতি, সকলই সেই রূপে নিশ্চিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নিশ্চিত। অতএব সকলই সেই নির্মাতার কীর্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা বাহাকে বলাবায়, ঈদৃশ নির্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত তাহা নিশ্চিত কি না—নির্মাতার হস্তপ্রসূত কিনা—তাঁহার কেহ স্রষ্টা আছেন কিনা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এই টুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্মাতাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাহাকে পাইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নির্মাতা এবং পালন

* *Mill on Nature...* p. 38-39.

বা রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে, কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায়, যে জন্ম ও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষা ও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্মাণ, বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষা ও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ বক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অল্পজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অল্পজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ।

তবে, পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক্, একপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে যিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, অগতঃ ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই

আধিক্য দেখা যায়। বাহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, একথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের ভুল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা, ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন” পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে, যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সঙ্গীর্ণ। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব, অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণু মধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বাহাদিগের বাহ্যিক বা আত্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, যে তদ্বারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে,

কিছা অন্য প্রকারে জীবন রক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বহুজাতীয়, একরূপ চতুর্দশ আছে, যে তাহা বা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহা বা কেবল সর্ক-নিম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহা বা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা উর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে পাবিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্কনিম্নস্থ শাখা সকল ফুটাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্থল বাই আহার পাঠবে—হৃৎস্থকরা অনাহারে মরিয়া বাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন। দীর্ঘ ক্ষুদ্রেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে বঞ্চিত হইল। হৃৎস্থকদের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ বক্ষা হইতে পাবে না। পাবিলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ একটি সামান্য বৃক্ষ কত সহস্র বীজ জন্মে; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত অণু প্রসব করে। যদি সেই বীজ, বা সেই অণু, সকল গুলিই বক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেট এক বৃক্ষেই, বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অত্র বৃক্ষ বা অত্র জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণু প্রসব করে, (ইহা অন্যরূপ কথা নহে) তবে

দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে বোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে তাহা শুদ্ধ কর হিসাব করিয়া উঠিতে পাবেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচবাচব হয় না, অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুষ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্বত্র এই রূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব কবিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হতীও অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষ্যও নহে কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে অতি নূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হতী সমুৎপন্ন হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষ বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ বক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

একপে পাঠক ভাবিয়া দেখুন একটি বার্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু—পরে ভাবুন বার্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে।

* *Origin of Species*—6th Edition. p. 51

তাহা হইলে একটি বার্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর ২ প্রাতি বৃক্ষের সহস্র ২ বার্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্তাকু বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্তাকুর স্থান হয়?

চৈতন্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সঙ্ক্ৰান্ত রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পবিধানে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে স্রষ্টা ও পাতা এক, একথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্ পাতা পৃথক্ একথা বলাই সম্ভব?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীব ধ্বংসের জন্য একজন সংহার কর্তা কর্তব্য করিয়াছে। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কার্য্য—যত সৃষ্টি হয় ততই যে রক্ষা হয় না, ইহা তাহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, ততই যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহার কর্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিপ্রায় নহে, এমত কর্তব্য নহে। যেখানে তিনি

সর্বশক্তিমান্ নহেন, কর্তব্য করিয়াছে, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাহার অভিপ্রায় নহে ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহার ও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায়, যে এজগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীব সৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যপেক্ষা অদূর্বদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময়—জীবমুজ্জন প্রণালী অপূর্ণ কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরিং প্রমাণ আছে। যাহার এত কৌশল তিনি কখনও অদূর্বদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাহাকে অদূর্বদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্য প্রণীত একথা আর বলিতে পারিবে না, কেন না অদূর্বদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে, বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূর্বদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালন কর্তা,

অপরিমিত জীব সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে।
অন্য পালনকর্তা হইতে পৃথক্ চৈত-
ন্যকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কল্পনা করা অস-
ম্ভব নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, যে,
অষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে, যে অষ্টা
নিফল সৃষ্টিতে প্রযুক্ত; চৈতন্য নিফল
কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ আপ-
ত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা,
কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা
হইতে অষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে
সৃষ্টি জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া
বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই।
সৃষ্টি তাঁহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং
সৃষ্টি হইলেনই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা
হইল—রক্ষা নাই হইলেও সে অভিপ্রায়ের
নিফলতা নাই।

অতএব, অষ্টা, পাতা, এবং হর্ভা, পৃথক্
পৃথক্ চৈতন্য এমত বিবেচনা করা,
অসম্ভব এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই
হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই
অষ্টা, পাতা ও হর্ভা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে
আমাদের কবেকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে এই
ত্রিদেবের উপাসনা এই রূপে ভারতবর্ষে
উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস
করি না যে ভারতীয় ধর্মস্থাপকগণ এই
রূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের
কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা-

দিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু কৃত্যাদি
হইতে। বৈদিক বিষ্ণু কৃত্যাদি বৈজ্ঞানিক
সম্ভব নহে, ইহার মধ্যেই প্রমাণ বেদেই
আছে। কিন্তু পাতৃহ হর্ভুহ অষ্টদেবের
সূচনাও বেদে আছে। তবে অধিতীয়
দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক
এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল,
জন সাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে
অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্তব্য যে
উহার স্মৃষ্টি নৈসর্গিক ভিত্তি আছে।
লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি
কি তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই
ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে
বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই
এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পা-
ওয়া যায় না, যে তদুপা এই ত্রিদেবের
অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া
স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর
ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই, যে জগতের নির্মাণ কৌশলে
চৈতন্যযুক্ত নির্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হই-
তেছে এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদে-
বের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া সংস্থাপিত
হইয়াছে। কিন্তু প্রথম-সৃষ্টি ভ্রান্তি-
জনিত; প্রাকৃতিক নির্মাচনের ফলকেই
নির্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম
হয়; সেই ভ্রান্তি জানেই আমরা নির্মা-
তাকে সিদ্ধ করিয়াছি। নচেৎ নির্মাতার
অস্তিত্বের নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্মা-
তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা

সংহার কর্তা, এবং পৃথক্‌র স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্যাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই, যে সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়মতা সেখানে পৃথক্‌ সঙ্কলন কবা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণ বিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা স্মরণ্য প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আত্মমুখিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্দোষ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাস

সের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি না।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় আতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্মোপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু এক জন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলিত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

পঞ্চম, অনেকের বোধ হইবে যে এ সকল কথায় আমরা উপধর্মের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। * কিন্তু প্রচলিত একেশ্বরবাদ যে উপধর্ম নহে একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিবেচনায় ত্রিদেবোপাসনাও উপধর্ম, প্রচলিত একেশ্বরবাদও উপধর্ম, এবং নাস্তিকতাও উপধর্ম। হইতে পারে একোপাসনাই প্রকৃত ধর্ম,—আমরা সে কথা অপ্রমাণ করিতে পারি না। আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই সন্ধান করিয়াছি; এবং বিজ্ঞান ত্রিদেবের অপেক্ষা সর্বশক্তিমান একেশ্বরে অধিক আদর করেন না ইহা দেখাইয়াছি। তবে যদি কেহ বলেন যে বিজ্ঞানের কাছে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিব না, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

যষ্ঠ। বাহাবা হিন্দুধর্মের পুনঃ সং-
স্থাবে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমবা জিজ্ঞাসা
কবি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন
অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনরুজ্জীবন
অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকা-
মুমত হয় কি না?

সপ্তম। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে
এমত কথা আছে যে তদ্বাচ্য অনেকে
বুঝিতে পাবেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক
প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ
কথা আমবা বলি নাই, তাহা অভিপ্রেতও
নহে। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, দয়াময়

এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা
অসিদ্ধ, ইহাই আমবা বলিয়াছি। জগতেব
নির্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন।
কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদেঃ প্রমাণীকৃত
হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিরা, সর্বত্র
সর্বকার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অ-
জ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ,
বহির্জগতেব অন্তবাসী স্বরূপ। সেই
মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার কবা দূরে
থাকুক, আমরা তত্ত্বক্ষেপে তজ্জিভাবে
কোটিকোটিকোটি প্রণাম কবি। আমরা
ত্রিদেবেব উপাসক নহি।



সুখচর ।

যথা বম্য মকদ্বীপ মরু ভূমি মাঝে
জুড়ায় পথিক অঁখি শ্যামল শোভায়,
এ স্মৃতি নয়ন পথে তুমিও তেমনি,
সুখধাম সুখচর—সতত স্মদব!

তব সেই সর্বোবব—কুসুম কানন—
বিশাল রসাল রাজী—চির দিন তরে
কে যেন রোপেছে আনি ক্ষময়ে আমাব।
যখন সংসার তাপে জলে এ অন্তর
ফিরাই কাতব আঁখি জুড়াইতে জালা,
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা;
সমীরণ আন্দোলিত কুসুম, পল্লব,
সবসী শীতল বাবি, তৃণ স্ন্যামল।
বহুদিন হল আজি,—এখনো তেমনি,—
নাবিব ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন।

আব কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময়?
জানি না অদৃষ্টে মম লিখেছে কি বিধি!

আব কি ভ্রমিব আমি সে কুল হৃদয়ে
মধুব বিজন স্থানে—বৃন্দাবলিমাঝে?
মবি কি স্মৃথের দিন গিয়াছে চলিয়া!
স্মৃতি মাত্র রেখে গেছে তৃষিতে ক্ষদ্র!

মধুব বসন্ত নিশি—প্রভাত মধুব—
মধুর ঘূমেব ঘোরে পশিত শ্রবণে
অক্ষুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি-লহরী,
বাতায়ন সন্নিহিত শাখা দল হতে
মাঝে মাঝে স্ককণ ‘বেউ কথা কও’—

“বেউ কথা কও” রবে ব্যথিত হৃদয়—
ভাবিতাম এত কিরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে তবে কি কারণ—
মিছা দোষে—মিছা ভ্রমে—মানেতে মজিয়ে
প্রিয়জনে প্রিয়জন দেয় এ বাতনা?

শুনিতাম স্মৃথে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই; প্রভাত সমীর—

গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ নির্জন পুলিনে—
‘অবিরাম সেই ধ্বনি স্বপনের মত’
মিশায়-মধুর ভাবে স্বচ্ছ ক্ষুটিকের
হুলায়ান ঝালরের ঠুন্ ঠুন্ রবে,
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;—
আবার ঘুমের ঘোরে মুদিতাম আঁখি।

ক্রমে দিক্ পরিকার;—বিহঙ্গ কুজন,
গ্রামবাসি-কোলাহল, বাড়িতে লাগিল;
মাঝে মাঝে যাত্রী তরে নাদিক চীৎকার
শুনায় মূহ্ মূহ্ জাহ্নবী উপরে।—
এইরূপে পোহাইত-সুখদ যামিনী।

উষার কোমল বিভা শোভিলে গগনে
যেতাম প্রফুল্ল মনে ভাগীরথী কূলে
দেখিতে তরঙ্গ-রঙ্গ প্রভাত সমীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা ভুঞ্জিতে বিরলে।

ক্রমেতে উঠিত রবি কিরণ বিস্তারি,—
কষিত কাক্ষন যেন সোহাগে গলায়ে
ঢালিত গগন গায় পূর্বদিক্ ব্যাপি,
নিখিল সরসী জলে—শ্যামল পাতার
সুবর্ণ বারির ছটা দিত ছড়াইয়া;
অবশেষে তটিনীর তরঙ্গ নিকরে
অযুত তপন-রশ্মি পড়িত আসিয়া—
সেই সে সুবর্ণ রাগে হইয়া জড়িত
অসংখ্য লহরী মালা ঝিক্ ঝিক্ করি
নাচিতে লাগিত রঙ্গে জাহ্নবী হৃদয়ে।
ক্রমে সেই রবিকর হইলে প্রথর,
পশিতাম দৃষ্ট মনে আপন মন্দিরে।
পুরাতন বাটী সেই তটিনী-পুলিনে,
তিম দ্বিষ্টে লতা পাভা কুসুম উদ্যান,

পশ্চিমে সরিৎগঙ্গা—সোপান উপরে
লৌহময় দ্বার ভায় প্রবেশিতে পুরে।—
রম্য স্থান—রম্য বাটী—রম্য সে তটিনী,
জীবন স্বপনমত বহি যায় হেথা!

মধ্যাহ্ন-মিহির-করে ধরণী যখন
জলন্ত অনল রূপ করিত ধাবণ,
নীরব বিহঙ্গ যত,—কেবল কোথাও
অমঙ্গলকপী সেই কালাস্ত-বাহন
বায়সের কা! কা! রব—ভষিত চাতক
সকাতর যুহুস্বর স্রুহু হইতে
অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;,
জুড়াতে নিদ্রাঘ জালা বসিতাম গিয়া
বিশাল-রসাল-মূলে নির্জন কাননে।
পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর—তাহাব পুলিনে
সুশ্যামল তৃণদল ছলিছে বাতাসে—
ঢলিছে পল্লব-কূল—লাগিছে অন্ধেতে
শীতল দক্ষিণ-বায়ু ঝুন্ ঝুন্ করি—
মীরবে ঝরিছে পাতা—ধরিছে ধরণী—
জগত জীবের মাতা—যতনে অন্ধেতে।
মর্ মর্ পত্র শব্দে—“শীতল ছায়ায়,
মুদি আঁখি দেখিতাম কতই স্বপন—
কতই কোমল ভাব উঠিত এমনে—
কেমনে-কাহাবে-আমি কহিব প্রকাশি—
বুঝিবে বা কেবা। জলিলে সংসারতাপে,
হৃদয় জালায় যদি ঘাই কার কাছে—
প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু, প্রিয় সহবাসে
বিশ্রুণ অলিয়া উঠে সে আঁরা আমার!
ওহ মা তোমার শাস্ত শ্যামল-মূর্তি
দেখিলে নয়নে মোর জুড়ায় জীবন!
আর কিছু এসংসারে ভাল নাহি লাগে!

বৃক্ষ-অস্তুরালে ক্রমে নামিলে তপন,
 ব্যাপিলে সুখদ ছায়া ধরণী অঙ্গেতে,
 উষ্ণিতাম তথা হতে। সরসী উত্তরে
 আছে এক তীর্থরম্যা, পূর্ব পাশে তার
 একটি বকুল গাছ,—দেখিতে সুন্দর,
 নিবিড় পাতায় ঢাকা, নবীন বয়স,
 অসংখ্য বকুল ফল রাঙ্গা রাঙ্গা তার;
 নীল, পীত, নানাবর্ণ ক্ষুদ্র পাখী কত
 রাঙ্গা ফল লোভে আসি বকুল শাখায়
 বসিয়া মনের সুখে গায় নিরন্তর!
 এই তরুতলে আসি বসিয়া তপন,
 শীতল সলিল মাখা মন্দ সমীৰণ
 সেবিতাম মন সুখে সোপান উপরে,
 দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মৎস্যদের ক্রীড়া,
 মৎস্যরক্ষ-মৎস্যধবা—আবো শোভা কত
 মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে।

পবে বেলা ঝিক্‌ মিক্‌ কবিতা আসিলে
 তাজি সে বকুল তরু, তাজি সরোবর
 যেতাম জাহ্নবী কূলে মনের আনন্দে
 দেখিতে তপন অন্ত তবঙ্গিনী পাবে,
 দ্বাদশ মন্দির পাছে, অপূর্ব সে দৃশ্য!
 প্রাচীন দেউল সেই, কৃষ্ণ স্বৈতবর্ণ—
 সম্মুখে দ্বাদশ ক্ষুদ্র পাদপ সুন্দর;
 দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা বহিছে নিম্নেতে!
 পবিত্র তটিনী বাবি—মোক্ষদা মহীতে!
 পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্তৃত।
 দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে
 রবি অন্তঃশোভা, নারিবে তুলিতে কভু।
 এক দিন সূর্য্য অন্ত দেখিবার আশে
 গেলেম গঙ্গার কূলে, দেখিহু গগনে

নাহিক তপন; শুদ্ধ নীল মেঘ যত
 নিবিড় ব্যাপিয়া নভে বলি প্রাস্ত প্রায়;
 আগ্নেয় নক্ষত্র এক দেখিহু সহসা
 ফুটিয়া নীবদ টাঁদ জলিতে লাগিল;
 বিশ্বয় হইহু হেরি সে দৃশ্য গগনে!
 ক্রমশঃ বাড়িল তাবা বোধ, হল যেন
 অগ্নিময় রাজ্য এক আছে মেঘ পাছে।
 তপন মণ্ডল শেষে হইল বাহির!
 চারিদিকে নীল মেঘ, সে মেঘের গায়
 সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আসিয়া।
 ক্রমে নীল তল হতে গোলাপরঞ্জিত
 বিচিত্র গগন গায় নামিল তপন,
 সুবর্ণেব চাপ্‌ যেন—মধ্যদেশ তার
 বিভক্ত শামল মেঘে, দৃশ্য মনোহর!
 অবশেষে তাত্র বর্ণ ধরিয়া তপন
 ডুবিল মন্দির পাছে দেখিতে দেখিতে।

দিবা অবসান। ক্রমে আইল যামিনী;
 পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলাষ পশিল,
 সন্ধ্যাব উজ্জল মণি শোভিল গগনে;
 নৌকায় জলিল দ্বীপ সহস্র আলোক
 ভাতিল বিমল জলে জাহ্নবী হ্রদয়ে,
 শাস্ত ভাব ধরি মহী লতিল বিরাম।
 হইলে চাঁদনী বাতি, উষ্ণিত যখন
 রজতের চাপ সম বৃক্ষ অস্তুরালে
 ভুবন মোহন সেই সুবাস্তু সুন্দর,
 হাসিত কুসুম কুল—হাসিত কানন,
 হাসিত জাহ্নবী দেবী—হাসিত গগন,
 কুসুম স্তবকমাঝে পশিয়া দুজনে
 আমিও আমার প্রিয়া—তুলিতাম কত
 মল্লিকা, মালতী, যুধি, সুগন্ধী কুসুম;

সেই সে ফুলের দল একজ মিশায়
মনোহর মালা প্রিয়া গাঁথিত যতনে,
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্দ্রালোকে
বিয়ল চন্দ্রিকা মাথা ফুল দল পাশে
প্রেয়সীর মুখচন্দ্র হয়েছে মধুর!
অনিমেষ মুখপানে থাকিতাম চাহি।
অবশেষে সেই মালা দিতাম পঁরায়ে
হুজনে হুজনে- গলে প্রেমের সোহাগে,
হাত ধরা ধরি করি পশিতাম গৃহে।
যথা সেই স্তম্ভ প্রান্ত অর্ধচন্দ্রাকার,
মর্ম্মর খচিত তল প্রকোষ্ঠ স্নানর,
বসিতাম গিয়া তথা। সম্মুখে ছাছবী,
অবিরাম বীচিরব পশিছে শ্রবণে,
হ হ করি সমীরণ বহিছে তথায়,
উদাস করিছে মন—এসংসার হতে
কোথা যেন অন্তরিত করিয়া রাখিছে।
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন মন্দিবে,
লভিতে স্বপ্নদনিদ্রা স্বপ্নদ শয্যায়,
দেখিতাম চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল সে গৃহ
নিদ্রিত গৃহস্থ সব—নীরব জগত;

কেবল কখন হৃদব বাজনা শব্দ,
কভু বংশীধ্বনি, কভু নাবিক সঙ্গীত
নিখব আকাশ তলে তুলিছে তরঙ্গ,
মধুব বসন্ত-বায়ু বহিছে মধুব;
অবশেষে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নিয়ন
সুখের স্বপ্ননক্সোতে যেতাম ভাসিয়া।

কভু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে
বসিতাম নীলাতলে ভাগীরথী তীরে।
কহিত আমারে প্রিয়া “দেখ কেবা আগে
দেখিবাবে পায় তারা একটা আকাশে।”
‘একদৃষ্টে হুইজনে আকাশের পানে
একটা তারার আশে থাকিতাম চেয়ে,
দেখিলে একটা তারা প্রেয়সী আমার
কবতালি দিয়া উঠি সদপে কহিত,
“দেখেছি আগেতে তাবা ওই যে আকাশে!”
এই মত কত দিন যাপিহু তথায়।
আর কি সুখের দিন আসিবে কিবিয়া?
না এ জন্মের মত গিয়াছে চলিবা?
শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।



দেবতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগতে সজীব নির্জীব দুই প্রকার
পদার্থ আছে। সূত্রাং বিশ্বকারণসম্বন্ধে
কোন কণ কল্পনা করিতে হইলে, হয়
জড়জগৎ নতুবা প্রাণিমণ্ডলী এ দুয়ের
মধ্যে একটিকে অবলম্বনভূমি করিতে হয়।
জড়জগতের তিমিরহারী আলোকপ্রকাশে

এবং প্রাণিমণ্ডলীর জীবোৎপত্তি ব্যাপারে
যেক্ষণ সৃষ্টিব ভাব লক্ষিত হয়, সেক্ষণ
আর কিছুতেই হয় না। এ নিমিত্ত এই
দুইটা ঘটনা লইয়াই প্রাচীন কালে যথা-
ক্রমে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই
দুই প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তিত

হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বেদ, পারশ্বের জ্যোতিষশাস্ত্র, এবং গ্রীসের ইলিগড্ ও ওডিসি, পাঠ করিয়া জানা যায় যে প্রাচীন আর্যেরা দেবোপাসক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিক অসুসঙ্গত ঘাণা নির্ণীত হইয়াছে যে কাঙ্ক্ষী, আসিবীর, মৈসরীর, ফিনিসীয় প্রভৃতি অনার্যজাতিদিগেব মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিপোপাসনা প্রচলিত ছিল।

পূর্ব পবিত্রদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পার্থিব অগ্নি, অন্তরীক্ষ বিহারী অশনিধাবী ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে অর্যদিগেব প্রধান উপাস্ত দেবতা ছিলেন; এবং অন্ত সকল দেবতা তাঁহাদিগেবই কপাস্তব বা নামাস্তব বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবতাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌব প্রকৃতিসম্বন্ধে আমবা পূর্বে কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে করেকটা কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই।

বেদে শিব নামে কোন দেবতা দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে শিবশব্দেব প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন তিনি সং-হাবমূর্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে রুদ্র বলে। বেদেব অনেক স্থলে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় রুদ্রের নির্দিষ্ট স্থান বা নির্দিষ্ট কার্য্য নাই। তিনি কখন সূর্য্যরূপী, হেম-বর্ণ, বথাক্রুত, ও ধনুঃশরধারী; কখন

বায়ুভাবাপন্ন, মরুৎকুলের পিতা ও গিরি-শারী; কখন অগ্নিমূর্তি, কপর্দী, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিবধ্যপাণি ইত্যাদি। বোধ হয় যেখানে উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানেই আদৌ রুদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। বায়ু ও অগ্নির কোপ সচবাচরই লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের অনেক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকার সহস্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রভৃতি সহসা বিনষ্ট হয়, এবং পর্ব্বতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়, সুতরাং রুদ্র যে মরুৎকুলের পিতা ও গিবিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। যাহাবা অগ্নি শিখার আকাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাবাই বুঝিবেন যে কপর্দী অর্থাৎ জটাধারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম কিরূপ অসঙ্গত। রুদ্রের অষ্টমূর্তি। এই অষ্টমূর্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে একটা উপাখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

“অভূদ্রেষম্ প্রতিষ্ঠেতি। তদুমিবভবৎ। তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যতবৎ। তন্তামশ্রাম্ প্রতিষ্ঠায়াম্ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সং-বৎসরায়াদিক্ষতঃ। ভূতানাম্ পতির্গৃহ পতিবাসীভূষাঃ পত্নী। তদ্যানি তানি ভূতানি ধৃতবন্তে। অথ যঃ স ভূতানাম্ পতিঃ সম্বৎসবঃ সঃ। অথ যঃ সা উবা পত্নী ওষসী সা। তানি ইমানি ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতিঃ সম্বৎসর উবসি রে-তোহসিকন্। স সম্বৎসরে কুমাবোহ

জায়তে । সোহ্রবীৎ । তাম্ প্রজা-
পতিরব্রবীৎ “কুমার কিং যোদিসি যচ্চুমাৎ
তপসোহিবিজাতোহসীতি ।” সোহ্রবীৎ
‘অনপহন্তপাপা বাসি অহিতনামা নাম
মে দেহী’ তি । তন্মাৎ পুত্রস্ত জাতস্ত
নাম কুর্যাৎ পাপানমেবান্ত তদপহন্ত্যপি
দ্বিতীয়মপি তৃতীয়মপি পূৰ্বমেবান্ত তৎ
পাপানমপহন্তি । তমব্রবীজ্জোহসীতি ।
তদ্যদস্ত তন্মাকরোৎ অগ্নিস্তজপমভ
বৎ অগ্নিবৈরুজো যদরোদীৎ তন্মাৎ রুজঃ ।
সোহ্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোহস্মি
থেহেব মে নামেতি । তমব্রবীৎ সর্কোহ
সীতি । তদ্যদস্ত তন্মাকবোদাপস্তজপ
মভবন্নাপোবৈ সর্কোহুভ্যোহি ইদম সর্কম্
জায়তে । সোহ্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অস
তোহস্মি থেহেব মে নামেতি । তমব্রবীৎ
পশুপতিরসীতি । তদ্যদস্য তন্মাক-
কবোৎ ওষধ্যস্তজপ মভবন্নোষধয়ো বৈ
পশুপতি স্তন্মাদ্যাদা পশব ওষধি র্নভস্তেহথ
পতিযন্তি । সোহ্রবীৎ জ্যায়ান্ বা
অসতোহস্মি থেহেব মে নামেতি । তম-
ব্রবীৎ উগ্রোহসীতি । তদ্যদস্য তন্মাক-
করোৎ বায়ু স্তজপমভবৎ বায়ুর্বোগ্রস্তন্মাৎ
যদা বলবদ্বাতি উগ্রো বাতি ইত্যাহঃ ।
সোহ্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোহস্মি থে-
হেব মে নামেতি । তমব্রবীদশনি রসীতি ।
তদ্যদস্য তন্মাকরোহিহ্যৎ তজপ মভ-
বৎ বিছাদা অশনি স্তন্মাদ্যাম্ বিছাদ হস্ত্য-
শনিরবধীদতি আহঃ । সোহ্রবীজ্জ্যা-
য়ান্ বা অসতোহস্মি থেহেব মে নামেতি ।
তমব্রবীৎ ভবোহসীতি । তদ্যদস্য তন্মা-

মাকরোৎ পর্জন্তস্তজপ মভবৎ পর্জনো
বৈভবঃ । পর্জন্তাৎ হীদম্ সর্কম্ ভবতি ।
সোব্রবীৎ জ্যায়ান বা অসতোহস্মি থেহেব
মে নামেতি । তমব্রবীৎ মহাদেবোহসীতি ।
তদ্যদস্য তন্মাকবোচ্চস্ত্রমাতজপ মভ-
বৎ প্রজাপতি বৈ চতুমা প্রজাপতি বৈ
মহান্ দেবঃ । সোহ্রবীৎ জ্যায়ান্ বা
অসতোহস্মি থেহেব মে নামেতি । তম-
ব্রবীৎ ঈশানোহসীতি । তদ্যদস্য তন্মা-
মাকবোৎ আদিত্যস্তজপমভবৎ আদি-
ত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সর্কস্য
ঈষ্টে । সোহ্রবীৎ এতাবাস্মি মা মেতঃ-
পবোনামথেতি । তান্যোতান্যষ্টাবগ্নি রূপাণি
কুমারো নবমঃ ।”

অর্থাৎ

“এই অধিষ্ঠান ছিল । তাহা ভূমি
হইল । তাহা বিস্তৃত করা হইলে পৃথিবী
হইল । এষ্ট অধিষ্ঠানে ভূত সকল ও
ভূত সকলের পতি সঙ্ঘৎসর দীক্ষিত
হইলেন । ভূতদিগের পতি গৃহপতি
ছিলেন, উষা পত্নী । এই যে ভূত
সকল তাহারাই ঋতু, এই যে ভূত সক-
লের পতি সে সঙ্ঘৎসব । আর এই যে
পত্নী উষা সে ঔষসী । এই ভূত সকলও
তাহাদিগের পতি সঙ্ঘৎসব উষাতে বীজ
ক্ষেপ করিলেন । সঙ্ঘৎসরে কুমার
জন্মিল । সে কাঁদিতে লাগিল । তাহাকে
প্রজাপতি বলিলেন, “কুমার কেন কাঁদি
তেছে? অনেক শ্রমে ও তপস্যার তোমার
জন্ম ।” সে বলিল, “আমার পাপ যায়
নাই, আমার নাম মাই, আমাকে নাম

দাঁড় ।” এই নিমিত্ত পুত্র জন্মিলে তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয় । প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, “তোমার নাম রুদ্র হউক ।” তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্নি তাহার মূর্তি হইল, কাবণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল, বলিয়া রুদ্র । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি সর্ক হইলে ।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার মূর্তি হইল, কাবণ জলই সর্ক, জল হইতে এ সকল জন্মিয়াছে । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি পশুপতি হইলে ।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহার মূর্তি হইল, কারণ ওষধিই পশুপতি; এই নিমিত্ত পশুরা ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয় । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি উগ্র হইলে ।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মূর্তি হইল, কারণ বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র বহিতেছে । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি অশনি হইলে ।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, বিদ্যুৎ তা-

হার মূর্তি হইল, কারণ বিদ্যুৎই অশনি, এই নিমিত্ত যে বিদ্যুতের আঘাতে মরে, লোকে বলে অশনির (অর্থাৎ বজ্রের) আঘাতে মরিয়াছে । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি ভব হইলে ।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, পর্জন্য তাহার মূর্তি হইল, কারণ পর্জন্যই ভব, পর্জন্য হইতেই সকল হয় । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি মহাদেব হইলে ।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, চন্দ্রমা তাহার মূর্তি হইল, কাবণ প্রজাপতিই চন্দ্রমা, প্রজাপতিই মহাদেব । সে বলিল, “আমি অসং হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি দীশান হইলে ।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্তি হইল, কারণ আদিত্যই দীশান, আদিত্যই এসকল শাসন করিতেছেন । সে বলিল, “আমি এত হইয়াছি; আমাকে আর নাম দিও না ।” অগ্নির এই আটটি মূর্তি, কুমার নবম ।”

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে উপাখ্যানটি উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্রের রূপে অগ্নিবই প্রবলতা, কিন্তু তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিরও স্থান আছে । প্রাচীন কালে যে সকল দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সকলই সময়ে সময়ে

ভীমমূর্তি ধারণ করিতেন। সূর্য্য কখন কখন দেশ দগ্ধ করিতেন। বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উল্লুখিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ্ন করিতেন। অগ্নি কখন কখন লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিতেন। অশনির আঘাতে সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত। প্রবল জলপ্লাবনে কখন কখন জনপদ সকল বিনষ্ট হইত। ভয়ঙ্কর শিলা বৃষ্টিতে কখন কখন বিলক্ষণ অপকার কবিত! মনোহর চন্দ্রমাণ্ড সময়ে সময়ে বাহুগ্রস্ত হইয়া ভয়বিস্তাব করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক দেবতারই কখন কখন উগ্রভাব লক্ষিত হইত। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্রই কদ্রমূর্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলের উগ্রতার সমষ্টি লইয়া কদ্রেব বিরাট মূর্তি বিরাজমান হইল। ইহাতে কালে কালে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাঁহাব নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু এরূপ অসম্ভবমান নিতান্ত অসম্ভব নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উগ্রভাব লইয়া শিবের এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর সৃষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে। হয় তবু নয় ভালবাসা এই দুইটির মধ্যে কোন একটীর বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে অতিমামুলিক শক্তির উপাসনা করিতে যায়। ইহার মধ্যে একটি হইতে

শৈবধর্ম্মের, এবং অপরটি হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিব কেবল বৈদিক রূপে নহেন। তিনি লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত। অথচ বৈদিক ঋষিদিগের কোন উপাস্য দেবতাই লিঙ্গমূর্তি বলিয়া বর্ণিত নহেন, এবং আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীন কালে অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিদিগের নিকট হইতে আর্য্যোবা এপ্রকার শিব পূজা পদ্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূর সম্ভব। শৈব উপাসনা যে অনার্য্য-ভাবাপন্ন, নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

(১) বেদে লিঙ্গোপাসকদিগের প্রতি বিবেচ্য প্রকাশ আছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

“সংধর্ম্মো বিষ্ণুস্য জন্তোর্ম্মা শিম্বেদবা
অপিগুণ্য তংনঃ।”

অর্থাৎ “ইঙ্গ শক্তিদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদের যজ্ঞের নিকট না আসিতে পারে।” ইহাতে বোধ হয়, যে, যে দম্ভাগণ আর্য্য ঋষিদিগের যজ্ঞের বিরূপ করিত, তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল। রামায়ণের অনেকস্থানে বর্ণিত আছে যে রাক্ষসেরা যজ্ঞ কালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত। রাক্ষসেরা যে আর্য্যধর্ম্মদেবী স্বতন্ত্রধর্ম্মাক্রান্ত অনার্য্য জাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং উক্তকাল-

বস্ত্রী বর্ণনা দ্বারা বৈদিক শ্লোকার্থের সম-
র্থনই হইতেছে।

(২) স্মৃতিতে ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা
নিষিদ্ধ দেখা যায়। বলিষ্ঠ স্মৃতিতে
লিখিত আছে,
শূদ্রাদীনাক্ত কুদ্রাদ্যা অর্চনীষা প্রযত্নতঃ॥
যত্র কুদ্রার্চনং শ্রোক্তং পুবাণেষু স্মৃতিষপি।
তদব্রহ্মণ্যবিষয় মেব মাহ প্রজাপতিঃ ॥
কুদ্রার্চনং ত্রিপুরা পুবাণেষু গীয়তে।
ক্ষত্রবিট শূদ্রজাতীনাম্ নেতরেবাং

তদুচ্যতে ॥

অর্থাৎ

শূদ্রাদিদিগের যত্নপূর্বক কুদ্রাদি অর্চ-
না করা কর্তব্য। পুরাণে ও স্মৃতিতে
যেখানে কুদ্রার্চনার কথা আছে, তাহা
ব্রাহ্মণের জন্ত নহে, প্রজাপতি বলিয়া
ছেন। পুবাণে কুদ্রার্চনা ও ত্রিপুরাধারণ
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য
ও শূদ্রদিগের জন্ত উক্ত হইয়াছে, অপ-
রের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্ত নহে।

(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে
রাক্ষস ও দৈত্যগণ মহাদেবের ভক্ত বলিয়া
বর্ণিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে
তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয়।

(৪) ইতিহাস পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞ-
ভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা-
তে বোধ হয় শিব পূর্বে যজ্ঞভাগ পাই-
তেন না, অনেক মারামারির পরে তিনি
দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। রামায়ণে
প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়।
হরষম্ সঙ্ঘে জনক বলিতেছেন,

“দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্বে ধমুয়াযম্য বীৰ্য্যবান্।
বিধুস্য ত্রিংশান কুদ্রঃ সলীলমিদমব্রবীৎ ॥
যস্মাদ্ ভাগাৰ্থিনো ভাগাম্ নাকল্পয়ত

সে হুয়াঃ।

বরাজাপি মহাহানি ধমুয়া শান্তরামি বা ॥
ততো বিমনসঃ সর্কে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রাসাদয়ন্ত দেবেশম্ তেবাং প্রীতো

হতবদ্ ভবঃ ॥

প্রীতশ্চাপি দদৌ তেবাং তান্তদানি
মহৌজসাং।

ধমুয়া যানি যান্তসন্ শান্তিতানি মহাম্বনা ॥
তদেতদ্ দেব দেবশ্চ ধমুরত্নং মহাম্বনঃ।।
জাসতুতং তদা ন্যস্তং অস্মাকম্ পূর্বেকে
বিভো ॥

অর্থাৎ

“পূর্বে দক্ষযজ্ঞ নাশ কালে বীৰ্য্যবান্
কুদ্র ধমুরাকর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে
পরাজয় করত উপহাস করিয়া এই ব-
লিয়া ছিলেন, “দেবগণ, আমি ভাগাৰ্থী
হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও
নাই; আমি ধমু দ্বারা তোমাদিগের মহাহ
বরাদ সকল কর্তন করি।” অনন্তর, হে
মুনিপুঙ্গব, দেবতা সকল বিমনা হইয়া
মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত
হইলেন। মহাদেব ধমু দ্বারা মহাতেজ-
সম্পন্ন দেবতাদিগের ঋণার যে অঙ্গ
কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করি-
লেন। এই সেই ধমুরত্ন, মহাদেব ইহা
আমাদিগের পূর্বপুরুষের হস্তে ন্যস্ত
করেন।”

মহাভারতের শান্তিপর্বে লিখিত আছে

যে অন্য দেবগণকে বধারোহণে দক্ষযজ্ঞে
বাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাসা
করিলেন যে তিনিও কেন যাইতেছেন
না। মহাদেব উত্তর করিলেন,

“সুতরেব মহাভাগে পূৰ্ণমেতদমুষ্টিতং।
যজ্ঞেবু সর্কেবু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥
পূৰ্ণোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে স্রবাঃ প্রযুক্তি ভাগং যজ্ঞস্ত ধর্মতঃ ॥

অর্থাৎ

“হে মহাভাগে, দেবতাদিগের প্রাচীন
অমুষ্ঠান এই যে কোন যজ্ঞেই আমার
ভাগ নির্দিষ্ট নাই। হে বরবর্ণিনি, পূর্ন
পদ্ধতি নির্ধারিত মার্গানুসারে ধর্মতঃই
দেবতাবা আমাকে যজ্ঞেব ভাগ দেয় না।”

(৫) শিবের নির্মালা গ্রহণ করা যায় না।
বহু চ গৃহ পবিশিষ্টে লিখিত আছে,
অগ্রাঙ্ক শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং
জলং।

শালগ্রাম শিলাস্পর্শং সর্কোষাতি পবিত্র-
তাং ॥

অর্থাৎ “পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি
শিবনৈবেদ্য গ্রহণীয় নহে। শালগ্রাম
শিলাস্পর্শে সকল পবিত্র হয়।”

ববাহপুবাণে উক্ত হইয়াছে,
অভক্ষ্যং শিবনির্মালাং পত্রং পুষ্পং ফলং
জলং।

শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদভবেৎ
সদা ॥

অর্থাৎ “পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি
শিব নির্মালা অভক্ষ্য। শালগ্রামশিলা-
যোগে তাহা সদা পবিত্র হয়।”

লিঙ্গার্চন তত্ত্ব শিবভক্ত কোন এক
ব্যক্তির রচিত। তাহাতে মহাদেবকে
জিজ্ঞাসিত হইতেছে,

দুঃস্থতং তব নির্মালাং ব্রহ্মাদীনাম্ কৃপা-
নিধে।

তৎ কথং পরমেশান নির্মালাং তব
দুঃস্থিতং ॥

“হে কৃপানিধে, তোমার নির্মালা
ব্রহ্মাদি বহু ভক্ত। তবে, হে পরমেশ, তব
নির্মালা দুঃস্থিত কেন?”

মহাদেব উত্তর কবিলেন যে তাঁহার
কর্ত্তে বিষ আছে বলিয়া লোকে তাঁহার
নির্মালা ভক্ষণ করে না। উত্তরটি ঠিক
হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য
যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবভক্তেরাও
স্বীকার করেন।

(৬) চণ্ডাল চর্ম্মকাবে প্রভৃতি অতি হেয়
জাতিও স্বহস্তে শিবপূজা কবিতে পারে।
কিন্তু দ্বিজসহায়তা ব্যতিবেকে অন্য
দেবতার পূজা হয় না। ইহাতে বুঝা
যাইতেছে যে শিবপূজাপদ্ধতি অনার্য্য-
ভাবাপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই অনার্য্য বংশ
সমুৎপন্ন নিম্ন শ্রেণীর তিন্দুগণ আপনা
আপনি মহাদেবকে অর্চনা কবিতে ও
নৈবেদ্যাদি দিতে অধিকারী। আর বোধ
হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনির্মালা
গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) পুবাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্ত্তি
বর্ণিত আছে, তাহা সভা আৰ্য্যজাতিদিগের
কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না। গলায়
হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা, মস্তকে
সর্প, পবিত্রান ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা দিগম্বর,
সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও ধুতুবা সেবনে
চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার; উপাস্য
দেবতার জীদৃশ কপ আৰ্য্য ঋষিদিগের
চিন্তা সমুদ্ভূত না হইয়া অসভ্য দম্ভাদি-
গের কল্পনার ফল হইবারই সম্ভাবনা।

কি প্রকারে অনার্য মহাদেব বৈদিক কৃত্তের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্য এরূপ একতার প্রতিপাদক হইয়াছিল। অনার্য মহাদেব এবং বৈদিক কৃত্ত, উভয়েই ভীম মূর্তি, উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি। আর সাঁওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব ও প্রাচীন অনার্য মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধরা যায়, কৃত্তের গিরিশ নাম দ্বারাও একতা সংস্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমি জয় করিয়া অনেক দক্ষ্য প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রজারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে দাসরূপে স্থান পাইল, তখন ধর্ম বিষয়ক অনেক বিবাদের পবে প্রজাদিগেব প্রীতি লাভ দ্বারা রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনার দ্বিজগণ এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগেব পরমপূজনীয় মহাদেবকে কৃত্ত মূর্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত করিয়া লন, এপ্রকার করণা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড় হইয়া উঠেন, তাহার আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনার্য ভারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক; সুতরাং অনার্য জাতিগণ হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের নিকটে শিবের সমাদবাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। একে ত কৃত্ত সর্বত্র স্বীয় ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত মূর্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র রবি বহি অপেক্ষা আপনার প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লিঙ্গোপাসকদল তাহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, কৃত্তের ক্ষমতা কেন না অনিবার্য্য ও বহুবিকীর্ণ হইয়া উঠিবে? আমরা পূর্বে

বলিয়াছি যে জড়জগৎ ও জীবজগৎ এই দুইটি হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুইটি উপাসনা পদ্ধতির উৎপত্তি। এই দুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, সুতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপূজা বহুকাল অবলম্বিত হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কোন সময়ে আর্য্য ঋষিগণে লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ ও বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসনার আভাস আছে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা কবিলেই প্রতীতি হইবে। সুতরাং বৌদ্ধদেব জন্মিবাব পূর্বে যে শিব শক্তির সমাদবেব সূচনা হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে।

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি শিবানীর প্রতি দৃষ্টি কবিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালী ও করালী এই দুইটি অগ্নি জিহবার নাম।* পার্বতী, হৈমবতী, গিরিজা, এসকল গিরিশায়ী বায়ু-পত্নী নাম। গৌরী নামটি সূর্য্যজারা উষা হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি, এসকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে সমুৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই।†

*কালী করালী মনোজবাচ স্নলোহিতা বাচ সূর্য্যবর্ণা ক্ষুণ্ণিঙ্গিনী বিশ্বরূপীচ দেবী লেনারমানা দহনস্য জিহ্বাঃ।

মুণ্ডক উপনিষদের টীকা

† এই প্রবন্ধ, এবং “মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম” শির্ষক প্রবন্ধ যে ভিন্ন লেখক প্রণীত, ইহা বুদ্ধমানকে বলিয়া দেওয়া বাহ্যল্য।

বং সং।

বৌদ্ধ ধর্ম।

বৈদিক ধর্ম আধ্যাত্মিক প্রাথমিক ধর্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূল-ভিত্তি এবং সংসারধাত্রা নির্কাহের সমস্ত কার্যকলাপ বৈদিক ধর্মামুসাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিদ্যাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্-যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই সুতরাং যিনি বেদে অবিদ্যাস কবেন তিনি নাস্তিক, ঘোব পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহাবে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমবস পান এবং পশু বধ কবা প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য। এ সকল না কবিলে বৈদিক ধর্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাট। আর্ধ্যগণ ধর্ম সাধন কবিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া ছুপবাহত। সাধারণ ধর্ম্মাক হইয়া যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া ক্ষয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এসময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিহ্রস্বত। সাধারণ লোকে ঐহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য কলাপ অনুষ্ঠানে আর্ধ্যগণ প্রবৃত্ত হও-

যাতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মাক, ব্রাহ্মণগণ সমাজের এক মাত্র কর্তা এবং তাঁহারা সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পবিত্রনশীল স্মৃতি-বাং ভাবত সমাজের পবিত্রন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তাব অবতাবৎ সমাজের পবিত্রাতা শাক্য সিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানেব নিন্দা করিতে তথা সমাজেব অভিনব প্রণালী বদ্ধ কবিতে প্রকৃত যোদ্ধাব ভ্রায় জ্ঞানেব শাগিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহার প্রচা-বিত বৌদ্ধ ধর্ম্মেব বিবরণ প্রকাশ কবা এই প্রস্তাবেব সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিয়ে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাম্বীকি বার্মার অযোধ্যা কাণ্ডীর নবোত্তর শত-তম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
সুখাগতং নাস্তিক মজ্জ বিদ্ধি।

তস্মাদ্বিরঃ শক্যতম প্রজানাত্

ন নাস্তিকে নাস্তিমুখো বধঃ শ্রাৎ ॥

অর্থাৎ যেমন বৌদ্ধ ভববেব ভ্রায় দণ্ডার্থ, নাস্তিককেও তজ্জপ দণ্ড করিতে হইবে,

অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পবিত্র্য কবা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সন্তোষ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনত্ব সন্দেহে কোন সংশয় বহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু, ককি পুবাণে পণেশ শত্ৰু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বুদ্ধ অবতাবের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্য বুদ্ধ। ইহার পূর্বে ৫৫ বুদ্ধ বর্তমান ছিলেন, তাহার মধ্যে পদ্মোত্তব চতুর্থে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বতু, ক্রকু-চ্ছন, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ “বহজন হিতায় বহজন সুখায়” মর্ত্যালোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বসুতপ্রদ ধর্মের একমাত্র উপদেশক যথা ললিত বিস্তাবে তাহার সঙ্ক্ষে লিখিত আছে যে—

জ্ঞান প্রভং হত তম সুপ্রভাকবং শুভ
পদং শুভ বিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্ত কায়ং শুভ শাস্ত মানসং মুনিঃ

সম্যগ্ভিষাস্ত শাক্যসিংহম্।
জ্ঞানোদধিঃ শুদ্ধ মহামুত্তাবং ধর্মেশ্বরং
সর্ববিদং মুনীশম্ উত্যাदि ॥
অভিধান মধ্যে শাক্য সিংহের নামা
স্তব যথা—যজ্ঞিং, খেতকেতু, ধর্মকেতু,
মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্বদর্শী, মহাবোধী,

* বামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ত্রিযুক্ত হেম
চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অমুবাচিত।

মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্বলার্থ সিদ্ধি, শৌক্যোদিনি, অর্কবন্ধু, মারা-দেবী স্তুতঃ গৌতম। হেমচন্দ্র তাহার এই কয়েকটা নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেশু, সর্বার্থ সিদ্ধ, গৌতমানেয় মারামুত, শুক্লোদন স্তুত।

অমর কোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অমুবাদ যথা “শুক্লোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অবিচ বজ্জুচ।”

শাক্য সিংহ এই নামটা নামকরণের নাম নাই। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার ঐ নাম। “শাক্য বংশ” ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষে (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্র-থিত হয়। তৎসংশয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভবত “শাক্য মুনি” এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখি-
য়াছেন, যথা “শাক্য বংশ্যস্তাং শাক্যঃ
শাক্যাস্তাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি
—শাকো বৃক্ষ বিশেষঃ তত্রতবা বিদ্যা-
মানাঃ শাক্যোঃ পিতৃঃ শাপেন কেচি
দিক্ষাকু বংশীয়া গৌতমবংশজকশিল মুনে-
বাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যো
উচ্যতে তত্শত “শাক বৃক্ষ প্রতি-

জন্মঃ বাসঃ বস্মাঃ প্রচক্ৰিঃ। তস্মা-
দিক্কাৎ বংশ্যাতে জুবি শাক্য ইতি-
জ্ঞাতাঃ।” শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম
গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে
তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া
থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম।
শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীয়, তাঁহাব
পূর্বপুরুষেবা গৌতম বংশীয় কপিল নাম-
ক মুনির আশ্রমে গিয়া লুপ্তায়িত ভাবে
শাক্যবৃক্কে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই
তাঁহাব শাক্য ও গৌতম নামে বিখ্যাত
হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন
বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধাদন।
মাতার নাম মাযাদেবী। শুদ্ধাদন
কপিল বস্ত্র নগবেব বাজা ছিলেন।
আৰ্ষ অভিধানে লিখিত আছে শুদ্ধাদন
বাজা অতি শ্রাঘবান্ ছিলেন এবং পবি-
ত্রাঙ্গ ভোজন কবিতেন যথা “শুদ্ধাদন
যতো ভুংক্রে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম।”
ললিত বিস্তাবে লিখিত আছে শাক্য সিংহ
জন্ম দ্বীপেব ১৮ স্থান ও ১৮কুল অন্বেষণ
কবিয়া পবিশেষে শাক্য কুলকে নির্দোষ
জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কো-
শলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল বি-
শালা নগবে, প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, কস্তি-
নাথ, পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব
বংশকেও সদোষ বিবেচনা কবিয়াছি-
লেন—“পাণ্ডব কুলগ্রহতৈঃ কোবব

নেপাল দেশের পব্বত সন্নিহিতে।

বংশোহতি ব্যাকুলী কতো মুখিবিবো ধর্মন্ত
পুত্র ইতি কথয়ন্তি ভীম সেনো বারোঃ—
ইত্যাদি—” একুলেব দোষ হইল যে
পাণ্ডবেরা কুলদিগকে ব্যাকুল করিয়া
ছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এই রূপ
সকল বংশেই দোষ, কেবল মাত্র শাক্য
বংশ নির্দোষ।

শাক্য কপিল বস্ত্র নগরে বসন্ত কালে
শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়া দেবীর
গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। তগবান্
বোধিসত্ত্ব যে কালে তুষিত পবিত্যাগ
করিয়। মায়াদেবীর দক্ষিণ কুঞ্জে প্রবেশ
কবেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতাবস্থায়
এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

“হিম বজ্রত নিভন্ত ষড়্ভিষাণঃ সূচবণ
চাক্ৰভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদয় মৃগগতো
গজো প্রধানো ললিত গতি দৃঢ় বজ্রগাত্র
সন্ধিঃ।” অর্থাৎ তুষার বা রজতের স্তায়
শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্ত যুক্ত, মনোজ্ঞকর,
সুবক্ত শীর্ষদেশ, একটা গজ মনোহর
গতিতে তাঁহার উদবে প্রবেশ কবিল।
তৎকালে তিনি কিরূপ স্তম্বে ছিলেন, তাহা
বর্ণন কবা যায় না “নচ মম সূখ জাতু
এবকপং দৃষ্টমপিপ্রতং নাপি চাত্তৃতম্।”
ভাবিলেন একি! কখন আমার এরূপ
সুখোদয় হয় নাই, আব এরূপ রূপও
কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ
কবি নাই। নিদ্রা ভঞ্জে তিনি রাজাকে
স্বপ্ন বিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন।
রাজা গণক দিগকে ইহাব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা
করিলে, তাহাবা উত্তর কবিল, আপনাব

সকল প্রাণীর হিতকারী একটি রাজচক্রবর্তী
পুত্র জন্মিলে এবং তৎকালে এইরূপ ঈশ্বর
বাণী হইল যথা—“তুষ্টিত পুরি চ্যবিদ্যা
বোধিসত্তো মহাত্মা নৃপতি তব স্তুতঃ
মায়াকুলোপগমঃ।” অর্থাৎ হে নৃপতি
তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ত
তুষ্টিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার
পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, বলিয়া
এই মায়ী দেবীতে উপগম হইবাছেন।
মায়াদেবী স্তোত্রে বিবিধ স্তলক্ষণাক্রান্ত পুত্র
প্রসব করিলে অষ্ট প্রকাব নিমিত্ত ঘটয়া-
ছিল যথা—তুণ কণ্টকাদি ব কাঠিন্য ছিল
না, দংশ মশকাদি ব দৌরাণ্য ছিল না—
হিমালয় পর্বতে ব সমস্ত বিহঙ্গম আসিয়া
রাজা শুদ্ধোদনে ব গৃহে ব ব কবিয়াছিল,
বাজা শুদ্ধোদনে ব আগাবে সর্ষকালীন
ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল—
শুদ্ধোদনে ব গৃহে আহার করিলেও আহার
বীৰ জ্বা ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার
অস্তঃপুরে যে সকল বাদ্য বাদ্য ছিল তাহা
সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়া-
ছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধে ব জন্ম সম্বন্ধে
এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত
বিস্তরে লিখিত আছে, তাহার এখানে
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য
হইয়া উঠে।

উরোপীয় পণ্ডিত গণের মতে শাক্য
সিংহ খ্রীষ্ট জন্মাব ৬২৩ বৎসর পূর্বে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা
মায়ী দেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের
পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার

ভগ্নী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতি পা-
লিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্র মুখ
নিরীক্ষণে দিনে ২ আনন্দ বুদ্ধি হইতে লা-
গিল এবং শাক্য জাতির কাল মধ্যে বহু
বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি
স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, বালকগণের
সহিত ক্রীড়া কোতুকে একদণ্ডও অতি
বাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র
বালমূলত চপলতা ছিল না এবং সময়ে ২
তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।
বাজা তৎকালে তাঁহাকে সংসাবে সুখী কবি
বার জন্য নানা উপায় চিন্তা কবিত্তে
লাগিলেন।

একদা মহাক্ক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য
বাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহাবাজ!
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণে বা নিশ্চয় কবিয়া বলিয়া
ছেন, যে “যদি কুমারো ভিনিক্ মিষ্যতি
তথা গতো ভবিষ্যতি অর্হন সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ,
উত না ভিনিক্ মিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি
চক্রবর্তী চ বিজ্ঞেতা ধার্মিকো ধর্মরাজঃ
সম্ভবন্ত সমসাগতঃ” (১২ অধ্যায় ললিত
বিস্তব)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন,
তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং
আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী
হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হই-
বেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ
বিবাহিত করা কর্তব্য। তাহা হইলে
শাক্যবংশের চক্রবর্তী আর লোপ
হইবে না।

রাজা শুদ্ধোদন কত্তার অধেষণ করিবার আদেশ মাত্র শতশত শাক্য কত্তাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তত্ত্বাস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্য সিংহ মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান নিম্নলিখিত নেত্রে ধ্যেয় স্থখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি জী-গৃহে বাস করিতে পারি? না তাহাতে আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্ত্বগুণেব পবিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কদমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ত্ব পরিবার লাভ কবেন, তাহা হইলে তিনি তদ্ব্যে কদাচিৎ থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব ২ বোধিসত্ত্বেরাও ভার্ঘ্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভার্ঘ্যাপুত্র গ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল “বিদিতং ময়ানন্ত কাম দোষাঃ শরণ সৰ্ব্ববাস শোক দুঃখমূল। ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা অনলনিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নমেত্তি ক্ষুণ্ণং রাগো নচাং শোভে জ্যাগার মধ্যে যোধহমূপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যানসমাধিস্থেন শান্ত-চিত্ত ইতি।”

“সদীর্ণ শক্তি পহুমানি বিবৃদ্ধিমেন্তি, আকীর্ণ রাজ্জ্বলমধ্যে লভাতি পুচ্ছাম্, যদি বোধিসত্ত্ব পরিবার বলং লভন্তে, তদস্য কোটি নিম্নতাত্ত্বমূতে বিনেত্তি ॥ যেচাপি পূর্বক অভূষিতবোধিসত্ত্বাঃ, সর্কেতি ভার্ঘ্যমূত দর্শিতইন্দ্রীগারাঃ নচ রাগ রক্ত মচ ধ্যান স্থখেতিভ্রষ্টা হস্তানু শিক্খি অহংপিগুণেষু তেষাং।

(১২ অঃ)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,
“ব্রাহ্মণীঃ ক্ষত্রিয়াঃ কত্তাঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ তথৈবচ। যস্তা এতে গুণাঃসত্তি তাং মে কত্তাং প্রবেদয় ॥”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য যে কোন জাতির কত্তা হউক, যাহার পূর্বোক্ত গুণ সকল আছে, সেই কত্তার সহিত আমাব বিবাহ দাও।

রাজা শুদ্ধোদন, নিজনগরে প্রচার করিলেন,

“ন কুলেনন গোত্রেন কুমারো মম বিস্মিত গুণে সত্যে চ ধর্মে চ তত্রাস্ত রমতে মনঃ।”

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলা-বণ্যে মোহিত হন না; গুণ, সত্য, ও ধর্মেই কুমারের মন, ইহা বিবেচনা করি-য়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বাৰা দণ্ডপাণি-শাক্যের হুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবর্তী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পানিগ্রহণ করিলেন। “অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য

হুঁহুতা শাকা কন্যা সা দাসী শত
পবিত্রতা" ইত্যাদি

কিছুকাল দম্পতি অতি সুখে অতিবা-
হিত কবিষাছিলেন; কিন্তু শাকা সিংহ
সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকি-
তেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্বদা সংসা-
রের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উথিত
হইত। তিনি মনশ্চকুধাবা দেখিতেন।
“সর্ব অনিত্য, অকামা, অজ্ঞবা নচ
শাস্ত্যাপি, ন কল্যাণমায়মরীচি সদৃশা,
বিদ্যাং ফেণাপমাশ্চপলা ॥

বাক্য শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য
দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ
দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃত-
কার্য্য হইতে পাবিলেন না। ক্রমেই
তাঁহার সংসারের স্তম্ভে বিরক্তি বোধ
হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন
সমভিষায়াবে বথাবোহণে নগরের পূর্ব
তোবণ দিয়া কুম্ভ নিকেতান গমন কবি-
তেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক
জন দম্পতী জবাগ্রস্ত বৃদ্ধক দেখিতে
পাইয়া সাবথিকে তাঁহার এতাদৃশ শোচ-
নীয় অবস্থার কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন।
সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ
বয়স জন্ত এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।
এ ব্যক্তি কোন বিশেষ বোগগ্রস্ত নহে।
ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের
সকলেবষ্ট এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়!
আমবা কি মুঢ়, যৌবনগর্বে মনুষ্য শরীর
পবিত্রামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা

এক বাবু চিন্তা করি না। সারথি।
বথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের
দুবস্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি
না। সাংসারিক সুখ কণভঙ্গু, তাহা-
তে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতা-
দৃক কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য একদিবস
শাকা সিংহ বথারোহণে নগরের দক্ষিণ
তোবণ সম্মুখে স্বজন পবিত্র্যুক্ত বন্ধুহীন,
বস্ত্রবোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক
ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সাবথিকে
তাঁহার এতাদৃক অবস্থার কাবণ জিজ্ঞাসা
কবিলেন। সাবথি কব ঘোড়ে তাঁহার
অবস্থার প্রকৃত কাবণ বিজ্ঞাপন কবিল;
তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন,
“হায়! শাবীবিক অবস্থা কতদূর পবি
বর্ত্তশীল, এবং বোগের তাডনায় মনুষ্যেব
এতাদৃক হীন অবস্থা চটয়া থাকে।
কোন জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের
সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন? এই
বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন
না কবিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হই-
লেন। এই রূপ তৃতীয় বার বথাবোহণে
নগরের পশ্চিম তোবণ দিয়া বিলাস
কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে
বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাই-
লেন। তাহার চতুর্দিকে স্বজন বান্ধবেবা
হাহাকার কবিষা ক্রন্দন করিতেছে।
তদ্রূপে রাজকুমারের মনে সংসারের
প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল।
তিনি সারথিকে কহিলেন, যৌবন গর্বে
বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শাবীবিক বাস্থা

ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের স্রুথে কে মুক্ত হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এই স্থান চিরস্থখের হইত।” তাহার পব মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, “সাবধি! নগব মধ্যে গমন কব, আমি এক্ষণে বথ হইতে অবতরণ কবিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা কবিব।”

অবশেষে চিন্তা কবিতেন নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন কবিবার সম্বন্ধ এক শাস্ত্র মূর্তি, বোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সাবধিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “এ ব্যক্তি কে?” সাবধি কহিল, “রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ কবিয়া ধর্মের কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল বিপুল পবাজয় কবিয়া, আনন্দ চিন্তে ভিক্ষুর জীবন অতিবাহিত কবিতেন।” রাজকুমার কহিলেন, “সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিট সাধু, জ্ঞানি গণের এই পথ অবলম্বন কবাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন কবিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।” এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের

বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন কবিতেন লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভাব কিছুতেই পবিবর্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল স্রুথ পবিত্যাগ কবিতেন কৃতসঙ্কর হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরা গ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্, ব্যাধিতে জর্জরিত হব এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যু মুখে পতিত হব এমত জীবনকেও ধিক্—হান।

ধিগোবিনেন জবয়া সমভিক্ষুতেন।

আবোগ্য ধিধিবিব্যাদি পবাহতেন ॥

ধিগ্জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।

ধিক্ পণ্ডিতস্ত পুরুষস্ত বতি প্রমদে ॥

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি, মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্বন্ধে অন্য একমাত্র দুঃখ স্থান বলিয়া পবিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জবা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে। এজন্য দুঃখ হইতে পবিত্রাগার্থ উপায় করা কর্তব্য। বথা।

যদি জবা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি ন মৃত্যু

স্তথাপিচ মহদুঃখং পঞ্চস্বন্ধং ধরন্তো।

কিংপুন জবা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা

সাধু প্রতি নিবর্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং ॥

“দুঃখং সংসারিণঃ স্বকান্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপ
মেব চ। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার
এবং রূপ এই পঞ্চ স্বন্ধ, ইহাই সাংসারিক
আস্রার দুঃখ হেতু।

এই রূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সকল স্ত্রী পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য মানা অনুন্নয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন যথা।

“ইচ্ছামি দেব জর মছনমাক্রমেয়া।”
 শুভবর্ণ যৌবন স্থিতোভবি নিত্য কালং ॥
 আরোগ্য প্রাপ্তু ভবিনোচ ভবেত ব্যাধি।
 রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ ॥

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন; “হে পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।” রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য আশীর্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাকা সিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত অনোমানদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিত্তে লাগি-

লেন। প্রথমে বৈশালীতে[†] আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্ধ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্কিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহা প্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমেই তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিফল মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সকল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারানসীতে ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্বের পঞ্চ সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার বশঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ

† বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে বাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্বাংশে বদরীকান্নম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্তী নগরের নাম বৈশালী।

বিশ্বসরেব প্রবর্ত্তে রাজগৃহে বজ্জতা কালে
বহুবাক্তি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।
কালান্তক বিহার তাঁহার উদ্দেশে এক
ধনাঢ্য বণিক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল;
তথায় তিনি কিছুকাল বজ্জতা করিয়া
অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ
সময় তাঁহার ধর্মের গৌরব দিনে বৃদ্ধি
হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে
বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ
হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ
ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শাক্য
সিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র
মৌদগল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভি-
বাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য
স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি
অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হইলে, তিনি
প্রাবস্তীতে* বাস করেন; তথায় অমাধ
পিণ্ড নামক বণিক তাঁহার জন্য একটা
সুসজ্জা বিহার নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।
শাক্যসিংহের বজ্জতার মোহিনী শক্তিতে
ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে
লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয়
কত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ,
সকলেই তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইল।
কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি
তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। ষাটশ
বর্ষ পরে তিনি কপিল বস্ত্রতে গমন ক-
রিয়া তাঁহার পিতৃস্বা, স্ত্রী এবং শাক্য

* প্রাবস্তী ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে
অবস্থিত। এই নগর এত প্রাচীন যে ইহার
উল্লেখ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়।

বংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্মে
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই রূপ ধর্ম
প্রচারে কালান্তিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০
বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট অব্দে পূর্ব
বৎসরে কুশী নগরে মানবলীলা সম্বরণ
করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য
শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাঁহারা সকলেই
বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।
এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার
অশিষ্য বর্গকে ধর্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞা-
সা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু
কেহই উত্তর করিল না। সে সময়
কাহাবণ্ড ধর্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপ-
স্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু কালে
ভগবান্ কহিলেন, “ভিক্ষুগণ! আমি
শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি;
সংসারের সকল বস্তুর ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য
তোমরা নির্ঝাণ কামনায় যত্নশীল হও।”
ভগবান্ নির্ঝাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ
ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অকৃত্যপ
করিতে লাগিল; কিন্তু অর্হতগণ পৃথি-
বীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোক-
বেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন কাষ্ঠের
চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত
করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাণ্ডপ তথা
৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ
করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের
চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্জলিত ক-
রিয়া দিলেন। নব্বয় শরীর ধ্বংস হইয়া
তন্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই তন্ম-
রাশি ধাতুনির্মিত পাতে পূর্ণ করিয়া অগ্নক

পুল্পে আচ্ছাদিত করত মৃত্যুগীত করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত গুপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার কুত্রং অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিল বস্ত্র, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথবীপ, পাণ্ডুয়া এবং কুশীনগর এই চন্দ্রানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অষ্টভূপ নির্মিত হইল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং অমুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুবায় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ঐসকল মন্দির বিশেষতঃ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য দেবের ত্রায় তাঁহার স্ত ত্রিবিধ কর্তৃক মৃত্যু অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় “ত্রিপেটক” রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অতিশয় কাব্যপদ্য দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা, খৃষ্ট জন্মবার ৫৪৩ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘে আচার্য্যগণ ধর্মের শুদ্ধা কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্মীর ৫০০ শত সুপণ্ডিত স্তুতির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সঙ্গোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবান্ নারায়ণ

মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, “আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আত্মাদিগের তদান্যোচনার প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্ত কর্তব্য”। এতদ্বাক্যে সকলেই সন্মত হইলেন। এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণি শিখর মূলে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্তৃক ধর্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্ঘ শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘ কালশোক কর্তৃক আহৃত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্ঘে বৌদ্ধধর্মের সমূহ উন্নতি হয়। এসময় বৌদ্ধধর্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্ধ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপের ক্রমেই হ্রাস হইতে লগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্রার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই বন্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিহ্মসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈয়াক্যাতনে হিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর

বৌদ্ধধর্মের উন্নতি করতে সকলেই ইহা কে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চাষিবৎসবের মধ্যে অশোক সমুদায় ভাবতবর্ষ জয় কবিরাজি লেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহার কবতলন্ত হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডুরোও অশোকের নাম ভারত বর্ষে একাধিপত্য কবিত্তে পাবেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত ধর্ম্মে তাঁহাব অকৃত্রিম অমুবাগ ছিল। তাঁহাব সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আৰোহণ কবিরাজি। ইনিই বৌদ্ধগণের “দেবানাম প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।” অসংখ্য প্রচাবেকা ইহার অমুজ্ঞানুসাবে গ্রামে নগরে এবং পুত্রবর্গের নিকটও ধর্ম্ম-প্রচার কবতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভাবত-বর্ষেব সকল জতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী কবিরাজি।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্মাণ কবিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা কবেন। এই সকল স্তম্ভ ভাবতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্মিত হইয়াছিল। আনবা কয় কটা প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি। তাহাব মধ্যে ফিৰোজ সাহেব নামে খ্যাত লাটটা সৰ্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্কে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবিধ অমুজ্ঞা খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, জলবাটে গিণাব শিখরে এবং আকশ্যানিস্থানে কপক গিঁব অঙ্গে, অশোকেব যশোঘোষণা খোদিত

ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায উবোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগডের পার্শ্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিবোকস্, টলে-মী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকেব খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসবে মৃত্যু হয়। তাঁহাব মৃত্যুতে ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব আব উন্নতি হয় নাই। অশোক-পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃপূঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন নাই। তিনি শিষ্য দিগকে প্রামান্যরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যোবা তদর্থ সকল ধারণ পূর্বক বহু বিস্তার কবিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্তি বলেন “তবি নেয়াঃ প্রচক্রিরে।” সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটি। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাভী-র্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচবার্থে আমবা বহু অন্বেষণ কবিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

“ইদম্প্রত্যয়কলমিতি। উৎপাদ'দ্বা তথাগতানা মমুৎপাদান্ধা স্থিতেবৈবাং ধর্ম্মাণাং, ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনি-য়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো-দ্বাত্যাং কারণাত্যাং তবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যাবোপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদক্ক রোহক্কবাং পজাং পজাং কাণ্ডং কাণ্ডা-

রালং নালদগ্গে গর্তাঙ্কং শূকাং পুষ্পং
 পুষ্পাং ফলমিতি; অমতি বীজেহুয়ো ন
 ভবতি যাবদমতি পুষ্পে ফলন্তবতি, সতিতু
 বীজেহুয়ো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি
 ফলমিতি তত্রবীজস্ত নৈবং ভবতি জ্ঞানং
 অহমকুরং নির্কর্তৃম্যমি অকুরস্তাপি নৈবং
 ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্কর্তৃত ইতি,
 এবং যাবৎ পুষ্পস্ত নৈবং ভবতি জ্ঞান-
 মহং ফলং নির্কর্তৃম্যমিতি ফলস্তাপি
 নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্কর্তৃতমিতি,
 তস্যাং সত্যপি চৈতন্যো বীজাদীনা
 মসত্যপি চান্যোন্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্য
 কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো
 হেতুপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্য
 সমুৎপাদস্ত উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতুনাং
 সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে
 হেতুস্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ
 প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। যগ্নাং
 ধাতুনাং সমবায়ং বীজহেতুবদ্ধু বো জায়তে,
 তত্র পৃথিবী ধাতু বীজস্ত সংগ্রহে কৃত্যং
 কৰোতি, যথাকুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্-
 ধাতু বীজং মেহয়তি, তেজো ধাতুবীজং
 পরিপাচয়তি, বায়ু ধাতু বীজমভিনির্হরতি
 যতোহুয়ো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ
 ধাতু বীজস্বাবরণং কৃত্যং কৰোতি রূপ
 ধাতুরপি বীজস্ত পবিণামং কৰোতি, তদে-
 তেষাং অবিকৃতানাং ধাতুনাং সমবায়ে
 বীজে রোহিত্যাহুরো জায়তে নান্যথা।
 তত্র পৃথিবী ধাতো নৈবং ভবত্যহং বীজস্ত
 পরিণামং কৰোমীতি; অকুরস্তাপি নৈবং
 ভবত্যহমেকিঃ প্রত্যয়ে নির্কর্তৃত ইতি।

তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎপাদো বাভ্যাং
 কারণাত্যাং ভবতি, হেতুপনিবন্ধতঃ প্র-
 ত্যয়োপনিবন্ধতঃ। তত্রাস্ত হেতুপ-
 নিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সং-
 স্কারা যাবজ্জাতি প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি
 অবিদ্যাচেন্নান্তবিষয়ং নৈবং অকুরো অ-
 অনিষ্যন্ত এবং জরা মরণাদয় উদয়পংশস্ত
 যাবজ্জাতিচেন্নান্তবিষয়ং নৈবং তত্রাবিদ্যার
 নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্কর্তৃম্য-
 মীতি সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়ম-
 বিদ্যয়া নির্কর্তৃতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা
 অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভি
 নির্কর্তৃম্যমীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং
 ভবতি বয়ং জাত্যা ভতি নির্কর্তৃতা ইতি
 অথচ সংস্কারবিদ্যাভি স্বয়মচেতনেষু
 চেতনানন্তরানধিষ্ঠিতেষপি সংস্কারাদীনা
 মুপৎতি বীজাদিষ্বিব সংস্কেতেনেষু চেত-
 নাস্তরাপধিষ্ঠিতেষপ্যাহুরাদীনং, ইদং প্র-
 তীত্য প্রোপ্যেদ সমুৎপাদস্ত ইতি। এতা-
 বদ্ব্যজ্ঞস্ত দৃষ্টবাৎ—চেতনাধিষ্ঠানমাত্মপ-
 লকে। সৌরমাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত সমু-
 দায়স্য হেতুপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্য
 যোপনিবন্ধঃ পৃথিব্যাগ্নেজো বায়ুকাশ
 বিজ্ঞান ধাতুনাং সমবায়ান্তবতি কার্য্যঃ।
 তত্র কার্য্যস্ত পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ক-
 র্তৃয়তি অপ্ধাতুঃ মেহয়তি কার্য্যং তেজো
 ধাতুঃ কার্য্যস্য শিত পীতে পরিপাচয়তি
 বায়ু ধাতুঃ কার্য্যস্ত শ্বাস প্রশ্বাসাদি কৰোতি
 আকাশ ধাতুঃ কার্য্যস্য শুশ্রীভাবং কৰোতি
 যাস্ত নামরূপাভূরমভিনির্কর্তৃয়তি গন্ধ
 বিজ্ঞানার্ধ সংযুক্তং সাত্ত্ববন্ধ মনোবিজ্ঞানং

সোহ্মমুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যা-
স্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্ত্য বিকলা
স্তদা সর্কেবাং সমবায়ান্তবতি কায়স্যোৎপ-
ত্তিঃ তত্র পৃথিব্যাদি ধাতুনাং নৈবং ভ-
বতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্কর্তব্যম ইতি
কায়স্যপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেতি
প্রত্যয়ৈরভিনির্কৃষ্টিত ইতি—অথচ পৃথি-
ব্যাদি ধাতুভ্যোহচেতনেনভ্যশ্চেতনান্তরা-
নধিষ্ঠিতেভ্যোহকুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ;
সোহ্মং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টেহান্না-
ন্যথরিতব্যঃ। তত্রৈতেষেব ঘটুঃ ধাতু-
মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, স্থ-
পংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুঙ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্য-
সংজ্ঞা মাতৃ হৃহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কারমম
কায়সংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঃ সৎসারানর্থ
সম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং
সত্যং সংস্কার রাগদ্বेष মোহাবিশেষু প্রব-
র্ত্তে—বস্তবিসয়া বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং বিজ্ঞান
শক্তারোহপিনঃ, উপাদানশক্তি স্তন্যম,
তান্যুপাদায় রূপমভিনির্বর্ত্ততে। তদেক-
ত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপাতে।
শরীরস্তেব কলল বুদ্ধদাদ্যবস্থা নামরূপ
সম্মিশ্রিতা, তানীজিয়াণি ষড়ায়তনং নাম
রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শ
স্পর্শাদেদনা সূখাদিকা, বেদনায়াম্ সত্যং
কর্তব্য মেভৎ সূখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যাসিতং
তৃষ্ণা ভবতি—”ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্বক
রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করি-
বার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্য-
দিগের নিকট জগতের কার্যকারণ

ভাব ঘটত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতি-
নিম্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্যমাত্রকেই
প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায়
কার্যে দুই প্রকার কারণ অনুভূত
আছে। একের নাম হেতুপনিবন্ধ;
অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতুপ
নিবন্ধ এই যে, কার্যোৎপত্তি কালে
যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন
অকুরোৎপত্তিব প্রতি বীজে হেতুভাব।
প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্যোৎপ-
ত্তির পূর্বে কারণ দ্রব্যেব সমবায়
(সংযোগ) থাকে যথা উক্ত অকুরোৎপ-
ত্তির পূর্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যে
সমবায় ছিল। এই হেতুপনিবন্ধ ও
প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহু
জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যও
আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎ-
পত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি
বিষয়ে) এই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।
প্রথমতঃ বীজ হইতে অকুর, অকুর
হইতে পএ, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ভ, শূক
(পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল
জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির
জন্ম হওয়াকে হেতুপনিবন্ধ বলা যায়।
বীজ না থাকিলে অকুর জন্মে না;
পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প
থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে
অকুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অকু-
রকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান
হয় না যে, আমি অকুরকে জন্মাইতেছি।

অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরূপ জ্ঞানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চৈতন্য-ত্বের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য-কারণ ভাবের বাঘাত নাট। বরং কার্যাকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর কার্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাব পক্ষেও (কাবণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু, (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য করে (যে কার্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে) জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে বীজের উচ্ছন্নতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পবিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে) বায়ুধাতু অতিনির্হার করে, (বহলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহিষ্কৃত হয়) আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (উহা প্রভাবেই অঙ্কুর দৃশ্যমান হয়) এইরূপ ষড়্‌ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্যে আশ্রয়লাভ করে। সমবায় না থাকিলে আশ্রয়লাভ কবে না। এখানেও পৃথি-

বীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবাব নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীতি অনুসারে মধ্য (বাহ্য কার্য সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্যের জ্ঞান পূর্বক উৎপত্তি নাই, তেমনই আধ্যাত্মিক কার্যেরও নাট।

আধ্যাত্মিক কার্য অনুসারেরও পূর্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা মরণ প্রভৃতিব উত্তবোত্তব হেতু হেতুমত্তাব, আব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান, এই ষড়্‌বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পাবে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ কবিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিবও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য চৈতন্যবান পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষেও সেইরূপ; পূর্বোক্ত ষড়্‌ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত

করে। তেজো ধাতু ভূক্তার পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্ৰ-ভাব জন্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপা-দিব কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চদশাঙ্গক; এই ষড়্‌ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হই-লেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এতলেও পৃথিবী ধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরেব কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি কবিতেছি। অতএব পৃথিব্যাঙ্গি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচে-তন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অতথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্মৃতরাং অনাথা কবিবার পথও নাই।*

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুঙ্গল, মজ্জ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, ছহিত্ প্রভৃতি নানা নাম করনা করে। উহাকে অনর্থ শতসস্তার সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতিরাগ, ঘেঘ, মোহ জন্মে। বস্তু আকার ধারী বিজ্ঞানবিষয়। বস্তু আকার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ

নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানধর্মের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরেব কলল ও বৃক্ষাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, বড়ারতন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই মুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এই রূপ নির্দিষ্ট হইরাছে—

“তথাগতি কৃত্যাদেবী” বাক্যং

লোকে ভগবতো লোক নাথাদাবভ্য

কেবলম্।

যে জন্তুবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বান চেহিতান। সাগসেপি নকৃপ্যন্তি কমরা চোপকুর্কতে। বোধিঃ স্বস্তৈব নেযান্তি তে বিশ্বধবণোদ্যমাঃ।*

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (যুক্ত) হইরাছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও বাহা-রা কোপ কবেন না, প্রত্যুত ক্ষমাশূণে উপকাব করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাহা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারা ই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা “বোধিসত্ত্ব পূর্বমজ্জতেষু ধর্মেষু—” এবং বুদ্ধদেবকে

*এতাবতা এই বলা হইল যে জগ-তের কোন চেতনাবান্ স্বতন্ত্র কর্তা নাই।

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অভিচারোৎ-পন্ন ধর্মাদিষ্ঠাত্রী দেবী।

তাহারা “জরা, মরণবিঘাতী তিষথর ই বোদ্ধগণঃ” জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্মাণ কামনা করা একান্ত কর্তব্য, বৌদ্ধমাত্রেয়ই পূর্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ ২ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিত্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংহ স্বয়ং হতী, মৃগ প্রভৃতি পশুবোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করে নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টেলর, বাক্‌নর প্রভৃতি জর্জন তত্ত্ববিদগণের এই মত, অধিকন্তু তাহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। স্কিওক্রীষ্টের জায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন;

যথা জীবহিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫ টি আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং স্নগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অমুচিত এবং স্তবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ কবিলে বৌদ্ধধর্মের উপর ভক্তির উদ্বেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুখ্রীষ্ট উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার “ধর্ম পদ” গ্রন্থপাঠে তাহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক ২ বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্মাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্ম নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন “কৃতিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ ভোজনম্। সত্ত্বো রক্তাশ্বরথঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুতিঃ।

অর্থাৎ চন্দ্রাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ণাঙ্ক ভোজন, সমুদ্রাবস্থান, ও বস্ত্রাবরণ এই কয়েকটি বৌদ্ধ দিগের যতি ধর্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপাবার সময় এই মাত্র পালি ভাবার কহিয়া থাকে “অনিত্য হুঃখম্ অনাত্য” ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করেন না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্তির সমীপে ধর্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান কাথলিকগণ পাত্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকাণ্ড সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব কালে বৌদ্ধগণ ধর্মসঙ্গমমধ্যে স্তবিরগণ সন্নিপেদে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী একজন্ম মাসে দুইবার সভা করিতে স্তবের নিপিতে অমুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন লিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে যথা—খুদক পাঠ।

“নমত্তসভাগবত অর্হত্ত সম সমবুদ্ধসঃ

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

ধর্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।

“হ্যাতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

হ্যাতম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

হ্যাতম্পি ধর্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

হ্যাতম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।

তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

* সর্বদর্শন সগ্রহ। ৬ জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন কর্তৃক বাঙ্গালার অমুবাদ।

তীত্তম্পি ধর্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

তীত্তম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।

শরণ্যত্তম্।”

বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমরা দিগের আধ্যাত্ম ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম সঙ্কীর বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু হুঃখের বিষয় আমরা দিগের কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈরায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাজলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধগ্রন্থ সকল পাঠ করিলে একপ বালমূলত চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদশাহের অমুজ্ঞাম্বারে ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা আবুলফজল বহু অমুসন্ধানে এক খানিও বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কছেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম নামে খ্যাত—অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীখর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সঙ্কর্ম পুণ্ডরিক, তথাগত ও-

হক, ললিত বিস্তর, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা উদ্যান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য অদ্বুত ধর্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ যথা—প্রজ্ঞা পাবমিতা, সাবিপুত্রকৃত অভিধর্ম দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম, ধর্মসংগ্রহ-পদ, কাবণ্ডব্যাহ, ধর্মবোধ, ধর্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্যা মাহাত্ম্য, অল্পমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্গীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অ-নেক অল্পসংখ্যানে হজ্জস্ন সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

“বোধিচিহ্ন বিবরণ” নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা ধর্মকীর্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে “সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বাঃ শিষ্যাঃ” “সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্মের আচার্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি ওহানে নাম মাত্র বোধক কি তাহাব শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন নাম, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রস্থানবোধক, গ্রন্থ কর্তাদিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না, বলা যায় না।

বাহাইউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নটেং বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিহ্ন বিবরণ গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি এই রূপ বলেন যথা

“দেশনা লোকনাথানাংসত্যায় বশানুগাঃ।
বিদ্যাস্তে বহুখালোকে উপায়ৈ বহুভিঃ

পুনঃ ॥

গম্ভীবোক্তান ভেদেন কচিচ্ছোভয়

লক্ষণা।

ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা ইয়

লক্ষণা ॥

লোক নাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম ক্রমে বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের গ্রন্থ পাঠে জামিতে পাবা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা সাবিপুত্র, আমন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কুম্মমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি স্থগিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয়

তিনি “প্রজ্ঞাপারমিতা” প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্মাবলম্বী প্রণীত অধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পরিভ্র, একমাত্র হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, যোঙ্গলিয়া, জাপান, শাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাও পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথি

বীতে ৪৫৫০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার, তথা পালি ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচেষ্টেব বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে। আমবা পাঠক বর্গকে উক্ত প্রস্তাবে পালিভাষার মূল গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উপভাব দিব।

শ্রীবাম দাস সেন।



বার্ষিক ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

সপ্তম প্রস্তাব।

বৈষ্ণববর্গ—কৃষি এবং বাগিচা।

ব্রাহ্মণ ও বাজ্ঞবর্গ এবং তাঁহাদের আনুযায়িক বিষয় সমস্ত যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া এক্ষণে বৈষ্ণববর্গ এবং তদানুযায়িক বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈষ্ণবেরা আর্ধ্যসন্তান, আর্ধ্য সম্প্রদায়ের তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত, বেদে অধিকাংশ এবং আর্ধ্যসন্তান হইলে নিকট বর্ণের নিকট যে যে মান মর্যাদা ও প্রভুত্ব পাওয়া যায় ইহারাও সেই সকলের অধিকারী। এই কথাগুলি আমি রামা-

যণের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি না, আর্ধ্যজাতির অতি প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, এবং এ নিয়ম, এ রীতি যখন পরবর্তী সময়েও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে উহা রামায়ণেরও সাময়িক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শির্বোবৃত্ত ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতির শিক্ষা দ্বারা, এবং বাজ্ঞবর্গ বাজ্ঞাপালন, দেশবন্দা,

শাস্তিস্থাপন ইত্যাদি কার্য দ্বারা সামাজিক কল্যাণের যথাসম্ভব অংশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভার হইতে মুক্ত হইতেন। বৈশ্যেরা সেই সামাজিক কল্যাণের কোন অংশ কি পরিমাণে সাধনের ভার যুক্ত ছিলেন তাহা বিবেচ্য। মনু চতুর্ধর্ষের বৃত্তি নির্দেশ নিয়ে উক্ত শ্লোকে কহিয়াছেন,

“ব্রাহ্মণস্ত তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রিয় রক্ষণং।

বৈশ্যশ্চ তপো বার্তা তপঃ শূদ্রস্য

সেবনং ॥

১১ অঃ ২২৬।

ব্রাহ্মণেব তপ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়েব তপ রক্ষণ, বৈশ্যেব তপ বার্তাশাস্ত্র এবং শূদ্রেব তপ সেবন।—(১)

বৈশ্যেরা বাস্তবিক সময়ে সমাজেব ক্ষুদ্র কখন বা কৃষিকার্যসাধন ও পশুপালন, কখন বা তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং সাধাবগতঃ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। বিশেষ বিদ্যা ও গুণবত্তা দেখাইতে পারিলে, কখন কখন বা রাজমন্ত্রি-ত্বেও অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। এবং মনুর গ্রন্থের সহ রামায়ণের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে ইহাদিগের সামাজিক মর্যাদা, গার্হস্থ্যধর্ম, আচার ব্যব-

হার মনুপ্রোক্তমত অবিকল না হউক প্রায় তদ্রূপ ইহা জ্ঞাতব্য।

এখানে একটি বিষয় বিবেচ্য। পূর্বা-গত প্রস্তাব সকলের মধ্যে একাধিক স্থলে, মনুর বিধানিত নিয়ম মালা রামায়ণোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করণে এবং সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইহাবে। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ কি না? বর্তমান সময়ে অস্বদেশীয় পুর্বাভূত সমালোচক দিগের মধ্যে এই এক নূতন মৌখিনতের উদয় হইয়াছে যে, আদিমকালীণ আর্য্যগণ জগৎস্থ পূর্বাণর সকল জ্ঞাতি অপেক্ষা সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা যে কোনরূপে হউক প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং তাহা সমর্থনার্থে প্রমাণ স্থলে ইন্তক আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইত ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিত এবং শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধ-চরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, যেন ঐ সকলই এক সময়ের গ্রন্থ, এবং একই সময়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। এরূপ লেখক এবং সমালোচক দিগের নিবেচনা করা উচিত যে, যুগপরিবর্তনে রীতি নীতির ভ্রমঃপরিবর্তন হইয়া থাকে;— একযুগের এমন অনেক বিষয় যাহা সুকাজ বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হয়, যুগপরিবর্তনে তাহাই আবার অকাজ্য বোধে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এতদ্রূপ যুগ হইতে যুগান্তরের পরিবর্তন সাধারণ বা অগণনীয় নহে। অতএব

(১) বৈশ্য নামের ব্যুৎপত্তি এরূপ “বিশ্ to enter (fields &c) কিপ affix and ব্যঞ্ added”—Wilson. টিহার দ্বারা বৈশ্যবৃত্তি বিশেষরূপে জ্ঞাপিত হইতেছে।

যে সময়ের বিষয় আলোচনা করা যায়, তাহাব প্রমাণস্থলীয় মূল ভাগে সেই সময়েরই প্রমাণ বচনাবলী প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ। বাঙ্গালীকির সময় সমালোচনার সেই নিয়মই পূর্ণাপর নিবপেক্ষ ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি যে যে গ্রন্থাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহ মূল প্রস্তাবের যথাসম্ভব অন্তরতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পবম্পরের মধ্যো অন্তরতা বাখাব চেষ্টা সবেও, মনুপ্রোক্ত বচন ও বিধান অধিক পবিমাণে এবং অধিক ঘনিষ্ঠতাব সহিত গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। ইহাব কাবণ নির্দেশ কবিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মনুর সঙ্গে রামায়ণের কি সম্বন্ধ। রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে যৎকালে বিনাপরাদে শত্রুতা করাব নিমিত্ত বালি বামকে তৎসনা করিতেছে, তখন রাম নিয়মত বাক্যে বালিব পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া আশ্বদোষ কালন করিতেছেন।

“অয়তে মনুনা গীতো শ্লোকো চাবিত্র
বৎসনৌ।

গৃহিতৌ ধর্মকুশলৈ তথা তচ্চরিতং

মথ্য। ৥”

এখন দেখা যাইতেছে যে মনুর নাম রামায়ণের পরবর্তী বা সমসাময়িক হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত যে তাহা বহু পূর্ববর্তী। কলতঃ মনুর নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম

স্থক্কে উক্ত। কিন্তু বাম এখানে যে মনুর কথা কহিতেছেন, তিনি স্মৃতিকর্তা মনু, এবং রাম বান্ধবধর্মপালনার্থে তাঁহার অনুগামী। রামের আপন মুখ হইতে উক্ত হওয়ায় সেই স্মৃতি তাঁহার অর্থাৎ বাঙ্গালীকিব পূর্বে প্রণীত। এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে মনুকে স্মৃতিকারক বলিয়া উল্লেখ ব্যতীত বহুস্থলে মনুসংহিতা স্থিত বিধানমালা সহ বাঙ্গালীকিব সাময়িক ব্যবহাবের অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন কবিরাহি ও কবিব। এসকলের দ্বারা কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে মনু সংহিতা সে সময়েরও সমাজ পবিচালক ছিল? তৎপক্ষে উপরি উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যাহা হউক এতদ্বিষয় প্রবন্ধশেষে বাঙ্গালীকির কাল নির্ণয়ে সবিস্তাবে বিবেচ্য। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই মনুসংহিতা বাঙ্গালীকির পূর্বেব, সমসাময়িক বা পরবর্তী হউক, কিন্তু তাহাতে প্রোক্তরূপ ব্যবহাব বাঙ্গালীকিব সময়ে যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কাবণেই মনুসংহিতা এই প্রবন্ধে এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈশ্রবর্গের সহ কৃষিকার্য্যেব সম্বন্ধ একটি প্রধান সম্বন্ধ। যে দেশে শস্তসিদ্ধ এবং গন্ধাদেবী হৃহিতৃগ্গ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন, যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম ও প্রভব, সে দেশে

যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং সমরোচিত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা দ্বিকৃতি মাত্র। আধ্যাত্মিক অতি প্রাচীন তম ঐতিহাসিক তত্ত্বময় গুণবেদে তুর্যো ভূষঃ কৃষি কার্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং “কিনাশ” শব্দে নামিত কৃষক ও “কুল্যা” শব্দে জল প্রণালীবণ্ড অস্তিত্ব সূচন হইয়াছে। (২) তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জল প্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [৩] বহুস্থানে ধান [৪] এবং যবের [৫] নাম উক্ত হইয়াছে। অথর্ববেদের এক স্থানে কথিত আছে “ত্রীহিম্ অন্তঃ যবম্ অন্তঃ অথো মাসম্ অথো তিলম্—” [৬] ১৪০ ২।৬ ইত্যাদি।

(২) ঋগ্বেদ ১০-৩৪-১৩, ১০-১১৭-৭, ১০ ৪৩ ৭ ইত্যাদি।

(৩) “যাঃ আপো দিব্যাঃ উত বা শ্রবন্তি ঋনিত্রিমাঃ উত বা যাঃ সন্নং জাঃ।” এই স্থান সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন “from this it is not unreasonable lands under cultivation may have been practised”—Muir

(৪) ঋগ্বেদ ৩ ৩৫ ৩, ৬ ২৯ ৪ ইত্যাদি।

(৫) ঋগ্বেদ ১-৬৬ ৩ যব সম্বন্ধে Messrs Böhrlink and Roth বলেন, যব অর্থে বৈদিক সময়ের উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যকেই বুঝাইত। এস্থল ম্যুর সাহেব কর্তৃক উক্ত অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল।

(৬) Muir's Sanscrit test নামক পুস্তক হইতে গৃহীত বচন।

এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বৈদিক সময়ে কৃষি কার্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে বহুপ্রসবিনী বস্তুকর্য হইতে আর্থোত্তা বহুদ্রব্য দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একগে বাণীকির সাময়িক কৃষিকা-র্যের অবস্থা দেখা যাউক। এই সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পূর্বোক্ত বৈদিক সময়ের ন্যায়, এখানেও কৃষি অস্তিত্ব, কৃষিপ্রণালী বা তথাবিধি বিষয়ের নিমিত্ত বামায়ণ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র এবং কিয়দংশে হাস্যজনক। বাণীকির সাময়িক সমা-ধেব গ্রাম অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে কৃষিকার্য রাজনিয়ে কতদূর বন্ধিত, কৃষিজীবীরা কিরূপ ব্যবহৃত, এবং কৃষি-কার্য কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাই দেখা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। এই প্রবন্ধেব চতুর্থ প্রস্তাব হইতে, দ্বিতীয় কাণ্ডেব ১০০ সর্গেব অংশ বিশে-ষেব অনুবাদ এস্থলে গ্রহণ করিলাম। তথায় রামের অন্বেষণে ভবত চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হটনে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় অন্ত্যস্ত বিষয়ক প্রশ্ন মধ্যে রামকর্তৃক ভবত ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতেছেন “সী-মন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিতঃ ৷ শস্য-সুপ্রচুরঃ; যথা নদীজলেই কৃষিকার্য্য স-ম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত একগে উপজীব শৃঙ্গ ? কুবক ও পণ্ডপাল-কেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে ?

এবং উহা বা স্বপ্ন কার্যে বস্তু থাকিয়া স্বপ্ন স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?” (৭) এইটি কৃষকদিগের পক্ষে যেমন অমূল্য-কূলবাক্য, এমনটি রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু এটি খাটি বাস্তবিকের মুখ নিঃসৃত বাক্য বলিয়া সন্দেহহীন হওয়া যায় না, বা তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। (৮) পুনশ্চ রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তষষ্টি সর্গে রাজশাসনের শিথিলতায় কৃষিকার্য্যের দুর্ববস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং ত্রয়স্তিংশ সর্গে রামের বনবাস এবং তরতেষ বাজ্য প্রাপ্ততা হেতু কৃষিজীবী ও পশুপালকগণ যথেষ্ট পৰিমাণে আশ্রয় পাইবে না বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলের দ্বারা অসুস্থিত হইবে, রাজশাসনের শিথিলতা বা রাজ্য অক্ষমতা অথবা অজ্ঞানতা হইলে, কৃষিজীবীর উপর অত্যাচারী অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইত। সে যাহা হউক, সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দেশে যখন “রামবাজ্য” প্রবর্তিত

(৭) এখানেও মূল্যবান বাহুল্য ভরে উদ্ধৃত হইল না। বাহুল্যের দোষে ইচ্ছা হইবে ২১০০১৪৪-৪৮ এবং রামায়ণের টীকা দেখিবেন।

(৮) বঙ্গদর্শন ৩ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠা টীকা দেখ।

হইত, তখন ত কৃষির প্রতি তৎকালোচিত বুদ্ধি অনুসরণ কর এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতই; তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও যথাযথ হইতে ক্রটি হইত না। রাজারা স্বয়ং আত্মহিসাবে লোকদ্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কৃষিকার্য্য কবাইতে ক্রটি করিতেন না। মহাসংহিতায় দৃষ্ট হইবে যে, সকল শ্রেণীর আর্থ্যবাহী কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব মমতা করিতেন, এবং তাহাব উন্নতিসাধন পক্ষে যত্নপরায়ণ ছিলেন। ইহাব আদর্শও এতদূর ছিল যে, আবশ্যিক মতে ব্রাহ্মণেও লাঙ্গল ধবিত্তে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,

“তত্রাসীং পিতৃনো গার্গ্যস্তিহাটো নামৈব
দ্বিজঃ।

ক্ষতবৃন্তি বনে নিত্যং ফলকুন্ডাল লাক্ষনী॥

২১০২১২২

এখন জিজ্ঞাস্য, যেন কৃষি কার্য্য আদৃত বা সুরক্ষিত হইল, কিন্তু কৃষিজীবী কি সর্বদা তাহাব সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে এবং ধনশালী হইতে পারিত? বোধ হয় সর্বদা নহে। তাহা হইলে সাধারণ প্রজাবর্গের অসম্পন্ন অবস্থা লক্ষিত হয় কেন? কৃষিকার্য্যের প্রতি উৎসাহ হইতে আদর, যত্ন, এবং সুরক্ষণ সংযোজন হইলেই যদি কৃষিজীবী আপন পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিত, তবে নীলকরের প্রজার এ দুর্দশা কেন? নীলকরেরা ত নীলের চাষের

উপর কম আদর, কম যত্ন, কম রক্ষণ করে না।

কৃষি এবং কৃষিজীবীর অবস্থা অন্য প্রকারে দেখা যাউক। রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে তখন ভাবতবর্ষে বহুধনের সমাগম হইয়াছে। ক্ষাটিক গবাক্ষ (৯) যুক্ত ঈশ্রভবন তুলা অত্যাচ অট্টালিকা, সুরমা উদ্যান মালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণি মাণিকের হুড়া ছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহু-বিধ জবা সকল, ইহাদের ভূর উল্লেখ কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উক্তর ভাবত অত্যন্ত ধনশালী হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অজান্তে ভাবে গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে মহাসংহিতা দেখ, বাস্তবিকবর্ণিত সমাজের ন্যায় অতীত উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাউবে, এবং ইহা কিয়দংশে রামায়ণের সময়েই উপর বর্ণিত পাবে। আবার বৈদেশিক ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে আসিরিয়া দেশীয় রাণী শমিরমা [যাহার প্রচুর ভাব কাল বাস্তবিক সময় হইতে অল্পই এদিক ওদিক,] অন্যান্য দেশ জয় করিয়া ভারতের গৌরব এবং ধনশালিত্ব প্রবণে ভারতজয়ে অগ্রসব হয়েন। ঐরূপ বাস্তবিকের অনতি দীর্ঘকাল পরবর্তী দরায়ুস একমাত্র সপ্ত-

(৯) রামায়ণ ৪র্থ কাণ্ড ১ সর্গ ৩৮ শ্লোক।
ইউবোপ ভূমে প্লিনির সময়েই অব্যব-
হিত পরে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

সিদ্ধুর কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক প্রকৃতি যুগাশ্রিত এবং হীনজাতি দ্বারা অধিকাংশ অধিবেশিত হইলেও এত ধনশালী ছিল, যে তখন হইতে বাৎসরিক কর ৩৬০ ট্যালেন্ট অর্থাৎ ১০০৮০০০ টাকা আদায় হইত। (১০) হিবোডোটসের পরবর্তী টিসিয়স সপ্তসিদ্ধুবিষয়ক বর্ণনার কহিয়াছেন যে তাঁহার জ্ঞাতসারে যত দেশ আছে, সপ্তসিদ্ধু প্রদেশ সে সকল অপেক্ষা বহুত্বতা ও সৌভাগ্যবৃত্ত এবং ধনশালী। যখন একমাত্র পঞ্জাবের অংশবিশেষ সম্বন্ধে ধনবস্তুর এত গৌরব, তখন সর্বগরিমার স্থল অমুগম মধ্যদেশ যে আরও ধনশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং শমিরমার সাময়িক ও হিবোডোটস এবং টিসিয়স কর্তৃক বর্ণিত ধনশালিতার পূর্বসম্বন্ধ বহুত্ব রামায়ণের সময়ের সহিত যোজন্য করিতে পারা যায়।

(১০) Hero: III 94. হিবোডোটসের মতে (Hero: III 98) ভারতবর্ষ অতি পূর্বতম দেশ। তৎপরে মক্কাহান। ইহাতে বোধ হয় দরায়ুসের রাজ্য হিরোডোটস যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পঞ্জাবের অংশ মাত্র। উপরোক্ত মক্কাহান বোধ হয় পঞ্জাব হইতে আরম্ভ রাজপুতানার মক্কাহান। তাহার পর (III 10) পঞ্জাবের অর্থাৎ কথিত দেশের দক্ষিণে লোকের বাস এবং তাহারা দরায়ুসের অধীন নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে দরায়ুসের ভাবতীয় রাজ্যের বিস্তার কত সঙ্গীর্ণ ছিল।

দেশ একরূপ ধনশালী হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্য। বাণিজ্যের পূর্বগামী সচরাচর শিল্প অথবা তদভাবে কৃষি, কিন্তু কৃষি উভয়েরই পূর্বগামী। সূতরাং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির উপর পূর্বকথিত সর্বপ্রকার ধনশালিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। স্মরণ থাকে যেন এ নিয়ম উর্ধ্বর ভূমি যুক্ত প্রদেশের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে। একসমাজ যতগুলি লোকদ্বারা সম্বলিত, তাহার যে অংশ কৃষক, কৃষি-বাবা তাহাদের ভরণ পোষণ হইয়াও যদি সমাজস্থ অবশিষ্টলোকের পোষণার্থে কৃষিজাত দ্রব্য উৎসর্গ থাকে, তবেই তদ্বারা সমাজ রক্ষা এবং ভাবী ধনশালিতার উপায় বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য শিল্পের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের ন্যায় লাভবৃত্ত না হওয়ায়, শিল্পীরা বহুপরিশ্রমে কৃষিকরণোপযোগী ক্রিষ্টিং অর্থ সংগ্রহ করিলেই, কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটে অবিকল এই অবস্থা গিয়াছে, এবং এখনও অনেক পরিমাণে চলিতেছে। এতদ্বারা সমাজ পোষণোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াও যখন অনেক অধিক থাকে, তখন সেই সকল শিল্পও বাণিজ্যার্থে, বা ত্রিমিত্ত অপরাধের দ্রব্য উৎপাদে এবং তাহাও তজ্জপ নিয়োগ হেতু, নিয়োজিত হয়, এবং তদ্বারা দেশ ধনশালী হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ের ভারতের ঐশ্বর্য্য গণনা করিলে, ইহা অবশ্যই অনু-

মেয় যে তৎকালে ভারতের কৃষিকার্য্য সমরোচিত বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, যে দেশে যত ধানের উৎপত্তি হয়, সে দেশে কেবল উপস্থিত জীবন সমূহের পোষণার্থে উপযুক্তাংশ মাত্র রাখিলে, অপরংশ হয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের স্বথ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, নতুবা সে স্বথ স্বচ্ছন্দতার খর্ব্বতা সাধনে রাজ্যে লোক বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বাণীকির সময়ে সেরূপ লোকবৃদ্ধির আধিক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যালথাস যে হারে যত দিনে লোক বৃদ্ধির নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন, সে নিয়মানুসারে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাণীকির সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ লোকে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আর্ধ্যাবর্তের প্রায় সমস্ত স্থান যেমন আর্ধ্য-রাজত্বক হইয়াছে, তেমন সমস্ত স্থান লোকসঙ্কুল হয় নাই। তরতকে আনয়নার্থে দূত যে পথে কেকয় রাজভবনে গিয়াছিল, এবং ভরত যে পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নিবিড় ও হরতিক্রম্য জঙ্গলে পূর্ণ। আবার যমুনার দক্ষিণ তীর হইতেই নিবিড় বনের সঞ্চার। গৃহদ্বারস্থিত অন্ধ-রাজভবনে গমন কালীন, দশরথকে এমত জঙ্গল জনশূন্য স্থান দিয়া বাইতে হইয়াছিল, যে কর্ণেল টড তাহাতে মোহযুক্ত হইয়া ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া অঙ্গকে তিব্বত বা আভা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র জনক ভবনে গমন কাশীর কতই
জমশুভ স্থান অভিক্রম কবিয়াছিলেন।
এখন দেখ, সেই সকল স্থানে এতই
লোকের আধিক্য হইয়াছে, যে তাহাদেব
জন্ম আজি কালি অস্ত্রে উপনিবেশ স্থাপ-
নের আন্দোলন হইতেছে। এই সকল
বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে
যে বান্দীকির সময়ের লোক সংখ্যা কত
অল্প। সুতরাং স্বীকার কবিতে হয় যে
জীবনোপাধ বৃদ্ধির সঙ্গে বান্দীকির সময়ে
অল্পকণ লোক বৃদ্ধি না হইয়া বিলাস বৃদ্ধি
হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। বলিতে
কি যেদপ অপরিমিত, সুশৃঙ্খল বিলাস,
এবং স্বচ্ছন্দতা তৎকালে দেখা যায়, সে
সময় বিবেচনা করিলে, তাহা আশ্চর্য্য
জনক। কিন্তু এ বিলাস, এধন, এ স্বচ্ছন্দতা
কোথার প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে,
রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী দেশভুক্ত লোক
নহে। বিশ্বব্যাপিনী বোমরাজ্য যেমন
ছই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোপাধন
করিত, ভাৰতেও তেমনি তাৎকালিকী
ঐশ্বর্য্য কয়েক পবিবাবেব মধ্যে আবদ্ধ
ছিল বলিয়া বোধ হয়। কাল্যানেব
দশা সব কালেই সমান। রাজকর ব
ষ্টাংশ, (১১) অতএব যেখানে ওটাকার দ্রব্য
উপার্জন করিয়া একটাকা রাজাকে দিতে
হইবে, সেখানে তাহাদের স্বচ্ছন্দতার
সম্ভাবনা কোথায়? এতব্যতীত অল্প
কোন রূপ কর, বুদ্ধব্যয় এবং মহাজনের
দেনাও সম্ভবতঃ ছিল, তাহার পর রাজ-

(১১) বঙ্গদর্শন (৩) ৭৩২৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

কর্মচারীর অত্যাচাব, বা প্রজার অবশি-
ষ্টাংশ ধন রক্ষার অমনোযোগিতা, প্রজার
নির্ধনতার অপর কাবণ। এই শেষোক্ত
কারণ বোধ হয় বিশেষ কপেই প্রবল
ছিল। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়
যে ক্রমক আপন আবশ্যকীয় ব্যতীত কিছু
বেশি ধন উপার্জন করিলেই, তাহা ভব
প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত।
একাদিকস্থলে তাহাব উল্লেখ পাওয়া
যায়। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাই-
তেছে।

“সমুদ্র তনিধানানি পরিধস্তাজিবাগিচ।

উপাস্ত ধন ধন্যানি হৃতসারানি সর্বশঃ।।”

বাম বনে যাইতেছেন, বলিয়া দুর্ভা-
গোরা আশঙ্কা করিতেছে যে, যে ধন ভূগর্ভে
প্রোথিত আছে তাহা পর্য্যন্তও অপবাপর
ধন ধান্ত সহ কেকয়ী পুত্রের রাজত্বকালে
অপহৃত হইবে। এখানে কেকয়ীর
চরিত্র দৃষ্টে কেকয়ী পুত্রের গুণ অবধারণ
করিয়াই তাহাবা এত আশঙ্কা যুক্ত হই-
তেছে। ভাল রাজার আমলে, মাটিতে
পুতিলেও বা কিছু রক্ষা হইত, এবার
তাহাও হইবে না। যেখানে ধন প্রথ-
মতঃ পূর্ব প্রদর্শিত কারণে সঞ্চিত হও
য়াই কঠিন, দ্বিতীয়তঃ যদি বা হইল, তাহা
প্রকাশ রাখাই দাব, সেখানে নিয়ন্ত্রণের
স্বচ্ছন্দতা বা ঐশ্বর্য্য সম্ভবে না। তাহা-
দের পরিশ্রমেব ফল অগরে ভোগ ক-
বিতা থাকে।

এহলে জিজ্ঞাস্য তইতে পারে যে, অ-
পর শ্রেণীর লোক, যাহাবা সামান্ত শিল্প

দ্বারা কেবল জীবিকা মির্জা করিত এবং লুপ্ত লাভজনক কাজে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত না, তাহাদেরই সম্ভবতঃ হীনাবস্থার থাকার কথা । কিন্তু কথিত আছে যে, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের হাতে, তবে কেন কৃষিজীবী বা পশুপালকের দশা তজ্জপ হইত । এখানে উত্তর করি যে, কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এ তিনই, এক ব্যক্তি সব সময়ে স্বহস্তে কবিত্তে পারে না । যদিওবা কাহার ঐ তিন বিষয়ে একীভূত বিষয় ছিল, প্রথমতঃ তাহাব কথা স্বতন্ত্র, ঐশ্বর্যে তাহাকে ঐ তিন কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ অপর লোক দ্বারা সেই সেই কার্য সম্পন্ন করাইত । এমন স্থলে যাগরা স্বহস্তে

কাজ করিত, এবং কৃষি দ্বারাই দিনান্তে বাহার অন্ন, তাহাদেরই অবস্থাক্রমে উপরে সমস্ত কথিত হইল । স্বাধীন কৃষক হইলেও, তাহাব সঙ্গে একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর লাজলাভের তারতম্য দেখ । একজন কৃষিজীবী ৩০টার ধানউপার্জন করিয়া রাজাকে এক টাকা দিবে, আর একজন বণিক ৫০টার সুবর্ণ উপার্জন করিয়া সেই এক টাকা দিবে । এই তারতম্য হেতু, ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে আদম শ্রম কর্তৃক উদ্ভাবিত মুদ্রাব মূল্যাবধারণ তত্ব তৎকালে এবং মনুষ্য সময়ে আর্থাদিগের নিকট সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত ছিল । সামান্য শিল্প বা তথাবিধ ব্যবসায়ীদিগের অবস্থাও কৃষিজীবীগণ হইতে উন্নত ছিল না ।

ক্রমশঃ ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।



বিদ্যাপতি ।

বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্যকাননেব পিকবব । তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই মরস কবিতাকুসুমের বাসন্ত্যসৌরভ বাঙ্গালার ব্যাপ্ত হইয়াছে । তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিভ্রম ও মধুকব সুমধুব জানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে ; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুলজানন্দানিল হিম্মোলে আন্দোলিত হইয়াছে । যখন অমৃতময় স্বর

লহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমন বার্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে ; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তত্ত্বপর্যন্ত বাজিয়া উঠে । এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের

জীবনভূক্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাঁহা যাঁহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। আমরা যাঁহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠাবাত্ত পড়িবে। একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা ঐকমত্য রাখিতে পারিব না।

বিদ্যাপতি কোণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে ইহা জানা আছে যে তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্তী ও কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং তিনি শিব সিংহ নামক রাজা ও লছিমা নামী রাজ্ঞীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আর রূপনারায়ণ নামে তাঁহার একজন বন্ধু ছিল। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের লেখা হইতে এসকল কথা সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃত লিখিত আছে,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহা প্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ মধ্যখণ্ড ।
চৈতন্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য
কয়েকটা স্থল পাঠ করিয়া জানিতে পারা
যায় যে চৈতন্য দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-
দাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল বাসি-

তেন। ভাল বাসিবারই কথা। চৈতন্য
যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের
রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই
কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক
ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রীতির উৎস
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা
বেগবতী নদী হইয়াছে, প্রেমের পাগল
গৌরচন্দ্র কেননা তাহার রসপান করিতে
উৎসুক হইবেন? নরহরিদাস লিখি-
য়াছেন,

জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত ।
জগত ব্যাপি রহ বিশদ চরিত ॥
লছিমা গুণহি উপজে বহুবদ ।
বিলসরে রূপনারায়ণ সঙ্গ ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস ।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ ॥
শ্রীগোকুল বিধু গৌর কিশোর ।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর ॥
নরহরি ভণ অরু কি কহব তার ।
অস্থখন মন জহু রহে তছু পায় ॥

পুনশ্চ,

বিদ্যাপতি কবি ভূপ ।
অগণিত গুণধন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়
পিরীতি মুরতি রসকূপ ॥
শিশু সমর্যাবধি অধিক পরাক্রম
বিরচল দ্বেষচরিত বহু ভাঁতি ।
কোই করল উপদেশ পরম রস উলসিত
তাহে নিরত রহ মাতি ॥

শ্রীশিব সিংহ নৃপতি লছিম প্রিয় অতুল
 বিমল বশ বিদিত হি তেল ।
 ভ্রামর গৌরী কেলিমলি সংপুট
 যতনে উষাতি ভুবন ধনি কেল ॥
 মরি মরি বাক গীত নব অমির
 শিবি শিবি জীবই সে রসিকচকোর ।
 নর হরি তাক পরশ নাহি পাওল
 বুঝব কি ওরস মরুমতি মোর ॥
 বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,
 জয় জয় দেব কবি, নৃপতি শিবোমনি,
 বিদ্যাপতি রসধাম ।
 জয় জয় চণ্ডীদাস, বসশেখর,
 অখিল ভুবনে অমুপাম ॥
 যাকর রচিত মধুব রস নিবমল
 গদ্য পদ্য ময় গীত ।
 প্রভু মোর গৌর চক্রে আশ্বাদিলা
 রায় স্বরূপ সহিত ॥
 যবহ বে ভাব উদয় দুহু অন্তরে,
 তব গায়হি হুহু মেলি ।
 শুনইতে দারু পাষণ গলি যায়ত,
 ঐছন সুমধুর কেলি ॥
 আছিল গোপতে, যতন করিপছঁমোর
 জগতে করল পরকাশ ।
 সোরস শ্রবণে, পরশ নাহি হোরল,
 রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥
 গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,
 কবিপতি বিদ্যাপতি যতি মানে ।
 যাক গীত, জগতচিত চোরায়ল,
 গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে ॥
 ভুবনে আছে যত ভারতী বাণী ।

তাকর সার, সাব পদসঙ্কে,
 বাখল গীত কতহু পরিমাণি ॥
 যো সুখ সম্পদে শকর ধনিয়া ।
 সো সুখসার, হার সব রসিকহি,
 কর্তৃহি কর্তৃ পরায়ল বনিয়া ।
 আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা ।
 সে আনন্দবস, জগতরি বরিখল,
 সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা ॥
 যত যত রসপদ কয়লহি বন্ধে ।
 কোটিহি কোটি, শ্রবণপর পাইয়ে,
 শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে ॥
 সোরস শুনি নাগর বরনারী ।
 কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
 রসময় চম্পু বিধারি ॥
 গোবিন্দদাস যতি মনে ।
 এত সুখ সম্পদ, বহইতে আনমন,
 যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥
 আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের বে করেকটা
 কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদৃষ্টে এই
 করেকটা কথা জানা যাইতেছে, (১)
 বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক
 ভক্তের হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছে;
 (২) চৈতন্য সর্বদাই ঐ সকল গীত শুনি-
 তেন; (৩) শিবসিংহ নৃপতি ও লছিম
 দেবীর সহিত বিদ্যাপতির সন্তাব ছিল;
 (৪) রূপনারায়ণের সহিত তাঁহার সখ্য
 ছিল । এক্ষণে দেখা যাউক, বিদ্যাপতির
 লিখিত কবিতা হইতে তাঁহার কিরূপ
 পরিচয় পাওয়া যায় । বিদ্যাপতির কোন
 কোন গীতে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে ।
 রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥
 কোথাও একরূপ,
 ভগ্ন বিদ্যাপতি ভনহ সুবতী
 এসব একরূপ জান ।
 রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ ।
 লছিমা দেবী পরমাণ ॥
 কুত্র এ প্রকার,
 ভগ্নে বিদ্যাপতি, ভন সব সুবতী
 ইচ রসকূপ যে জান ।
 রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ
 লছিমা দেবী পরমাণ ॥
 কোন স্থলে ঈদৃশ,
 ভগ্নে বিদ্যাপতি, অপকূপ মুরতি,
 রাধা রূপ অপার ।
 রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
 একাদশ অবতারা ॥
 কুত্র বা এবমিধ,
 রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ ।
 ভগ্নে বিদ্যাপতি মনহঁ নিশঙ্ক ॥
 কোথাও এপ্রকার,
 বিদ্যাপতি কহ ভাষি ।
 রূপনারায়ণ সাধি ॥
 এইরূপ বিদ্যাপতি লিখিত অনেক ক-
 বিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা
 শিব সিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের
 সঙ্গে তাঁহার সঙ্গাব ছিল ।
 বাঙ্গালা ভাষার পুরুষপরীক্ষা নামক
 একখানি গদ্য পুস্তক আছে; উহার
 প্রারম্ভ এই প্রকার, “অমরবৃন্দ কর্তৃক

স্তুত ব্রজা বাঁহাকে স্তব করেন এবং দেব-
 তাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর বাঁহাকে পূজা
 করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত
 হইয়াও বাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী
 যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি
 কোটি কোটি প্রণাম করি। সুর সমূহের
 মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমু-
 দায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে ত্রীদেব
 সিংহ রাজার পুত্র ত্রীশিব সিংহ রাজা
 তিনি জয়যুক্ত হউন ।

“অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকের
 দিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এবং কাম-
 কলা কৌতুকবিশিষ্ট পুৰুষীগণের হর্ষের
 নিমিত্ত ত্রীশিব সিংহ বাজাব আজ্ঞানুসারে
 বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা
 করিতেছেন যে রসজ্ঞান দ্বারা নিঃশূল বুদ্ধি
 যে পণ্ডিত সকল তাঁহার নীতিবোধানু-
 বোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নি-
 মিত্তে কি আমাব এই বচি ত গ্রন্থ শ্রবণ
 করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন ।
 যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পু-
 রুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের
 কথা সকল লোকেব মনোরমা সেই পু-
 রুষ পরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা
 যাইতেছে ।”

এইরূপ বাঙ্গালা গদ্যে কবি বিদ্যাপতি
 পুরুষ পরীক্ষা রচনা করিয়াছেন, ইহা
 অনেকের বিশ্বাস । কিন্তু এটা ভ্রম ।
 ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করি-
 য়াছেন, অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ
 প্রয়োগ করেন নাই । আমরা কেন ভ্রম

বলিতেছি, নিম্নে তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছি,

(১) পঞ্জিতবর শ্রীযুক্ত দৈবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা আছে। পুস্তকখানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। ঐপুস্তকের উপরে লিখিত আছে,

“শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীত পুরুষপরীক্ষা ॥ শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত।”

(২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস (Annals of the College of Fort William) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে হরপ্রসাদ রায় মূল সংস্কৃত হইতে পুরুষ পরীক্ষা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোম্পিলের অভিপ্রেতানুসারে গবর্ণমেন্টের উৎসাহে শ্রীবামপুর মিসিনরী বন্দে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।*

* In a “Catalogue of Literary works, the publication of which has been encouraged by Government at the recommendation of the council of the college of Fort William, since the period of disputation, held in 1814,” we find the following:—

“পুরুষ পরীক্ষা Pooroosah Pureekha or the Test of man, a work containing the moral doctrines of the Hindus, translated into the Bengalee Language, from the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit

(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে যে পূর্বপ্রদত্ত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা সূচনা অনুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ

“ব্রহ্মাণি যাং নোতি মৃতঃ সুরেণ

যামার্চতোপ্যচর্যতীন্মোলিঃ।

বাংধ্যায়তি ধ্যানগতোপিবিষ্ণু

শ্রুমাণি শিরসা প্রপদ্যে ॥

attached to the College of Fort William, for the use of the Bengalee class. It is a delineation of eminence of character, in many situations of human life, and consists of forty-eight stories, illustrative thereof. Some of these describe men eminent for moral virtue; others, men eminent for heroic or daring actions; others are represented as examples of high qualifications; and others, of extraordinary folly or wisdom, virtue or vice.—The whole forming an useful miscellany of Eastern manners and opinions.”

p. 474. Annals of the College of Fort William.

In Appendix—No. II of the same work, giving a “Catalogue of Oriental and other works, which have been published under the patronage of the College of Fort William, since its Institution, in 1800,” we find the following:

“পুরুষ পরীক্ষা Pooroosah Pureekha, translated from the original Sanscrit, by Huruprusuda Raya. Serampore, printed at the Mission Press, 8vo. 1815.”

বীরে মাতঃ সুধিরাং বরেনো
বিদ্যাবতামাদিবিবেচনীয়াঃ ।
শ্রীদেবসিংহকৃতিপালমুখ
জ্যৈষ্ঠাচ্চিরং শ্রীশিব সিংহ দেবঃ ॥
“শিশুনাংসিদ্ধার্থঃ নর পরিচিতে নূতনদিরাং
মুদে পোরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক
যুধাম্ ।

নিদেশান্নিঃশঙ্কঃ সপদি শিবসিংহ
কৃতিগতে:
কথানাং প্রস্তাবং বিবচয়তি বিদ্যাপতি
কবিঃ ॥

নয়ানুবোধেন শুণেন বাপি
কথনবসস্তাপি কুতুহলেন ।
বুধোপি বৈদগ্ধ্যবিশুদ্ধচেতাঃ
প্রবন্ধমাকর্ণয়তাং ন কিস্মে ॥
পুরুষাঃ পবিত্রীয়ন্তে যুক্তবস্ত্রাঃ পবীকৃয়া ।
তৎপুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্বজনপ্রিয়া ॥”

পুরুষপরীক্ষা লেখক বিদ্যাপতি বাজা
শিব সিংহের আশ্রিত; গীত রচয়িতা
বিদ্যাপতিও রাজা শিব সিংহের আশ্রিত।
সুতরাং পুরুষপরীক্ষা লেখক ও গীত
রচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভা-
বনা। অন্ততঃ যতক্ষণ অন্তরূপ প্রমাণ
না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ
বিবেচনা করাই যুক্তি সিদ্ধ, কারণ বি-
ভিন্ন পাত্রস্থলে গ্রন্থকর্তা ও আশ্রয়দাতা
উভয়ের নামের ঐক্য হওয়া অতীব অস-
ম্ভব। পুরুষপরীক্ষা হইতে রাজা শিব
সিংহের একটি পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,
তিনি বাজা দেব সিংহের পুত্র।

বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকাল-
বর্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা
শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভি-
লাষী হন। উভয়ের মিলন সম্বন্ধে
চারিটা কবিতা আছে; তন্মধ্যে আমরা
দুইটা উদ্ধৃত করিলাম; একটি রূপনারা-
য়ণের, অপরটা বিদ্যাপতির রচিত।

(১)

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অমুরাগ ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অমুরাগ ॥
হুহঁ উৎকণ্ঠিত ভেল ।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পাবই,
চলল দরশন লাগি ।
পছহি হুহঁ জন, হুহঁ গুণ গাও ত,
হুহঁ হিয়ে হুহঁ রহঁ জাগি ॥
দৈবহি হুহঁ দোহা, দরশন পাওন,
লখই না পারই কোই ।
হুহঁ দোহা নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই ॥

(২)

সময় বসন্ত, যামদিন মাঝি
বুটতলে সুরধুনী তীর ।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে মিলল,
পুলকে কলেবর গীব ॥
হুহঁ জন ধৈরজ ধরই না পার ।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
হুহঁক অবশ প্রতিকার ॥

ধৈরজ ধবি হুঁ, নিভুতে আলাপই,
 পুহুত মধুর রস কি ?
 রসিক হইতে কিসে, রস উপভায়ত,
 রস হইতে রসিক কহি ?
 রসিকা হইতে, রসিক কিসে হোয়ত,
 রসিক হইতে রসিকা ?
 রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি কিসে,
 কাহে মানব অধিকা ?
 পুহুত চণ্ডীদাস কবি বজনে,
 গুনত রূপনারায়ণ।
 কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ,
 লছিমা পদ করি ধ্যাম ॥

আমরা যে দুইটা গীত উদ্ধৃত করিলাম
 না, তন্মধ্যে একটীর ভণিতা এইরূপ,
 রূপনারায়ণ, বিজয় নাবায়ণ,
 বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
 মিলম ভাবি, হুঁক করু বর্ণন,
 তছু পদ কমলভূজ।

সুতরাং এটির রচয়িতা চারিজন,
 রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও
 শিবসিংহ; এবং এই চারি জনই বিদ্যা-
 পতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি
 চণ্ডীদাসের লিখিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া-
 ছিলেন। বীরভূমস্থ নারুর গ্রামে চণ্ডী-
 দাসের বাসস্থান ছিল। অতএব বিদ্যা-
 পতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে
 অতিদূরবর্তী ছিল না, এরূপ অনুমান করা
 নিতান্ত অন্যায় নহে।

এদ্বারা আর একটা কথা বিচার করা
 আবশ্যক হইতেছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যা-

পতি উভয়েই এক সময়ের লোক; চণ্ডী-
 দাসের লেখার সঙ্গে বর্তমান বাক্যলার
 অল্পই প্রভেদ, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতায়
 হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।
 উভয়ের বচনা প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদ-
 র্শন করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েরই
 দুইটা করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।
 প্রথম ও দ্বিতীয়টা চণ্ডীদাসের, এবং তৃতীয়
 ও চতুর্থটা বিদ্যাপতির।

(১)

রাধাব কি হইল অন্তরে ব্যথা।
 বসিরা বিবলে, থাকয়ে একলে,
 না শুনে কাহার কথা ॥
 সদাই ধৈর্যানে, চাহে মেঘপানে,
 না চলে ময়নাব তারা।
 বিরতি আহাবে, রাঙ্গাবাস পবে,
 যেমত যোগিনী পারা ॥
 এলাইবা বেগী, খুলয়ে গাঁথনী,
 দেখয়ে স্বসাক্ষী চুলি।
 হাসিত বদনে, চাহে মেঘপানে,
 কি কহে হুহাত তুলি ॥
 একদিট করি, মধুর মধুবি,
 কষ্ট করে নিরীক্ষণে।
 চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
 কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

(২)

ধিক রহ জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
 তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে ॥
 এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
 সুধার সাগর মোরে গরল হইল ॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিহু তার ।
 গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ার ॥
 নীচল বলিয়া যদি পাষণ কৈলাম কোলে ।
 এ দেহ অনল তাপে পাষণ সে গলে ॥
 ছাঁয়া দেখি যাই যদি তকলতাবনে ।
 অলিয়া উঠয়ে তক লতা পাতা সনে ॥
 যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ ।
 পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
 অতএব এছাব পবাণ যাবে কিসে ।
 নিচয়ে ভবিষ্য মুক্তি এ গবল বিষে ॥
 চণ্ডীদাসে নাল দৈব গতি নাছি জান ।
 দ্বাকণ পিরীতি সেই ধবই পবাণ ।

(৩)

শৈশব গৌরন দবশন ভেল ।
 ছুই দলবলে ধনী দ্বৈকে পড়ি গেল ॥
 কবচ ঝাপয়ে অঙ্গ কবচ বিখাব
 কবচ বাধয়ে কুচ কবচ উবার ॥
 শিব নয়ান নাছি অগিব ভেলা ।
 উরজ উদয় খল নাশিম দেল ॥
 চঞ্চল চবণ চিত চঞ্চল ভাণ ।
 জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
 বিদ্যাপতি কহে শুন ববকান ।
 বৈবজ ধরু মিলাসব আন ।

(৪)

সখি কি গুছসি অমুভব মোষ ।
 সোই গিরীতি অমুবাগ বাথানিতে
 তিলে তিলে নূতন হোষ ॥
 জনম অবধি হম রূপ নিহাবহু
 নখন ন তিরপিত তেল ।
 সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনহু
 শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥

কত মধু যামিনী বভসে শোয়ারহু
 না বুঝহু কৈছন কেল ।
 লাখ লাখ ফুল হিবে হিয়ে বাগহু
 তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥
 ষত ষত বসিক জন বসে অমুমন
 অমুভব কাহ না পেখ ।
 বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
 লাখে না মিলিল এক ॥

যদিও চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে
 হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং বিদ্যা-
 পতির নামাবলিষ্ট কোন কোন কবিতা
 বিস্তৃত বাঙ্গালায় বচিত, তথাপি সাধারণতঃ
 চণ্ডীদাসের লেখা বাঙ্গালা ও বিদ্যা-
 পতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন । একপ
 হইবার কাবণ কি বিবেচনা কবিয়া দেখা
 উচিত । পূর্বে কেহ কেহ বলিতেন
 যে বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা
 হিন্দি হইতে পৃথগ্ভূত হয় নাই ; কিন্তু
 চণ্ডীদাসের বচনাপ্রকৃতি দেখিলে এ বি-
 শ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পাবে
 না । চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, চণ্ডী-
 দাসের ছন্দ বাঙ্গালা । বিদ্যাপতির শব্দ
 হিন্দি, বিদ্যাপতির ছন্দ হিন্দি । কেহ
 কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক
 গীত বচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি ব্রজ-
 ভাষার অমুকবণ কবিয়াছেন, তাহাতেই
 তাঁহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য, চণ্ডী-
 দাস তাঁহার ভ্রাতৃ বিদ্যান ছিলেন না বলি-
 যাই অনেক ব্রজবুলি প্রয়োগ করিতে
 পারেন নাই । বাহা এই মতেষ সম-
 র্থন করেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে

চৈতন্যের পরেও, এমন কি এখন পর্যন্ত, বঙ্গীয় কবির উক্ত প্রকার হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে আর একটি কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির গীতে যুক্ত হইয়া, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়াই পরবর্তী কবির হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্বের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা কবির উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতিকেই হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিতে স্বতঃ প্ররত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতৃভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষার স্থায় বিস্তৃত বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাঁহার অধিকাংশ গীতগুলিকে ছন্দে ও শব্দে হিন্দিভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আদি কবির স্বদেশীয় দিগের বোধগম্য করিয়াই গীত রচনা করেন; তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ পরবর্তী কালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাঁহাদিগের রচনা প্রণালী সর্ব সাধারণের হৃদ্যে হইলেও বিশেষ পাঠক শ্রেণীর জন্য অনুকরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার স্থায় ভাষা যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি বীরভূম জেলার চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙ্গালা। অতএব বীরভূম হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলভিমুখে গমন করিলে বিদ্যাপতির

বাসস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। “খেলত,” “ভেল,” “কহব,” “মাতল,” “শ্রবণক,” ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক।

এপর্যন্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটি কথা পাওয়া যাইতেছে; (১) তিনি চৈতন্যের পূর্বে ও চণ্ডীদাসের সময়ে শিবসিংহ নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মহিধীর নাম লছিম ও পিতার নাম দেব সিংহ ছিল; (২) রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যাপতির মিত্র ছিল; (৩) বিদ্যাপতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা রচনা করেন; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল।

মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিম দেবীর নামোল্লেখ আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটি গীত উদ্ধৃত করিলাম —

অরুণ পূরব দিশ, বহল মগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।

মুনি গেল কুমুদিনী, তইও হোহর ধনি,
মুনল যুথ অরবিন্দা ॥

কমল বদন, কুবলয় দুই লোচন,
অধর মধুরি নিরমাণে ।
সকল শরীর, কুহুম তুম সিরঙ্গল,
কিঅ দর্শে জন্ম পথাণে ॥
অসকতি কর, করণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে ।
গিরিসম গরুজ, মান নহি মুকুসি,
অপহুব তুম ব্যবহারে ॥
অব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে ।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে ॥

আর একটা গীতেব ভণিতা এষ্টরূপ
ভণই বিদ্যাপতি, সুহু ব্রজ গৌবতি,
ইথিক লক্ষ্মী সমানে ।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই
বিরমাণে ॥

অপর একটা কবিতাব ভণিতা এবম্বিধ,
ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজ নারি ।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি ॥

মিথিলায় পঞ্জী নামে একখানি বৃহৎ
গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রা-
হ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায় । ১২৪৮
শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজ-
ত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয়;
উহাতে লিখিত আছে,

শাকে ত্রিহরিসিংহদেবনৃপতে: ভূপার্ক
তুল্যোজনি ।
তস্মাদন্তমিতেহলকে দ্বিজগণৈ: পঞ্জী
প্রবন্ধ: কৃত: ॥

অর্থাৎ “১২৪৮ শাকে হরিসিংহ দেব
নৃপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পঞ্জীপ্রবন্ধের
জন্ম হয় ।”

এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয়
আছে । তাঁহার পিতার নাম গণপতি,
পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের
নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম
দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের
নাম ধর্মাদিত্য । তিনি মিথিলামহীপতি
শিবসিংহের সভ্যসদ ছিলেন । পঞ্জী
প্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণ-
বংশীয়; লখিমী দেবী তাঁহার মহিষী:
রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, এবং
তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া
সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন ।

শিবসিংহ নৃপতি সুগুণা নামক গ্রামে
বাস করিতেন । অদ্যাপি সেই গ্রামে
তাঁহার দ্রাক্ষবংশীয় বা ছত্ররাজা হইয়া
বাস কবিতোছে । তৎস্থানিত বিস্তৃত
অতি গভীর রাজপুকুরিণী নামে অনেক
তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদিগের
সদৃশ বৃহৎ জলাশয় দেশান্তরে প্রায় দেখা
যায় না । মিথিলায় এই একটি প্রবাদ
প্রচলিত আছে,

“পোখরি রনোখরি অরু সত্ পোখরা ।
বাজা শিবসিংহ অরু সত্ ছোকরা ॥”

অর্থাৎ “রাজধানিত পুকুরিণীই প্রকৃত
পুকুরিণী, আর সকল ডোবা; শিবসিংহই
প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্য
লোক ।”

রাজা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপতি

সম্বন্ধে মিথিলার একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রাজা শিবসিংহকে দশ দিবার জন্ত দিল্লীস্থর ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন করেন। যাইয়া দিল্লীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া দিল্লীস্থর পরীক্ষার্থে তাঁহাকে কাষ্ঠপেটকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাজ্যকে দান করাইয়া নিজ নিজ ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্বক গমুনা তীব্রব্রতান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি নাকি ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দপ্রসাদে, উহা অদৃষ্ট হইলেও, দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,

কামিনী করু অসনানে।

হেরইতে হৃদয় উদিত পচবাণে ॥

চিকুর গবল জলধারে।

জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধাবে ॥

কুচযুগ চারু চকেবা।

জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা ॥

জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।

বাকি ধএল উড়ি লাগত অকাসে ॥

তিতল বসন তন লাগু।

মুনিহক মানস মনমথ জাগি ॥

বিদ্যাপতি কবিগাবে।

বড় তপ গুণমতি পুনমতি পাবে ॥

বিদ্যাপতির এই গীতটি বাঙ্গালা দে-

শেও চলিত আছে; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন গল্প কাহারও মুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে চৈহার বৈরূপ আকার হইরাছে নিয়ে প্রদত্ত হইল:

কামিনী করয়ে সিনান।

হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ ॥

চিকুরে গলয়ে জলধারা।

মুখশশি ভয়ে কিয়ে বোয়ে আঙ্গিয়ারা ॥

তিতল বসন তনু লাগি।

মুনি এক মানস মনমথ জাগি ॥

কুচযুগ চারু চকেবা।

নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা ॥

ভেঞ্জি শঙ্কা ভুজ পাশে।

বাকি ধরল জহু উড়ব তরাসে ॥

কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।

গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে ॥^{১০}

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বিদ্যাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীস্থর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। এই কারণে হউক বা না হউক, বিদ্যাপতি যে গ্রাম দান পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎসংশয়েরা অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহার দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা শিবসিংহ নিজভৃত্যমাস্ত্রগত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দানপত্র দেন;

^{১০} প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ। ১৫ পৃষ্ঠা।

তাহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা
যাইতেছে,

অন্ধে লক্ষণ সেন ভূপতি মিতে বহিগ্রহ
ছাঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংস্কে শুভতিথৌপক্ষে
বলক্ষে গুরৌ ।

বাংত্যাঙ্গুরিতন্তটে গজবথৈত্যাখ্য
প্রসিদ্ধে গুরে
দ্বিংসোংসাহ বিবর্দ্ধবাহপুলকঃ সভায়
মধ্যে সভম্ ॥

প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্বরং পৃথুতবাভোগং
নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসবোবরঞ্চ বীসপীনাযানমাসী
মতঃ ।

ত্রিবিদ্যাপতি শর্ম্মণে স্ককবয়ে রাজাধি-
রাজঃ কৃতী
বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতিগ্রামং দদৌ
শাসনম্ ॥

অর্থাৎ

“২৯৩ লক্ষণ সেন ভূপতিব অন্ধে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে গুরুপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাংতী নদীর তীরে গজবথৈত্যাখ্য প্রসিদ্ধপুং রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোংসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভা স্ককবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসবোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন ।”

পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষণ সেনের অন্ধ

ব্যবহৃত । বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা তদ্বিষয়ের সামান্য প্রমাণ নহে । মিথিলা হইতে আমলা আবও সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি কবি ৩৪৯ লক্ষণসেনাকে মৈথিলাক্ষেবে তালপত্রে শ্রীমন্তাগবতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং উহা অদ্যাপি বর্তমান আছে । বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া ছইবার লক্ষণ সেনের অন্ধেব উল্লেখ দেখিয়া আমাদেরিগেব জানিতে ইচ্ছা হয়, যে এক্ষণে ত্রিভুতে লক্ষণ সেনেব অন্ধ প্রচলিত আছে কি না । অহুসঙ্কান দ্বারা পাবে আমলা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষণ সেনের অন্ধ চলিতেছে । উহাব চিহ্ন “লনং” মাঘ মাসেব প্রথম দিন হইতে উহাব নংসব পরিবর্তন ঘটে । এক্ষণে ৭৬১ লক্ষণ সংবৎ চলিতেছে । এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান । সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল হইতেছে । বাবু নাজেঞ্জলাল মিত্র অহুমান দ্বাবা খৃঃ অঃ ১১০০ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষণ সেনের রাজত্ব সময় ধারয়াছেন । মিথিলায় প্রচলিত লক্ষণাব্দ দ্বারা তাঁহাব মতে-রই সমর্থন হইতেছে ।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষণাব্দেব আরম্ভ । সুতরাং ২৯৩ লক্ষণাব্দে ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে । যদি শেবোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমিদান

পত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলায় পঞ্জীগ্রহে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অস্বাভাবিক করেন যে এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াস সাধ্য কার্য্য কবিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তিনি অত্যন্তকাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। স্মৃতরাং বাজা হইবাব ৪৬ বৎসর পূর্বে শিবসিংহ যুব রাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস্যকর নহে। ৪৬ বৎসর পূর্বে ভূমি দান পত্র পাইলেও রাজা শিবসিংহের বাজ্যাভিষেকের পবে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুষপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আর বিদ্যাপতি ৩৪৯ লঙ্কাকাণ্ডে অর্থাৎ ১৩৭৯ শকাব্দে তালপায়ে শ্রীমন্তাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্বারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গা-

তীবে যাইতে বাটতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আসিবেন না কেন। এইরূপ চিন্তা কবিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভাগীরথী জিহবারা হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া বিদ্যাপতি সানন্দে সেই খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতা প্রদেশে একটা শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে স্থান এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ, সেস্থান ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ বাল্মীকিপুর নগরের উত্তরভাগে বাচ নামক নগর হইতে পঞ্চকোশ দূরে অবস্থিত।

যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নীরাষণ নামক সামান্য দ্বিজকুল সম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম “রূপ-নায়ায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।” তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহাবাজ ভবেন্দ্র, পিতৃব্য হরসিংহ-দেব। হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনানারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন নারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ, বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ, ও বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ। মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, লখিমী দেবী, ও বিশ্বাস দেবী; রাজার মৃত্যুর পরে ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন;

তাহার পরে তৎপুত্র হৃদয় নারায়ণ পদা-
ঙ্কিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাঙ্কিত
ভৈরবসিংহ সিংহাসনে আবোহণ করেন ।
ইহার পর রূপনারায়ণের, রাজত্ব । এই
সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পঞ্জী প্রবন্ধ হইতে
সংগৃহীত ; এবং এতদ্দ্বারা রূপনারায়ণ,
বিজয় নারায়ণ ও শিবসিংহ নামক বিদ্যা-
পতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । রূপনারায়ণ
নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশে-
ষণ ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির
নাম বলিয়া বোধ হয় ।

আমবা বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে
অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত পুরুষ
পরীক্ষা পাই নাই । কিন্তু মিথিলায় আ-
মরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি । উহার
উপসংহারে যে কয়েকটী শ্লোক আছে,
বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষায় তাহার অনুবাদ
নাই । এখানে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত
হইল ;

ভূক্তা রাজ্যস্বং বিজিত্য হরিতো হস্তা-
রিপুন্ সংগরে ।
হস্তাচৈব হস্তাশনং মথবিধৌ ভূক্তা ধনৈ
রর্থিনঃ ॥
বাণত্যাঃ ভবসিংহদেব নৃপতি স্ত্যক্তা শি-
বাগ্রে বপুঃ ।
পুত্রো यस্য পিতামহঃ স্বরগমদারদ্রাণ
হৃতঃ ॥
সংকুরীপুর্ সরোবর কর্তা হেমহস্তী রথ-
দান বিদগ্ধঃ ।

ভাতি যন্ত জনকো রণক্ষেত্রে দেব সিংহ-
নৃপতি গুণরাশিঃ ॥
যো গোড়েশ্বর গর্জনে থররণে কৌণীয
লজ্জা যশঃ ।
দিক্কাষ্ঠাচরকুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্ত দামা-
ন্দম্ ॥
তস্য শ্রীশিবসিংহ নৃপতে বিজ্ঞপ্রিয়স্যা-
জয়া ।
গ্রন্থং (অম্পষ্ট) নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতি-
ক্ৰীয়াতনোৎ ॥

অর্থাৎ

“রাজ্য স্বাধোগ করিয়া, দশদিক্ জয়
করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে নিহত করিয়া,
যজ্ঞ বিধিযুক্ত অগ্নিতে হোম করিয়া, ধন-
দ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, যাহার
পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাণতী
নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর পরি-
ত্যাগ করিয়া পুত্র ও দারদ্র্য ভূষিত হইয়া
স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; সংকুরীপুরের
সরোবর কর্তা হেম হস্তী রথ দান তৎপর
রণজয়ী গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি যাহার
জনক ছিলেন ; যিনি গোড়পতির সহিত
সংগ্রাম করিয়া যশোলাভদ্বারা দিক্ কাষ্ঠা-
চরের কুন্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন ; সেই
বিজ্ঞপ্রিয়শিবসিংহ নৃপতির আজ্ঞায় নীতি
বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেন ।”

মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা
বাতীও বিদ্যাপতি রচিত অনেক
গুলি সংস্কৃতগ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে ;
যথা “ভূগাভক্তিতরঙ্গিনী” “দানবাক্যা-

বলী,” বিবাদসার,” “গৰাপতন,” ই-
ত্যাदि। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর আরম্ভ এই
প্রকারঃ—

“অভিবাঙ্কিত সিদ্ধার্থ বন্দিতো যঃ সুবৈ-
রপি ।

সুর্কবিষ্মিহ্মে তন্মৈ গণাধিপত্যে
নমঃ । ১ ।

ভক্তানম্রসুবেজ্জমৌলি মুকুট প্রাগ্ভাব-
তাবক্ষুবন

মানিক্যভ্রাতিপুঞ্জরঞ্জিত পদদন্দারবিন্দ-
শিখঃ ।

দেব্যাত্তৎক্ষণদৈত্যদর্পদলমা গচ্চিৎ
প্রহুটামর

স্বাবাজ্যপ্রতিভূতবিষ্ণুকবণা গন্তীরদৃক্
পাতু বঃ ॥ ২ ।

অভিপ্রীনবসিংহদেব মিথিলা ভূমণ্ডলা-
খণ্ডলো

ভূভ্রমৌলি কিবীট বভ্রনিকর প্রত্যর্চিতা
জিব্ধয়ঃ ।

আপূর্নাপবদক্ষিণোত্তরগিরি প্রাপ্তার্থি
বাহ্যধিক

স্বর্ণক্ষৌণিমণি প্রদান বিজিত শ্রীকর্ণকল্প-
ক্রমঃ ॥ ৩ ।

বিস্বখ্যাতনবস্তুদীপ্তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপো-
দযঃ

সংগ্রামাঙ্গলকুটৈববিবিজয়ঃ কীর্ত্যাপ্ত-
লোকভ্রয়ঃ ।

মর্যাদানিলয়ঃ প্রকাশনিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষা-
শ্রয়ঃ

শ্রীমদ্রূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যাগোঘ-
ক্রিয়ঃ ॥ ৪ ।

শৌর্য্যাবজ্জিত পঞ্চগৌড় ধবনীনাথোপ-
নয়ীকৃত্য

নেকোত্তরুত্তরঙ্গ সঙ্গিত সিতচ্ছত্রাভি-
রামোদয়ঃ ।

শ্রীমদৈবব সিংহদেব নৃপতিগুণামুজ্জ্বা-
জয়

ত্যাচক্রাক্ষমখণ্ডকীর্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারা-
য়ণঃ ॥ ৫ ।

দেবীভক্তি পরায়ণঃ শ্রতিমুখ প্রারক্ষণার্য-
য়ণঃ

সংগ্রামে বিপুর্বাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ
নাবায়ণঃ ।

বিশ্বেবাংহিত কাম্যয়া নৃপববোহুজ্জাপ্য
বিদ্যাপতিং

শ্রীধৃগোৎসব পদ্ধতিংস তমুতে দৃষ্টানিবন্ধ
স্থিতিম্ ॥ ৬ ।

এই কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া জানা
যায় যে, বাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব-
কালে বাজকুমার কপনারায়ণের আদেশে
বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী রচনা ক-
বেন। ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ, ও রূপ
নারায়ণ নামক নরসিংহ দেবের পুত্রত্ব
উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই খ্যাতিলাভ
করিয়াছিলেন; কপনারায়ণ কংস নামক
কোন রাজাকে পবাক্ষয় করেন; এবং
ভৈরবসিংহ গোড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে
জয়ী হন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ
রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্বে
বিদ্যাপতি তাঁহার নিকটে ভূমি দানপত্র
প্রাপ্ত হন। দান প্রাপ্তিকালে কবি

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের নূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহের সিংহাসনারোহণকালে বিদ্যাপতির বয়স অন্ত্য ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অজ্ঞায় নহে। দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব সময়েও কবি বর্তমান ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল ৩১০ বৎসর; তৎপরে মহাবাদী পদ্মাবতী ১১০ বৎসর, লখিমা দেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন; তদন্তর নরসিংহ দেব বাদা হন। সুতরাং নরসিংহ দেবের রাজত্বাবস্তু সময়ে বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সে দিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে লিখিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। নরসিংহ দেব ১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া ৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সুতরাং

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বমধ্যে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,

“অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীকৃত্য মহার্ণব রতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাত বলিদানয়োঃ পৃথক্ ফলমভিহিতং। যথা, দেবীংধ্যাত্বা পূজয়িত্বা অর্ধরাত্রৌষধীষুচ। ঘাতয়ন্তি পশুন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহা-

বলাঃ ॥

বলিং যে চ প্রগচ্ছন্তি সর্কভূত বিনাশনং। তেষাম্ তুষাতে দেবী যাবৎ কল্পত্ব

শাকরং ॥”

দুর্গোৎসবতত্ত্ব ১

জ্যোতিষতত্ত্বে “একাকীন্দ্র শকাব্দকে” পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অস্বাভাবিক কবেন যে, উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যদিই বা পরবর্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদের প্রায় বক্তব্য শেষ হইল। তিনি যে মৈথিল কবি, ভবিষ্যের প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের

ভণিতার রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্ৰন্থে বিদ্যাপতির পবিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্ৰন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগ দখল করিয়া তথায় বাস কবিতেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তৎসংশ্লিষ্টদিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হুতবাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতিলিখিত পুরুষ পবীক্সা, দুর্গাভক্তিভরস্বিনী, ও অন্তান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আব কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্ৰন্থে মিথিলার বাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গাগণের নান বিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই ও বিষয়ে

সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অনায়াস নহে। বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অঙ্গ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালাব স্বাধীন হিন্দু রাজ্যস্বাক লক্ষ্মণ সংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালাব অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইবে? এতদ্ভাবিতক, বিদ্যাপতিব হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসেব রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবেব নিকটে পাঠিয়াছিলেন এবং সে রস পবে চৈতন্যদেব ও ওক্তদিগেব সময়ে মূর্ত্তিমান হইয়া বাঙ্গালা প্রাবিত করিয়াছিল। হুতবাং বিদ্যাপতির কবিতাকুশল সাদবে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাচর্চার একটা প্রধান স্থান। এখানেই মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া

পরমার্থ বিষয়ে এবং পরমাছা সঙ্কে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন। মহর্ষি সকলকে সাদর সজ্জ্বর প্রদান করিতেন; তদীয় অতীব গভীর নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশকলাপ সংসারত জনগণ হৃদয়ে সর্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত।

একদা বাসন্তীয় প্রভাত সময়ে যখন নবোদিত দিনকর স্বীয় কর দ্বাৰা হিমাকরের তুঙ্গ-তুহিন শিখর-নিকর পাতিত করিতেছিলেন, যৎকালে স্নগীতল পবনমলস্কুল নিশ্বল মলয়ানিল হিমালয় নিলয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছিল, যখন বিমানবিহাবী বিহঙ্গমবর্গেব বিনোদ কলরবে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন পার্শ্বতীয় বন্যকুমুমসৌরভ দ্বিধিদিগ পরিব্যাপ্ত হইতেছিল,—তখন যোগিবাজ এক পবিত্র লতামণ্ডপ মধ্যবর্তী শিলাতলে উপবেশন কবত এক মনে মুদ্রিতমনয়ে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। তৎকালে তদীয় শুভ্র মূর্তি, গম্ভীরাকৃতি, এবং অচল প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি ভবদেব কৈলাস ভূধরে মহাযোগে মগ্ন আছেন।

এদিকে ক্রমেক্রমে কতিপয় যাত্রী নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত ভক্তিতাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে মহর্ষি নমনো-ম্মীলন করিলেন, এবং সকলকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন—“বৎসগণ! তো-

মাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন কর আমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছি।”

অনন্তর প্রথমতঃ এক কামিনী স্নিগ্ধ চরণে কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—“মহর্ষে! মদীয় স্বামী বহুদূরস্থিত কতিপয় স্বীপপুঞ্জেব নৃপতি। তদীয় প্রগাঢ় প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া আমিই তাঁহাকে মদীয় পিতৃসিংহাসনে স্থানদান করিয়াছিলাম; বহু দিবসাবধি আমি তাঁহার একান্ত প্রণয়িনী ছিলাম কিন্তু দেখুন কি আক্ষেপের বিষয় তিনি আর আমাকে প্রণয়নয়নে নিরীক্ষণ করেন না; অধিক কি বহিষ তিনি আমাকে সামান্য মহিলার ন্যায় অবহেলা কবেন; অতএব প্রভো! কি উপায় অবলম্বনে তাঁহার প্রণয় আমি পুনরুদীপন করিতে পারি, এবিষয়ে আপনি সংপরামর্শ প্রদান করুন।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি সমাক শিষ্টাচারসহকাৰে মুনিবব সন্নিধানে এই প্রকারে আবেদন করিল।

“ঋষিরাজ! যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়কূলে এ অভাগার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে। এক অসাধারণ রূপলাবণ্যশালিনী কামিনীর প্রণয়ে আমি মুগ্ধ হওয়াতে সে কিছুকাল পরে আমাকে স্বামিভবে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তদীয় প্রণয়লাভার্থ বহুল তুণ্যবিয়সঙ্কুল রণস্থলে বিজয়লাভপূর্বক স্বীয় যশোরশ্মিতে পৃথিবীতল প্রদীপ্ত করিয়াছি। কিন্তু হায়!

অন্যাপি আমি তদীয় প্রণয়রত সম্পূর্ণ লাক্ত করণে কৃতকার্য হই নাই; এক্ষণে সেই কামিনী মৎপ্রতি অতুঃসাগিনী নহে।”

এইরূপে ক্ষত্রিয়নন্দন আত্মবেদন দ্বিধা সমক্ষে নিবেদন করিয়া কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিল, “তাপসবর, মদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত আকর্ষণ করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে আমি তাহার হৃদয়ে প্রণয়গ্নি পুনঃ প্রজ্বলন করি এবিষয়ে আমাকে অপরাধ প্রদান করুন।”

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিজ্ঞাপন সমাপ্ত হইবা মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি অতিমাত্র ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “আমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, এক্ষণে ভ্রাতৃপ্রণয় অপনয় শোকে একান্ত প্রপীড়িত। আমি আমার একমাত্র সহোদরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সমুদায় ঐশ্বর্য্য রাজকার্য্য তাহার সহিত সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলাম অধিক কি কহিব আমি সংসারস্থ যাবতীয় সুখ তদীয় সুখানুেষণে বিসর্জন করিয়াছি; কিন্তু আমার অদৃষ্টভাগে সে আমার পূর্ণ প্রীতি প্রতিশোধ প্রদানে একান্ত পরাশূন, ধর্ম্মরাজ! ভ্রাতৃপ্রীতি প্রাপণার্থ আমি এক্ষণে কি করি?”

অনন্তর চতুর্থ যাত্রী নিবেদন করিল, “মুনিকুলতিলক, আমি স্বয়ং একজন কবি, মদীয় প্রণয় জনৈক মানবে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞ এবং সাধুরাই আমার প্রণয়পাত্র এবং সেই সকলের চিও বিনোদনার্থ আমি আমার হৃদয়ের

গূঢ়ভাব সংগীতাবলীতে নিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহা কি সামান্য খেদের বিষয়, যে আমি তাহাদের জন্য স্নেহদৃশ বিষদৃশ যত্নশীল তাঁহারা আমার বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেন না। মহর্ষে! এক্ষণে তাহাদের নিম্নিত প্রণয় জাগরিত করণার্থ কি কর্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।”

অনন্তর এক সৌম্যমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি পুরুষ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, “আর্য্য, আমি একজন বিজ্ঞা নাট্যসংগীত বিদ্যাপথের পথিক। গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূরিত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত নিয়ম কোশল নির্ণয় করিয়াছি, পৃথিবীর অন্তরস্থ অস্ত্র উদ্ভেদ করিয়া যে সমস্ত মহামূল্য পদার্থপুঞ্জের অস্তিত্ব অবধারিত করিয়াছি, তরুলতা ওষধিপুঞ্জের পরীক্ষানন্তর যে সমস্ত উত্তমোত্তম ঔষধরাশি গবেষিত করিয়াছি, সে সমুদায়ই আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু কৃত্রিম মানবগণ আমার কথা কর্ণকূহরে স্থান দান করে না,—ফলতঃ তাহারা আমাকে অবহেলা করে, সাধারণ প্রণয় আহরণার্থ এক্ষণে কি কর্তব্য?”

অনন্তর এক অবলা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞাপন করিল। “পিতঃ! আমার কি ক্ষিপ্রাত্ত ও মাহাত্ম্য, জ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই; আমি এক সামান্য, সূদীনা, সহায়হীনা, সরলপ্রাণা কুমারী মাত্র হইয়াও, কি ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান, কি

হীনবল অজ্ঞান, আমি সকলের প্রতি সমভাবে সম্যক্ অহুঃসাগ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বলিতে কি, আমি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় আমার জীবন সর্ব্বদা বিসর্জনেও পরাধু্য মহি। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহাদের মৎ-প্রতি অণুমাত্রও অহুঃসাগ বা স্নেহ নাই এবং সেই জন্যই আমি আমার অভিলাষ-মুরূপ কার্য্য করিতে পারি না, অতএব হে তাপসশ্রেষ্ঠ! অধীনীর প্রতি কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক কি প্রকাবে এ অবলা তাহাদের প্রণয়পাত্রী হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনি সংপরামর্শ প্রদান করুন।”

অনন্তর এক শান্তশীলা যোষিৎ অগ্র-সর হওত ক্ষিত্তান্তজানু হইয়া ধীর বি-নয় বচনে একান্ত মনে আবেদন করিল। “হে ঋষিপ্রবর! মনীয় শোক অধুধির অবধি নাই। আমি একজন সামান্য ম-হিলা এবং একমাত্র সত্যানের জননী। পুত্রমুখ দর্শনাবধি আমার অপত্যস্নেহ অতি প্রবল। সত্য বটে আমি আমার অঙ্কধন সেই নন্দনকে রাজসিংহাসন, কি মান সত্ত্বম, কি ভূমি সম্পত্তি, কি বিপুল জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার হৃদয় কবাট উন্মাদনপূর্ব্বক অমূল্যরত্নস্বরূপ মাতৃস্নেহ প্রদান করি-য়াছি, হায় ঋষিরাজ, কি কোভের বিষয় দেখুন, তথাপিও তাহার হৃদয়ে মাতৃ-ক্তির লেশমাত্রের উদয় হয় নাই। এক্ষণে কি প্রকাবে তাহার অন্তঃকরণে তত্ত্ববীজ

অঙ্কুরিত হয় তাহা মহাশয় বলিয়া দিউন।”

এইরূপে স্বীয় স্বীয় আবেদন সমাপ-নাতে এই সপ্ত সংখ্যক অভিযোজক যথা-স্থানে নিবৃত্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষিও কণকাল গভীর তুষ্ণীভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

তাহাদের এতৎসমস্ত বিনয় বিজ্ঞাপন বচনবিন্যাসে বেলা অধিক হইয়া উ-ঠিল। দিনমণি শীতশীর্ণ অচলবাসীদি-গের উপর হিম্যানির হুঃসহ প্রপীড়ন নি-বাবণ মানসে যেন স্বীয় প্রণয়তর কর বিকীরণ কারণে তাহাদিগের শিরোপরি ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। শৈত্য এবং অন্ধকার উভয়ে এক শত্রু কর্তৃক তাড়িত হইয়া বদ্ধুতাব অবলম্বন পূর্ব্বক একত্রে নিহৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা অচল গুহাটি আলোকময় হইল। বোধ হইল যেন একটি অগ্নিময় কুজ্জটিকায় উহার লঙ্ঘনপূর্ণ পরিপূরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সকলে এই কুজ্জটিকা মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হইল যেন আকাশপথে অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক যুবা পুরুষ নবীন নীরদে পৃষ্ঠতার অর্পণ করিয়া ঘোর নি-দ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; তপোধন ক্ষণ-কাল উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অবলোকন করত অভিযোজকদিগকে সন্মোদন পূর্ব্বক ক-হিলেন। “দেখ, প্রণয় কি ঘোরতর সুষুপ্তিতে অভিভূত রহিয়াছে। এ মহী-মণ্ডলে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ করণে কাহার

কমতা নাই।” এই বাক্য বলিবা মাত্র সম্মুখস্থ ধূমাবলীর অভ্যন্তর হইতে কতিপয় স্নানর মূর্তি বহির্গত হইয়া প্রণয়ের শয্যা সন্নির্কর্ষে সমাগমন পূর্বক কেহ বা চুখন প্রদান দ্বারা, কেহ বা অশ্রুবারি বর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা অন্তরে হুঃখরাশি থাকিতেও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে কবিত্তে কেহ বা মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া হস্তবর্ষণ করিতে কবিত্তে কেহ বা কিতিন্যস্ত জাহ্নু হইবা কেহ বা রাজ্যসিংহাসন, কেহ সূত্রচূব স্বর্ণ ও গীবকাবলী, কেহ সম্মমপতাকা, কেহ যশোমালা প্রদানানন্তর কাতর স্ববে কহিতে লাগিল। “হে প্রণয়! আব কতকাল নিদ্রা যাইবে? শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।” প্রণয় তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না কবিয়া, এবং তাহাদের প্রদত্ত ধনে, সম্মেহ চুখনে এবং অশ্রুজীবনে কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ না হইয়া অগাধে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মূর্তি যাত্রিগণের নয়নপথ হইতে অপসারিত হইয়া গেল। অবিলম্বে জনৈক পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ কলেবর পুরুষ, সংকারোপযোগী ব-

সনে বসান, ধূমগর্ত হইতে বহির্গত হইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চাবে প্রণয়ের পালঙ্কপার্শ্বে সমাগত হইলেন। ধোব ঘনঘটায় ধরণী অগ্নে যেক্রপ কালিমা পড়ে, তাঁহার আগমনে প্রণয়ের স্বর্ণকাস্তি সেইক্রপ বিকৃতভাব ধাবণ করিল। চীৎকার করিয়া প্রণয় উঠিয়া বসিলেন, এবং যাহারা তদীয় নিদ্রাভঙ্গনার্থ এতকাল বৃথা চেষ্টা কবিয়াছিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণার্থ করপ্রসারণ কবিলেন। কিন্তু তাহাবা যে পথে গিয়াছে সে পথ হইতে কেহ কখন ফিরে নাই; কেহই আসিল না। তখন উদ্বুদ্ধ প্রণয় বোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যোগিবর যাত্রীদিগের প্রতি স্মীয় উজ্জল গম্ভীর কটাক্ষ ক্ষেপণ কবিলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোমাদিগের হৃদয়বেদনা শাস্তিসাধনার্থ আগাব এই মাত্র মহৌষধ—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ,—মৃত্যুচ্ছায়া স্মীয় শরীরে পতিত না হইলে নিদ্রিত প্রণয় উদ্বুদ্ধ হয় না।”



বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় এই সময়ে কাহাব কাহাব হাত দিয়া সম্পন্ন হইত তাহা বিবেচ্য। বামাষণেব বহুস্থানে বহুবিধ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর নাম উল্লেখ আছে, সেই সকল এই সংকীর্ণ স্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে না। তবে এক স্থলে যথায় বহুতর শিল্পী ও ব্যবসায়ীর নাম একত্রে আছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বামাষণেব অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়ো-
শিত্তিম সর্গে ভবত যৎকালে বামেব
অনুসবণে সনৈন্যো চিত্রকূট পর্কতে গমন
কবেন, তৎকাল নিম্নলিখিত শিল্পী ও
ব্যবসায়ীগণ তাহাব সঙ্গে গমন কবিয়া
ছিল।

“নগিকাবাশ্চ যে কেচিৎ কুস্তকাবাশ্চ

শোভনাঃ।

স্বকর্ম্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপ-

জীবিনঃ ॥১২

মাণবকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা বোচকা-

স্তথা।

দন্তকাবাঃ স্পকাবা যে চ গন্ধোপ-

জীবিনঃ ॥১৩

সুবর্ণকাবাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কঙ্কলকারকাঃ।

স্নাপকোষোদকা বৈদ্যা ধূপিকা শৌণ্ডিকা-

স্তথাঃ ॥১৪

বজ্রকাস্ত্রবায়াস্চ গ্রামখোষ মহন্তরাঃ।

শৈলযাস্চ সহ জীভির্বাশ্চি কৈবর্তকা-

স্তথা ॥”১৫

মণিকাব, স্ত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞ (তন্তুবার
বামান্নজ,) কুস্তকার, শস্ত্রোপজীবী (শস্ত্র
নির্ম্মাণোপজীবিনঃ—বা,) মাণবক (মণু
পিত্তে: ছত্রাদিব্যঞ্জনকাবিনঃ—রা,) ক্রাক
চিক(করপত্রং তেন জীবতি তে ক্রাকচিকা:
—বা, করাতি), বেধকা (মণিমুক্তাদিবেধক
র্ত্তাবঃ—বা,) দন্তকাবঃ (গজদন্তাদিভি:
সমুদ্রকাদিকর্ত্তাবঃ—বা,) গন্ধোপজীবী
(গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়িকাঃ—বা,) সুবর্ণকাব,
কঙ্কল কাব, স্নাপক, অঙ্গমর্দক, বৈদ্যা, ধূপক,
(ধূপবিক্রিয়য়া জীবিনঃ—বা,) শৌণ্ডিক,
বজ্রক, তুন্নবায় (সূচ্যা সীবনকর্ত্তাবঃ—বা,
দজ্জি,) সুধাকাব (যে চূর্ণ লেপন করে,)
শৈলযাস্চ সহ জীভিঃ বাইজি এবং
ভেডো,) কৈবর্ত।

এই উদ্ধৃত অংশ দ্বাৰা একবারে ত্রি-
নটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। প্রথ
মতঃ শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায় বহুবিধ সৃষ্টি
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় এবং লা-
ভের আকরস্থান বাজধানী অবোধ্য পরি-
ত্যাগ কবিয়া, যখন লাভের সর্ব্বপ্রকাব
আশাব ধ্বংসস্থল চিত্রকূটের জঙ্গলে রা-
জাজ্ঞায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীবা গমনে বাধ্য
হইয়াছে, তখন ইহা অনুমেয় যে ব্যব-
সায়ী ও শিল্পীদিগের কার্য্যপথে স্বাধীনতা
শ্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইত
না। সুতরাং তদ্রূপ বাধাজনিত তদ্বি-
ষয়েব অনুগামী যে কামদল ও মান্দ্যতা,

তাহাও অবশ্য ঘটত। এই সকল শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ইচ্ছাপূৰ্ণক অমুগামী, বা অমুগমনে বেতনভোগী হইলে একথা খাটিত না, কিন্তু ভবতের আত্মা হইল যে, সেই সেই বণিক অমুগমন করিবে।

“যে চ তত্রাপবে সৰ্ব্বৈ সন্মতা যে চ
নৈগমাঃ।”

—“তত্র নগবে সন্মতাঃ প্রসিদ্ধাঃ নৈগমা
বণিজঃ।”
বামানুজ।

কোন প্রসিদ্ধ বণিক এ কল্পভোগে স
হজে যাইতে স্বীকৃত হয়, অথবা স্ব
ইচ্ছায় হইলে আবার বাজাৰ্জা কেন?
পুনশ্চ বাম যৎকালে বনগমন কবিত্তে
উদ্যত হয়ন, তখন বামেব বন্ধ। এব
স্থার্থে দশবথ সৈন্য প্রেরণের আদেশ
দিয়া কহিতছেন, বণিকেরা পণ্য দ্রব্য
লইয়া সজ্জ সঙ্গে গমন করক।

“———বণিজশ্চ মহাধনাঃ।

শোভবন্ত কুমারস্য বাহিনীঃ স্তপ্রসা
বিতাঃ।”

—“প্রসাবিতাঃ—স্তপ্রসাবিতাপণাঃ।”
—বামানুজ।(১২)

(১২) বণিকদিগের উপর একরূপ বা
তথাবিধ দৌবার্যা প্রাচীনকালে প্রায়
সকল দেশেই কিছু না কিছু দেখিতে
পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যমকালে
এমন কি আধুনিককালেও কম ছিল না।
সভ্যদেশ ইংলণ্ডেও এলিজাবেথের রাজত্ব
কাল পর্যন্ত স্বদেশীয় বণিকদিগের উপর
৩৩ না হউক বিদেশীয় বণিকদিগের উপর

কেবল ইচ্ছা হইয়াই ক্ষান্ত নহে।
মহুব বিধানানুসারে ধবিলে, প্রত্যেক
ব্যবসায়ীকে অবার বাজার জন্য মাসে
মাসে কিছু কিছু কবিত্তা খাটিয়া দিতে
হইত। মনু, সংহিতাব সপ্তম অধ্যায়ে
বলিতেছেন,

“কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চান্যো-
পজীবিনঃ।

একৈকং কাবষেৎ কৰ্ম্মং মাসি মাসি
মহীপতিঃ।”

তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদেই
অনুমিত হইতেছে যে বেদাধিকারী বৈ
শ্যব দ্বারা ঐ সমস্তই সম্পন্ন হইত না।
ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কবজাতি দ্বারা ব্যবসায় বা

পব অপবিমিত অন্যাতাব হইত। ১৬৪০
খৃঃ অঃ রাজবিপ্লবের পব হইতেই কি
স্বদেশীয় কি বিদেশীয় উভয় প্রকার ব
ণিকদিগের উপর অত্যাচার কিঞ্চিৎ কি
ঞ্চিৎ কবিত্তা শমতা প্রাপ্ত হইতে আবস্ত
হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রজা দ্বারা বিনা পুৰস্কারে
নিয়মিতকালে বাজার ব্যাগাব খাটাব
কিন্তুভাবে অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল।
বাজপথ মেবামত বাধা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে
ফিলিপ এবং মেবির অষ্টবিংশতি রাজ
ঘোষে একরূপ নিষম হইয়াছিল যে, যে
বাজপথ যে পবিসবের মধ্য দিয়া গমন
কবিত্তে, সেই পবিসবস্থ লোকেরা সেই
বাজপথ পরিষ্কার বাধাব নিমিত্ত বৎসরে
চারিদিন কাজ কবিত্তে বাধ্য। একরূপ
স্কটলণ্ডে ১৬৬৯ খৃঃ অঃ পার্লিামেন্টে
যে আইন হয়, তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি
বৎসবের মধ্যে ছয় দিন কার্য্য কবিত্তে
বাধ্য।

শিল্প বিশেষ সম্পাদিত হইত,—এস্থলে সেই সকল সঙ্করজাতির নাম পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। বাম্বীকির বহুপূর্ব হইতে সঙ্করজাতির উৎপত্তি। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ধরিলে, বাম্বীকি ত্রেতাযুগের এবং বেণবাজা সত্যযুগের। কথিত আছে যে সেই বেণ রাজার রাজত্বকালে রাজশাসনের শিথিলতায় প্রজাবর্গ কামবশে যথেষ্ট অভিগমন করিলে বহুবিধ সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, পূর্বে যে সকল অপেক্ষাকৃত হীনকার্য্য আর্য্যেরা স্বহস্তে বা শূদ্রের সাহায্যে করিতেন, যে দিন সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইল, সেই দিন হইতে সেই সকল কার্য্যেব ভার তাহাদিগের স্বন্ধে চাপাইয়া, অন্য বিষয়ে চিত্ত পরিচালন করিতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক সঙ্করবর্ণের আভিজাত্য বিবেচনায়, তাহাদের উপর উচ্চ বা নীচ ব্যবসায় আরোপিত হইল। তাহাই হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিতেছে। একপ বন্দোবস্ত তত্তব্যবসায়ের বিস্তৃতি বাতীত সুসম্পাদিত হয় নাই। বাম্বীকির সময়ে এই বিস্তৃতির আরও বিস্তার। এই নিমিত্তই বহুবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকল যে বৈশ্য হইতে ভিন্নতর বর্ণের হস্তে বাম্বীকির সময়ে দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। বৈশ্যেরা এসময়ে সাধারণতঃ সেই সকল জাতির শ্রমজাত দ্রব্য লইয়া উচ্চতম বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। এই সময়ের চিত্র একপ দেখা

গেল, আবার আর্ধ্যজাতির আদিম সমাজের চিত্র দেখ। ঋগ্বেদের একজন কবি আত্মপরিচয় দিয়া কহিতেছেন যে, তাঁহার পিতা বৈদ্য, তিনি কবি, তাঁহার মাতা শস্যপেষণকারিণী।

“কাকর অহম্ তাতো ভিষগ্ উপল-

প্রক্ষিণীনা।”

৯১১২৩।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত বাতীত আব কোথাও জাতি বিভাগের কথাব উল্লেখ নাই। তথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিটি মাত্র জাতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে পুরুষ সূক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। (১৩) একারণে অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ে জাতিভেদ ছিল না। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, সেই বেদের যে সকল সূক্ত প্রাচীন বলিয়া গ্রাহ্য, সেই সকলেই তক্ষা অর্থাৎ ছুতার, বৈদ্য, কামার, পাখীয়ারা, রথ নির্মাণের কৌশল ও ব্যবসায় বর্ণন দৃষ্টে তাহার নির্মায়ক, তত্ত্ব এবং ওতু ও বয়ন শব্দের উল্লেখ তাঁতের কার্য্য, কৃষি, ক্ষৌরকার্য্য, রসারসি, চর্ম্ম, এবং জল বা স্রাবহনার্থে মসক বা ভিস্তির (“ছতি”) উল্লেখ (১৪) হেতু তত্তব্যবসায়ীর ও

(১৩) Max Muller's Aus: Saus: lit pp. 570.

(১৪) Muir's Sanscrit texts vol V. তথা হইতে ব্যবসাদারের এই তালিকা গৃহীত হইল।

কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এসকল ব্যবসায়ী বা কাহারো ও এসকল কার্য কাহারাই বা করিত। আর্থেরা মুখে বেদসূক্ত রচনা এবং হাতে সেই সকল কার্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের বৈষম্যতা বৈদিক সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক সময়ে তাহা অতি প্রবল।

পূর্বানোচিত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তৎকালে দেশমধ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে প্রবাহিত হইত। এস্থলে আব এক বিষয় বিবেচ্য। অন্তর্বাণিজ্যই হউক, আর বহির্বাণিজ্যই হউক, তাহাব সুবিধার নিমিত্ত দেশমধ্যে আপাততঃ এই কয় বিষয়ের আবশ্যক—রাজপথ, খাল, ঋণ দানাদান এবং ব্যাক।

রাজপথ সম্বন্ধে পূর্বগত এক প্রস্তাবে যথাযথ কথিত হইয়াছে, এবং একরূপ দেখান হইয়াছে, যে, রাজপথ যাহা ছিল, তাহা ভালরূপই ছিল, কিন্তু অধিক সংখ্যক ছিল না। তাহা সে সময় বিবেচনা করিলে না থাকারই সম্ভব। ইং-রাজ রাজত্বের পূর্বেই বা আমাদের কতট রাজপথ ছিল। যাহাহউক রাজপথের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাজপথ নিৰ্ম্মাণদক্ষ কর্মকরণেরও অস্তিত্ব যখন অবলোকিত হয়, এবং সেই কার্যই তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ দেখা যায়, তখন কি একরূপ অনুমান করার দোষ আছে যে, যে স্থান দিয়া লোকের গতিবিধি সর্বদা

হইত, এবং বাণিজ্য কার্য নিরন্তর প্রবাহিত হইত, সেই সেই স্থানে প্রশস্ত রাজপথের অভাব ছিল না? তরত যখন রামের অহুসরণে চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন তখন সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত পরিসর রাজপথনিৰ্ম্মাণ হেতু নিয়মিত মত কর্মকার্যগণ নিয়োজিত হইয়াছিল।

“অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশা-

রদাঃ।

স্বকর্ম্মাতিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥

কর্ম্মাস্তিকাঃ স্থপত্যঃ পুঞ্চা যন্ত্রকো-

বিদাঃ।

তথাবার্দ্ধকয়শ্চৈব মাগিনো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥

স্থপকাবাঃ সুধাকাবা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।

সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুর্বতশ্চ প্রতস্থিরে॥”

২৮০

ভূমি প্রদেশজ্ঞ, সূত্রকর্ম্মকাব [শিবি-রাদি নিম্মাণে সূত্র গ্রহণকুশল,] খনক, যন্ত্রক, [জল প্রবাহাদি যন্ত্রণসমর্থ,] স্থপতি [রথাদি কর্তার,] যন্ত্রকোবিদ [ক্ষেপণী আদি [যন্ত্রকরণকুশল,] মাগিন [বনমার্গ রক্ষার নিযুক্ত,] বৃক্ষতক্ষক [মার্গাবরোধক বৃক্ষছেদ্যার,] স্থপকার, সুধাকার, বংশ-কার, চর্ম্মকার।

অনন্তর ইহারা ভারতের নিমিত্ত কি-রূপ রাজপথ প্রস্তুত করিল, তাহার প্র-ক্রিয়া নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদুপে তৎকালে পথাদি নিৰ্ম্মাণ প্রণালী বহু-লাংশে অনুমিত হইবে।—“অনন্তর সূত্র-কর্ম্ম পর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ

খনক, অবরোধক, স্থপতি, বান্ধকী, সুপ-
কার, সুধাকার, বংশকার, চন্দ্রকার, যন্ত্র-
নিষ্ঠাতা কৰ্ম্মান্তিক ভূতা, ও পথ পবীক-
কেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্যক লোক
হর্ষভাবে নির্গত হইলে, পূর্ণিমার খরবেগ
মহাসাগরের তরঙ্গ রাশির ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা স-
ক্সাণে দলবল সমভিব্যাহারে কুন্দালাদি
অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম
স্থান ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ
প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেখানে বৃক্ষ
নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল,
এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা
নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল।
কোন কোন মহাবল বন্ধমূল উশীরের
গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই
উন্নত স্থানে সমতল ও গভীর গর্ত পূর্ণ
করিয়া দিল। কেহ, সেতুবন্ধন কেহ
কর্কর চূর্ণ, (১৫) এবং কেহ কেহ বা জল

(১৫) ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহ জানা
যাইতেছে যে রাজপথ সকল কাঁকরা
দ্বারা পাকা (metalled) করা হইত।
ইহা অবশ্যই আমাদের প্রাচীন কালের
পক্ষে গৌরবের কথা। পাণ্ড্য ভূভা-
গের ইতিবৃত্ত দেখিলে পাকা রাস্তার প্র-
থম উল্লেখ শমিরমার রাজত্বকালে দেখা
যায়। তৎপরে থিবস এবং কাথাজিনীয়
নাগরিকেরা পাকা পথ প্রস্তুত আরম্ভ
করিয়াছিল। রোমনগরে ৫৬০ খৃঃ পূঃ
আপিয়স ক্লডিয়সের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান
হয়। বর্তমান সভ্যতায় ইউরোপ ভূ-
ভাগে ৮৫০ খৃঃ পূঃ পূর্বে নাগরিক রাস্তা
সমস্ত পাকা করা হয় নাই, ঐ শকে

নির্গমার্থে মৃৎ পাবাণাদি ভেদ করিতে
লাগিল। স্বরকাল মধ্যেই স্তম্ভ প্রবাহ
সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ
হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই,
তথায় বেদি পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত
করিল।” (১৬)

মাগিন নামক কৰ্ম্মচারীর অস্তিত্ব হেতু
ইহাও বোধ হয় যে, রাজপথের মধ্যে
আশঙ্কায়ুক্ত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, রক্ষণে
যত সমর্থ হউক বা না হউক, কিন্তু নি-
যুক্ত হইত। আমাদেবও নিযুক্ত হওয়া
টুকুই জানিবার প্রয়োজন। যে সকল
রাজপথ রাজধানী বা সহরের ভিতরে,
সে সকলে নিয়মিতভাবে জলসিক্কন হ-
ইত। এবং উৎসবকালে আলোকে
আলোকিত হইত। অন্য সময়ে আলো-

স্পেনদেশীয় চতুর্থখলিফা দ্বিতীয় আবদুল
রহমানেব আজক্রমে কর্ডোবানগরের
রাস্তা দিয়া ইহার প্রথম আরম্ভ হয়।
পারিস নগর তদভাবে এমন ধূলা ও
জঞ্জালময় ছিল যে তন্নিমিত্ত উহা পূর্বে
নাম লুটিয়া (Lutetia) পরিবর্তন হইয়া
পারিস হয়। তথায় ১১৮৪ খৃঃ পূঃ দ্বি-
তীয় ফিলিপ প্রথমে পাকা রাস্তার অনু-
ষ্ঠান করেন। লণ্ডননগরে একাদশ শ-
তাব্দীর পূর্বে ইহার অনুষ্ঠান হয় নাই।
জর্মানীতে ইহার প্রথম সূত্রপাত খ্রীষ্টীয়
পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই তুলনে আ-
মাদের পিতৃপুরুষদিগের কার্যশৃঙ্খলা ও
উদ্ভাবনীশক্তি অবধারণ কর।

(১৬) অযোধ্যাকাণ্ডে ৮০ সর্গ। এখানে
পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ
গৃহীত হইল। বাহুল্যভয়ে মূল্যাংশ উ-
দ্ধৃত হইল না।

কিত হইত না তাহা নিম্নলিখিত কথাব
ভাবে বোধ হইতেছে। রামের যৎকালে
রাক্ষাভিষেকের কথা হয়, তখন উৎসব
হেতু, এবং রাম যদি রাজিকালে নগর
ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, এতদ্ব্যতীত সকল
নিৰ্ম্মাণ করিয়া পথে আলোক দিবার
নিমিত্ত তাহাতে দীপাবলী সজ্জিত হইল।
“প্রকাশীকরণার্থক নিশাগমন শঙ্কয়া।

দীপবৃক্ষাং স্তথা চতুঃসুবধ্যাস্ত

সৰ্গঃ ১১” (১৭)

২১৬।১৮

(১৭) নৈমিত্তিক আলোদানের অভাব
হেতু অন্যের সহ তুলনা করিলে অর্থাগণ
নিশ্চিন্ত হইবেন না। পূর্বকালে প্রায়
সর্বদেশেই কেবল উৎসবাদি আনন্দ
কার্য্যে মাত্র পথে আলোক প্রদানের প্রথা
অবলোকিত হয়। বেক্‌মান সাহেবেব
কহত মত জানা যায় যে, হিবোডোটেসেব
সাময়িক মিসবীষেরা বাগ্মীকির সময়েব
ন্যায় উৎসবে মাত্র এষ্ট প্রথা অঙ্গুসবণ
করিত। যিহুদিবা Festum encoenio-
rum নামক পর্বকালে অষ্টবাতি প্রতি
গৃহের সম্মুখে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া
রাখিত। স্কটলসেব বাগ্মীসারে ইহা
বাক্ত যে গ্রীকেবা উৎসবাদিতে কেবল
ঐ প্রথাবলম্বী ছিল। বোমনগরে ক্যা-
টিলিনেব ষড়যন্ত্র ভেদ হইলে কিকিবোব
গৃহাগমনকালীন নগবাসীবা আনন্দ
নগর আলোকিত করিয়াছিল। ইত্যাদি।
কিন্তু ধারাবাহিক রূপে পথে আলোক
প্রদানের প্রথা পুরাকালে এবং জীষ্টেব
পবেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কোথাও ল
ক্ষিত হয় না। ইহাব প্রথম সৃষ্টি পা
বিস নগরে। জীষ্টেব ষোড়শ শতাব্দীতে
ঐ নগর দল্লদল দ্বারা এতদ্ব্যতীত

পথ সকল সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
রাখার চেষ্টা করা হইত। মহুসংহিতার
যে যে ব্যক্তি রাজপথে মল মূত্র ত্যাগ
প্রভৃতি যে কোনরূপে পথ অপরিষ্কার
করিত, তাহাব প্রতি দণ্ডবিধান করা
হইত (মহু ৯।২৮২-২৮৩)। কিন্তু সচ-
রাচর পথ পবিস্কার রাখার নিমিত্ত দণ্ড-
বিধি দ্বারা বা অন্য কোনরূপে বাধ্য করা
হয় নাই। “পথ সংস্কার” শব্দের ভূয়
উল্লেখ হেতু পথ মেরামত প্রথাব বহুলতা
জ্ঞাপিত হয়। এ পথসংস্কারের নিমিত্ত
রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিত কি না,
তাহা নিরূপণ হয় না। হইতে পারে
যে সকল ব্যক্তিকে পূর্বে কথিত রাজনি-
য়ম অনুসারে মাসে মাসে বাজার জন্য
কিছু কিছু করিয়া কাজ করিতে হইত,
তাহাদেরই মধ্যে কার্য্যক্রম এবং তদুপযুক্ত
জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই পথসংস্কার ও
পূর্বোক্ত পথ পরিষ্কার কার্য্য সমাধা করা
হইত। (১৮)

হয় যে, অধিবাসীবা অনন্যোপায় হইয়া
বাতি নয়টার পব হইতে সমস্ত বাতি
নগর দীপাবলী দ্বারা আলোকিত রাখিত।
এ নিমিত্ত ১৫২৪ খৃঃ অঃ রাজাজ্ঞা প্রচা-
রিত হয়, সেই আজ্ঞা সময়ে সময়ে
[১৫২৬, ১৫৫৩ খৃঃ অঃ ইত্যাদি] লো-
কের স্মরণার্থে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়।
এইরূপে নিতা আলোকদানের প্রথা
পারিস নগরে প্রথম সৃষ্টি হয়।

(১৮) পাশ্চাত্য ভূমির অধুনিক সভ্যতা
গর্ভিতজাতির ব্যবহারসহ এখানে তুলনা
করিয়া দেখা যাউক। ফ্রান্সরাজ্যে ১৩৭২
খৃঃ অঃ এবং স্কটলণ্ডে ১৭৫০ খৃঃ অঃ

উক্ত ভারতবর্ষ যেকোন নদীমাতৃক দেশ তাহাতে খালের আবশ্যক ছিল না। তথাপি “কৃত্রিম সরিৎ” প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্বিমিত্ত যদি কোন আৰ্য্য সম্ভান এই বলিয়া অহঙ্কার করিতে চাহেন যে, যে খাল কাটা প্রথা ১৭৫৫ খৃঃ অঃ সাক্ষিকৃত খাল কাটা দিয়া ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্তিত হয়, আর্যেরা বহু প্রাচীন কালেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ কোন আপত্তি নাই। ব্যাক্তের প্রথা

পর্য্যন্ত গৃহস্থগণকে আপন গৃহের ময়লা গৃহেব সমুখস্থ পথে নিক্ষেপ করিবার বাধা ছিল না। স্মৃতবাৎ অপরিষ্কারকের দণ্ড ছিল না। কিন্তু যে অংশ দিয়া পথ গিয়াছে সেখানকাব সকলকে আত্মব্যায়ে বা কায়িক পরিশ্রমে সেই পথ সৰ্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইত। ১২৮৫ খৃঃ অঃ ফিলিপের রাজত্বকালে যে আইন জারি হয়, তদনুসাবে যাহাব বাড়ীবা কাছ দিয়া বে পথ গিয়াছে, তাহাকে সেই পথ মেবামত করিতে হইবে। ইহাতে লোকের অমনোবোগবশতঃ ১৩৮৮ খৃঃ অঃ এই আইনসহ দণ্ডবিধি পর্য্যন্ত যোজিত হয়। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ফ্রেঙ্কেবা এই রাজদৌবাত্ম্যভোগ করিয়া আসিয়া ছিল। বার্লিন নগরে ১৫৭১ খৃঃ অঃ এক আইন হয়, তদনুসারে, যে যে বাজার ঘাটে অধিক ধুলা মাটি জমিবে, সেই সেই বাজার ঘাটে যিনি যিনি গতায়িত করিবেন, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ধুলা মাটির ভার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কেমন, এর তুলনার পরিব ত্রাঙ্কণদের বিধি কি রকম?

ছিল কি না তাহা জানি না। ছয় কাণ্ড রামায়ণে তত্তাবের কোন আভাষ নাই। তবে ঋণ দানাদানের প্রথা যখন ঋণে দেই (১০-৩৪-১০) লক্ষিত হয়, তখন বায়ীকির সময়ে যে ইহার বহু প্রচলন, তাহা বলা বাহুল্য। বহুলোক একত্র হইয়া ভাগে বাণিজ্য করণ প্রণালীর উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাই না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার জম্বুকালীন ইহার প্রচলন অবলোকিত হয়। যথা

“সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কৰ্ম্ম-

কুৰ্ব্বতাং।

লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসস্থিদি।

কৃতৌ ॥”

ব্যবহার কাণ্ডে।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বায়ীকির সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে “বণিজো দূরগামিনঃ” ইহা বায়ীকি কর্তৃক অসংখ্য বাব উক্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের সেই পারিমাণে উল্লেখ পাওয়া না যাউক, কিন্তু পাওয়া যায়।

“উদিচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ

কেবলাঃ।

কোটিয়াপরাস্তাঃ সামুদ্রা রত্নাহ্যাপহবন্ত তৌ।”

২৮২৮

—উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ,

দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বাণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করত ।

এখানে দেখা মাইতেছে যে বহুদূর-গামী বাণিজ্য কেবল জলপথে নহে, জলপথেও আছে । জলপথে গমন কেবল বাস্তুকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও দেখিতে পাওয়া যায় । অথোদে (১-১১৬, ১-২৫, ৭-৮৮ “নাব সামুদ্রিক” বাক্যের উল্লেখে অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে । কিন্তু এখন কথা এই যে এ সমুদ্র গমন আর্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যের গমনাগমন করিতে দেখিয়া গান করিতেন । তাই বা কি করিয়া বলি, মনুতে ভূয়ো ভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথার উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাহাদেব সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে, আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত “——সমুদ্রযাত্রা স্বীকাঃ ।

* * *

ইমান্ধর্মান কলিযুগে বর্জ্যানাত্মনিষিঃ।” পূর্বকালীন সমুদ্র যাত্রা প্রথা সূচনা করিয়া কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্যেরা সমুদ্রে গমন করিতেন । কিন্তু আরার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্যবাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দেশ এই করা হইয়াছে যে কুম্ভসার যুগ স্বভাবতঃ যেখানে যেখানে বিচরণ করে তাহাই যান্ত্রিক দেশ, তাহাতেই আর্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অন্যত্রো কদাপি নহে । কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান

নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমনে এবং বাসে সমর্থ । (১৯) এ কথা সম্ভবতঃ বাস্তুকির সময়েও খাটে । আবার বাস্তুকির পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্মানাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর, মেল্লুদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জানে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেজ নগর অগ্নি প্রবেশ করেন । ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজান্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada নগরে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন । অতএব ধর্ম্মভীক ভাবতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং মেল্লুদেশে গমন যখন এমন দৃষণীয়, তখন কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে ইহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণ পূর্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ বাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন । সমুদ্র যাত্রা যেন কোন মতে হইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছুদিন থাকিতে হইবে । সে সময়ের জলপথে গতিবিধি

(১৯) Hero: vii 65, 86. &c গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জাত নহি, হইতে পারে ভারতস্থ পার্শ্ববর্তী বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকট জাতি হইবে ।

থাকিলেও তাহা উন্নতভাবে ছিল না। স্তত্রাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত কিছুদিন নহে। যদি এ কিছুদিনে দোষানা পড়ে, তবে কাষোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন স্নেহে প্রাপ্ত হইল? যদি বলা যায় শূদ্রেরা যদুচ্চা গমনে সক্ষম, স্তত্রাং তাহাদের দ্বাৰা বিদেশ বাণিজ্য সমাধা হইত, কিন্তু তাহা হইলে শূদ্রেরা সমাজে এত হীন ও নির্ধন হইবার কারণ কি? এই সকল কারণে বোধ হয় যে আর্যোবা সমুদ্র যাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসাব বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভাবতেবই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্তী আর্যেরা স্বধর্ম বিনাশ ভয়ে সহসা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু বৈদিক সময়ে ত সে বাধা ছিল না; ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সময়ে বৈদিক আর্যেরা সভ্যতাপদবীতে পদার্পণ করিয়া বিলাস কলা বিস্তার কবিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত মেদিনী বোর মূর্থতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিসরীয় এবং কিনিসীয় জাতিরা যদিও কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অস্বাভাবিক দূরবর্তী ছিল। অতএব বোধ হয় বৈদিক আর্যদেরও জলপথ, স্থলপথে অপরিচিত ও অগম্য, কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এমন সকল ভারতস্থ দেশেই গমনাগমন হইত।

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি কিনিসীয়দিগের ভারতে গতিবিধি ছিল কি না তাহা জ্ঞাত নহি। যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে, নতুবা আরব ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিষ্কৃতের ভ্রাম্য থাকিত না। এবং সিদ্ধনদ হইতে মিসর পর্যন্ত সমুদ্র পথ আবিষ্কারার্থে সাইলাক্স দবায়ুস কর্তৃক প্রেরিত হইতেন না। আবাব দেখা যায় যে, ১৩০ পূঃ খৃঃ টিমি এবারগিসের রাজত্বকালীন একদম ভাবত এবং মিসরদেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হওয়াতে, অলৌকিক কার্যসাধনের ন্যায় “ধন্য-ধন্য” প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতেও এ সমুদ্র পার হওয়া আর আশ্চর্যজনক ছিল না, তখন ইহা সাধারণ কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

দূরবর্তী দেশ সকলেব সহ বান্দীকির সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালে ভারতের জলপথে বাণিজ্য বহুলতা না থাকিলেও, পাশ্চাত্য ভূভাগের দূরতব দেশ পর্যন্ত ভারতের ধনবস্তার গৌরব ধ্বনিত হইত, এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই এরূপ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্ম কেবল ভারতবর্ষ বলিলেই হয়, এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। ইহা কিরূপে সম্ভবে। ভারতের বিদেশ গমন যথার্থ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীকদিগেরও সে প্রাচীনকালে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। হোমরের

সময়ে লিবিয়া এবং মিশরদেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল। ইটালী এককালেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিয়ডেব গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেকপ ভয়াবহ এবং জাহাজ গঠনপ্রণালী যেকপ কুংলিত অল্পমিত হয়, [১০] তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে কি স্থলপথে কি জলপথে গমনাগমন অতি সংকীর্ণই বলিতে হইবে। তথাপি সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। এখানে বলা উচিত যে, সেই সেই দ্রব্য কিনিসীয বণিকদিগেব দ্বারা তদ্দেশে নীত হইত। যাহা হউক ঐকপ পুৰাতন বাইবেলে জবাধ্যায় অনুসারে অফিব দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানি হইত, তাহাব অবস্থা গত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমূলব বিবেচনা কবেন যে সে সকল ভারতজাত দ্রব্য এবং অফিব সৌবীবদেশের নামের অপলংশ মাত্র। (২১) বাইবেল গ্রন্থেব আব একস্থলে (২২) টাষবনগবেব ঐশ্বৰ্য্য বর্ণনে তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ সুচের কাজ যুক্ত পটু বস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহাব সকলেই যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সম-

স্তই যে ভারতবর্ষস্থ বা তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ নাই, এবং সে সন্দেহ না থাকিলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অপরিমিত সন্দেহ স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্বকাল হইতে আমেরিকায় আবিষ্কার কাল পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষ হইতেই যে আর সর্বত্র নীত হইত, তৎপক্ষে অল্পই সন্দেহ আছে, (২৩) এবং বাইবেলে যে নীলেব কথা আছে, তথারও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

[২৩] নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতে আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়াব পূর্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত। এবং উত্তমাশা (cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার হওয়াব পূর্বে, উহা ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যেব সহ, পাবস্ত্র উপসাগর দিয়া স্থলপথে ব্যাবিলন বা আবদোশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপেব অন্যান্য দেশে প্রেবিত হইত। নীলেব জন্মভূমি এবং বাণিজ্য বিষয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন "The proper country of this production is India; that is to say, Gudecherat or Gutscherat, and Cambaye or Cambaya from which it seems to have been brought to Europe since the earliest periods. It is found mentioned, from time to time, in every century; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interrup-

[১০] Grotes Groeco i 491.

[২১] Max Muller's same of Language i 7a8,

(২২) Greek : xxvii.

টারর নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্য সমূহের পক্ষে পণ্ডিতবর বিনসেন্ট কহেন, যে এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিরাজাত পট্টবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে সেই সকল বস্ত্র ইউক্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত, সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না। ইউক্রেটিস তীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প কৌশল বিদ্যুন্মাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ

tion “পুনশ্চ” I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India.”—Johnston’s translation of Beckmann’s history of inventions and discoveries. Vol. II 260, 260. এখানে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয়ের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্বস্থ, সে সকল প্রায়ই অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান সাহেব তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিবৃদ্ধি কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন সে মত অবগুণীত, এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সফল হইবেন, ঐ মত তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং ভারত উহার উৎপত্তি স্থান সমূহের মধ্যে যে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী

নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে ডিডন ও ইউমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্যস্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোনস্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষেব নামোল্লেখ নাই। বাইবেলের জ্ঞাতসারে ইউক্রেটিস নদীই পৃথিবীর পূর্বতম দেশের সীমা এবং তদ্রূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেই আবার পূর্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্বকাল হইতে স্থাপিত বণিকদিগের গতায়াতের পথেব

রপ্তানির বর্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিলে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson’s Cycloperdia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের শ্ববচ এইরূপ দেওয়া আছে।

বুটনদীপে	১১৫০০ বাল্ল।
ফ্রান্স	৮০০০ ঐ
জার্মানি এবং ইউরোপেব	
অপবাণের সমস্ত দেশ	১৩৫০০ ঐ
পারস্য	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেডষ্টেট	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশ	১০০০ ঐ

সমুদয়ে ৪৩৫০০ ঐ

ইহাব মধ্যে উক্ত ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মাদ্রাজ, ও গোয়াটিমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়া থাকে। Page 385. art: Indigo.

উল্লেখ আছে। (২৪)। আমি বিবেচনা করি যে এই পথ নিঃসন্দেহই বহুপূর্বতর দেশে প্রচলিত এবং ইহার সঙ্গে ভারত-বর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাণ্যিকের বহুপূর্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বাণ্যিকের সময়ের উপরেও বর্তে।

প্রাচীন কালীয় স্থলীয় বাণিজ্য কার্য আলোচনার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে দূর বাবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করেনা, এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। বাবধানের মধ্যস্থিত জাতি সমূহের দ্বারা হস্তহইতে হস্তান্তরে বাবসার দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত। এক্রপ হওয়ার কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। বোধ হয় ইহাও এক প্রধান কারণ যন্নিমিত্ত প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীকভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতীয় লোকের দেখা নাই, এক্রপ আবার ভারতেও তাহাদের নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ বা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পল্লব বা পারস্যবাসীদের ভারতে সমা-

গমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোধন করেন, তখন পারস্যবাসী স্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয় পল্লবজাতিরাই ভারবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মধ্যস্থলীয়।

ভারতীয়েরা যদিও স্লেচ্ছদেশে গমন-বিমুখ ছিলেন, তথাপি স্লেচ্ছদিগের ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য স্ফূর্তরূপে প্রবাহিত হইত। তাহাতে ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, তবে স্বয়ং কৃত্তী হইলে যতদূর হইবার সম্ভব তাহা অবশ্যই হইবে না। আভ্যম স্থিতি বলেন যে যখন স্বদেশ হইতে বিদেশ দ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে স্বয়ং কৃত্তী না হইতে পারা যায়, সেস্থলে দেশজাত বস্তু সকলের অযথা ভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্রে বিদেশ নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভব আছে, এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে এই নিয়ম হেতু প্রাচীনকাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্য বিমুখ হইলেও বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে এই কারণেই উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে কি এই অবস্থাই আবহমান কাল চলিবে?

ইতি সপ্তম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২৪] এই স্থানের "Murray's History of India" নামক পুস্তকে অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্বক এখানে সন্ধানিত হইল।

বংশ রক্ষা।

একদা কোন উৎসবস্থলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হন। গৃহস্থের পরিবারবর্গ সকলেই অতিশয় ব্যস্ত, কেহ এক দণ্ডকাল কোথাও বসিয়া থাকিতে পাবেন না। কেবল এক জন অধ্বপ্রাচীনা আভ্যন্তরিক ভার বুদ্ধি বশতঃ মনঃসংগতি হইয়া বড় কিছু করিতে পারিতে ছিলেন না। ইত্যবস্থায় তাঁহাকে পবিত্রাস করিবার যোগ্য যুবতীগণ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডি কবিত্তে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বদনজ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তত্পলক্ষে গৃহস্থে যেন অপব একটা উৎসব উপস্থিত হইল। প্রোচা বিপদ বসিয়া আপন কর্মক্ষমতা প্রদর্শনার্থ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন যে অল্প কাল মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিরুপায় হইয়া চুইচাবিটা সময়স্বাক্ষর নিকট আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, “ভাই ছুঁড়ি গুলাব জন্যে জ্বালাতন হইয়াছি।” তাঁহা গম্ভীরভাবে অবলম্বন পূর্বক, কথাত্তে, বিলক্ষণ সঙ্গদয়তা ব্যক্ত কবিত্তে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, “তাইত ওদেব রঙ্গ দেখে আব বাচি না।” কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “ওগো ওতে কিছু মনে করে না এ সকল ভাগ্যি থাক্লেই বটে।” আর একজন বলিলেন, “তা ভাই এতে তোমাব দোষ

কি, এ সকল ভগবানের ইচ্ছা; তা তুমি কেন চুংখ করিতেছ?” তখন এই কথা শুনিয়া আর এক সুন্দরী মৃদু মধুর বচনে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ভাই যদি সত্য কথা বলিতে হয়,—তা সব দোষটা ভগবানের নয়,—একটুও ওঁরও ছিল।” এই কথাত্তে মহা হাসি পড়িয়া গেল ইত্যাদি।

নিষ্ঠুরতা কদাচই আদরণীয় নহে। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক ইহাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মন কখন অবচলিত থাকে না, থাকিলেও দোষের বিষয় হয়। লোকে ভগবানের নাম কবিয়া অনেক দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াব চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু সমাজের ভদ্র মণ্ডলী বিচক্ষণ হইলে এতাদৃশ দোষ কখনই আবৃত থাকে না। স্ত্রীপুরুষের পবম্পরের প্রতি আচরণ আর প্রকাশ্যরূপে আলোচিত হয় না এই জন্য অনেক ভূবৃত্ত ভূবাচার জনসমাজে ভদ্র বলিয়া পবিচয় দিতে পাবে নচেৎ তাহাবা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিত না।

আমবা যে বিষয়ের প্রস্তাব কবিয়া এত প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি তাহার সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের শীলতাব ক্রটি হইতে পাবে কিন্তু ইহার সার কথা গুলি প্রচার করা এত অবশ্যক হইয়াছে যে এখন চক্ষু লজ্জা ত্যাগে আর দোষ নাই। বঙ্গ-

দর্শন বালক বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত লিখিত হয় না সুতরাং শৈশব পাঠকদিগের কর্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রবন্ধ সম্বন্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্বে যথাযোগ্য বিচার করিবেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পুং নামে এক নরক আছে, তাহা হইতে যিনি ত্রাণ করেন তাঁহার নাম পুত্র। শাস্ত্রের কথা কে শুনে; বেদাধ্যয়ন, দয়া দাক্ষিণ্য এ সকল বিষয়ে শাস্ত্র কেবল হিজিবিজি বলিয়া গণ্য কিন্তু বংশরক্ষার বেলা শাস্ত্রের দোহাই দিতে কেহই ছাড়েন না। তাতে আবার ছাপার অক্ষরে ইংরাজি হরফে লেখা আছে live and multiply তখন আর কে পায়? বাঙ্গালিরা বংশ বৃদ্ধিতে যেমন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার লিমাগণ বিধবা বিবাহের জন্ত লালারিত। অমনিই রক্ষা নাই আর বাড়ী বাড়ি কেন?

আমাদিগের সমাজে বংশ বৃদ্ধি লইয়া কতই আনন্দ! হাতে খড়ি আড়ম্বরটা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। উপনয়ন কেবল ঐতিহাসিক বাপাব মাত্র, বলি-লেট হয়। কিন্তু ষেটেড়া পূজা, বড়ী পূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পুনর্বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ ইত্যাদি গুণ্ডা উৎসব কেবল বংশ-বৃদ্ধি লইয়াই হইয়া থাকে। বংশধরে বা কাজ করেন কি? কের বংশ বাড়াইতে নিবৃত্ত হন। আহা! কি স্কন্দ! ঠিক বেন প্রবাল কীট পালে আসিতেছে যাইতেছে

আর সমুদ্রে চড়া পড়িতেছে। প্রবালের মূলা আছে, এবং প্রবাল কীটগণ যে সকল দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা ক্রমশঃ লোকের আবাস হয়। কিন্তু বঙ্গীয় কীটগণ আবির্ভূত হইয়া অনেকেই কেবল পিতৃ-লোকের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগের পথ করিয়া দেন।

আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে যাহাদিগেব গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই তাহাবাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিম্বা পুত্র কন্তার বিবাহ দিতে বারপার নাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কে? না একজন বংশজ ব্রাহ্মণ, অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারেন না—সর্বনাশ উপস্থিত বংশলোপ হইবার উপক্রম। উনি কে? না শত্রুমুখে ছাই দিয়ে গুটি আষ্টক জন্ম দিয়াছেন; কতক আছে কতক গিয়াছে; যাবা আছে তাদের জন্ত বিব্রত, বস্ত্র দিবাব সংগতি নাই, সোনার টাদেবা মিগষব-মুষ্টি অবলম্বন করিয়া ধূষরিত কলেববে রাজপথ স্নোভিত করিতেছেন; গৃহিণী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন: কতী দোকানে বসিয়া কলিকাতে ফু দিচ্ছেন আর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে তাহার তত্ত্ব লইতে-ছেন। আর একজন বলিতেছেন, “ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা—কি দিবি তা দে, না দিবি তো তোকে নির্বংশ করব।” কেহ বলিতেছেন, “গ্রামে একটু সম্মম আছে, লোকটা জনটা চেনে, তা ছোট কাজ করি কেমন করে, দশজন বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়াই সংসার চালাচ্ছি

তা ভগবানের ইচ্ছা।” সন্তানের অভাব নাই—জন্ম দিচ্ছেন আর বড় লোকের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন আমি কন্যাতার গ্রন্থ। এমন বংশ কি না রাখিলেই নয়?

বাকালিদিগের জ্ঞান নির্কোষ জ্ঞাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোক সকল যে সুখে আছে, তাহা নহে; নির্দয় স্নেহহীন, তাহাও নহে কিন্তু মহাপুরুষেরা এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন আর বৎসরান্তে এক একটা কালানি বুদ্ধি করিতেছেন। একবার ভুলেও ভাবেন না যে সন্তানোৎপাদন বন্ধ হইলে অনেক দুঃখ দূর হইবে।

কুষ্ঠরোগী অস্পর্শীয়; কিন্তু সে কখনই গুপ্তভাবে লোকেব নিকট আইসে না, লোকালয় ত্যাগ করিতে পারে না বটে, কিন্তু সমীপবর্তী ব্যক্তির তাহাকে দেখিয়া সবিয়া যাইতে পাবে সুতরাং তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার উপায় আছে। পৃথিবীতে দস্যভয় যথেষ্টই আছে। সেই জন্য যথাযোগ্যরূপে রাজদণ্ড নিয়োজিত হইয়াছে এবং লোকে স্বয়ং যত্নেও আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যেসকল হৃদৃষ্ট সন্তান ঔরসজাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কিম্বা দারিদ্র্যতার ধারণ পূর্বক জগতে জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগের যত্নপার হেতু কে? তাহাদিগের কষ্টের শাস্তি নাই কিন্তু কষ্টদাতৃগণ কি দণ্ডের পাত্র নহে? দণ্ডের পাত্র হইলে কি দণ্ড পাইবে না?

পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়া থাকে কিন্তু বাহার বুদ্ধির দোষে বা রিপুসম্বরণের ক্ষমতায় সমস্ত সন্ততি গণকে আজন্মকাল কদম্বরীতে অর্জাশনে দিনপাত করিতে হয় তাহার দণ্ড হয় না। নিষ্ঠুরতা আদরণীয় নহে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার সীমা নাই তথাচ ভ্রম-মণ্ডলী এতাদৃশ লোকের সমাদর করিয়া থাকেন।

ভগবান, গ্রহ, অদৃষ্ট ইহাদিগের কথা যতই বল জন্মদাতার দোষ স্থলন কিছুতেই হয় না—বাহারা সংসারমধ্যে পদেং ঐশীশক্তির কার্য দেখিতে পান তাহারাও স্বীকার করিবেন যে দ্বীপুরুষ আত্মসম্বরণ করিলে বংশ বৃদ্ধি জনিত যত্নপার লাঘব হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে আত্মসম্বরণও ঐশ্বর্যধীন সুতরাং মহাম্যোর চেষ্টাতে কিছুই হয় না। কিন্তু এদেশের কেহ কখন কি বংশবৃদ্ধি নিবারণের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন? বাহারা জানেন না তাহাদিগকে বলা আবশ্যক যে ইউরোপের কোনও স্থানে অতি হীন শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরও পুত্রোৎপাদনের পূর্বে আপনাদিগের সংস্থানের প্রতি বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। অনেকে তিনটি সন্তান হইলে আর জী মহাবাস করেন না। বাহারা তিনটিকেও ভরণপোষণ করিতে না পারে তাহাদের বিবাহই হয় না।

লোকের মুখে সর্বদাই শুনা যায় যে বংশরক্ষা না হইলে নাম লোপ হইবে। আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি নাম

লোপের মর্দ বৃষ্টিতে পারিলাম না। আমি হরিশ্চন্দ্রে গঙ্গোপাধ্যায়—আমার বংশ না থাকিলে কি আর কোন হরিশ, চান্দর স্বন্ধে করিয়া বেড়াইবেন? না হরিশের নাম করিয়া আর কেহ কি পিণ্ড গয়াং গচ্ছ, বলিবে না? পৃথিবীতে অনেক হরিশ হইয়াছে আবার হবে। তাহাদের ঢেরং বংশ। হরিশের নাম করিয়া অনেকেই পিণ্ড দিবে; তবে আমি হবিশ ইতভাগ্য পিণ্ড খাইতে পারিব না এই বড় দুঃখ।

কিন্তু পিণ্ডের কথা ত কেহই বলে না—নাম লোপ হইবে এই আশঙ্কাই প্রবল। সন্তান থাকিলে নাম রক্ষা হইবে। সে কেমন? অতিবুদ্ধ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত, বেটারা কালে ভদ্রে কোন একটা বুড়োব সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসিত হইলে একবারং আমাব নাম করিবে। হয় ত হবিশ বলিতে গবেশ বলিয়া বসিবে আর শ্রদ্ধেব সময়ে “যথা নাম” বলিয়া সা-বিবে কিন্তু তাহাৰ পরে আর কোন্—আমাব নাম করিবে? অতিবুদ্ধ প্রপিতামহের পিতাকে কি বলিয়া পবিচয় দিতে হয় তাহা যখন জানি না তখন আর অতি বুদ্ধ প্রপৌত্রের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি। যাহা হউক মনে করিলাম যে ৫ পুরুষে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ না কেহ এক-বারং নাম উচ্চারণ করিবে। আব চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত আর একটী সুখ-ভোগ করিতে হইবেক।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যাস বাম্বীকির নাম কে কতবার কবিয়া থাকে? তা এই

সকল স্থলের জন্ত কি কতকগুলি কাঙ্গালি রাখিয়া যাইতে হইবেক?

বংশ রক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি উপায় হইয়াছে। এক, শাস্ত্রের বচন “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা” ইত্যাদি। দুই, কস্তার বিবাহ না দিলে নয়। শুদ্ধ তাই নয় বিবাহের পূর্বে যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে পিতা মাসেং তাহার জগহত্যা পা-তকে পতিত হবেন। (৪) রজস্বলা নারীর গর্ভাধানের কোন প্রকার বিঘ্ন না হয় তদুপলক্ষে ভূরিং নিয়ম হইয়াছে। ইহা-তেও পিতৃপুরুষ মহাশয়দিগের অতীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কিজানি যদি পুত্রই বা বৈবাগ্য অবলম্বন কবে এই জন্য তাহার বিবাহেব ভারও পিতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আবও আছে। (৬) অর্থোপার্জনের ক্ষমতা নাই, ভাগ্যক্রমে যদি বা ঘরের লক্ষী বড় একটি আশীর্বাদ করেন না, সন্তানের জালা সহিতে হয় না, কিন্তু নাঠাকুকণ বড়ই উৎকণ্ঠিত, পুনরায় বিবাহ না ক-বিলে নয়। তিনিও শাস্ত্রের দোহাই দেন। শাস্ত্রের কথা শুনিলে, যতদিন পুত্রের মুখ না দেখিব, ততদিন যত ধুসী বিবাহ করিতে পারি; এমন মজার শাস্ত্র কি আর কখন জগিবে?

সম্প্রতি একটি কণ্টক উপস্থিত হই-তেছে। এখন “পাসওয়ারা” পাত্র না হইলে কস্তার বিবাহ দেওয়া ভার। আর পাসেব মূল্য দেওয়াও কঠিন স্ত্রতয়াং অনেক স্থলে কন্যাকাল থাকিতেং বিবাহ দেওয়া ঘটে না; যদি এইরূপ আর কিছু-

দিন চলে, তবে হয় ত ক্রমশঃ অবিবাহিত কন্যার বয়স আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে এবং পরিশেষে বংশবৃদ্ধির কিছু বাধাত ঘটিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুন্সী প্যারীলাল আর হিন্দুপেট্রিয়ার তাহার প্রতিকার চেষ্টায় বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছেন। তবে আর বংশবৃদ্ধির ভাবনা কি ?

নবাসম্প্রদায় আবার একটি নূতন ধারা ধরিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপাতে পুতুলখেলার মত বিয়ে আর কেহ যুগে আনিতে পারেন না কিন্তু চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাইবে? এখনকার কথা এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পুত্রগণ হুশ্রিত হইয়া উঠে। বহুকাল পূর্বে পুরুষেরা অনেকেই পরিবার বাটতে রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জন করিতে যাইতেন সুতরাং অনেকস্থলে বয়ঃক্রম অধিক না হইলে, সন্তান হইত না। পিতা মাতা ব শরীর পরিপুষ্ট হইয়া সন্তান হইলে পুত্র সবল হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তৎকালে বিদেশবাসী পুরুষদিগের চরিত্রের দোষ ছিল। ইহা

নিবারণ করিবার নিমিত্ত সুশিক্ষিত যুবকগণ আপনাদিগের চাকুরির স্থানে পরিবার লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং জিতেজিয়তার একশেষ করিয়া ফেলিলেন। তদবধি বংশবৃদ্ধির অনেক সহপায় হইয়াছে কেবল হুর্ভাগ্য বশতঃ সন্তানগুলি কিছু ক্রয় হইয়া থাকে এবং গৃহস্থের প্রথম সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হয়। বাবুরা আপনাদিগের কীর্তিধ্বজা অনেক উচ্চে তুলিয়াছেন এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের ধর্ম্মরক্ষা হওয়া ভার। এঁরাও বাপের বেটা, বেয়াল্লিশকন্মা। পুকে বাবা বলেছেন “বাবা বিয়ে দিয়েছেন আমার কি?” এখন ছেলে বলেন বাবা কেন আঠার বছর বয়সে আমার জন্ম দিয়াছিলেন? ছেলের বাবা ভেবেই সারা হলেন; তাঁর বাবা বিয়ে দিয়েই যত সর্বনাশ কবেছেন। তা চুলোয় যাক, এখনকার উপায় কি?—কাজেই ছেলেটির বিবাহ দিতে হয়েছে। খুব বাহাদুর! এগজামিনের সময়ে মাসমাসের পেপারে ৯৯ মার্ক পেয়েছিলেন; এখানেও তার ফল হাতে হাতে!

মহুযা ও বাহু জগৎ।

মহুযা সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া বাহু জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা

দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজন মত আলোক

* Buckles' works, Mahaffy's Lectures on Primitive civilizations, Smith's History of Greece &c.

জালান, কল ঘুরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্যন্ত টানান। তাঁহার কোশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), জলযান ও বোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্ধের প্রিয় বিদ্যাৎ মানব সম্ভানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিরা বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে সলিলসিকনের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মহুযা আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন, (৪) কোথাও সমুদ্র ভাঙাইয়া বাসস্থান করিতেছেন, (৫) কোথাও গুরুস্থলে সাগর কবিতেন (৬), কোথাও জলেব নীচে বাস্তা করিতেছেন। (৭) উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ সিদ্ধ সভ্য নবজাতির যাতায়াতের বন্দ্ব হইয়াছে। কি সূর্যাস্তগুণ উষ্ণমণ্ডল, কি তুষাবাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পবিধের, আহার সামগ্রী, ও বাতাতপ নিষমিত করিয়া মহুযা স্থলসঙ্ক্ষে বাস কবিতেন সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ

(১) Wind Mill

(২) Photograph.

(৩) Electric Telegraph.

(৪) Mont Cenis Tunnel

(৫) Holland

(৬) Suez Canal

(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

ক্রমেই কমপ্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল বিজ্ঞীর্ণ ঘন বিজন কালন ভূমিতে তাহার আশ্রয় গ্রহণ কবিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রমোজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পবিমাণে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে মহুযোর প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহু পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধবিষা জগতের সহিত মহুযোর যুদ্ধ চলিতেছে; আবও বহুকাল চলিবে। কিন্তু ক্রমে মহুযোর জয়লাভ ও আধিকার-বৃদ্ধি হইলেও বাহু জগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপবিমাণে পবিবর্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জগতের কার্য্যকারিতা সৰ্ব্বক্ষে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, যে দেশ বিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহু কারণগুলিও পরস্পর মিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি ও শীতো-

কতা সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশেব অবস্থান সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য প্রদর্শন করিব।

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য সকল সূচ্যক্রমে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মহুয়াশরীরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যিক। কিন্তু চতুঃপার্শ্ব বায়ুর তাপদ্বারা দৈহিক তাপের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিবা যায়, এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরে তাপ বৃদ্ধি পায়। (৮) এই জন্য শীত-প্রধান প্রদেশে লোকে শরীরে নিষ্পিত তাপ বন্ধা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম কবিত্তে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহান্তান্তবে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম কবা কষ্টকর বোধ হয়। সুতবাং শীতোষ্ণতার তাবৎমাত্রাসাবে নিতান্ত সামান্য কণ কলিতেছে না। শীতে মহুয়াকে পরিশ্রমপ্রিয় কবে; গ্রীষ্মে মহুয়াকে অলস কবে। শীতে মহুয়াকে ক্রমাগত কার্য কবিত্তে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মহুয়াকে বিশ্রাম অবস্থান কবিত্তে শিখায়। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কব, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপখণ্ডের

সুহিত এশিয়া ও আফ্রিকার উচ্চপ্রদেশ সকলেব তুলনা কব। ইউরোপ পরিশ্রমেব আকর, আফ্রিকা ও এশিয়া আলস্যের আবাসভূমি। লোকের পারলৌকিক বাহ্যতেও বাহ্যজগতেব ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্মাণ বা লব। ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশেব অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পার্বত্য প্রদেশেব লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহাবও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতল প্রদেশোপেক্ষা পার্বত্য প্রদেশ সকল উচ্চ বনিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল, সুতবাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমপ্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পাবসিকদিগেব যদিও ভাষা ও ধর্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডবা পবিশেষ পার্বত্য প্রদেশবাসী পাবসিকদিগেব প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশেব প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালিগ সহিত উক্তব পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশেব অধিবাসীদিগেব তুলনা কব। উক্তব পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথার অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পার্বত্য প্রদেশ, মে-

(৮) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed p. 429.

(৯) Medes

খানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত মু-
হসী ও পবিত্রমী। (১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক
হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লা-
গিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎপরি-
মাণে বাষ্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয়
ও সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ তাপও বহি-
র্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্ব বায়ুতে অ-
ধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে
দেহ হইতে বাষ্পনির্গমনের বাধা জন্মে,
সুতরাং তাপ নির্গমনেরও প্রতিবন্ধকতা
হয়। (১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু
মধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও
উত্তপ্ত বায়ুमध्ये তত তাপ সহ্য করা যায়
না। (১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে সজল
ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা
যেকোন অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও
উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট প্রদেশ বাসীরা সেরূপ
নহে।

ভূমির উর্বরতা অনেক পরিমাণে উ-
ত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে
সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই
সকল দেশের ভূমিই সর্বাপেক্ষা উর্বর।

(১০) The inhabitants of the dry-
countries in the north, which in
winter are cold are comparatively
manly and active. The Mahrattas
inhabiting a mountainous and
unfertile region, are hardy and
laborious" Elphinstone's History
of India

(১১) See Carpenter's Human
Physiology, 6th Ed. p. 444.

(১২) Ibid p. 432.

যেখানে এই দুইটিব মধ্যে একটির অভাব
আছে, অথবা যেখানে এই দুইটির প্রয়ো-
জনানুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সে
খানকার ভূমি অসুস্থ। এই কারণেই
সপ্তসিদ্ধি, অমরগন্ধ প্রদেশ, নীলনদের
তীর, ইউক্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী সন্নি-
হিত স্থান, উর্বরতাময় প্রসিদ্ধ। এই
কারণেই তুবারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিম
মণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্বরতা
বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর,
গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপ
বৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভাল বা-
সিবে না, সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল
মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে।
শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপ বৃদ্ধি
কারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বনায়ুক্ত মাংস
আহার করিতে অনুভব প্রকাশ করিবে।
যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ হবে,
সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশোপেক্ষা শীত-
প্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এত
দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের
অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এসকল
কথার সত্যতা প্রতীত হইবে। আবার
মনে কর, যে উষ্ণদেশে সলিলসিক্ত সুতরাং
উর্বর, সেখানে অল্প পবিত্রমেই আব-
শ্যক আহার্য উদ্ভিদ সকল উৎপন্ন হইবে।
এই কারণেও অল্প পরিভ্রমই লোকের
অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের
আলস্ত বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্র-
দেশে ভূমি শুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ সকল
যে কেবল অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে,

এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মুগয়াপ্রিয় হইবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয়, সে দেশের ভূমি উর্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নগ্রহণের ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকণ্ট। সেখানে বৃহৎ নদ, নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য তক্ষ্য সংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে গণ্যেষ্ঠ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবে বায়ু শুষ্ক; ইহা অত্র প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের জায় আরবে প্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহারা এক সময়ে সিফুনদ হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত, ভারতমহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত, মুসলমান জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। বেরূপ পার্শ্বত্যাগে দেশে কখন কখন বহুদিন পর্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য

ক্লারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহানদের আদেশে সনাতন ধর্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি একবার স্বদেশেব সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্রাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারস্য সাম্রাজ্য ও পূর্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এশিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর ঋণ, ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগাল, অগ্নিনির্ভর আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নি শিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী ভূমি, অমুগল প্রদেশ, মণ্ডসিদ্ধ ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর পূর্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয় তীরেই কিয়দূরে পর্বতশ্রেণী, মধ্যে কয়েক কোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে

নীল নদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা
প্রদেশ প্রাবিত করে, তাহাতেই ভূমির
উর্ধ্বতা বন্ধা পায়। আষাঢ়মাস হইতে
জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির
সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩।১৪ হাত
জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে,
এবং প্রায় চাষমাসে নদের পূর্বাবস্থা
প্রাপ্তি ঘটে। বর্ষাব জল হইতে যে
পলল পড়ে, তাহাতেই প্রাবিত ভূমি উ-
র্ধ্বতা হয়; এবং জল সরিতে সরিতেই
মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে-বীজ বপন করে।
নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ
করিয়া উত্তর সীমাপর্যন্ত যাইয়া ভূমধ্য-
সাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের
উপত্যকা সর্দীর্ণ হইলেও অতিদীর্ঘ ও
অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্বত্রই যাতায়াতের
সুবিধা। বৎসবের মধ্যে আটমাস উত্তর
দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ই-
হাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে
অনার্যাসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে
যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ
হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ।
জল বায়ু সর্বত্রই সমান। ভূমিকম্প
প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎ-
পাতও প্রায় নাই, পীরামিড প্রভৃতি
রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের
জলপ্রাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বস্ত্র
জন্মের দৌরাণ্ডা নাই। মিসরের পশ্চিমে
বৃহৎ মরুভূমি, পূর্বে লোহিতসাগর, উ-
ত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার
অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃ-

শত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের
অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর,
এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের
কিছুপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথ-
মতঃ বর্ষাক্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ
সুবিধা হইত, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে
কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ
জলপ্রাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার
হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির
ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত ভূমি পরিমাণ করিতে
জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ কোন্
সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন্
সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির
করিবার নিমিত্ত মক্ষত্রগুণ সকলের আবি-
র্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ
করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল
কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষি-
বিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতিষবিদ্যার চর্চ্চা-
রম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ
লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ
করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী
একই উপত্যকা; মধ্যে কোন মরুভূমি,
পর্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে
খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্বত্র গমনা-
গমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায়
দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা।
বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই
ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যেপ্রকার
উর্ধ্বতা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে
অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। একারণে

অনেক লোকে আহারাশেষণ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাই-
রাছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুৰাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট
জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্বে
মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের
চতুর্দিক যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে
বহুকাল পর্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণদ্বারা
আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে
পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমু-
দায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন
থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া
জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না।
একস্থল হইতে অল্পস্থলে সর্বদা যাতা-
য়াতের সুবিধা থাকাতে সর্বত্রই লোকের
শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা
দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়া-
ছিলেন। গ্রীসে আথেল, স্পার্টা, আর্কে-
ডিয়া, বিওসিয়া, থেসালী, ইপাইরস্
প্রভৃতি স্থান সকলের সভ্যতার তারতম্য
ছিল; কিন্তু এসকল স্থান পরস্পর যত
দূরবর্তী, তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্তী
প্রদেশের মিসর বাসীদিগের মধ্যে সভ্য-
তাসম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না।
নীল নদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশা-
লিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু
জন্ত মিসরবাসীদিগের অন্তঃদেশের অপেক্ষা
রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা
বহির্বিপ্লব করিতে বা বিদেশে যাইতে
তাল বাসিত না।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, গ্রীকপ্রধান

দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদভোজী হয়।
মিসর এ বিষয়ের একটা প্রমাণ। কিন্তু
মিসরের জ্ঞান যেখানে অল্প পরিপ্রমে
অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর
একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীক বলিয়া
বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা
করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য
অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে
বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে
চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদি-
গের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রম-
জীবীদিগের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের
বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা
অনেক ধন উপার্জন করিতে পারে না,
কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে
পারে। এদিকে বহুসংখ্যক লোকের
শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের
বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে একদিকে
ধেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে,
তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের
অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে
থাকে। অর্থবলে শেযোক্ত নলের অ-
ত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসন
তার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে;
এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী
বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার
ইতিহাস লেখক বাকল সাহেব বিবেচনা
করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রা-
হ্মণ ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও
সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধা-
রণ লোকে একপ্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন,

সেখানে নৃদ্বিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অভ্যাচার হইবে, এবং রাজ্যেচ্ছা-চারী বা উচ্চশ্রেণীর অধুগত হইবেন, আশ্রয় নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজ্য বাহ্য ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত।

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়; কিন্তু ঔষ্য ও আষাঢ়মাসে আর্দ্রাণদেশের পক্ষে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পুরিয়া যায়, ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্তী প্রদেশের উর্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য সাতশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম পরিধা স্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্শ্বত্যা আর্দ্রাণদেশ। সুতরাং দেশ রক্ষা কার্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্তমানকালে পীরামিড প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টক নির্মিত সৌধ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্তী পক্ষে যথেষ্ট প্রস্তর

পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্মিত মিসরের কীর্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাধ্বনন করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়া-খণ্ডে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সম্মিলিত প্রদেশে, বিস্তীর্ণ উর্বরভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আৰ্য্য সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতা বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত, যে এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তর দিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার

সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছেন। বহু-কালপর্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক পরিবর্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে কোন একটি অস্থান বহুনিষ্ঠীর্ণ স্থানব্যাপী হইলে বহুকালস্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্যবস্তু পর্যাপ্তপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক হইতে কোন পরিবর্তন স্রোত আসিয়া তাহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরেব পূর্বে উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। এক পার্শ্বে উচ্চ লিবেনন পর্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকার ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসদ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিহ্ন নহে। এই রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে বাতায়ন করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহারা সাইপ্রসদ্বীপ হইতে তান্ত্র ও মিসর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে

আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, দোষ হয়। বাবিলন ও মিসর প্রাচীনকালে বেক্রপ সভ্য হইয়াছিল, এক বাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসার চলিবার কথা। অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েরও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা বণিজ্য দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্ত ও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা, ও স্পেন, প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাৱশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) একপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, বাবিলনে শরমুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক ও রোমেরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং বর্তমান ইউরো-

(১৩) Hieroglyphics

(১৪) Cuneiform writings

পীর সভ্যজাতি ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মুসলমান ও বীহুদীয়া অদ্যপি পবিত্রিত ফিনিসিয়াৰ বৰ্ণমালাই ব্যবহার কৰিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীবা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন কবেন, তন্মধ্যে কাৰ্থেজই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউৰোপেৰ অভিমুখে চণ। ইউৰোপীয় সভ্যতাব মূল গ্ৰীষ্মাদশ। গ্ৰীষ্ম হইতেই ইউৰোপেৰ অন্যান্য জাতি দৰ্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাকাব্যে হোমৰ তাহাদিগেৰ আদশ, গীতিকাব্যে পিণ্ডাৰ, নাটকে সফক্লিস ও ইক্ষিলাস। হেবোডোটস ইতিহাস বচনাৰ পথদৰ্শক। সাক্ৰটিস ও প্লেটো দৰ্শনশাস্ত্ৰেৰ শিক্ষক। আৰিষ্টটল বৈজ্ঞানিক প্ৰণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড জ্যামিতিৰ, আৰ্কিমিডিস পদার্থবিদ্যাৰ, হিপার্কাস ও টলেমি জ্যোতিষেৰ, এণ্ড হিপাক্ৰটিস তৈৰজবিদ্যাৰ, দীক্ষাগুরু। ফিডিয়াস স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য্য কাৰ্য্যেৰ সৰ্ব্বোচ্চ আদৰ্শ, এণ্ড এপিলিস চিত্ৰকৰ দলেৰ উন্নতিপথ প্ৰদৰ্শক। এক্ষণে দেখা যাউক বাহুভগৎেৰ প্ৰভাৱে গ্ৰীষ্মে কিদৰে ফল কৰিয়াছে।

গ্ৰীষ্মেৰ মানচিত্ৰেৰ প্ৰতি দৃষ্টি কৰ। দেখিবে গ্ৰীষ্ম ও এসিয়া মাইনেৰেৰ মধ্যবৰ্তী সাগৰে অনেকগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পবম্পৰ এত নিকটবৰ্তী যে সমুদ্ৰপথে একাট দেখিতে

দেখিতে প্ৰায় আৰ একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্ৰীষ্মেৰ নিকট হইতে দ্বীপাবলীৰ আৰম্ভ, এণ্ড সাগৰ মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখানে হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এণ্ড এক বন্দৰ হইতে অল্পদূৰে অন্য বন্দৰ লক্ষিত হইবে। একগ অবস্থায় গ্ৰীষ্মেৰ অধিবা সীৰা যে সমুদ্ৰপথে ভ্ৰমণ কৰিয়া বাণিজ্য অবলম্বন কৰিতে ভাল বাসিবে, এণ্ড বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনেৰ তাহাদিগেৰ কৰ্ত্তক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চৰ্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটি যাছিল। এস্থলে তৰ্ণবয়ানে পৰ্য্যটন কৰিবাব আৰ একাট সূৰ্বধা ছিল। হেলেন্‌স্পন্ট হইতে ক্ৰিট দ্বীপ পৰ্য্যন্ত নিৰ্ম্মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্ৰীষ্মে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনেকগুলি পৰ্ব্বত আছে। তাহাদিগেৰ দ্বাৰা অল্পস্থল মধ্যাষ্ট অনেক প্ৰকাৰ জল বায়ু পৰিবৰ্ত্তন সংঘটিত হয়। আৰ্থেৰে অনেক যত্ন না কৰিলে দক্ষিণ প্ৰদেশেৰ সুখাদ্য ফল সকল জন্মে না। কয়েক ক্ৰোশ দক্ষিণ দিকে চল। আৰ্গোনিষেৰ উপকূলে কমলা ও কলম লেবুৰ বিচিত্ৰ উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সেগুলিহইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীৰ্ণ হইতে পাৰিবে, যেখানে জাফালতাও বাচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্ৰদেশে খজ্জুৰ পৰ্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন দ্ৰব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পৰম্পৰ

বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত মধ্যে থাকায়, একস্থান হইতে অল্পস্থানে স্থলপথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ক্রম বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্বত, এবং এতদুত্তর পেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা দ্বারা বিভক্ত, উক্ত শৈলমালা-মধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থর্ণাপলী। করিষ্ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাঠিতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্থল পথে যাওয়া অপেক্ষা জলপথে গমন অনেক সহজ। গ্রীসদেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্বত্র একপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, সকল স্থান হইতেই উহা নিকটবর্তী। এই প্রকার নানা কারণে, সাগরপর্যটন আবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছিল, দৈর্ঘ্য অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুর্পার্শ্বে যাদৃশ উপনিবেশাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এই রূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্বপার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল, ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিমপার্শ্বের উপকূল ছুরারোহ ও তথাকার বায়ু অস্বথকর। স্তব-বাং পশ্চিম পার্শ্ব রোম ও আথেন্স উভ-

য়ের মধ্যবর্তী হইলেও, তাহা পূর্বপার্শ্বের ন্যায় সত্য হইতে পারে নাই। আথেন্স যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্ত জন্মিত না; স্তব-বাং আথেন্সবাসীরা খাদ্য সংগ্রহ-জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্সবাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল; কোথাও নদীপ্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু, কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্বরাভূমি, যথেষ্ট শস্য; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলাসক্ত ও বায়ু কুজ্-ঝটিকাবিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ, মেষ চবায় ও পর্বতগহবরে বাস করে। দক্ষিণেব উপদ্বীপে ও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এই প্রকাব প্রদেশভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মহুয়াচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম, ভাষা, ও রীতিনীতির বহুপরিমাণ একতা সত্ত্বেও গ্রীক চরিত্রে যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় এইরূপ দৈনিক বৈচিত্র্যই বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ।

পর্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটি ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এনিমিত্ত অগ্রে মাসিডোনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্পদিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্ব বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিবোহিত হয়। তৃতীয়তঃ ক্রমে সর্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায়, এবং প্রদেশের অবস্থাতেই সম্রাটত্ব বা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে আথেন্সে একপ্রকার ভাষা, স্পার্টায় আর একপ্রকার, থিব্‌সে অপর আর এক প্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের আলোচনা করাই বীতি ছিল। এইরূপে মহাকাব্য সকল দুর্বোধ্য হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের গুরুত্বপূর্ণ স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত।

এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও এরীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আত্মাদিগের দেশের কবির যখন কৃষ্ণ বিয়য়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাহারা গ্রীকদিগের পথাবলঙ্গী হন।

যে সকল পর্বত পূর্ব পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা ধেরূপ অবস্থাতেই উৎপন্ন করে, উত্তর দক্ষিণে ধাবিত পর্বতগুলি সেরূপ নহে। হিমাচল তিব্বত হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগানিস্তান হইতে তুর্কিস্তান পৃথক করিতেছে। আল্পস পর্বত ইতালীকে ইউরোপের অপবভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীবেনিস্ ফ্রান্স ও স্পেন দেশ বিভিন্ন বাধিতেছে। ইউরাল পর্বতের উত্তর পার্শ্বে রুশিয়া। আপিনাইন পর্বতের উত্তর পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস পর্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটা কারণ বোধ হয় এই, যে পূর্ব পশ্চিম প্রধাবিত পর্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উত্তর পার্শ্ববর্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর দক্ষিণ প্রধাবিত পর্বতশ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্শ্ববর্তী প্রদেশবাসীদিগের নিয়মিত আক্রমণ দ্বারা অসুখ্য করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা

যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্তুগীজপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্থ্যাডিগের আক্রমণে এদেশে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এই-রূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্যের অধিকার-বৃদ্ধি, সভ্যতা বিস্তৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ইউরোপাখণ্ডে সর্বত্রই পূর্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মহুয়ার প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশেব কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ড, ইহাব দৃষ্টান্ত স্থল। জঙ্গলেব অধিবাসীবা প্রায়ই অসভ্য, এই কাবণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেকস্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগেব স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কানন প্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবিরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান লোকে বিবেচনা করেন যে, মর্শ্মদিগের বহুবিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অমুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার, ও নির্জোষ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের মেচিরা, সিংহলের বৃহদরণের বেদেগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের জোলাহিরা, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যেখানে বহুদূরব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানেব ভূমি এত সলিলসিক্ত হয়, যে তাহা মহুয়ার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহুজগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে কবেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বাৰা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্তী বহিঃপদার্থ দ্বাৰা ইতিহাসেব ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতিব অন্তর্হিত শক্তিও এস্থলে গণনীয়। নীলনদের তীবে কাফিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে? আর্যোবা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহাহইলে কি এদেশে বান্দুক বা কালিদাসেব ন্যায় কবি, গোতম বা কপিলের জ্ঞান দার্শনিক, এবং আৰ্য্যভট্ট বা ভাস্করাচাৰ্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত? যদি বাহুবল হইতেই সমৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন? দেশের

ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে কেন? আৰ্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে বাইবাব পূর্বে তথায় অন্য জাতীয় লোকে বাস করিত; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্মিত অল্প। যীহুদীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীকলও যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও; ইংবেজ সর্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মিসরের অটালিকায় যে কাফি চিত্রিত আছে, এখনও তাহা বৃষ্টি বা অবস্থা পরিবর্তিত হয় নাই। আবার দেখ যে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, ও সাহিত্যে আৰ্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই। এবং সৈমজাতি হইতেই যীহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখনা কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না।

কিহুপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আৰ্য্য, সৈম; প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেস্ সাহেব বিবেচনা করেন যে আদৌ বাহ্যবস্তুর ভেদই একরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন

হইবার কারণ। যখন মহুযোরা বাসগৃহ নির্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধের ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আরক্ত করিয়া তদ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা যে দেশে বাইত অশ্রুজীবের জায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুযায়ী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত। সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেকপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহাব করিত। এই রূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থানের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীন কালে বাহা হইয়া থা কুক, সভ্যতাবুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে যে বাহু জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মহুযোর প্রভাব বাড়িতেছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসীদিগের জ্ঞানবুদ্ধির উপর সভ্যতাবুদ্ধির নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মহুযোর প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে, যে ভূমণ্ডলে মানবের অপ্ৰয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ কিছুই থাকিবে না, এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এত দূর মহুযোর আচ্ছাদিত হইবে, যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

শৈশব সহচরী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিপদে আরম্ভ।

অন্তঃসমনোমুখ পুষ্কর হেমোভ রোজ, ভাগীরথীর তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের অগ্র ভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল; মন্দ মন্দ মাকতহিল্লোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ ঢঞ্চল হইতেছিল; নদীর উভয় পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবল মাত্র সমীরণ সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন শন শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর অনন্ত সাগর সম্ভাষণে গমনের কলকল রব শুনা যাইতেছিল। রজনী-কান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ স্বৈত-পক্ষীর ন্যায় স্বৈতপক্ষ বিস্তৃত কবিন্দ্র নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশালবক্ষে বিচরণ কবিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারিরাশি উছলিতে ছিল, পিতৃ মাতৃ সম্ভাষণাকাজ্ঞা শ্রুত রজনী-কান্তের হৃদয়ে তেমন উছলিতে ছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাটী যাইতে ছিলেন; রজনী একাগ্রমনে তাহার জন-নীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। সেই রেহ, সেই বদ্র, সেই ব্যগ্রতা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাটী পহুছিবা-মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি

করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্যক্রীড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনাকার আশ্রয় কানন, তদ্ব্যাপ্তিপদ্মপুষ্কর নামে সরো-বর, যাহাতে গ্রাম্যকুলকামিনীগণ অগুরুণ আশ্রয় নিমজ্জিতা হইয়া পদ্মবনে পদ্ম পুষ্পের সহিত মিশিয়া থাকে এবং যে পুঙ্খবে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে ছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাতৃকন্যার সহিত?—কুমুদিনী? সে ত বাল্যকালে বিধবা হই-য়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। স্ববর্ণপূরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য? ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে। নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্ব-তীর দৃষ্টি করিতেছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। অতিদূরে বনমধ্যে নদীকুলো-পরি রাজহংসের ন্যায় একটি ধবল পদার্থ

দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্তী হইয়াছেন, কেন না ঐ রাজ হংসের জাতি ধবল পদার্থ তাঁহার গ্রামেব একটি ইষ্টকনির্মিত ঘাট মাত্র; এবং উহা বসুন্ধরার ঘাট বলিয়া খ্যাত। রজনী অধীর হইয়া দাঁড়িদিগের জোবে দাঁড় টানিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভাগীবথীর জলোচ্ছ্বাসে এবং বিস্তৃত পালসংযোগে নৌকা তব তব বেগে ছুটিতেছিল, হঠাৎ মাঝিরা পাল নামাইল। রজনী কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত হইয়া দিয়গল অন্ধকাবে আচ্ছন্ন কবিল অল্প কাল মধ্যেই ঘোববাব প্রবল ঝটিকা উঠিল। ভাগীবথীর প্রশান্ত হৃদয় ছবস্ত হইয়া উঠিল, বজ্রনীকান্তের নৌকায বিষম কোলাহল উঠিল এবং যুহুর্ভ্রমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল। বজ্রনী সাঁতাব জানিতেন ছবস্ত বেগবান তবঙ্গের সহিত যুদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে কিছু দূর আসিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত পদাদি শিপিল হইয়া আসিল, তথাচ কূল অতি নিকটে বিবেচনা কবিয়া সাঁতাব দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবসন্ন হইয়া অচেতন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আর একপ্রকার বিপদ ।

বজ্রনীকান্ত আচতন হইয়া জলমগ্ন হন নাই, অমূল্য বায়ু দ্বাবায় ভাঙিত হইয়া

কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। বখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন বাত্রি হইয়াছে, ঝড় বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। সে প্রকাব ঝড়ের হুকার শব্দ নাই, সে প্রকাব নদীর তরঙ্গ নাই, সে প্রকার নদীর শব্দ নাই, সে প্রকার প্রকৃতির সর্বসংহাবিণী মৃষ্টি নাই, তাহার পরিবর্তে শান্ত এবং স্তব্ধমূর্ত্তি হইয়াছে। উজ্জ্বল অনন্ত নিবিড় নীলাকাশে সপ্তমীর চঞ্জ অসংখ্য তাবাব সহিত বিবাজ করিতেছে, নিয়ে অনন্ত দেশব্যাপিনী বিশাল হৃদয়া জাহবী নিঃশব্দে বজ্রনীকান্তের চরণ ধৌত কবিয়া ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন, কেবল মাত্র বজ্রনীকান্ত মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া শয়ন কবিয়া আছেন।

বজ্রনীকান্ত জান লাভ মাত্রই বোধ হইল যে তিনি নদীতীরে মৃষ্টিকায় শয়ন কবিয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক কঠিন মৃষ্টিকায় বক্ষিত নহে, অথচ কোমল উপাধানেও নহে। চক্ষুকন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অন্ধ জলে অন্ধ স্থলে বসিয়া সেই বিজ্ঞান ভটিনী কূলে তাহার উরুপবে বজ্রনীকান্তক বাস্তব্যা আল্লায়িত আত্র বেশ-বাশি দ্বাবায় ঝড় বৃষ্টি হইতে বজ্রনীকান্ত দেহ বক্ষা করিতেছিল। রজনী স্বপ্ন মনে করিয়া চক্ষু মুদিত কবিলেন, কিন্তু মধ্যে২ ক্ষুদ্র বীচিমালা তাহার পাদমূলে আঘাত করাতে সে ভ্রম দূর হইল, আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু পবিত্রাবরূপে দেখিতে পাইলেন না। যুবতীর মুখ-

কুঞ্চিত বিপুল কেশরাশি-মধ্যে লুকাইত। সেই কেশরাশির শেবাগ্রভাগ রজনী-কান্তের বাহুঘর, বক্ষ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে; যুবতী মথোঃসেই স্নগন্ধযুক্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অলকা-গুচ্ছের অন্তরাল হইতে তাঁহার প্রতি ব্যাগ্রভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা দেখিলেন। রজনী বিংশতি বৎসব বয়স্ক। এ বয়সে কে সেই সপ্তমী চন্দ্রালোক বিধৃত কলকলনাদী তরঙ্গিণীব তীরোপবি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যলুকাইত অঙ্গরা-নির্মিত স্নানরীর উরুপরে মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে কবিরী মোহিত না হয়? রজনী আশ্রয় বিস্মৃত হইলেন, নিজ-বিপদ ভুলিয়াগেলেন, স্বাভাবিক বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অমস্তর যুবতী চকিত নেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল। যুবতীব অলকাগুচ্ছ রজনীর গণ্ডদেশে পড়িল। রমণী দেখিলেন যে, বঙ্গনী চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছেন, অমনি সলজে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সেই চেষ্টাতে অলঙ্কার রজনীকান্তের মস্তক তাহার উরু হইতে ভূমে পতিত হইল। অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং হুই হস্তে

তাহার মস্তক ধারণ করিয়া অতি দয়াদ্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “আহা!” তৎপবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লেগেছে কি?” রজনীকান্ত সেই স্বর শুনিলেন; যেমন কোন পুষ্পের স্নগন্ধ ভ্রাণে অথবা কোন সঙ্গীত শ্রবণে কখনঃ মনুষ্য হৃদয় উচ্ছাসিত হয়, এই রমণীকণ্ঠ-স্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ হইল। রজনী নিরন্তর হইয়া রহিলেন, যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “লেগেছে কি?”

রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, “না—আপনি কি মুখ্যযোদের—?” তখন রমণী আশ্রয়শ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলজে মুদ্রু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে রজনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘবৎ আন্তঃ চলিলেন। রজনীও উঠিলেন; হুই এক-বার পদাশ্লিত হইল, তথাপি চলিলেন; সম্মুখে একটি বাঁধাঘাট দেখিলেন, এবং চিনিলেন, যে তাঁহার নিজ গ্রামেব বস্তু-ধাব ঘাট। অতি ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিচয়লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; এই আর একরূপ বিপদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ নানা প্রকার।

পূর্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী দাঁড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। সমুখে জাহ্নবীর অনন্ত বিস্তার নীলাবু-রাশি, তত্পরি বনিকদিগের বৃহৎ বৃহৎ ভরনী খেতপক্ষ বিস্তার করিয়া অতি দূর হইতে উড়ুতীন, শ্রেনীবন্ধ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু রজনী সে সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী খেতপালবিন্দুত করিয়া তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতে-ছিলেন। তাঁহার পূর্বকথা স্মরণ হইলে তাঁহার জলমগ্ন বৃত্তান্ত স্মৃতিস্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। কাল মেঘ তাঁহার মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্বত প্রাণ তবঙ্গের গর্জন তাঁহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই বিপদে পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর উরুপরে মস্তক রাখিতে বাসনা হইল। এই যে নৌকা তরতর বেগে আসিতেছে ইহাতে আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ কাল মেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় উঠিবে, শেষ নৌকা জলমগ্ন হইবে, পুনরায় রমণীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু রজনীর আশা নিফল হইল; নৌকা নক্ষত্রবেগে বহুদূর-রাত্ৰি ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে

ছুটিল। রজনী নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তৎপরে পশ্চাতে অমুদ্যাক্ত শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা তাঁহার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। যুবক তাঁহার বাল্যসহচর নাম মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ রজনীকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার কথা বার্তা কহিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল “হাঁ” এবং “না” উত্তর করিতে লাগিলেন। রজনীর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রজনী, প্রায় দুই মাস হইল আমি যখন তোমার কলিকা-তায় দেখিয়াছিলাম তখন তুমি সদানন্দ ছিলে, এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন? তোমার বাটা আসাতে কোথায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে—না উহা হাস হইল? ইহার কারণ একমাত্র আমার অমুদ্যাক্ত হইতেছে যে তুমি কলিকাতায় কোন রমণীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছ এবং তাঁহার রিচ্ছেদে এমন বিমর্ষ হইয়াছ।” রজনীকান্ত উত্তর দিলেন না। মহেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার এই শেষ উক্তি রজনীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাঁহার বিমর্ষতার কারণ এ পর্য্যন্ত অসুসন্ধান করেন নাই; অসুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ছদ্ম মুকুরে সেই জাহ্নবীতট-বিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। রজনী-কান্ত শিরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, যে

সেই যুবতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভাল বাসিয়াছেন। তবে সেকি শৈশব সহচরী কুয়ূমিনী! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্যমনে সেই জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, একটি অশ্বখ বৃক্ষের পাতা লইয়া, হস্ত দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীনীবে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কেমন তাহার ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে নাচিতেছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেম তাও বিপদ।

এখনও অন্ন অন্ন বেলা আছে—আত্র, বকুল, নাবিকেনাদিব উচ্চশাখায় স্তব্ধ সদৃশ স্তব্ধাকিষণ এখনও জ্বলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাসদয় অতি ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে প্রতিফুরিত হইতেছিল। এমত সময়ে ছুইটি বালিকা গাজধৌত কবিত্তে আসিতেছিল। পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্য দিন আয়োদ্য আয়োদ্যে আসিষা থাকে, কিন্তু আজ ভবে ভয়ে আসিতে ছিল। দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল মাথার উপরে নীল নভোমণ্ডলে পাণিয়ার আকাশব্যাপী বব আর পৃথিবীতে জাহ্নবী বৃদ্ধবাহু সংস্পর্শ জনিত মধুব ধ্বনি। বালিকারা দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সঙ্কোচিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হঠাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিধারা গঙ্গাতীর ঘর্ত্তী একটি অশ্বখবৃক্ষ ঐতি নির্দেশ করিয়া

জ্যেষ্ঠাকে কহিল, “দেখ, স্বর্ণপ্রভা ঐ গাছের আড়ালে কে দাঁড়াইয়া বহিয়াছে।” স্বর্ণপ্রভা একাদশবর্ষীয়া আশ্চর্য্য স্কন্দরী, তাহার শরীর যুবতীদিগের ন্যায় শুক্ল প্রাপ্ত হইতেছিল। স্বর্ণপ্রভা কহিল “কৈ?” বয়ঃকনিষ্ঠা অর্থাৎ কামিনী ভয়হৃৎক মুহুঃ সবে পুনবার অঙ্গুলিধারা দেখাইল “ঐ” এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার কবিত্তে উঠিল, “স্বর্ণপ্রভা তোব বর লো তোব বর।” স্বর্ণপ্রভা একবার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জ উজ্জ্বলসে বাটীবদিকে দৌড়িল। বজ্রনীকান্ত বৃক্ষান্তবাল হইতে সকল দেখিতে ছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণপ্রভাব সচিত তাঁহার বিবাহ হটলে স্ত্রী হইতে পাবিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গঙ্গাতটবিহাবিনী রমণীর দ্বারা হৃদয়মধ্যে অন্তর্ভব করিলেন। রজনীব অমনি সকল স্ত্রের আশা অন্তর্হিত হইল, বজ্রনী চিন্তাকবিবার অবকাশ পাইলেন না। বালিকা দিগেব মধ্যে চীৎকারধ্বনি শুনি লেন। দেখিলেন স্বর্ণপ্রভা দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া পিয়াছেন। বজ্রনী রক্ত-খাসে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপ্রভাকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। স্বর্ণপ্রভা লজ্জায় বস্ত্রমা বর্ণ হইল, এবং রজনীর হস্তত্যাগ করিবার জন্য বলপ্রকাশ কবিল, রজনীও বলপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী পরাভূত হইলেন। স্বর্ণপ্রভা কামিনীকে ইষ্টিক, গঙ্গার শপথ করাইয়া নিষেধ কবিলেন, যেন রজনীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, কাহারো নিকটে প্রকাশ

না কবে। স্বর্ণপ্রভা বাটা পৌছিয়া সন্ধ্যাব সময় কালী বাড়ীতে আবর্তি দেখিতে গিয়া প্রণাম কবিয়া মনে মনে বলিলেন, “হে মা কালি, বজ্রনীকান্ত যেন আমার বব হয়।” তৎপবদিন প্রত্যুষে স্বর্ণপ্রভার মাসি দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয়্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিতেছিল, স্বর্ণপ্রভা অমনি মনে মনে বলিল, “হে মা দুর্গা বজ্রনী কান্ত যেন আমার বব হয়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেশ বিগ্রাস।

তাঁহাই হইল, দুই সপ্তাহ পরে দেব তাবা স্বর্ণপ্রভাব প্রার্থনা শুনিপেন, বজ্রনী কান্তেব সহিত তাঁহাব বিবাহ স্থির হইল। আগামী সোমবার ২২শে আষাঢ়ে বিবাহেব দিন ধার্য্য হইল। অদা গাত্রে হবিদ্রা,স্ববর্ণপুবে বড় ধুম; ববকর্ত্তা, কত্কা কর্ত্তা উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ-উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কত্কা-কর্ত্তাব বাড়ীতে অদ্য বড় গোল, স্বর্ণপ্রভাব আত্মানন্দেব শেষ নাই, বজ্রনী কান্ত তাঁহাব বব হইবে।

অপবাহে তাঁহার বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা ভগিনী কুমুদিনী তাঁহাব কেশবাশি লইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বিন্যাস কবি তেছিল। সম্মুখে আদব দিদি নামে এক বৃদ্ধা ‘ঠাকুরাণী দিদি দাঁড়াইয়া,— আদবদিদি নামেও যেমন কাজেও তেমন, সকলকেই আদর কবিতো ভাল বাসিতেন,

ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে জোষ্ঠাকে উপলক্ষ ক-বিয়া বলিলেন, “আহা! কুমু আমাদের কি সুন্দরী। অমনসুন্দরী স্বর্ণও নয়—”

কুমুদিনী বিবক্ত হইয়া বলিল, “আদব দিদি। স্বর্ণেব চেয়ে আমার সুন্দরী বলিলে আমি কি সন্তুষ্ট হইব?” স্বর্ণপ্রভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি রাগ করিলি কেন, সত্য যতাই ত তোব মতন সুন্দরী কেউ কখন দেখে নাই।” আদব দিদি ভীত এবং অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “তা নয় আমি স্বর্ণপ্রভাকে কুৎসিত বলি নাই, স্বর্ণও বড় সুন্দরী, আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রও পড়িল, কুমু, তুই স্বর্ণপ্রভাব এব বজ্রনীকান্তকে কখন দেখিয়াছিস?”

কুমুদিনী নীরব হইয়া বহিল।

আদব। আমি দেখিগাচ্ছ, দিকি সুন্দর, তবে কি না, শুনেছি এদা সফরদা বিমর্ষ, বুঝি কোন আবাগি ঔষধ কবেছে, আহা! কাব কপে বশীভূত হইয়াছে, তা হক, আমাদের স্বর্ণপ্রভা তেমন মেয়ে নয় শীঘ্র বশ কবে নৈবে।

এইপ্রকারে কপোপকথন চলিতে ছিল, কিন্তু কুমুদিনী উহাতে বিবক্তি প্রকাশ করাতে আদব দিদি চলিয়া গেল। স্বর্ণপ্রভা কেশ বচনা শেষ হইলে চলিয়া গেল, যাঠিতেই অক্ষুট স্বরে আদবদিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতেই বলিতে লাগিল “শীগ্গির মব শীগ্গিব মব শীগ্গিব মব।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ, সন্দেহ ভঞ্জন।

অদ্য বিবাহরাত্রি। বড় ধুম, স্বর্ণ-পূরের পথ ঘাট জনাকীর্ণ, কত দেশ দেশান্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্নার বাটী পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোক জন যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি এক প্রহরের পর রজনীকান্ত বরবেশে শিবিকাবোহণ করিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়া তাঁহার স্বজনগণের অমুখ জন্মিল। চাবিদিক্ হইতে দর্শক-মণ্ডলীর কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রুহৎ অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে স্বর্ণপ্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুনিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল, অকাবণে মনে ভয়সঞ্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনিও কাদিয়া উঠিলেন, কি কারণে কাদিতে লাগিলেন দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে কোলাহল নিকটবর্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরজীগণ “বর আসিয়াছে” বর আসিয়াছে” বলিয়া হুলুধনি ও শব্দধ্বনি করিল। স্বর্ণপ্রভার ক্ষণকালের দ্রুত আল্লাদে শরীর কণ্টকিত হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়া পৌরজীগণ নানাপ্রকার ব্যঙ্গ কবিতা লাগিল। যে সকল যুবতী বাসরে বরের

সহিত রহস্য করিবার আশয়ে আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা বরকে দেখিয়া অক্ষুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন “ও আবার কি রকম? ছোঁড়া কি নড়াই করিতে আসিয়াছে নাকি?” স্বর্ণপ্রভাব জননী রজনীকান্তের মূর্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কন্যাকর্তা বিষন্ন বদনে সন্তান সকলের নিকট অমুখিত লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণপ্রভা স্ত্রীআচারস্থানে আনীত হইল, কুমুদিনী স্বর্ণেব সঙ্গে সঙ্গে আসিল। স্ত্রীআচার আরম্ভ হইল; দুব হইতে এক উন্মাদিনী গাইয়া উঠিল।

যমুনার জলে গিয়ে

কদমতলার পানে চেয়ে

না জানি দেখিলা কোন জনে।

রজনীকান্ত সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিত লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কি দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল—শরীর কাঁপিতে লাগিল। কন্যাসম্প্রদান হইল, দুই হাত এক হইল, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইল। সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীর নিনাদে মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাক্কণের আলো নিবিয়া গেল, পৌরজীগণ কোলাহল কবিতা উঠিল, কন্যার জননী, বর কন্যা বাঁসরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন

না। আলো আনিলেন, তখাচ দেখিতে পাইলেন না। বাটার এমিক্ ওমিক্ চতুর্দিক্ অবশেষে সমুদায় গ্রাম আলো লইয়া ভূতাবর্ণ অমুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও বরকে দেখিতে পাইল না, তখন কন্যাকর্ত্রী চীৎকার কবিয়া আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, গভীরশব্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন শন শব্দে ঘোবতব বায়ু বহিতেছে, বজ্রনীকান্ত জনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্তব মধ্যে একাকী। বর্ষাকালে প্রান্তবের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, কদম হইয়াছে, বাত্রি বনাক্কার—জ্বোদশীর রাত্রি। রজনীকান্ত চলিলেন। অন্ধকাবে কোথায় যাইবেন? কিন্তু হুঃসহ মনেব চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থিব হইতে পারিলেন না, স্ততরাং চলিলেন,—কাদাব উপর দিয়া চলিলেন,—মধ্যে মধ্যে জলেব উপর দিয়া চলিলেন। আবাব পথ অন্বেষণে দাঁড়াইলেন, অন্ধকাবে কোথাব পথ। পশ্চাতে একবার মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, চীৎকার কবিয়া বলিলেন, “কেও?” কোন উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবার ভাবিলেন, তাঁহার সদ্য বিবাহিত স্বর্ণপ্রভাকে ত্যাগ কবিয়া

কুকর্ষ করিয়াছেন, সম্মুখে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ বাতাসে শনশন শব্দ করিতেছিল রজনীকান্ত তাহাতে বুঝিলেন যেন বৃক্ষ তাঁহাকে ভৎসনা কবিতেছে—“কি কুকাজ কবিলে” পশ্বদেব যেন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছেন “ছি, ছি! কি কাজ কবিলে?” আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইল, বজ্রনী অমনি দ্রুত চলিলেন। এবাব হাঁটুসমান জলে আসিয়া পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না, সম্মুখে এক ধবল পদার্থ দেখিলেন। মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কেও?” এবাব উত্তর পাইলেন “পথিক,” বজ্রনীকান্ত অন্তর্ভবে বুঝিলেন যে, পথিক এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, আমাকে প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার? পথিক কহিল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, বজ্রনীকান্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিককে আব দেখিতে পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “কোথা গেলে গো।” উত্তর নাট, কেবল প্রান্তবের অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হইল “হো হো” বজ্রনীকান্ত আবার দাঁড়াইলেন, এবার কলকল-নাদী সমীরণ-সস্তাড়িত ভাগীরথীব তবঙ্গ-গর্জন শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ উদ্দেশে চলিলেন। এখন একটু আকাশ পবিকার হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন। ইঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন বহুবিরি পূর্ণা প্রাবণ মাসের গঙ্গা কলকল ববে তরতর

বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। সম্মুখে গঙ্গাবাসীর কোটা দেখিয়া রজনীকান্ত বুঝিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বনুন্ধরার ঘাটে আসিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় মাসাবধি হইল তাঁহার বিপদ ঘটয়াছিল। এই ঘাটে কুমুদিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মুচ্ছিত ছিলেন। রজনী অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর শোভা দেখিতে দেখিতে পূর্ক ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে জলক্রীড়ার শব্দ শুনিলেন, বোধ হইল কে জলে গা ধুইতেছে। আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করিতেছে। রজনীর বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না কিন্তু জলবিহারিণী রমণী মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, “কে, রজনীকান্ত, ভগিনীপতি?” রজনীর শরীর কণ্টকিত হইল; অনেককষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কেন? জলবিহারিণী উত্তর করিল “ডুবে মরিব বলে।”

রজনী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হুংখে ডুবে মরবে?” জলবিহারিণী কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, “আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আসি নাই, তুমি আমার ভগিনীপতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম আমার প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা।” রজনীকান্ত উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, “আমিও জানিতে ইচ্ছা করি

তোমার ভগিনীপতির প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা—আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর।” কুমুদিনী উত্তর করিল, “ভগিনীপতি তোমার কি মনেপড়ে? যখন আমরা বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম, এক দিবস পদ্ম পুকুরে আমার জন্য একটি পদ্ম তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনেপড়ে? কে তোমার বাঁচাইয়াছিল; আর সে দিন এই গঙ্গাতীরে যেমন করে একবার বাঁচাইয়াছিলাম তেমনি করে এ বারও বাঁচাব।” এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। যেন গঙ্গার ভীষণ শোভায় হইজনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, ক্রমে পরে রজনী বলিলেন, “আচ্ছা তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাঁচাও দেখি।” এই বলিয়া কুল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন, অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রজনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপ দিলেন। চীৎকারধ্বনি সেই ভীষণ তমিষ্র নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া গঙ্গার একূল ওকূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুমুদিনী কাঁদিয়া তাহাকে বলিলেন, “ওগো তুমি কে গো রক্ষা কর, আমার ভগিনীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল তাহাকে বাঁচাও।” আগন্তুক অতি ক্রুদ্ধ এবং গভীর স্বরে বলিলেন, “কুমুদিনী!” কুমুদিনীর শ-

রীর কাপিয়া উঠিল, নিশান হইল। তিনি দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনরপি ডাকিল, “কুমুদিনী!” “তুমি বাহার সঙ্গে আসিয়াছিলে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইয়াছে। ঐ দেখ তিনি তোমার অন্য মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন, উঠ বাড়ী যাও।” কুমুদিনী বলিল, আমার ভগিনীপতি? সন্ন্যাসী বলিল

“ভয় নাই।” মন্দিরের নিকট হইতে বাম-কণ্ঠে একজন ডাকিল, “কুমু আর আমার হইয়াছে।” কুমুদিনী আন্তে আন্তে তাঁরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার ভগিনীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, আজ যে তাহার বাসর।” সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর কবিল “এই আমার বাসরঘর।”



ক্রিও পেট।

বিধির অনন্ত লীলা!—অনন্ত স্বজন!
একদিকে দেখ, উচ্চ হিমালয় শিখর,
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া,—
প্রকৃতি গৌরবধ্বজা, অচল অটল;
অন্য দিকে দেখ নীল ফেনিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য!—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র মালায়
প্রজ্জ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হতে?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্জ্বলিত রবে?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম;
কত কাল হতে তাহে তাসিতেছে হায়!
অসংখ্য পৃথিবী থও, কে বলিতে পারে;
কে বলিবে কত কাল তাসিবে এ রূপে?

মধ্যে এক থও বাবি!—এক তাঁরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নবন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিরী—চাক অলঙ্কৃত!
অন্য তীবে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরুভূমে ভয়ঙ্করতা ‘আফ্রিকা’ ভীষণ!
বিধিব অনন্ত লীলা! কে বলিবে হায়!
এই হুই রাজ্য এক শিরীষ স্বজন!
লজ্জিত প্রকৃতি বৃষ্টি তাই রোব ভরে,
হতভাগ্য আফ্রিকার করিতে মগন
অনন্ত অলধি জলে, হুই মহা শাখা
ফরিল প্রেরণ হুই সূচীবদ্ধ পথে—
উত্তরে ভূমধ্য,—পূর্বে রক্তিম সাগর।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভরে পড়িল কাঁদিয়া
“এসিয়া” চরণ তলে; ভারত—গর্ভিনী
দিলেন অভয়, রাখি স্বচ্ছের উপরে

চরণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি; অশ্রু বারীশ
বলে টলাইতে তারে! সেই দিন হতে,
পূণ্যবতী 'এসিয়া'র শুভ পরশনে,
মরুভূমি মধ্যে যুগ-তৃষ্ণিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হটল সৃজন।

মিশর অপূর্ব সৃষ্টি! দৃশ্য মনোহর!
বিশাল অরণ্য যার দুর্লভ্য প্রাচীর;
আপনি সাগর গড় প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত—বিশ্বয়
'টলেমির' চির কীর্তি-সুস্ত সারি সাবি।
অদূরে আলোক-সুস্ত(১)—আকাশ প্রদীপ!
অলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত,—
নিশাক্ত নাবিকগণ নয়ন রঞ্জন!
শিরীর গরবে মাতি প্রকৃতি মানিনী,
পড়াইল নীল নদী(২) নীলমণি হার,—
তরল আভাষ পূর্ণ! ভুবন বিজয়ী
'মেকিডন' অধিপতি গ্রস্থি স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন।(৩)
রাজধানী রাজহর্ষ্যে বসিয়া নীরবে,
বিরস বদনে, আজি টলেমি-দুহিতা
ক্রিও পেট্রা,—মরি চিত্র বিশ্ব বিমোহিনী!
ধরা ব্যাপী 'রোম' রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর; যে রূপ শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায়!
বীরপণ্য ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে! করে, অস্ত্রে গাহাদের,
সমগ্র পৃথিবী ভার ছিল সমর্পিত!—
সিঙ্গার, এণ্টনি,—এই নাম যুগলের

সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমভূল!—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়
পড়িয়া পতঙ্গ প্রায় হলো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সে রূপ কেমন?
মিশর বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এইরূপ বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপ-রাশি?—রূপ অল্পম ভবে!
কল্পনা অতীত রূপ,—নহে চিত্রনের!

বিবাদ আধারে এই রূপ কহিহুর
অলিতেছে; অলিতেছে স্থখ তায় সম
বিবাদ আকাশ গায়ে যুগল নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—যুক্তানিত!—
আছি দাঁড়াইয়া দুই নয়ন কোনারি;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা! নাহি চাহে যেন
তাজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে; হেম স্বর্গ-ভ্রষ্ট হতে
কে চাহে কখন? যেই নয়নের জ্যোতি:
কামান অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছ্বসিয়া হৃদয়ের বিলাস লহরী,
ভাসাইল তাহে বোম হেন রাজ্য-লিপ্সা
(সসাগরা পৃথিবীর রাজ সিংহাসন!)
আজি সেই নেত্র আহা! সজ্জল এমন!
বিবাদ লহবী, পূর্ণ-বদন-চঞ্জিমা,
রক্ত বাজাসন পৃষ্ঠে ফেলিছ ঠেলিয়া;
অপমানে কেশরাশি, বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদাবি ভূতল চাহে পশিতে শুধায়;—
'রোমেশ' হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয়!

(১) Light honor of Sesostres.

(২) River Nile.

(৩) Alexandria.

রক্ষিত যুগল কব, বক্ষে রমণীব—
 হায়! যেই রমণীয় কর সঞ্চালনে
 বীরগণ হৃদয় ও হইত চঞ্চল,
 প্রণয় ভাঙিত-ক্ষেপে;—ইঙ্গিতে যাহাব
 চলিত পুতুল প্রাণ ধবাব ঈশ্বর,—
 আজি সেই কর আছা! অবশ, অচল।
 পাষণ হৃদয়োপরে, পাষণেব প্রায়
 বয়েছে পড়িয়া; বুঝি হৃদয় পিঞ্জর
 ভাঙি রমণীব প্রাণ চাহে পলাইতে,
 সেই হেতু, হায়! এই যুগল পাষণ,
 বেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয় কপাট।
 দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
 অপলক, অচঞ্চল! চাহি উরু পানে;
 কৃষ্ণ বেখানিত দুই কমলেব দলে,
 হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ!
 মবি! কি বিষাদ মূর্তি!

সম্মুখে বামাব,

বতন খচিত শ্বেত প্রস্তবেব মঞ্চে,
 শোভিছে আহাঙ্গ্য চয়; বহু মূল্য পাত্রে
 শোভিছে মিশর জাত সুবা নিবমল;
 উপবে অলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে;
 বিমল ফটিকে দীপ শাখায় শাখায়
 অলিতেছে, চাক চিত্র খচিত দেবালে।
 অনন্ত আনন্দময়ী, আমোদ কপিণী
 ক্রিওপেট্রা সুনন্দবীৰ, এই সেই কক্ষ
 মনোহর—অনন্তের চির বাস! রতি
 অধিষ্ঠাত্রী দেবী!—যেই কক্ষ আনন্দের
 ধ্বনি, অতিক্রমে সিদ্ধ, প্রবেশিয়া রোমে
 (সেনেট)^(১) মন্দিরে হতো প্রতিধ্বনি ময়,
 গণিত জেমেশ^(২) কেহ রোমেনিশি জাগি
 (১) Senate. (২) Augustus Caesar.

লহরী বাহার; সেই আনন্দ ভবনে
 আজি কেন দেখি সব নীবব, অচল।
 অচল আলোক বাশি; দেখাব দেয়ালে
 অচল মানব চিত্র; অচলিত ভাবে
 পড়ে আছে যন্ত্রচয় বস্ত্রী অনাদয়ে;
 অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে
 আন্দোলিত হ'য় পাছে মধুব 'সিটাব'^(১)
 বামাব বিষাদ স্বপ্ন কবে অপনীত;
 অচল বামাব মূর্তি; অচল হৃদয়ে
 অচল যুগল কব; অচল জীবন
 শ্রোত; চিত্রাপিত প্রাণ, দাঁড়াইয়া পাশে
 অচল ভর্তৃব শোকে, সহচরী দ্বয়
 কেবল বামাব সেই অচল হৃদয়ে,
 সুবেগে বহিতেছিল, ঝটিকা তুমুল।
 “ওলো” চারমিয়ন!”^(২) - চমকিলসখীদ্বয়
 বামাব বিকৃত কণ্ঠে, হলো বোমাকৃত
 কলেবর, যেন এই তমসা নিশীথে
 আশান হইতে স্বর হইল নির্গত।—
 “ওলো সহচরি। এই হৃদয় মন্দিবে
 অতিনেতা ছিল যেই প্রণয় ছলভ,
 অন্তবিত হলো যদি, তবে কেন আব
 এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত?
 শূন্য আজি বঙ্গভূমি! যৌবন পবশে
 উঠিল প্রথমে যবে লজ্জা আবরণ,
 দেখিলাম বঙ্গভূমি নাযক এণ্টনি,
 জীবন সঙ্গীত শ্রোতে খুলিল নাটক—
 ক্রিওপেট্রা জীবনেব চাক অভিনয়।”
 “সুখদ প্রথম অঙ্কে, ওলো চারমিয়ন!—
 আছে কি হে মনে?—অমন্ত বালুকাময়ী

(১) Guitar.

(২) Charmian—one of the two
 maid attendants.

প্রাচি মরুভূমি—পট্টাহীন, বাবিহীন,—
 পদতলে প্রজ্জলিত বালুকা অনল;
 তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে, শিবে উজ্জ্বল বাশি রাশি,
 শত্রু শত্রু বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ,—
 তবু অতিক্রমি হেন হস্তর প্রান্তর
 বীভতরে,—উডাইবা ইজ্জালে যেন,
 শত্রু সৈন্য চম্ব, শুক পত্র বাশি যেন
 ভীম প্রভঞ্জন হায!—প্রবেশিল যবে
 দিগ্বিজয়ী রোম সৈন্য মিশর নগরে,—
 লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
 পশে গজযুথ যথা কমল কাননে।
 বিজয়ী বীবেজ্র বাহ-নগর প্রবেশ
 নিবধিতে, বসেছিল অলিন্দে বিষাদে,
 চিত্ত কৌতূহল মম। পদতলে মম
 প্রাণিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
 প্রবাহিত; দেখিলাম,—আব নাহি সখি।
 ফিবিল নবন মম, ডুবিল মানস
 সেই প্রবাহ ভিতরে।

“ষোড়শ শব্দীয়া

সেই বালিকা। হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
 প্রবেশিল, অভিন।; হেন ভাব সখি।
 কি পূর্বে, কি পবে, শৈশবে, যৌবনে,
 আব ত কখন কবি নাহি অনুভব;—
 সেই যে প্রথম, আহা! সেই হলো শেষ।
 চিত্ত মুগ্ধকরী ভাব! চিত্ত উন্মাদিনী।
 বালিকার অবস্থিত হৃদয় মোহিন।
 কোথায় রোমীর সৈন্য, কোথায় মিশর,
 কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল?
 অদৃশ হইল সব নয়নে আমার।
 কেবল একটা মূর্তি—বীরত্ব যাহার
 মিশি সরলতা, দয়া, — দাক্ষিণ্যের সনে,

[আতপ মিশিয়া যেন চক্রিকা শীতলে,]
 ভাসমান ছিল খেত প্রশস্ত ললাটে:
 প্রজ্জলিত নৈত্র ঘরে; চিব বিবাক্তিত
 উন্নত প্রশস্ত বক্ষে, ক্ষবিত প্রত্যেক
 বীব—পদ সঞ্চালনে,—হেন মূর্তি সখি।
 লুকাইয়া অল্পম বীবত্রে তাহার,
 সৈন্যের প্রবাহ (যথা মহীকূহ চম্ব,
 লুকাই চক্রমাচল (১) আপন গহবরে।)
 ভাসিল নয়ন মম,—ব্যাপিয়া হৃদয়,
 ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন।
 সেই মূর্তি সখি মম বীরেশ এন্টনি।
 চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
 প্রথম প্রণয়বেশে—স্ববগ ভূতলে।—
 সেই মূর্তি, প্রিয় সখি' হইল অদৃশ,
 সুদূর স্কন্দ বোমে, কিছু দিন তবে;
 স্থির জলধির জল কবিতা চঞ্চল,
 প্রতিপদ চক্র সখি। গেল অন্তাচলে!”

“পুনিল দ্বিতীয় অঙ্ক। জনক আমার—
 (পিতামহা, দেবগণ। ক্ষমিত আমারে।)
 অস্বাবী টলেমির বংশে বংশীধর (২)

(১) Mountain of the moon.

(২) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশী বা
 দন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্র-
 জাব বিবাক্তিত হওয়াতে তাহার। তাঁ
 হাকে সিংহাসনচ্যুত কবিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ
 কন্তাকে মিসরের রাজ্যী কবে। টলেমি
 রোমের সাহায্যে, তাঁহার কন্তাকে পরা
 জিত কবিতা সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—
 এই সময়ে এন্টনি রোমান সৈন্যের এক
 জন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি
 তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্তাকে বধ করেন—এই
 পাপিয়সীও তাহার প্রথম সখীকে

কুলাঙ্গার—বিসর্জিয়া স্বাধীন মিশবে
বোম রূপী শার্দূলেব বিশাল কবাণ;
পতি হস্তা, পাণিয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতাব
তপ্ত শোণিতাক্ত, ত্রুষ্টি সিংহাসনে মুখে
আবোহিয়া,—বিধাতাব কেমন বিধান।
পতি হস্তা দুহিতাব কস্তা হস্তা—পিতা।—
অবশেষে—হাঃ! দুঃখ বলিব কেমনে!—
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠ আমাব,
কবি আমি যুবতীর পতিত্বে ববণ;—
সেই খানে ক্লিও পেট্রা জীবন উদ্যানে,
যেই বীজ, প্রিয় সখি। হইল বোপণ,
সে অকুবে কি পাদপ জন্মিল স্বপ্ননি।
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি?
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায়; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু অস্ত্র কবিষা মৃজন;
ডুবাবে মিশবে; আহা! ডুবাবে আপনি;
ডুবাবে টলেমি বংশ; জনক আমাব
সম্বিলা নব দীলা,—নব দম্পতিরে
সমর্পিয়া দবাচাব ক্লীব মজ্জিকবে,
দুগ্ধেব প্রহরী কবি পাণিষ্ঠ মার্জ্জাবে।”
“না হতে পিতাব শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হতে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্দাবণ্যে। হা অদৃষ্ট! বাজাব উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুহুম। পডিল এখন
মরুভূমে।—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায়।

তাহাব মনোমত্ত হয নাই নলিয়া ইতি
পূর্বে বধ কবিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু
সমবে মিসব দেশেব বীতি মতে, উইল
দ্বাবা ক্লিও পেট্রাকে তাহাবা একট ১০ম
বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পবিগয় বন্ধ এবং
একজন ক্লীব চুরাচাবকে তাহাদেব অভি-
ভাবক করিয়া যান।

কিন্তু নাবী প্রতি হিংসা, প্রচণ্ড অনল,
শীতানিল মার্জ্জাওঁর মধ্যাহ্ন কিরণ।
মহসা মিলিল সৈন্য। সেনা পত্নী—আমি
সাজিহু সমব সাজে। কবরীৰ স্থলে
বাধিলাম পিরস্তান, উবস্তান, উচ্চ
কুচ যুগোপরে। যেই কর, কমরীর
কুহুম দামেব ভরে হইত ব্যথিত,
লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবাব;
পশিলাম এই বেশে মিশর ভিতবে,
ক্লীব বস্ত্রে নীল নলী কবিতে লোহিত,
কিন্ধা বীবাঙ্গণা রক্তে রঞ্জিতে মিশরে।
হেন কালে বোম রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোডি,
ভীষণ তবঙ্গ দ্ব্য(১)—সিদ্ধু অতি ক্রমি,
পডিল জীমূতমাজে মিশবেব তীবে,
ক্যাপিল মিশব সেই ভীষণ আঘাতে,
বণোন্মত্ত অসি দ্ব্য(২) পডিল ধসিয়া।
এক উর্শ্বি হলো লয সমুদ্র নৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংসনোপবে!”

“সিঙ্গাব মিশবে।—দূবে গেল বণসজ্জা।
নব ফার্শেনিয়া—পম্পি বিজয়ী সিঙ্গাব,
মিশবেব সিংহাসনে।—খুলিলাম সখি!
রণবেশ, দীনা বেশে বোমেশ চবণে
পডিলাম,—সে কুহক আছে কি হে মনে?”

(১)ফার্শেনিয়ার যুদ্ধেব পব পম্পি সিঙ্গা
বেব দ্বাবা পশ্চাৎকাবে হইয়া মিশরে উপ-
স্থিত হইলে, মিশরবাসী সমুদ্রতীরে
তাহাব শিবশেহদ কবিয়া সিঙ্গাবেকে উপ-
ঢোকন দেয়; সিঙ্গাব মিসবেব আভ্যন্ত-
বিক বিগ্রহ নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধি-
কার কবিয়া বসেন।

(২)ক্লিও পেট্রার এক অসি, এবং
তাহাব শত্রু পক্ষে দ্বিতীয় অসি।

(৩)ক্লিও পেট্রার জনৈক অমুচর তাহাকে

ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীকহ হায়!—নিরাশ্রয়া লতা!”

“সে ঐক্সজালিক সখি! কর সঞ্চালনে
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্তিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহভরে। প্রিয় সখি! হায়!
এই জীবনে প্রথম,—এই মরুভূমে—
স্নেহ স্মৃতিতল বারি হলো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার; নিষ্ঠুরা ভগিনী;
শিশু সহোদর, ভর্তা; মন্ত্রী—নরাধম;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহযে কি ধন?
যুড়াইল প্রাণ, সখি! পুবাইল আশা,
বসিলাম সিংহাসনে, বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিষা অগ্নি—গিবি—উদগীরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকাব, বুঝিল মন্তক,
পড়িতেছিলাম সখি! মুচ্ছিত হইয়া
অকুল সাগবে,—কি যে বীষণা সখি!
জলে, স্থলে, কি অনলে কবিল বীবেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ, সখি! শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মুচ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্তা শত্রুদলসহ,
অনন্ত জীবন জলে; বসিয়াছি আমি
মিশবের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা?—সিজাবের হৃদয় আসনে!
কৃতজ্ঞতা রসে সখি ভরিল হৃদয়,
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয় দাতার,
কবিলাম সহচরি আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জান সমুদয়—

বসন রাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের
নিমিত্ত উপচৌকন বলিয়া! তাঁহাকে গুপ্ত
ভাবে সিজারের মন্দিরে লইয়া যায়।

সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হলো লয়!
একে প্রাণ দাতা, তাহে পৃথিবী ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভূমণ্ডল জয়ী;
এত প্রলোভন!—সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর আকর্ষণে—সরলা হরিণী।”

“হেন কালে চাবি দিকে সমর অনল
জলিল, সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল শিখা; বৈখানর রূপে
ঝাঁপ দিল, সখি! সেই বহির ভিতরে;
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত প্রবাহে
বীরবর! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দি যার রাজ্যেব ভিতবে,
এই ক্ষুদ্র অগ্নি শিখা কি করিবে তারে?
বিজয় পতাকা তুলি, ভীম সিংহনাদে
কাপায়ে ভূধর শ্রেণী সূদূব উত্তবে;
ডুবারে জলধি মল্ল অদূর দক্ষিণে,
ছডারে গৌরব ছটা দিগ্ দিগন্তবে;
ঢালিয়া আনন্দ শ্রোত্র অজস্র ধাবার
বাক্স পথে; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দিগ্বিজয়ী বীরবর বোন রাজধানী।

সতী সহধর্মিণী ব স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট গৃহে,—হায়! জাল মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ ক্ষুদ্র কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত! তোমবা কেহে?(১) তোমরা দুজন
বিষম গম্ভীর মুখে? চৌবট্টী রৌবব
যেন ভাবিতেছ মনে? কণ্টক স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি?
নরে যাও।—বীরবর সেনেট মন্দিরে

(১) ক্রুটস এবং কেশিবাস।

প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চাকু সিংহাসনে;
 “বিশ্বজয়ী মহারাজা সিংহাসনের জয়!”
 আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বার;
 আনন্দে রোমান বাদ্য কবিল সঙ্কার
 নর বক্তে সেই ধ্বনি পুণিল গগন
 সেই জয় জয় রবে; নামিতে লাগিল
 রোম ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট
 সিংহাসনের শিবোপবে, এটনির হবে।
 কুবাইল;—কি? সিংহাসনের বাক্যঅভিবেক?
 কেন আনন্দেব ধ্বনি থামিল হঠাৎ?
 নিরবিল যন্ত্রিদল? কেন অকস্মাৎ
 এই হাঙ্গাকাব?—সখি দেখিলু সন্মুখে;
 কি দেখিলু? ইহজন্মে ভুলিব না আব।
 ভূপতিত, হা অদৃষ্ট! বীবেজ্ঞ সিংহাব!
 কোথায় মুকুট? সখি। বক্ষে তববাব!”(১)
 কণ্টকিল বয়ণীব কম কলেবব,
 বিস্ফাবিল নেত্রদ্বয়; সহিল না আব
 অবলা হৃদয়ে, মুচ্ছা হইল রমণী—।
 স্রগন্ধ ভূষার ধারি, নয়নে, বদনে,
 ভূষাব উরস ষেতে, সহচরী দ্বয়,
 ববঘিল, কিছুক্ষণ পরে রূপসীব
 অচল হৃদয় যন্ত্র, জীবন পবন
 স্পর্শে চলিল আবাব; খুলিল নয়ন,—
 প্রভাতে দক্ষিণানীলে কোমল পরশে,
 উন্মেষিল যেন ধীবে কমলের দল।

(১) রোমবাজ্যে ইতিপূর্বে রাজ-তন্ত্র
 শাসন ছিল না, সুতবাং রাজাও কেহ ছিল
 না। সিংহাসনই প্রথম বাক্য উপাধি গ্রহণ
 করিতে ঐদ্যোগ কবেন; এই কাবণে
 কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের
 দিবস বধ করেন। ইহাদেব মধ্যে ক্রটস্
 এবং কেশিয়াস প্রধান ছিলেন।

অর্ধ উন্মূলিত নেত্রে, এক দৃষ্টে চাহি
 কক্ষে বিলম্বিত এক চাকু চিহ্ন পানে,
 বলিতে লাগিল বামা—“ওই, সহচরি!
 ওই বে দেখিছ—চিহ্ন,—নিসর্গদর্পণ!—
 অপূর্ণ—অঙ্কিত!—ওই দেখ ওই,
 ‘চিদনস’ (১) স্রোতে ওই প্রমোদ তবণী
 ভাসিতোছে, নাচিতেছে বাবিবিহাবিনী,
 হাসিতেছে, জলিতেছে, পশ্চিম তপনে,
 প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তবল সুলিল।
 ময়ূব ময়ূবী প্রেমে মখে মুখ দ্বিধা,
 বন্ধিম গ্রীবায ভাসে তরী পূর্বোভাগে;
 চক্ৰকলাপ বাশি—নয়ন বন্ধন!—
 চাকু চক্ৰাতপকপে শোভিছে পশ্চাতে।
 তাহাব ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী;
 নাচে স্বর্ণ কর্ণ, বন্ধ কুসুম মালায়
 কুসুম কৌমল কবে। বসন্ত রঞ্জেব
 নাচিতেছে সুবাসিত স্তম্ভব কেতন,
 সৌরভে মোহিত—মৃৎ—অনীল চুম্বনে।
 তরণীব মধ্য দেশে, সুবর্ণ খচিত
 চক্ৰাতপ তলে, স্বর্ণ কমল আসনে,
 বাকুণী কপিণী—ওই তবণী ঈশ্বরী;
 আপনাব কপে যেন আপনি বিভোব!
 জুই পাশে স্রুমাংস সহচব চব
 দাঁড়ায় মম্বাথ বেশে—সন্মিত বদন!—
 বাজনিছে ধীরে ধীরে বিচিহ্ন বাজনে।
 কিন্তু সে অনীলে কই যুড়াবে বামাং,
 যবং হইতেছিল কোমল পরশে,

(১) চিদনস নামক নদ—এসিয়া মাই-
 নেরে? এটনির আজ্ঞা মতে ক্লিওপেট্রা
 তাহার সঙ্গে ‘টারসাসে’ সাক্ষাৎ করিতে
 যান।

কাম লালসায় উচ্চ কপোল বৃগল!
 সম্মুখে অঙ্গণাগণ—অনঙ্গ মোহিনী!—
 কোমল মদনোন্মাদী—সঙ্গীত তরল
 বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে; জালে তালে তার
 পড়িছে রক্ত দাড় রক্ত সলিলে,—
 তরণী স্বন্দরী—ভুঙ্গ মৃণালেতে যেন
 আলিঙ্গিছে প্রেমাম্বুলাদে নদ ‘চিদ নসে!’
 সে সুখ পরশে নাচি শ্রোত হিলোলিঙ্গা,
 প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে—তরণী পশ্চাতে;
 নাচিছে তরণী;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
 সনিলের ক্রীড়া, সখি! দেখ চিত্রকর
 চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে নাচিতে
 চুম্বিয়া সরিৎ বক্ষ, কহি কানে কানে
 অক্ষুট প্রণয় কথা তর তর স্বরে,
 চলেছে বঙ্গীণী ওই,—আশ্চর্য্য অদৃশ্য
 সোবতে করিয়া, মবি! ইন্দ্রিয় অবশ।
 নগর, সম্ভাব দীর্ঘ দর্শক-মালায়,
 সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
 অদূরে নগরে বসি—একাকী এণ্টনি
 ডাকিছে অক্ষুট সিসে অপহৃত মন।
 কিন্তু সখি! তুমাত্তর সহস্র নয়ন,
 যে রূপ স্রুৎগু অংগ করিতেছে পান
 কে ওই রমণী,—সর্বদর্শক-দর্শন?
 ক্লিওপেট্রা? আমি? না, না, সখি! অসম্ভব!
 সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি;
 আমি যদি ক্লিওপেট্রা,—তরী বিহারিণী,
 ওই চিত্র নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।
 সেই মুখে হাসি রাশি, এ মুখে বিষাদ;
 সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক;
 সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয় সলিলে,
 আমি ডুবিয়াছি হায়! নিরাশ সাগরে।

যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি!
 শোভিতেছে মরি! যেন শারদ কৌমুদী
 বেষ্টিয়া কুম্ভ বন; আজিও সে বেশে
 সজ্জিত এ বণু মম; কিন্তু সহচবি!
 সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর!
 আজি সেই বেশ, স্বর্ণ-হীরক খচিত,
 নিবিড় তমিশ্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া।
 সে দিন প্রেমের গুরু দ্বিতীয়া আবার,
 আজি হায় নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দশী!”

নীরবিল ধীরে বামা;—মধুর বাঁশরী
 পাইয়া বিষাদ তান, নীববে যেমতি।
 স্থির নেত্র, কিছুক্ষণ চাহি—শূন্যপানে,
 বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা।
 “চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
 ভেটিতে এণ্টনি; সখি! করিতে অর্পণ
 বালিকার চিত্ত চোরে, যুবতী যৌবন।
 যত অগ্রসর তরী হতেছিল বেগে
 ততই হইতেছিল মানস আমার
 সঙ্কোচিত;—নির্ধরিনী মুখে যথা নদ
 চিদনস। হায়! সখি, ভাবিতেছিলাম
 কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম সিংহাসন,
 কিম্বা—রোম'কারাগার! দেখিতে দেখিতে
 সঙ্কুচিত আশা শ্রোত প্রণয় নির্ধরে
 উত্তরিল, কিন্তু সখি! সেই সংমিলনে
 উখলিল যেই চল প্রেম প্রস্রবনে—
 হৃদয় প্রাবিনী!—সেই সলিল প্রবাহে
 ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়,
 ভেসে গেল সেই বেগে, ভূত ভবিষ্যত,
 বর্তমান উভয়ের; হইল চঞ্চল
 বেগে, রোম, মিশরের রাজ্য সিংহাসন;

ভেসে গেল -- সেই স্রোতে সপত্নী সিল্ভিয়া [১]
 ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয় প্রাবনে
 আসিলাম মিশ্ররেতে, প্রাবন প্রবাহ
 সখি! মিশ্রিল সাগবে। স্বপ্ননি! তখন
 সকলি—অনন্ত! হায়, অনন্ত প্রেমের;
 অনন্ত লহরী লীলা। অনন্ত আয়োদ
 বিবাজিত নিরন্তর অধবে নবনে!
 অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ, যুগল হৃদয়ে!
 ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, বাজ্য, ধন,
 প্রেমিক জীবন হায়! অনন্ত সকল।
 যে কাম-সরসী সখি! কবিত্ব নির্মাণ,
 যত পান কবি, বাড়ে প্রণয় পিপাসা,—

[১] এটনির প্রথম পত্নী।

অনন্ত পিপাসাভূর নায়ক আমার!
 চালিয়া দিলাম তাহে, জীবন, যৌবন
 যম; কাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তেব
 প্রায়,—মদন-বিহ্বল! সেই সরোবরে
 কত মৃণালিনী আমি, সখা মধুকব;
 আমি মবালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
 কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সজিলে,—
 সখা মদমত্তকবি, সলিলেব তলে
 কত আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি;—
 অধিপতি ক্লিওপেট্রা। কাম সবসীব!
 এই কপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
 মাস, চলিল বৎসর, বিছাতেব স্বপ্নে,—
 অনন্ত বিলাসে, সুখা, সঙ্গীতে বিহ্বল!

ক্রমশঃ।



হরিহর বাবু।

হরিহর বাবু বড়ই রাশ্ভারি লোক; কাব সাধ্য বে তাঁর সম্মুখে মুখ তুলে কথা কর? তাঁহার ভয়ে তাঁহার পবিচিত ব্যক্তি মাজেই আপনাপন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে কোথাও কুক্রিয়াসক্ত লোকদিগের প্রভাব পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই আছে অথচ সহসা কোন কথাব উচ্চবাচ্য নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে কিছু পড়িলে দেখেও যেন দেখেন না। পথে চলিবার সময় বালকেরা খেলা করিতে করিতে অনাবিষ্টতাবশতঃ তাঁহার গতিরোধ করিলে একপাশ দিয়া যান, যেন টেবই পান নাই। বিচক্ষণও তেমনি; একটি কথা উপস্থিত হইলে তিনবৎসর পরে কি ঘটনা হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন; তাহার আত্মজ্ঞিক বিষয়গুলি সমস্তই একবারে দেখিতে পান এবং তোমার মুখে ছুচারিট কথা শুনিয়াই তোমাব মনের সকল কথা বুঝিয়া লন। যেমন ধার তেমনি ভার; লোকে তাঁহাকে এমন মান্য করে যে, তাঁহার কথা বেন বেদ-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। তুমি তিন মাস বুঝাইয়া যাহার মনের দ্বিধা দূর করিতে পারিবে না, প্রস্তাবিত বিষয়ে হরিহর বাবুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেই সে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে তদনুসারে কার্য করিবে।

কিন্তু হরিহর বাবু যাহার প্রতি বিমুগ্ধ হন, তাহার নিষ্কৃতি নাই। একবার শ্যামসুন্দর বসু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কোপে পড়িয়াছিল। শ্যামসুন্দর কিছু দিন তাঁহার সহিত বিবোধ করিয়া নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িল, মোকদমা মামলাতে বিভ্রত, অনেকের নিকটেই ঋণ গ্রস্ত; পবিশেষে এক ব্যক্তি তাহার নামে দস্তকের পেয়াদা বাহির কবিল; পরদিন প্রাতে ৫০০ পাঁচশত টাকা দিতে না পারিলে পিয়াদা আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে। সমস্ত দিন শ্যামসুন্দর লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও টাকা সংগ্রহ কবিতে পারিল না, অবশেষে রাত্রি একটার সময় হরিহর বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত; হরিহর বাবু তখন শয়ন করিয়াছেন, ভৃত্য এক জন সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারে আঘাত করিয়ামাত্র বলিয়া উঠিলেন “কে, বে, বামা?—শ্যামসুন্দর এসেছে বুঝি?” “আজ্ঞা হাঁ” অনন্তর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে দীপ লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই অন্ধকার ঘবে শ্যামসুন্দরকে আমিতে বলিয়া যে দ্বারে সে প্রবেশ করিবে সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন।

শ্যামসুন্দর স্বভাবতঃ মনেব, যন্ত্রণায় নিতান্তই পীড়িত, তাহাতে অন্ধকার ঘরে আহুত হইয়া একবারে হতবুদ্ধি হইল। কিন্তু উপায় নাই। আত্মবক্ষার জন্য

চেষ্ঠার ক্রটি করে নাই। “যামে মাঝি-
লেও মবিব বাবণে মারিলেও মবিব।
দস্তকের পিয়াদা রাস্তা দিয়া ধরিয়া ল-
ইয়া যাইবে ইহা অপেক্ষা হরিহর বাবু
যদি অস্বাভাব্য করেন এবং তাহাতে প্রাণ-
বিয়োগ হয় সেও ভাল।” হরিহর বা-
বু সহিত এতকাল যে শত্রুতা কবিয়াছিল
সমস্তই মুহূর্ত্তেকমধ্যে তাগাব অবগ হইল;
এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে
শ্যামসুন্দর বৈঠকখানায় প্রবেশ কবিল।
হরিহর বাবু যেমন ফিবিয়া বসিয়াছিলেন
সেই অবস্থায় বলিলেন “আমার সম্মুখে
আসিস্‌না; সব কথা বুঝেছি এই নে টাকা
ধব্ব আমাব কাছে মুখ দেখাস্‌না।” শ্যাম
সুন্দর একপ অমুগ্রহেব কথা স্বপ্নেও ভাবে
নাই। ভাবিয়াছিল হরিহর বাবু সহিত
বিবোধ করাতেই এই বিপদ ঘটয়াছে
এবং তিনি কটাক্ষপাত কবিলেই নিষ্কৃতি
পাইব; কিন্তু টাকাব ভোড়া মাটিতে প-
ড়িল সেই শব্দে অবাক হইয়া বহিল।
হরিহর বাবু চলিয়া যান, তাহার পদশব্দে
শ্যামসুন্দরেব চৈতন্য হইল; তখন সে
কাদিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল এবং
বলিল, “আমার ঘাট হয়েচে নিতান্ত
হুর্কুচ্ছিশতঃ আপনাব মত লোকের
বিক্রদ্ধাচরণ করিছি, যা কলেন এভেতো
আমি কেনা রইলুম কিন্তু বলুন যে আ-
মার প্রতি প্রেসন্ন হোলেন।” হরিহর
বাবু পা ছাড়াইয়া দেয়ালের পার্শ্বে শ্যাম-
সুন্দরের দিকে পিঠ কিবাইয়া থাকিলেন।
শ্যামসুন্দর মেজের বসিয়া অনেক ক্ষণ

পর্যন্ত বিস্তর কাকুতি মিনতি কবিল,
হরিহর বাবু চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে
শ্যামসুন্দর ক্ষান্ত হইলে বলিলেন, “তা
হবে না, আমাব অবগাপন্ন হলি, আমি
তোকে বক্ষা কল্পম কিন্তু তোর মুখ কথা
নই দেখব না আমাব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন
হবাব নয়।” এই বলিয়া অবিলম্বে চলিয়া
গেলেন।

গল্পটি উপন্যাস মাত্র। কিন্তু শুনিলে
অনেক বাঙ্গালির মনে এই হরিহরেব
নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত
হইবেক। মনে হইবে যে, অমুক এইরূপ
তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দূর্বদর্শী ছিলেন, অমুক
তাঁহার নাথ সর্বদর্শী। কেহ আশ্রিতেব
প্রতি দয়াতে বা শত্রুশাসনে তাঁহার
অমুকপ আব কেহ বা অস্বার্থক প্রতিজ্ঞা-
পালনে অথবা কেবল বাক্‌ মথবণে এতা
দৃশ প্রকৃতির অমুকরণকাবী। এইরূপ
গুণ কতক কতক থাকিলে আমাদিগের
সমাজস্থ লোক রাশভাবি বলিয়া গণ্য
হয় এবং “রাশ ভাবি” প্রকৃতি প্রায়
সকলেবই প্রশংসার স্থল।

বুদ্ধিব অপবিপক অবস্থাতে অহুচি-
কীর্ষা বৃত্তিই শিক্ষালাভেব প্রধান উপায়
কিন্তু সকল বিষয়েব দোষ গুণ বিশ্লেষ
কবিতে না পারিলে বুদ্ধি কখনই পরিণত
হয় না। ইহাই সমালোচনার মহোপ-
কার। সমালোচনা ভ্রান্ত হইলেও সমা-
লোচকেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রোতৃ বা
পাঠকবর্গ বিচার কার্যে নিযুক্ত হন, সুতরাং
সমালোচিত বিষয়ের যথাবোধ্য বিচার

না হইলেও শুদ্ধ বিচার কার্যের দ্বারাই বুদ্ধির বিশিষ্টরূপ চালনা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যদি কেবল মনের মত কথা অবশেষ করেন তবে সমালোচনাতে কেবল মন্তভেদই বৃদ্ধি হয়।

হরিহর বাবুর সূচ্যাত্তি সকলেই করে, এই ভাবিয়া যদি লোকে কেবল তাঁহার অনুকরণ করিতেই চেষ্টা কবে তবে তাহার ক্রিয়দংশে উন্নতিলাভ করিতে পারে বটে। বালকেবাও প্রথমতঃ এই প্রণালীতে শিক্ষা কবিয়া থাকে এবং পশুগণ ইহার অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এতাদৃশ অনুকরণ সম্যক-রূপে সুসিদ্ধ হইবার নহে। যাহাদের তাদৃশ তেজ নাই, যাহারা তাঁহার ন্যায় চৈতন্য নাই তাহারা কখনই হরিহর বাবুর প্রকৃতি পাইবে না। কিন্তু এমনও লোক আছে যাহাদিগের বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎকপে হরিহর বাবু সদৃশ। তাহারা তাঁহাব অনুকরণ কবিত্তে চেষ্টা কবিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সর্বতোভাবে মানসিক? আদর্শের যদি দোষ থাকে এবং তাহা দোষ বলিয়া অনুভূত না হয় তবে অনুকরণ হইতে ক্রমশঃ কেবল দোষেরই বৃদ্ধি পায়। অতএব বিচারপূর্বক অনুকরণ করা প্রয়োজন। হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে তদপেক্ষা নির্দোষ পাত্র কাহাকে আদর্শ করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নির্দোষ কেন সম্পূর্ণ দোষাত্মক অবশেষ করাই ভাল। কিন্তু মানব শরীরে

এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব। অতএব লোকচরিত্রে কি হইলে দোষ হয় কি হইলে গুণ হয় তাহা বিশ্লেষ ক্রিয়ায় দ্বারা স্থির করণান্তর একের অভাব অপরের পূর্ণতা অনুমান করিয়া লইতে হইবেক। আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার কালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ইহা নিষিদ্ধ। কেন না এরূপ তুলনা দ্বারা কেবল এই মীমাংসা হইতে পারে যে, অমুক আমার মনের মত লোক এবং অমুককে আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তোমার আমার প্রসঙ্গভেদে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কাহার কি দোষ কাহার কি গুণ তাহাই স্থির কর্য আৱশ্যক।

এতদ্দেশের লোকাচার মতে চপলতা নিন্দনীয় এবং গাভীয়া প্রশংসার স্থল।—কেন এরূপ হইল?—একথা বলিলেই বিপাক। কেহ মনে করেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।—কেহ বলেন চপলতা বালকস্বভাব; কিন্তু তাহাতেই দোষ কি? ষাণকেরা ক্ষুদ্র এবং অল্প বুদ্ধি; তবে বালক প্রকৃতির বৈপরী-তাই কি বুদ্ধিমত্তার আদি লক্ষণ?—কেহ বলিবেন মুনি ঋষিরা গভীর প্রকৃতি ছিলেন। ইহা লোকদৃষ্টান্তমাত্র, এক হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার জন্য যেন আর কতকগুলি হরিহর সংগৃহীত হইল। এ প্রণালীও অসিদ্ধ।—কেহ বলিবেন শাস্ত্রের বচন আছে। এবার হারিলাম। শাস্ত্র সমগ্র অতি বিজ্ঞানোক্তির আদেশ এবং সর্বোতোভাবে আদর্শগণ কিন্তু শাস্ত্রও বিচার্য্যধীন। সমালোচক লেখক

অপেক্ষা নিকট হইলেও বিচারাধিকারী বটে।

আমরা বলি গান্ধীর্ষ্য বিবেচনার সহ চব, চপলতা বিবেচনার বিদ্বকারী, এই জন্য গান্ধীর্ষ্য প্রশংসনীয়। মহুষ্য, জন সমাজে থাকিয়া স্বতন্ত্র হইতে পারেন না; এই কারণে বিবেক ত্যাগের সাবকাশ নাই। যদি তোমার বিবেক না থাকে তবে বত লোক কোন প্রকারে তোমাকে আশ্রয় করিতেছে তাহারা সকলেই তোমার অববিবেচনার ফলভোগী হইবেক। যদি বিবেককে তুচ্ছ কর তবে এই সকল লোকেব গহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে; অর্থাৎ একদিক্ ভাঙ্গিয়া গেল, রাশির ভার খর্ব্ব হইল। আব সেই সমস্ত লোকের অবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর; অমনি চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি হইবে; তোমাব আপন কার্য্য লইয়া মনে মনে সকলেব নিকটে জবাবদিহি করিতে হইবে। ফলতঃ যাহাকে মন হইতে ছাড়িবে তাহাব ভার কমিয়া যাইবে; যাহার প্রতি মনে মনে দৃষ্টিপাত করিবে তাহাব ভার তোমার উপবে আসিয়া বসিবে। “ধারে কাটে আর ভাবে কাটে।” প্রবাদ বাক্যটি অপ্রকৃত নহে; অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে এই অভিমান সূচক আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে যে, আমার কথা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইলেও অমুক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কথার “ভার” অপেক্ষাকৃত অধিক। এই ভার সহজে হয় না। লোকের ভার বহন

করিতে হয় তবেই “ভারে কাটে।” এ ভার চিন্তার অঙ্গ, মনে মনে বহিতে হয়। চিন্তার আবির্ভাবে চপলতা দূরে যায়; বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, যুবা বান্ধক্য লাভ করে এবং মারী পুরুষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। জীলোক মাজেই তরল স্বভাব। কেননা পুরুষেরাই জীদিগের ভার বহন কবেন। আবার এতদেশেব জীজাতি অধিকতর তরলপ্রকৃতি;—স্বতন্ত্রতাতেও ইহারা অন্য দেশস্থ জীলোক অপেক্ষা নিকট। আমাদিগেব দেশের জীলোকেব মীমাংসা কিরূপ পদার্থ তাহা কখনই জানে না। বস্তুতঃ চিন্তা বা মীমাংসা করিবার ভাবই পায় না। সুতরাং জী লোকদিগের গান্ধীর্ষ্য ও বিচারশক্তি উভয়ের কিছুই নাই। এবং চপলতাই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হই-
ষাছে। কথা না কহিলেই যে গান্ধী হব এমন নহে। নতুবা বর্দ্ধিষ্ণু নববধুগণ গান্ধীর্ষ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিজা বিচার কার্য্যের অনন্যোপায়।

গান্ধীর্ষ্য রাজলক্ষণ, কেন না রাজা প্রজার ভারবহন করেন। রাজা যত আপনাব ভার বৃদ্ধি করেন, প্রজাব ভার তত লঘু হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণ তত্ত্বে প্রজাবর্গের এত গৌরব। রাজ্য পরাধীন হইলে প্রজাবর্গ রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়া তৎকাবণে মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের তুলনায় আপনাদিগকে গান্ধীরপ্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। ইহা প্রকাণ্ড

ভুল। রাজনীতিবিদগণ বিষয়ে বাঙ্গালি-
দিগের মতামত নাই; কেবল অসবজ্ঞ
বা অন্যান্য স্বার্থ সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই ইহারা
মগ্ন। গান্ধীর্ষ্যও তদনুরূপ। রাজ্য পুড়িয়া
ছার খার হইয়া যায় কিন্তু কেবল কো
পীনখণ্ড দগ্ধ হইবে সেই ভয়ে গবাক্ষের
দিকে ধাবিত। ইংরাজ স্বার্থসাধনে অ-
নেক সময়ে যথেষ্টাচারী হইয়া চাপল্য
প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন ভারপ্রাপ্ত
হইয়া কতকগুলি লোক সমবেত হয়েন
তখন চপলতার লেশ থাকে না। বি-
বোধ থাকুক, বিবস্বাদ হউক, উদ্দেশ্য
সিদ্ধির পক্ষে সকলেই একাগ্রচিত্ত, সক-
লেই চিন্তার মগ্ন, সকলেই ভাবাক্রান্ত।
বাঙ্গালিবা পুণগ্ভাবে বং ভাল কিন্তু
একত্রিত হইলে হৃদয়, সঙ্কোচপ্রিয়, অথবা
ভবিষ্যতে দোষস্পষ্ট হইবাব শব্দে বিচ-
লিত অথবা ভাব ত্যাগে অভিলাষী কিম্বা
অন্যের বাসনা ও পরামর্শের প্রতি অম-
নোযোগী হন; নতুবা, অপরিণামদর্শী,
বাচাল, কলহপ্রিয়, স্বার্থাভিলাষী এবং
জেদে অভিভূত হইয়া পড়েন। এগুলি
প্রকৃত গান্ধীর্ষ্যের লক্ষণ বা প্রশংসার স্থল
নহে। ফরাসি জাতি সভ্যতাতে ইংরাজ
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষা
করিতে অপেক্ষাকৃত অগতু। ইংরাজেরা
বলেন ফরাসিবা চপলপ্রকৃতি; ফলতঃ
তাহাবা মে রাজকার্য্য নির্বাহকালে পরের
বিবেচনা প্রদান করিতে নিতান্ত অক্ষম
হইয়া পড়েন এ কথা আমাদেরও
মনে হয়। তাহাদিগের আচরণ দেখিলে

বোধ হয় সকলেই যেন আপনাদের মনের
চিন্তাতেই উন্মত্ত আর কিছুই প্রতিই দৃক-
পাত নাই। সুতরাং ঐক্যের সম্ভা-
বনা কি। ছোট মুখে বড় কথা বলিতে
পাইলে বলা যায় যে, বাঙ্গালিবা এই
বিষয়ে কথঞ্চিৎ ফরাসি জাতির সদৃশ।

হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরকে মনে মনে
মার্কনা করিয়াও যে তাহার দিকে মুখ
ফিরাইলেন না, এটি তাহাব জেদ। প্রতি-
জ্ঞাপালন অতি প্রধান ধর্ম কিন্তু তাহার
নিমিত্ত দিগ্দিগ্ধ জ্ঞানশূন্য হওয়া উচিত
নহে। শ্যামসুন্দরকে যদি মনে মনে
মার্কনা কবিয়া থাকেন তবে তাহার মুখ
দেখিতে দোষ কি? যদি তখনও তাহার
প্রতি আক্রোশ সম্পূর্ণরূপে না গিয়া থাকে,
তথাচ ক্রোধশান্তিব চেষ্টা করাই ভাল।
প্রতিজ্ঞাবক্ষা ভ্রমে সন্ধিতক্রোধ প্রতিপালন
করা সর্বপ্রকারেই ক্ষতিজনক। জেদ
স্বভাবতঃ গুণও নহে দোষও নহে।
ইহাতে যেমন সংকল্প তেমনি কুসং-
বুদ্ধিরও ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি প্রশং-
সনীয় কার্য্যে জেদ করেন তিনিই প্রশং-
সনীয় কিন্তু কুসংবেদে জেদ অজ্ঞানকৃত
হইলেও অন্ততঃ অনিন্দনীয় এইপর্য্যন্ত
বলা যায়। কিন্তু তাহতেও ক্ষতির কিছুই
লাঘব হয় না। তরবারি দ্বারা শত্রু মিত্র
উভয়েই বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহাতে
তরবারের কোন মহত্ব দৃষ্ট হয় না।
আওরঙ্গজেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফিরোজ শা
কোমল প্রকৃতি ছিলেন; লোকে আওরঙ্গ-
জেবেরই প্রশংসা করে। আজি কালি

বিস্মার্কের নামে কজন বাহবা না দিয়া থাকিতে পাবেন? এক সময়ে প্রথম নেপোলিয়ানও এইরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার প্রাধান্য কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে? তেজ দেখিলেই আমবা স্বভাবতঃ চমৎকৃত হইবা থাকি। ইহা পতঙ্গপ্রকৃতি। রাশভাবি লোকেব জেদ কিছুই নয়, পর্বোপকারই তাঁহাদের মহত্বের প্রকৃত লক্ষণ।

রাশভাবি লোক কর্তৃত্ব ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যেই হউক বা চবিত্তগত গুণ হইতেই হউক পর্বোপকার কবা ইচ্ছাদিগেব একটি বিশেষ লক্ষণ। আমবা যেমন দূরদর্শিতা ও সর্বদর্শিতাব অন্নতা হেতুক আপনাদিগেব গাঙ্গীর্ষ্যেব স্থল সংকীর্ণ কবিয়া লইবাছি, পর্বোপকার এবং তাহাব আনুষঙ্গিক কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিষয়েও আমাদিগেব দৃষ্টি ও প্রয়াস তদনুরূপ। জমীদার প্রজাগণেব উপরে কর্তৃত্ব করিতে ভাল বাসেন। হাকিমেবা আমলা উকীল ও আহেলা মানলাব উপর কর্তৃত্বাকাজ্য কবেন। হেডমাষ্টার, হেডকেবাগী অধীন কর্মচারিগণেব উপর ধুমধাম কবেন। এবং সংসর্গগুণে ভাবতকলঙ্কিত ইংবাজ কাল মুখ দেখিলেই কর্তৃত্ব কবিত্তে ইচ্ছা কবেন। এবং হরিহর বাবু ন্যায় রাশভাবি লোকেব যাহার পরিচয় পান তাহাকেই আজ্ঞাবহ কবিব মনে করেন। আজ্ঞা নানাবিধ। তন্মধ্যে শুভকবেব আজ্ঞাই সর্বপ্রধান। এতাদৃশ আজ্ঞা দানেচ্ছা বড় একটা দেখা যায় না।

যেমন লক্ষ্মীব অনেক প্রকাব বরযাত্রী থাকে, উন্নতিব পক্ষে কৃত্রিমতাও সেইরূপ একটি সহচর। উন্নতিব সৌন্দর্য আছে। যেমন কদাকার ব্যক্তি সৌন্দর্যের গুণে মোহিত হইয়া কৃত্রিম রূপ ধারণ করিত্তে চেষ্টা করে। তেমনি সভ্যসমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পরেব নিকট-চিহ্ন-সৌন্দর্য প্রদর্শন কবিবার জন্য কৃত্রিম দয়া অভ্যাস কবে। এই কৃত্রিমতা লোকেব ক্ষতিজনক না হইলে, শুদ্ধ ইচ্ছাব স্বার্থপরতার জন্য কেহ বড় বিবস্ত্র হব না। রাশভাবি লোকেবা আপনাদিগেব মনোগত ভাব পরিষ্কার কবিবা না বুঝিলেও এই নিয়ম অনুসাবে কার্য্য কবিয়া থাকে; লোকেব প্রতি আন্তরিক দয়া থাকুব বা না থাকুক দয়াব মাহাত্ম্য জানিয়া পর্বোপকাবে প্রবৃত্ত হয়। প্রশংসাকাজ্যবাও ঠিক এই প্রশালীতে কার্য্য কবিয়া থাকে। তবে উভয়েব মধ্যে প্রভেদ এই বে একজন প্রশংসা এবং আর একজন কর্তৃত্ব অভিলাষ কবে। আব আশাতঙ্গ হইলে নিব বচ্ছিন্ন প্রশংসাবিলাষী জ্রীণোকেব ন্যায় অভিমান কবে ও কর্তৃত্বাবিলাষী বৈব নির্ধাতনে সচেট্ট হব। অভিমান, যে মনে কবে তাহাবই পক্ষে যজ্ঞগাম্যক, অন্যের পক্ষে উপহাসস্থল। বৈবনির্ধাতন অপেক্ষাকৃত গুরুতর দোষ। কিন্তু কর্তৃত্বাবিলাষী এবং রাশভাবি লোকেবই সম্মান সর্বত্র দেখিত্তে পাওয়া যায়, কারণ পুরুষের চক্ষে অভিমান অপেক্ষা বৈবনির্ধাতনই ভাল লাগে। কর্তৃত্বাবিলাষ এবং প্রশংসাবি-

লাষ উভয়ই নিকৃষ্ট প্রকৃতি। কিন্তু প্রথমটি বাহ্যিক পরিমাণে স্বার্থপর; অনেক এই কথার স্মৃতি অভাবে পৌরুষ বলিয়া ইহার গৌরব করেন। রাশভারি লোকে বদমা সর্বতোভাবে নিন্দনীয় নহে। কেন না স্বার্থপর হইলেও ইহা অনেকস্থলে বিপুল-রূপে পরের হিতজনক হয়। লোকে এই স্থূল কথাটি বিলক্ষণ বুঝিয়াছে এবং তৎকারণে রাশভারি লোকের আজ্ঞাপালন কবিয়া থাকে। নতুবা কর্তৃত্বাভিলাষিগণের উদ্দেশ্য দেখিয়া যদি সকলেই তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইত তাহা হইলে এই শ্রেণীস্থ লোকের জীবন ও কার্যক্ষমতা সর্বসাধারণের পক্ষে বার্থ হইত এবং আজি পর্য্যন্ত জগতের যত উন্নতি হইয়াছে তাহার অনেকাংশ অনা-য়ত্ত হইয়া থাকিত। ফলতঃ রাশভারি লোকেরা যে সকল মঙ্গল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তজ্জন্য উপকৃত ব্যক্তিদি-গের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তব্য কিন্তু কর্তৃত্বাভিলাষীদিগের চরিত্র অমুকরণ করা উচিত নহে।

যেমন কর্তৃত্বাভিলাষের প্রকাশ্য ফল মঙ্গলিক হইলেও উৎপত্তি নিন্দনীয়, আজ্ঞাবহন প্রকৃতির আদি এবং অন্তও তদনুরূপ। আজ্ঞাবহন অজ্ঞতা এবং তেজস্বীত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞ-তার অনেক দোষ এবং তেজকে যতপূ-রুষক সংপথে পরিকল্পিত করাই আবশ্যক। কর্তৃত্বাভিলাষীরা যেমন ছাগলের নিকটে শাদুলের ন্যায় আচরণ করে তেমনি

সিংহের সমীপে শৃগালবৎ ব্যবহার কবিয়া থাকে। এই ধর্ম্য বাঙ্গালি আতিতে প্রকৃষ্ট রূপে লক্ষিত হয়। আমাদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি যেমন, উচ্চাভিলাষও তদ্রূপ। উভ-যই “বিঘত প্রমাণ।” যে উচ্চাভিলা-ষের বশবর্তী হইয়া বিশ্বাসিত্র ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাস শিবের সমতুল্য হইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাকে আমবা বামনের চতুঃস্পর্শ আকাজ্জাব অমুরূপ বলিয়া উপহাস, বা উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং যে প্রতিজ্ঞার প্রভাবে পাণ্ডবগণ অর্জুনের যুদ্ধবিদ্যাবৃদ্ধিব প্রতী-ক্ষাতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমরা মনোযোগ করি না কিন্তু ভীম যে বীভৎসের একশেষ করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করেন তাহাই আমাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাপালনের দৃ-ষ্টান্ত হইয়াছে। এই সংস্কার প্রযুক্তই হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরের মুখ দেখিব না স্থির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালিরা তর্কেব বলে শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সমপ্রমাণ করিতে পাবিলে, বিচারকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলে এবং মনিবকে আপন মতে ঘুরাইতে পারিলে উচ্চাভি-লাষ সর্বোতোভাবে চরিতার্থ হইল ব-লিয়া বোধ করেন। এইরূপ অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সংপ্রকৃতি ব্যক্তিরাজ্ঞানপূর্বক কুতর্ক করিতে পরাশ্রয় করেন না; এবং অনেকে মিথ্যাকথন পর্য্যন্তও স্বীকার ক-রিয়া থাকেন। তাহাদিগের প্রসন্নতা ব্যতীত কার্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের সমীপে

এইরূপ আচরণ আর যাহাদিগের প্রতি ভর মৈত্র উভয়ই প্রদর্শিত হইতে পারে সেখানে কাল্পনিক ব্যবহার। ইহাই কর্তৃত্বাভিলাষী বাঙ্গালির বীজমন্ত্র। ইহারা সময়ে২ অন্তরাঙ্গার নিকট সহস্র ধিক্কাব সহ করিয়াও হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের তোষামোদে প্রবৃত্ত হন! এই তাঁহাদিগের কর্তৃত্বের পবাকী। ফলতঃ যে কর্তৃত্ব আপনাদের নিকটেই নতশির হইয়া থাকিতে হয় তাহাব গৌরব কি?

রাশভারি লোকের গুণ এই যে পবের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন; চাপলা বশতঃ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করেন না। ইহারা বহুলোকের ভাববহন করেন। তাঁহাদিগের মনে যাহাই থাকুক কার্য্যে অনেকের হিতসাধন হয়। ভারবহনের

মর্শ—জবাবদিহি। যেসকল বিষয়ের ভার বহন করিতে হয় তাহার জবাবদিহি করা আবশ্যিক। জবাবদিহি যে, কোন নর্দিষ্ট লোকের নিকটেই করিতে হয় এমত নহে। আপনার মনে২ জবাব দিহি করার ন্যায় কঠিন কার্য্য নাই। জবাব দিহি প্রকৃত ভারিত্বের লক্ষণ কিন্তু সকল রাশভারি লোক যথাযোগ্য মতে জবাব দিহি কবেন না। অনেকে কেবল কর্তৃত্বাভিলাষী, স্বার্থপর এবং অতিশয় জেদপ্রিয়, তাঁহারা ঈষ্টলাভের জন্য সকল কুকর্ম্মই কবিত্তে পারেন। এতদ্দেশে রাশ ভারি লোকের দোষগুণের বিষয় প্রকৃত বিচার হয়না বলিয়াই তাঁহাদিগের এত সম্মান আর আড়ম্বর।

সাহসাহ চরিত ।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকূজাধিপতি সাহসাহ নৃপতির জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থ বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি সাহসাহ চরিত ও শেষোক্ত খানি নব সাহসাহ চরিত নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাহ চরিত রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে কিন্তু বিশ্ব প্রকাশ নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বরের অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি

গাধিপুুরেশ্বর সাহসাহের চিকিৎসক চূড়া-মণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে ১০৩৩শকে বর্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব যে তাঁহার ১১১১খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ প্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাহের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুুরাধিপতি। কেহহ গাধিপুুর গাজি

পুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন
কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্ত-
কুজের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন
সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান
চিন্তামণির “নানার্থভাগ” বিশ্বকোষ
হইতে সঙ্কলিত কিন্তু এ কথার আমরা
অনুমোদন করি না। সে যাহা ইউক
বিশ্বকোষ হইতে আমাদের মত পরি-
পোষক কবির জীবন বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ
ও গ্রন্থ প্রণয়নের অবতরণিকা নিয়ে
উদ্ধৃত হইল ॥

যথা

শ্রীসাহসাহ নৃপতেরনবদ্য বিদ্য বৈদ্যা-
ভরঙ্গ পদপঙ্কতিমেব বিভ্রং ।
যশঃই চাক্র চরিতো হরিচন্দ্র নামাস্য
ব্যাখ্যাত চরকতন্ত্র মলং চকার (৫)
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয় স্তস্যায়ৈ
সকল বৈদ্যকুলাবতঃসং ।
শক্রস্য দস্য ইব গাধিপুত্রাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণ
ইত্য মল কীর্তি-লতা-বিতানঃ (৬)
সংকম সংমিলনম্ন বিকল্প ভ্রম কল্পানলা-
কুলিত বাদিসহস্র সিদ্ধুঃ ।
তর্কজয় ত্রিনয়ন গণয়ন্তদীয়ো দামোদরঃ
সমভবন্তিষজাং বরেণ্যঃ (৭)
তস্তা ভবংসুহৃদুদারবাচো বাচম্পতিঃ
শ্রীললনা বিলাসী। সর্বৈষ্য বিদ্যানলিনী
দিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র “কান্য-
কুজং গাধিপুত্রং” ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুজ
নগরের পর্যায়ে ‘গাধিপুত্র’ শব্দ বলিয়া-
ছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং
মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সংকুহুদাকরেন্দুঃ ৷৮।

বস্তুভূজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্র রত্ন রত্নাকর
শ্রীমমবাণ্যচ কেশবোভূৎ ।
কীর্তিনির্কেতন মনিদ্যাপদ প্রমাণ বাক্য
প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শ্রী ৷৯।
কৃষ্ণস্য তস্যচ স্তুতঃ শ্রিতপুণ্ডরীকদণ্ডাতপ
ভ্রপ ভাগযশঃ পতাকঃ ।
শ্রীত্রক্ষাইন্দ্র বিকল্পাশ্বমুখারবিন্দ সোল্লাস
ভাসিত রসার্জ সরস্বতীকঃ ৷১০।
তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকাস্তকীর্তিঃ
শ্রীমমহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীভ্রঃ ।
অশেষ বায়স মহার্ঘ্য প্যার দৃশ্যশব্দা-
গমাধুরহমণ্ড রবিবর্ভুব ৷১১।
যঃ সাহসাহ চরিতাদি মহাপ্রবন্ধ নির্মাণ
নৈপুণ্য গুণ পৌরবতীঃ ।
যো বৈদ্যকজয় সরোজ সরোজবজ্র বজ্রঃ
সতাং চ কবি কৈরব কাননেন্দুঃ ৷১২।
সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধ্যসিদ্ধোঃ
পুরুষোত্তমানাং ।
দেদীপ্যতাং হংকমলৈষু নিত্য সাকর
সাকরিত কৌস্তভতীঃ ৷১৩।
লঙ্কৈঃ কথঞ্চিদভিজাত স্ববর্ণকারলীভেন
কোষ শত বারিধি শব্দবৈষ্ণৈঃ ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বজ্র শোভাং
বিভ্রম্যাত্ত বাটতো মুখখণ্ড এষঃ ৷১৪।
কণীষরোদীরিত শব্দকোষরত্নাকরা-
লোড়ন লালিতানাং ।
সেব্যঃ কথং নৈব স্তম্ভ শৈলো বিশ্ব
প্রকাশো বিবুধাধিপানাং ৷১৫।
ভোগীভ্র কাত্যায়ন সাহসাহ বাচম্পতি
ব্যাড়িপুত্রঃ সরাণাম্ ।

সবিস্মরণামর মঙ্গলানাং শুভাক্ষ বোপা-

লিত ভাণ্ডারীণাং ১৬।

কোষাবকাশ প্রকট প্রভাবলঃভাবিতা

নর্ঘণ্ডণঃ স এষঃ ।

সংপাদরস্তে স্যাতি বাহিতার্থান্ কথং

ন চিন্তামনিতাং কবীনাং ১৭।

আমিত্র শৈল চরমাচল মেঘলাজি

কৈলাস ভূমিবরাদসদিস্তিকিঞ্চিৎ ।

একত্র সংভূত মগোববশক রত্ন মালো

কাতাং তদখিলং স্মৃতিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ

১৮। ইত্যাদি

অর্থাৎ যিনি সাহসার নৃপতিব নিকট

বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন কবিষা মনোহব

চবিজে অবস্থান কবত সম্বাদ্যা দ্বাষা চবক

শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাব নাম

হবিচন্দ্র। (হবিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে

আর পাওয়া যায় না।) এই হবিচন্দ্রের

বংশে বহল বসুধাপতিমানা, বৈদ্য-

কুলোদ্ভব, নির্মলকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা

ব্যক্তি স্মরণগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের

অধিনীকুমারের তায় গাধিপূরাধিপতির

বৈদ্য ছিলেন। (৫, ৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে

সমস্ত ভিষগুণের পূজ্য দামোদব স্মরণ

গ্রহণ করেন। ইহার মানসিক শক্তি সমু-

দ্রুত বহুবিধ স্নান রূপ অনলে বাদীরূপ

সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ

ভরু শাস্ত্রে জিনয়ন অর্থাৎ শিবত্বা ছি-

লেন। [৭] ইহার পুত্রের নাম বাচস্পতি।

বাচস্পতি অতি জী বিলাসী ছিলেন এবং

বৈদ্য বিদ্যারূপ পঞ্চকুলের দিবাকর ছি-

লেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ

কুমুদেব চন্দ্রবরূপ হইয়া ক্রক উৎপন্ন

হন। [৮] ইহার ভ্রাতৃপুত্র-কেশব। কেশ-

বও বৈদ্যক শাস্ত্রের পারদৃষ্টা ছিলেন।

অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা বিষয়ে

সুচতুর ছিলেন। [৯] তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র

শ্রীত্রক। ইনিও সর্বাণ্ডগসম্পন্ন। [১০]

এই শ্রীত্রকের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি

চন্দ্রের ভায় নির্মল কীর্তিলাত করেন এবং

ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ। বাক্যরূপ অপার

সমুদ্রেব পাবগমনকাবী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্ম-

বনের সূর্য্য হইয়া স্মরণগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। [১১] ইনি সাহসার চবিত প্র-

ভূতি মহা প্রবন্ধ নির্মাণে নিপুণতা প্রকাশ

কবিষা, গুণ গৌববে শ্রী সম্পন্ন, বৈদ্যক

শাস্ত্ররূপ পদ্মেব সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধ,

কবি, এবং কবিত্বরূপ বৈবব বনের চন্দ্র-

বরূপ বলিয়া প্রাথিত। [১২] এতাদৃশ

মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের

হৃদয়ে আকর পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য শ্রী

পুরুষোত্তমের কৌশল ধারণের শোভা-

লাভ করুক। [১৩] [১৪] কলিগতি ক-

র্তৃক উদীবিত শব্দকোষ সমুদ্র আলোড়ন

কবিত্তে করিতে যাহারা লালসিত হইয়া-

ছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই

স্বর্ণ স্মরণকুল্য বিষপ্রকাশ সম্বাদৃত

হইবে? [১৫]।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ কলিগতি, কাত্যায়ন,

সাহসার, * বাচস্পতি, ব্যাভি, বিশ্বরূপ,

* সাহসার কৃত শব্দ গ্রন্থ বাহা আছে

তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু

শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে

অমর, মঙ্গল, শুভাক, বোপালিত, ভাণ্ডারী, এবং আদি প্রভৃতির কি কাকন শৈলের সেবায় পরাধু্য হইবে? দেবতারা কি এই কাকন শৈলের (স্বমেয়র) সেবা করেননা? —ইত্যাদি ইত্যাদি—(১৬) [১৭] [১৮]

আদিপুরুষ

হরিচন্দ্র

ত্রিভুজ

দামোদর

বাচস্পতি

কৃষ্ণ

(অনিদিষ্ট নামা)

শ্রীভক্ত

কেশব

মহেশ্বর

অপিচ, রায় মুকুট মণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচক্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহারা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাপি মেদিনী—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষক রত্ন

মালক ।

অপি বহু দোষ বিশ্বপ্রকাশ কোষক

সুবিচার্য্য । ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ পুরি বিশ্বকোষের

“ইতি সাহসাহ দেবঃ” এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন । এবং “দেবঃ” এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাহ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন ।

প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন । রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরচাৰ্য্যের পরে বর্তমান ছিলেন । এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক । মহেশ্বরের সাহসাহ চরিত রচনাব পরে নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাহ চরিত রচনা করেন ।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে রাজশেখরের প্রবন্ধ চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষ দেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ ছিলেন । এই প্রমাণ বিষংশাদীল বলাব মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করি তেছি । পুনরায় রাজ শেখর হবিহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হবিহার শ্রীহর্ষ বংশধর । তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধ চবিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে গুজবাটে লইয়া গিয়া চোলকাব বাণা বিবাহ বলের মন্ত্রী বস্তপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীহর্ষের সাহসাহ চবিতের পূর্বে “নব” শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তিনি নতুন রাজা সাহসা দেব চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক নৃপতির চবিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নব সাহসাহ চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাহ চরিতে চম্পু-

কৃতোয়ং মহীকাব্যে

তস্য কৃতৌ ননীয় চবিতে

সগোনির্গোজ্জ্বলঃ ।

ইহাতে টাকাকার লায়ন এই ব্যাখ্যা
করিয়াছেন—

নবো যঃ সাহসাক নাম রাজা তন্ত চরিত্তে
বিবরে চম্পুঃ
গদ্য পদ্য ময়ীং কথং করোতীতিকৃৎ তন্ত
বিনির্মিত
বতঃ সোপি গ্রহো তেন কৃত ইতিহ্যতে।
অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাক বাজার চরিত্র
লইবা চম্পু অর্থাৎ গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ

রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণনাক
মহাকাব্যের ষাটশ সর্গ ভৎকর্তৃক সমাপ্ত
হইল। নলচরিত বর্ণনাক মহাকাব্যের
রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের মতনা করি-
লেন যে, নবসাহসাক চরিত্র গ্রন্থও তাহা
কর্তৃক নির্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হই
বেক, নূতন সাহসাক নৃপতির চরিত্র
বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম নব
সাহসাক চরিত্র রাখিয়াছেন।

শ্রীরামদাস সেন।

ক্রিও পেট।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

“এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি—
মদ্যলসে! প্লথ দেহ, নিশি জাগরণে
অবশ পড়িবা আছি কোমল ‘ছোঁকায়া।’
কখন পড়িতে ছিহু; কত অন্য মনে
গাইতেছিলাম ধীত গুণ গুণ স্বরে,—
প্রেম ময়,—নব রাগে, নব অহুবাগে,
নিবন্ধি অসাবধানে শাসিত শবীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ-আরসীতে।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, বালা চারমিয়ন!
মধুরে বাজিতেছিল আনন্দ সঙ্গীত;
আবার অজ্ঞাতে সখি! না জানি কেমনে
বিবাদ ভাঙিতেছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিহু,—না জানি কারণ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।

একটি মানব ছায়া, এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি! কক্ষ গালিচায়;
পলকে ফিবাতে নেত্র, দেখিলাম কক্ষে
প্রাণেশ আমার। কিন্তু সেই মূর্তি!—যেই
মূর্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাসিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল কবিত অধীর;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—‘কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ(১) চাক কবিনী আমার?’
সেই মূর্তি—আজি দেখি গাঙ্গীর্ষ্য আঁধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—‘ক্রিও পেট।! এই
দুঃসময় বোঝিতেছে জলধর রূপে,
চাঁরদিকে এটনির অদৃষ্ট আকাশ;
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,

(১) নীলজ—নীলনদী জাত।

হইবে অসাধ্য পরে। রোম হতে আজি
কুসম্বাদ;—আন্তবিক বিগ্রহ ক্রপাণে
‘ইতালি’ কণ্টকাকীর্ণ! ক্রপাণ ফলকে
প্রতিবিম্ব রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস জীবন।
প্রেরসি! বিদায় তবে-কিছু দিন তরে
দেও যাই; কটাক্ষে সে ক্রপাণ সকল
ছিন্ন শস্য রাশি মত, আসি শোয়াইয়া
আমি ডুবাইয়া নৈজ নিমিষে, পম্পির
জল যুদ্ধ সাধ, সেই সমুদ্রের জলে,—
পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্রেরে।
দেও অহুমতি তবে। দ্বৈধার অনল
জলে থাকে যদি তব রমণী হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে ফুলভিয়া আমা—’

মবেছে!—

‘ফুলভিয়া।’

কি মরেছে ফুলভিয়া! “হাঁ মরেছে ফুলভিয়া।”
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ তুঙ্গ
যেই পলে, সেই পলে, ‘মরেছে ফুলভিয়া—’
এ সংবাদে, চারমিয়ন! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তা হার নাথ! গরাইয়া গলে,
বলিলেন,—‘এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!
ইতালির রণজয় করিতে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার
কল্যাণি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেরসি! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;

বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা,—’

“ধরিয়া গলায়,

উন্মত্তার প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—‘নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্য ধন, মুহূর্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিছা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্রিও পেট।। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ! তোমার
প্রণয় রাজ্যের রাণী যেই স্নভাগিনী।’
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল;—
রণে মত্ত কেশরীরে, কেমনে সজনি!
রমণী বীতংসে বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুষন
বিছাতের মত,—সখি! নাহি জানি আর।”

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখি—
(হায়! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত)—আরস্তিল,—“পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দোখিলাম
চাহি আকাশের পানে—রবি, শশী, তারা;
ধরাতল মরুভূমি; নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দবহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল সজনি!
দেখিলাম কি আকাশ, কিবা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ! শুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিছা ভাবিতে,—এণ্টনি! ক্রিও পেট! কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে—এণ্টনি কেবল?
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—

সকলি—এটনি! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আক্ষিকার মরুভূমি, ঐতোক বালুকা
কণা—একটি এটনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গনিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভূজঙ্গ সম কাল বিষধর
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হতো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমারে যেন অনন্ত কণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এটনি,
রণবেশে! রবি অন্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেল রোমে।
হাসিমুখে শশধর ভাসিতে গগনে
ভাবিতাম আসিতেছে এটনি আবার,
প্রণয় পীয়নে হায়! যুড়াতে আমার।
অন্ত টুগলে নিশানাথ, প্রাণনাথ গেল
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।”

“এইরূপে সখি!

গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিম্বা দিন, মাস,
নাহি জানি। একদিন তাপিত হৃদয়
যুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল কোচ অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত মুখে, নব পরিণয়
এটনির নারী-রত্ন অগস্ত্য(১) সনে
শুনিয়াছিলাম;—তরুজট হায়! যেই
বিশুক বল্লরী, কেন, রে দারুণ বিধি!
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে!
শুয়েছি; উপরে নীল চিজিত আকাশ
প্রসারিত,—নাঙ্কজিক চাকু রক্তভূমি!

(১) অগস্ত্য—এটনির বিচার পত্নী।

মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন চলিয়া চলিয়া
করিতেছে অভিমর। নক্ষত্র সকল
নীরবে, অচলভাৰে করিছে দর্শন
সেই স্তম্ভীতল রূপ। কেহ বা আননে
জলিতেছে; অভিমানে নিবিত্তেছে কেহ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূতবৃন্দ উন্নতের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেইরূপ; উৎখলিছে সিদ্ধ;
রূপ মুগ্ধ—অধিক কি ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের! সময়ের তামস গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অন্ধে অন্ধে দেখিলাম
বিগত জীবন। কত ভাবিতাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরশ্রেষ্ঠ সকল,
নক্ষত্র মানব চয়; আমি শশধর,—
সিদ্ধ বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিতাম আমি চন্দ্র, ধরণী এটনি।
ভাবিতেছিলাম পুন, এই চন্দ্রালোকে
নব-প্রণয়িনী পাশে, নব অহুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলেছে কি ক্লিওপেট্রা? ভাবিছে কি মনে—
“কোথায় নীলজ চাকু ফণিনী আমার?
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ? কিম্বা অগস্ত্য
নবীন প্রণয় রাজ্যে এবে এটনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয়?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্জাসিত?—
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চারমিয়ন!
জলিয়া উঠিল তীব্র দীর্ঘার অনল
রমণী হৃদয়ে, যেন বিশুক কাননে

অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
 বমনীর অভিযানে রমণীকদম্ব
 ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
 যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
 ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
 আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তিচয়
 হলো ষড়্জ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে!
 হৃৎপুং ভূজঙ্গ যেন, ছুট প্রহারীকে,
 বিস্তারিয়া কণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে।
 ‘কি! মিশরের ঈশ্বরী!—টলেমি হুহিতা!
 ক্লিওপেটু! আমি!—কপ বিশ্ববিমোহিনী!
 যে রূপের তেজে সেই ভুবন বিজয়ী
 সিজাবের তরবারি পড়িল খসিয়া!
 সামান্য গুঞ্জিকা তরে, সেরূপ রতন
 এটনি ঠেলিল পায়ে!—তীরের মতন
 বসিহু শয্যায়; কিন্তু দুর্বল শবীর
 দুক্লহ যন্ত্রণা, চিন্তা, সহিতে না পারি,
 ভূজঙ্গ দংশিত যেন পড়িল ঢলিয়া
 শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
 বহিল শীতল নীল-নীরজ অনিল;
 কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
 অর্ধ নিদ্রা, অর্ধ মুচ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।”

“দেখিহু স্বপন! সখি! কি যে দেখিলাম
 এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
 দেখিহু শাফুল এক—ভীষণ আকৃতি!
 নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
 বিস্তারিয়া মুখ। জাহি জাহি বলি আমি
 চাহিহু আকাশ পানে। দেখিলাম সখি!
 অপূর্ণ তপন এবে উদ্ভিত গগনে
 উজ্জলিয়া দশ দিক্ করে আকর্ষিয়া
 সেই মার্ত্তও আমারে তুলিল আকাশে;

সখি! আমি-শোভিলাম শশধর রূপে
 বামে সবিতার। হায়! এমন সময়ে
 অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
 হইয়া আশ্রয় হীনা আমি অভাগিনী
 পড়িতেছিলাম বেগে, অর্ধ পথে সখি!
 বীর-হৃদ্য অন্য জন হৃদয় পাতিয়া
 লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া
 পরাইহু প্রেম হার গলাঙ্গ তাহার,
 কিন্তু কি কুক্ষেণে হায়! বলিতে না পারি!
 সে হার পরশে বীর হৃদয় তাহার,
 —ফাটিত যে উরজ্ঞাণ রণ রঙ্গে মাতি,—
 হইল বিলাসে যেন নারী স্ককুমার!
 শারসন হতে অসি পড়িল খসিয়া,
 —অরাতি মন্তকে ভিন্ন নামে নাহি যাহা,—
 কুহুম শয্যায়! শেষে মাথার মুকুট
 পড়িল খসিয়া ওই ভূমধ্য সাগরে,
 অন্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
 যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কুপাণ
 গিয়াছে ভাসিয়া যেন প্রচণ্ড শিলায়
 ক্ষটকের দণ্ড, কিম্বা মত্ত গজ দন্ত
 হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্কত প্রান্তরে;
 মম প্রেম হার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
 সেই বক্ষে প্রিয় সখি! পশিল আমূল!
 তখন সে হার ধরি ভূজঙ্গের বেশ
 ছুটিল পশ্চাতে মম। সন্তয়ে তখন
 ডাকিতেছি—‘কোথা নাথ! এমন সময়ে,
 কোথা নাথ!—’

‘প্রিয়ে! এই চরণে তোমার।—’
 যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল প্রবণে,
 সে সঙ্গীত ক্লিওপেটু! শুনিবে না আর।
 ভাঙ্গিল স্বপন সখি, ছুটিল চূষন

বিশুদ্ধ অধরে মম; মেলিয়া নয়ন
 দেখিলাম প্রাণনাথ! হৃদয়ে আমার!
 অভিমানে বলিলাম—‘সে কি নাথ! ছাড়ি
 রোম রাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
 এখানে আপনি পুঁকিষা এ আপনি নন;
 এই ছায়া আপনার, আসিয়াছে বৃষ্টি
 বিরহ আতপ তাপে যুড়াতে আমার।—’
 ‘নিমজ্জিত হৃৎ রোম টাইবেরের জলে,
 বাজা; প্রণয়িনী সহ, এই রাজ্য মম,—’
 (বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার,)
 ‘প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা—ইহ জীবনের
 স্তব এই,—’ পুনঃ নাথ চুঁষিলা অধর;
 ‘জীবন তোমার প্রেম, বিরহ মরণ।’”
 “দূরে গেল অভিমান; রমণীর প্রেম
 স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
 বলিলাম—‘সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
 তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
 এই ক্ষুদ্র-রাজ্য তব? অনন্ত জলধি
 জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
 ক্ষুদ্র সরসীর নীবে মিটিবে কেমনে
 ক্রীড়া সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?
 প্রণয় বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
 রাখ সমিলা এই সরসী তোমার,
 যোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাদিনী।’”
 “মৈশরী হৃদয়াকাশে প্রণয়ের সখি
 প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
 ছুটিল বিগুণ বেগে আমোদ জোরার।
 কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
 ক্লিওপেট্রা পদতলে বলিব কেমনে।
 সমস্ত পূর্বব রাজ্য মিলি এক তানে,
 ‘পূর্বব রাজ্যের রাণী, মিশর দৈতরী!—’

গাইল আনন্দ হবে। হায়! সেই ধনি
 জাগাইল স্তম্ভ সিংহ—কনিষ্ঠ সিদ্ধার—(১)
 কুক্ষণে; কুগ্রহ সখি হইল তখন
 ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
 শুনিহু গর্জন তার সহস্র কামানে,
 মিশরে বসিয়া সখি, ছুটিল হর্যাক
 অসংখ্য অর্ণব পোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
 শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য সাগর,
 মহোদরা অপমান প্রতি বিধানিতে।(২)
 নির্ভর হৃদয়ে সখি! সাজিল এণ্টনি,
 হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
 বলিলা আমারে নাথ! হাসিয়া হাসিয়া
 ‘মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখ মুহূর্ত্তেকে
 বালকের ক্রীড়া সাধ আসি মিটাইয়া।’
 ধৈর্য্য না মানিল মনে; তাবিলাম যদি
 পাণ্ডিত্য সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
 লয়ে যার এ কোশলে। বলিলাম—‘নাথ!
 বহু দিন সাধ মম করিতে দর্শন
 অর্ণব আহব, প্রভু পূবাও সে সাধ;
 তুমি যদি না পূরাবে, কে পূরাবে আর
 বীরেন্দ্র!—’ হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
 ‘সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
 মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথী এণ্টনি!’
 আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
 আমাকে, সজনি! স্তব্ধে সাজাইতে হাদ!
 কত যে কি স্তব নাথ দেখিলা নয়নে,
 চুঁষিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
 বলিব কেমনে? অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিয়া

(১) কনিষ্ঠসিদ্ধার—Augustus Caesar.

(২) অগস্তা—অগস্তস সিদ্ধারের কনিষ্ঠা ছিলেন।

স্টুট নলিনীর, অলিও কি সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে ? আমি আপনি সজনি !
বীববেশে প্রেমাবেশে হইলু বিতোর।
ফুরাইলে বেশ, নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া কবে চাকু কুসুমের হাব,
বলিলো—“কিকাজ প্রিবে ! অন্তরে তোমাব,
বিনা রণে, এই অস্ত্রে, জিনিবে সংসার।”

“অসংখ্য অর্ণব যান, সৈন্য অস্ত্র ভবে
প্রায় নিমজ্জিত কাণ, বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী কবি দেব প্রভঞ্নে দর্পে,
বিক্রমে ফেণিয়া সিকু, চলিল সাঁতাবি
যেন প্রমত্ত বাবণ। চলিলাম আমি
নির্ভবে, কেশবী যেই হরিণীরে সখি !
দিয়াছে অভয়, তাব কি ভয় ভগতে ?
বীব প্রণয়িনী আমি, বীবেব সঙ্গিনী,
উবিব কাছাবে ? কিন্তু অবলা মনের
না জানি কি গতি ; যত আশ্বাসিবা মন
কবি ভাসমান, তত ভাবি আশঙ্কায়
হইতেছে ভাবি। তত কাল রঙ্গে, মম
চকিত করনা হায় ! অজ্ঞাতে কেমনে
চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ। যদিও না জানি,—
পর চিত্ত অন্ধকার !—বুঝিহু তথাপি
ভাবি অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এগটমিব। লুকাইতে সে করাল ছায়া
বমণীর কাছে, নাথ ! হয়েছে মগন
সঙ্গীতে, সুরায়,—”

“দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন,
সর্কনাশ !—এ কি দেখি সমুখে আমার !
অসীম বারিদ পুঞ্জ, ভীম কলেবর !—
পড়েছে খসিয়া ও কি জলধি হৃদয়ে ?
খেলিছে বিদ্যা ও কি জীমূত বর্ষণে ?

ও কি শব্দ ভয়ঙ্কর ?—জীমূত গর্জন ?
সকলই ভ্রম !—সখি ! গুকাটল মুখ,
বিপক্ষ তবণী ব্যূহ সজ্জিত সমরে !
বিদ্যাৎ,—কামান অগ্নি ; দুর্জয় কামান
মুহমূহ মেঘমস্ত্রে গজ্জিছে ভীষণ !
যেই দৃশ্য—নেত্রে কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর !—
দেখিলাম চাবয়িন ! বলিব কেমনে
কামিনী কোমল কণ্ঠে ? শুনিবে তোমরা
নাবী কোমল হৃদয়ে ? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্নে প্রাবৃট্ অস্ত্রোদ
আঘাতে পবম্পবে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল ; বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তবী ব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূমপুঞ্জ চাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশ দিশ ; কিন্তু না পারিল
সংহারক বণমূর্তি লুকাতে আঁধাবে।
সেই অন্ধকাবে সখি অস্ত্র নিশাইয়া
তবী উপবে তবী ঝাঁপ দিল বোম্বে।
গাজ্জল কামান,—ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেণিল সাগবে, তবী বৃন্দ নিদারিষা
নিমজ্জিগা জলে, নর বক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায় ! সখি ! তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি,—সেই ভীষণ নির্ঘাত,
ভীত্র অনল বর্ষণ, না পাবি সহিতে,
করিতেছে ছটফট উত্তাল তরঙ্গে,
ফেণিয়া ফেণিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কুলেব উপরে।
তরণীব প্রতিঘাত কামান গর্জন,
দহমান তরণীব, অনল হুকাব,
বন্দকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্রবনংকাব,
জ্যেতার বিকর ধ্বনি, মৃতের চীৎকার,

ভীষণ তবঙ্গ ভঙ্গ, সিদ্ধ আফালন
ভয়ঙ্কর। নিবধিয়া উড়িল পরাণ।
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল :
বলিলাম কর্ণধারে—‘ফিরাও তবণী,
বাঁচাও পরাণ।’ আজ্ঞামাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী ক্ষেপণে, বেগে চলিল তবণী
মিশর উদ্দেশে হাথ! মন্দুবাব মুখে
ছুটিল তুবঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে অঁখি দেখিতে পশ্চাতে
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমাব।
না দেখি তবণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এঁটনি!
আকাশ ভাঙ্গিয়া হাথ! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দর্শন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার; হাথ! কেন আসিলাম,
আনি কেন মজিলাম! নাহি ভুবিলাম
কেন জলধিব তলে? নাহি মধিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে?
কেন আসিলাম আমি।—কেন মজিলাম!”

“অনাহাবে, অনিদ্ৰায়, মুমূর্ষুব মত,
অবতীর্ণ হইলাম মিশরের তীরে
বহু দিনে। এই রণে গিয়াছিহু সখি!
এঁটনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রানী;
আসিলাম তিখাধিনী ডুবায় এঁটনি।
চলিলাম গৃহ মুখে, বিসর্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবি রোম সিংহাসন,
এঁটনির প্রেম,—হাথ! মৈশরী জীবন,—
ভূমধ্য সাগরে;—এই জীবনের মত
বিসর্জিয়া যত আশা ব্যোম নিকেতন।

চলিলাম গৃহে;—কোন মতে, কোন পথে
নাহি ছিল জ্ঞান। নিম্ন উড়'ইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকাব! নাহি সে মিশর
রাজ্য নাহি রাজধানী, দেখিহু কেবল
অন্ধ কার!—মক্‌ভূমি! সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকাবে, সেই মক্‌ভূমি মাঝে
দেগিহু কেবল—মম সমাধি ভবন!
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি।
বলিলাম—তোমাথে কি?—না হয় স্ববর্ণ,
চাবমিষন!—বলিলাম—আসিলে এঁটনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যাজিল জীবন,—
বলিও প্রাণেশে মম, বলিও তাঁহাবে,—
‘মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এঁটনি!’
সমাধির দ্বারে সখি! পড়িল অর্গল।”

“আসিল এঁটনি: সখি! নাথের সে মূর্তি
স্ববিলে এখনো মম বিদবে হৃদয়!
প্রসাবিত নেত্রদ্বয়—উন্মত্ত, উজ্জল!
প্রশস্ত ললাট—যেন ধবল প্রস্তব,—
নাহি বস্তু চিহ্ন মাত্র। বিঘাল লিখেছে
রেখা কপোলে, কপোলে, উপহাসি যেন
বর্ধকো! চিত্রেছে শুক্রে মস্তক সুন্দর!
এত কপান্তর সখি। এই কয় দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর!
গুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,—
‘অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যাজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এঁটনি।’
‘ক্ষমিলাম’—বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
হুই হাতে, প্রবেশিল রাজ হস্তোৎসবে,—
বিদ্যাতের গতি! হেম কালে চারিদিকে

উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্রাবিল মিশর! ত্রস্তে বাতায়ন পথে
দেখিলাম—নহে সিঁদু—সৈন্য সিজারের,
লুণ্ঠিতেছে হতভাগ্য—নগর আমার।
অপূর্ব সিজার গতি! চকুর নিমিষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী,—সমাধি আমার;
পড়িহু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিনী!
কিন্তু ও কি, সহচরী! সমাধি তলে!
ওই শয্যাব উপবে! মুমূর্ষু এন্টনি!!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যাব উপবে,
তুমি ধবিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে;—হায়! সমাধি উপবে!
এই ছিল লেখা সখি কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণ নাথ বলিলা ভাষাবে
সেই স্বর, প্রিয় সখি! অক্ষুট দুর্জল!—
‘মৈশবি! ভবেব নীলা ফুবাইল আজি
এন্টনিব; পৃথিবীতে, প্রেরণি। আমার
আব নাহি প্রয়োজন! ফুবাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অঙ্গলিখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার,—নহে শত্রুদন্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এন্টনি বিজয়ী,—বিনা ক্লিওপেট্রা! আজি
এন্টনির করে প্রিয়ে! আহত এন্টনি।
আসিয়াছি,—শেষ স্রবা পাত্র কবি পান
তব সনে, প্রেরণিনি!—লইতে বিদায়;
দেও, প্রিয়তম! যাই—বিদায় চূষন।”

“স্বরা করিলাম পান, চূষিহু চূষন।
তনিহু অক্ষুট স্বরে, জন্মের মতন—
‘ক্লিওপেট্রা!—প্রাণ—রি—নি!——’”

“‘প্রাণনাথ! আমি

ক্লিওপেট্রা! অভাগিনী!’—বলি উঠে:—স্বরে;
অঁটিয়া হৃদয়ে সখি! ধরিহু হৃদয়ে
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল নয়ন—
জ্যোতিতে বাহার রোম আছিল উজ্জল,
অসংখ্য সমর ক্ষেত্রে, কিরণ বাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন তপন;
খেলিত বিছাৎ মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে;—নিবিল ক্রমণ:
মানব গৌরব রবি হলো অন্তমিত।
‘প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এন্টনি আমার।’
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী প্রায়;
‘প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এন্টনি আমার।’
তুলিলাম উত্তবিল, সমাধি ভবন।
প্রাণে—স্বর!—প্রাণ!———”

আহা! সহিল না আব;
অবশ মস্তক ভার গ্রীবা ছুঁখিনীর
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে;—
ব্যাধ শবে বিদ্ধ যেন বন কপোতিনী!

অতি ত্রস্তে সখীদয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় গ্নেত প্রস্তর পুতুলী,
উরবাস, কটবন্ধ, কবিয়া মোচন,
নীতল তুষার বাবি, উরসে, বদনে,
ববরিগ, কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী! তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদয় হুঃখে বসিয়া নিকটে
কাদিতেছে ভগ্নী-শোকে, হৃদয় বিকল।
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টি-বদ্ধ করদয়,—বিস্তৃত নয়ন,—
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ! চাহি শূন্য পানে
উন্মত্ত, বিকৃত কণ্ঠে, বলিতে লাগিল।
“পরিণয়!—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়

যদি না থাকে প্রণয়। প্রণয় বিহনে
পরিণয়।—পরিমল হীন পুষ্প! নগি
হীন ফণী—আজীবন অনন্ত দংশক।
মধুহীন মধু চক্র!—মক্ষিকাপূরিত।
হেন পবিণয় বলে, ওই দেখ সখি
এটনিব পাশে বসি, অগস্তা, সিল্ভিয়া,
আমাব কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা—ক্রিওপেটু। প্রণয়ের তবে
বিসজ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিহু যাবে,
কুল তুচ্ছ—প্রাণ দিয়া—তোবা অভাগিনী
না পাইয়া তাবে, আজি তোবা গববিণী,
পোড়া পবিণয় বলে। পবিণয় বলে
জীব লোকে তোবা নাহি পাইলি যাহাবে,
দেখিব অমর লোকে, পবিণয় বলে
তাবে বাখিবি কেমনে।” উন্মাদিনী হান।
ছুটিল তাড়িত বেগে, সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে বাখিতে ধরিশা
প্রবেশিয়া কক্ষান্তবে, দ্রুত হস্তে বামা,
একটা স্বর্ণ কোটা খুলিল যেমতি,

ক্ষুদ্র বিষ্ণুর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে,—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুষন!
সখীদ্বয় উচ্চৈঃস্ববে কবিল চীৎকার,
ভূতলে চলিয়া আহা! পড়িল মৈশবী।
“এই বেশে চাবমিয়ন! ভেটিয়া ছিলাম
নাথৈ চিনমনস ভীবে, এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণ নাথ ভেটিতে আবার—”
বলিতে বলিতে বিষে, কালিয়া সঞ্চাব,
কবিল অতুল রূপে, যেইরূপে হাব।
সমস্ত বোমান রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত, সেনৈরূপে জলে, স্থলে,
হলো প্রজলিত কত সময় অনল,
কতই বিপ্লবে বোম চলো বিপ্লাবিত,
নিবিল সে রূপ আজি,—মবিল মৈশবী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন বতন,
অপূর্ণ বয়সী কীর্তি—রূপে, শুণে, দোয়ে।
বাপি ভ্রমণে হাব। বাখি প্রতিবিষ
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।



শৈশব সহচরী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্বাখ্যান।

বহুকাল পূর্বে স্বর্ণপুরে রামভদ্র বন্দো-
পাধ্যায় নামে এক জন অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণ
বাস করিতেন। ধনীদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ
পাইয়া রামভদ্র আপনাব উদর পূরণ
করিতেন। তাঁহার পবিবাবের মধ্যে এক

মাত্র নবমবর্ষীয়া ভগিনী ছিল। তাঁহার
ভগিনী চন্দ্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল।
পূর্বাঞ্চলের কোন অশীতিবর্ষব্যয় ধনাঢ্য
ভূস্বামী তাঁহার পাণিগ্রহণ কবাত্তে কিঞ্চিৎ
পরিমাণে রামভদ্রের দ্বিজতা ঘৃণিল।
প্রাচীন ভূস্বামী কিঞ্চিৎকাল পরে মানব-
লীলা সম্বরণ কবিলেন। চন্দ্রাবলীর সম্ভান
হইল না দেখিয়া তিনি আপন মৃত্যু

কিছুকাল পূর্বে চন্দ্রাবলীর ইচ্ছামুসাবে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যবাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বামীৰ মৃত্যু হইলে চন্দ্রাবলী আপন ভ্রাতা রামভদ্রকে তাঁহার আলয়ে বাস করাইলেন এবং তিনিও কিছুদিন পরে বামভদ্রকে স্বামীর চিরসঙ্কীর্ণ ধনবাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ কবিলেন। বামভদ্র, ভগিনীৰ বিয়োগেব দুঃখেই হউক, আব “যংলাবতি স জীবতি” ভাবিবাই হউক, তৎক্ষণাৎ ভগিনীপতিৰ বাটী পরিভাগ কবিয়া ভাগীবথীতীবে, নিজ গ্রামে আসিয়া বাস কবিলেন। সম্ভবাতিবিক্ত ব্যার ভষণ কবিলে পাছে বিপদগ্রস্ত হবেন, এই আশঙ্কায় বামভদ্র অপর্গ্যাপ্ত ধনেব অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন কবিতেন। তাঁহার পরলোক গমন হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাকান্ত ও লক্ষীকান্ত তাদৃশ সাবধানেব আবশ্যকতা বিবেচনা কবিলেন না; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় কবিলেন এবং আপনাদিগের আবাস জন্য পৃথক্ অতিবৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কবাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া মানবলীলা সম্বরণ কবিলেন।

এই প্রকাৰে লক্ষীকান্ত বন্দোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দোপাধ্যায় দুই পৃথক্ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেব পরে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই সহোদরেব বংশ উহা অবিবাদে ভোগদপূর্ণ করিয়াছিল। তৎ-

পরে যখন রমাকান্ত এবং তারাকান্ত বন্দোপাধ্যায় এই দুই জমিদারীর অধিপতি হইলেন, তখন এই বহুকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—

রমাকান্ত কিছু সাবধান-বারী হওবাতৈ তাবাকান্ত অপেক্ষা অধিক ধনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি যখন তবক স্বর্ণপূর নীলামেব ইস্তাফাব হইল, তখন তাবাকান্তেব নিতান্ত ইচ্ছা উহা ক্রয় কবিয়া বাস ভূমিৰ অধিপতি হইলেন। কিন্তু নিজেব তত সঙ্গতি না থাকাতৈ রমাকান্তেব নিকট একপানি ভালুক বন্ধক বাখিয়া খত লিপিবা দিয়া টাকা কর্জ কবিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় কবিলেন। কালে এই খতই দুই বংশেব মধ্যে অনর্থেবমূল হইল।

এপর্য্যন্ত দুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি ভিন্ন কাবণে অপ্রীতি ঘটিল। একদিবস রমাকান্তেব একজন চাকরাণী খিডকীর পুঙ্খবিগীতে বাসন মাজিতে গিয়া তাবাকান্তেব একজন থানপবিচারিকার পরিষাব গাত্রে অসাবধানে জল দিয়াছিল। থানস পনিটারিকাব উহাতে অপমান বোধ হওবাতৈ তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমুল বাগ্‌বুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধ দুই বাড়ীব দুই গৃহিণী পর্য্যন্ত পৌছিল; স্মতবাং সেই সূত্রে রমাকান্ত ও তাবাকান্তেব বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

প্রথমে গালিগালাজ পবে আলাপ ও নিমদণ বন্ধ। তৎপবে ছোটো মোকদ্দমা, প্রজা ধরিয়া টানা টানি, শেষ লাঠালাঠিৰ

উপক্রম। শেষে তারাকান্ত জেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন, যে আমি রমাকান্তের ঋণ টাকা দিয়া পরিশোধ করিয়াছি। রমাকান্ত বন্ধক সম্পত্তিতে দখল দেয় না, অতএব দখল পাওয়ার প্রার্থনা। দাবির প্রমাণ স্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল করিলেন। রমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জাল। মোকদ্দমা ক্রমে ক্রমে প্রিবিকৌন্সেল পর্যন্ত গিয়াছিল। তিন আদালতে রমাকান্ত অস্বীকার করিলেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইলেন। তারাকান্ত ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া একে একে সকল বিষয় খোয়াইলেন, শেষে অর্থহীন ও হতসর্বস্ব হইয়া মনোহুঃখে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীকান্ত অতি কিশোর বয়সে রামহরি মুখের ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন; কনিষ্ঠ রতিকান্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তারাকান্ত বন্ধ্যোপাধায়ের চরমকালে বদ্ধ এবং সেবার্থ ক্ষোভ ছিল না; তাঁহার পুত্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর পতন করিয়াও ঋণের শাস্তি করিতেন। তারাকান্ত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে গঙ্গাভাঙ করিলেন।

পিতার মৃত্যুসংবাদ শাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন; পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি

সমাপনান্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে ঋণের বাড়ী কাহাকে বাপের বাড়ী কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার অতি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে রমাকান্ত, তারাকান্তের সমুদায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল জমীদার হইলেন এবং কিছু দিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্তের বিবাহ দিলেন; বিবাহ রাত্রি হইতে রজনী নিরুদ্ধ হওয়াতে রমাকান্ত পুত্রের বিরহে বোগগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

যাহা সচরাচর ঘটে না।

রমাকান্তের শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত, তাঁহার কন্যারা মহাসমারোহপূর্বক আয়োজন করিয়াছেন, এক জন জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করিবে, সভা সন্মজিত হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বসিয়াছেন, শ্রাদ্ধকারীর আসন প্রস্তুত। পুরোহিত পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত মার্জনা করিতে করিতে আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, জ্ঞাতি

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত আসন গ্রহণ করিতেছেন। আক্লাদে আত্মীয়েরা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন; রজনীকান্ত রীতিমত শ্রদ্ধাদি করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পরিবাসস্থ সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করিলেন। সকলে সমবেত হইলে বলিলেন, “তোমরা সকলেই জান যে, এই বিষয় আমাদের পূর্বপুরুষ কৃত। পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই।” রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখো বলিলেন, “তাহার উইল কবিস্বাং আবশ্যক কি? তিনি সকলকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকলের পক্ষে উইল। তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হইয়াছে।”

রজনীকান্ত বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কথা অমৃততুল্য; এক্ষণে শ্রবণ করুন। পিতা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি তাহার উপদেশ ছিল, যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার আশ্রিত অহুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার ইচ্ছানুসারে তাহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব।”

দেবনাথ মুখো বলিলেন, “দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন।”

রজনী বলিলেন, “দেবতারা কখন কখন অনাবৃষ্টিও ঘটাইয়া থাকেন। এক্ষণে আপনারা সকলে জানেন আমি কিছু কৃপণ।”

দেবনাথ মুখো বলিলেন, “স্বর্গদেব অন্ধকারের কর্তা।”

এবার রজনী উত্তর না করিয়া কহিলেন, “আমি বৈজ্ঞানিকেরা বাহাকে যাহা দিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আমার স্বামীর ভগিনী শৈলবতী কোথায়?” একজন স্ত্রীলোক কহিল, “তিনি আমেরন নাই। কাদিতেছেন।”

রজনীকান্ত বলিলেন, “মেজদিদিকে পনের হাজার টাকা দিলাম। তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা কোথায়?” শৈলবালা প্রসন্নমুখে অগ্রবর্তিনী হইল। রজনী বলিলেন, “তোমাকে দশ হাজার টাকা দিলাম।”

শৈলবালার প্রফুল্ল মুখ স্নান হইল—বলিল, “কেন রজনী, মেজদিদিকে পনের হাজার, আমাকে দশ হাজার?”

রজনী কহিলেন, “মেজদিদি তোমা হইতে পাঁচবৎসরের বড় এই জন্য।”

শৈলবালা “আমি টাকা চাহি না” বলিয়া কাদিতে কাদিতে কক্ষের বাহিরে গেল।

রজনী অস্নান বদনে বলিলেন, “সেজদিদি টাকা লইলেন না—আমি তাহার টাকাও মেজদিদিকে দিলাম।” দেবনাথ মুখো বলিলেন, “তিনি রাগ করিয়া গিয়াছেন এখনি আবার আসিবেন। আপনার উপর রাগ করিবেন না ত কাহার উপর রাগ করিবেন।” সে কথা কবপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুম্ব, ভৃত্য প্রভৃতিকে পিতৃসঙ্কিতার্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশ-

য়ের কোন কথা উল্লেখ কবিলেন না।
দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন,

“তোমার জ্যোষ্ঠা ভগিনী স্বর্গে গিয়া-
ছেন তাঁহার অংশ আমি পাইতে পাবি।”

বজ্রনী বলিলেন, “আপনি যখন তাঁ-
হার কাছে যাইবেন তখন আপনার হস্তে
তাঁহার টাকা প্রেবণ কবিব।”

দেবনাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন,
“তবে জামাব নিজাংশ?”

বজ্রনী উত্তর কবিলেন, “আপনাকে
এক টাকা দিলাম।”

দেবনাথ প্রথমে মনে কবিলেন বহুশ্রু,
কিন্তু যখন বজ্রনী গাত্রোথান কবিয়া
চলিয়া যান তখন বুঝিলেন বহস্য নহে।
তখন বলিলেন, “এক টাকাই আমার
এক লক্ষ।”

দশম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচবাচর ঘটে।

বাত্রি ঘনাক্রম, অমাবস্তা। নিশীথ
কালে, সমীপে গভীর গর্জন কবিতোছে।
তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া স্রবণপুত্র গ্রামেব
প্রান্ত বাহিনী জাহ্নবী কল কল করিতেছে।
তটোপরি এক উচ্চ দেবমন্দির। গ্রামেব
প্রান্তভাগে বসতি নাই; কেবল সেই কল
কলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী, আর সেই
ভুঙ্গ শিখবশালী মন্দির। নিকটে নিবিড়
বন—কুর্জ এবং বৃহৎ তরু, লতা, কণ্টকা-
দিতে দূর্ভেদ্য বন। মন্দির ভগ্ন, প্রা-
চীন, জনসমাগমচিহ্নশূন্য। মন্দির মধ্যে

কবাল মূর্তি দেবী, কালী—সেই ভৌতিক
বাজ্যেব যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহস্তপরি-
মিতা, পাষাণময়ী, ভয়ঙ্করী মূর্তি, সেই
অন্ধকার স্থানে অন্ধকার কবিয়া, মহা-
কাল হৃদযোপরি বিবাজ কবিতোছেন।
দিবসে এক বৃদ্ধ বাবেক মাত্র আসিয়া
সামান্য প্রদাবে পূজা কবিয়া যাইত।
নাহ্নে কেহ তথা আসিত না। নিকটে
শ্মশান, তথায় শবদাহ হইত। গ্রামা-
লোকে দিবসেও সেখানে আসিতে গাহস
কবিত না।

সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে বাহ্নে কখন
গ্রামা লোক দূর হইতে আলো দেখিতে
পাইত। সেই আলোক দেবযোনি ক-
র্তৃক জালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগেব বি-
শ্বাস ছিল। কখন কখন তথা হইতে
শঙ্খধ্বনিও হইত।

অদ্য আনাবসার বাত্রি; এই গভীর
অন্ধকারনিশীথে একজন দুঃসাহসিক গ্রাম-
বাসী, সেই মন্দিরভিত্তি মুখে আসিতেছিল।
একবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে
ছিল, আবার পশ্চাৎপত্তী হইতে ছিল।
কখন চলিতে ছিল, কখন দাড়াইয়া দূর-
লক্ষ্য নভঃস্থ মন্দিরচূড়া নিবীক্ষণ কবিতো-
ছিল। এমনত সময়ে মন্দির মধ্যে আলো
জলিতেছে, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টিপথে
পতিত হইল। তখন আবও সন্ধিগতিতে
কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের স্তায় দাঁড়াইয়া বহিল।
সহসা গভীর শঙ্খনাড়ে সেই কানন
কম্পিত হইল। শুনিবামাত্র পথিক নিঃ-
সঙ্কোচিতচিত্তে মন্দিরভিত্তি মুখে চলিল।

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিল। দেখিল এক ব্রাহ্মণ রাশীকৃত জবাপুষ্প, বিলপত্র, রক্ত চন্দনাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। সন্ধ্যাঙ্ক ছাগযুগ, এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তে মন্দির প্রাণিত হইতেছে।

যতক্ষণ পূজা সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তুক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পূজা সমাপনান্তে পূজক জিজ্ঞাসা করিল, “এখনও ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ?”

আগন্তুক বলিল, “আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে।”

পূজক কহিল, “তবে দেবীর পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।”

তখন আগন্তুক কালী প্রতিমার চরণে হস্তার্ণ করিয়া বলিল, “মা জগদম্বে, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয়োর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়মনোবাক্যে তাহার শত্রু। য-হাতে তাহার সর্বস্বান্ত হয়, তাহা আমি করিব।”

পূজক তখন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, “আমার প্রতিজ্ঞা শুন। আমি জীবিত থাকিতে যে আমার পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবে, আমি তাহার চিরশত্রু। তাহার সর্বপ্রকার অমঙ্গল আমি কায়মনো-বাক্যে সাধিব। যদি তাহাতে অবতর করি তবে যেন হে জগদম্বে, আমি তোমার কোপে পতিত হই।”

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেই রতিকান্ত বাঁড়ুয়ো। পূর্বপরিচ্ছেদে তাহার নিকৃৎশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছিল, সে রজনীব ভগিনীপতি দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “রজনী এখন আমার সন্ধান করিতেছে কেন, কিছু জ্ঞান?”

দেবনাথ। কেহ কিছু বুঝিতে পারি-তেছে না।

বতি। দেখ, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেবনাথ। আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে অ-বিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জ্ঞানি না। তুমি মনে করিতেছ, যে একত্রে বাস করি, সর্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমাব জানিবার সম্ভা-বনা, কিন্তু তাহা নহে। রজনীকান্ত সহজ লোক নহে। তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

রতি। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার।

দেবনাথ। “আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি ভয় হইলেও

আমি তোমার ক্রীতদাস। বিশেষ আ-
মরা যে জরী হইব, তাহাব এক বিশেষ
লক্ষণ দেখিতেছি। আমাদের একজন
প্রধান সহায় জুটিয়াছে।

রতি। কে ?

দেব। বজ্রনীর তৃতীয়া ভগিনী শৈল-
বালা। পিতৃধনে বজ্রনী তাঁহাকে বঞ্চিত
করিয়াছে।

রতি। তাহাকে বিশ্বাস করিও না।
তাহাব হউক সে ভগিনী।

দেব। তুমি তাঁহাকে চেন না। সেও
একটি বজ্র। সে যে আমার সহিত এক
পবামণী, তাহাব প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে
একটি সম্বাদ দিতেছি। আগামী কলা
বজ্রনী কলিকাতায় যাইবে।

রতি। সেটা কি এমন বিশেষ সম্বাদ,
তাঁত বুঝিলাম না।

দেব। বিশেষ সম্বাদ এই যে, বজ্রনীর
সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে।

রতি। কেন ?

দেব। কেন ? তুমি আজ দুই দিনেব
জনা সন্ন্যাসী হইযা কি সব ভুলিয়া গেলে।
যবে নগদ টাকা যবে না সূচবাং কলি-
কাতার ব্যাঙ্কে অথবা অন্য কোন স্থানে
উহা রাখিতে যাইতেছে।

রতি। এ সম্বাদ ভাল বটে, কোন্
পথ দিয়া যাইবে ?

দেব। কলিকাতার যাইবাব নৌকা-
পথ ভিন্ন কি আর কোন পথ আছে ?
কিন্তু বজ্রনী প্রথমতঃ পাকীতে শ্রীধরপুর

পর্যন্ত যাইবে, তথার আমার বাটিতে
একদিবস থাকিবা নৌকা পথে যাইবে।

রতি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস
কবিলাম, এক্ষণে কার্যো চবিলাম।

এই কথাষ পবে উভয়ে গাত্রোথান
কবিয়া মন্দির হইতে বাহিব হইয়া স্বয়ং
স্থানান্তিমুখে চলিলেন। গভীর নিশীথে
অমাবস্যাৰ অন্ধকারে দেবনাথ শ্যালক
গৃহে কবিয়া চলিলেন, কিন্তু তিনি যে
ভয়ঙ্কর শপথ কবিয়াছেন তাহা স্বয়ং
কবিয়া তাঁহাব শরীর বোমাক্রান্ত হইতে
লাগিল, অন্ধকারে প্রতি পদে তাঁহাব ভয়
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথপার্শ্বে নদী
গর্ভে প্রেতভূমি। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখি
লেন যেন কত প্রেতমূর্তি দাঁড়াইয়া বাহ
তুলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে “কি ভয়া-
নক শপথ !” পবিত্রাব নৈশাকাশপ্রতি
চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তাবা তাঁহাব
দুর্লভ্য ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে,
উজ্জল নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহাকে বলি
তেছে “আমবা সাক্ষ্য আছি।” দেব-
নাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মান মনে
বিচার কবিয়া দেখিলেন। তাবিলেন,
“বজ্রনীর আমি দক্ষনাশ কবিব, কৃত-
সঙ্কল্প হইরাছি। কিন্তু কেন ? আমি
বজ্রনীর আলিহ, তাহাব গৃহে থাকি,
তাহাব অঙ্গ ধাই। তাহাব পিতার অঙ্গে
আমার শরীর। বজ্রনীকান্ত কি আমার
কোন অপকার করিয়াছে ? কিছু না।
তবে কেন ? তবে আমাকে কিছু দেয়
নাই, দেয় নাই, ইহা নিতান্ত বৈবিত্তার

কাজ করিয়াছে। টাকান্তি পাইয়া এই সময়ে আমার মনের মামস সিদ্ধ করিতাম। টাকা না দিয়া রজনী আমার ইচ্ছার স্বপ্ন নষ্ট করিয়াছে। আমি তাহাকে না নষ্ট করিব কেন? কিন্তু টাকা কার? রজনীকান্তের। তবে আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, আমি রজনীকান্তকে দেখিতে পারি না; পিছনে কে?”

“পিছনে কে?” এই কথাটি দেবনাথ পরিস্ফুট স্বরে বলিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে রজনীকান্তের অট্টালিকা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন এমন সময়ে পশ্চাৎ

হইতে কে তাঁহাকে বলিল “মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত রাত্রে একটা আলো লইলে ভাল হইত, অন্ধকারে সিঁড়িতে পা বাধিয়া পড়িয়া বাইবেন।”

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন “কে, রজনী বাবু!”

রজনী বলিলেন, “আপনারই ভূতা।”

দেব। এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন?

রজনী। কোথায় যাইব? আপনার বাড়ীতেই আছি। আপনি কোথায় গিয়া ছিলেন?

দেব। নিমন্ত্রণে।

দেবনাথ কম্পিত কলেববে শয্যাগৃহে গমন করিলেন। রজনীও আপন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।



বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

অষ্টম প্রস্তাব।

সাময়িক ব্যাপার।

সাগরগর্ভে মহর্ষি রত্নসঞ্চার, এবং ঘোর নিরুজন অরণ্যে বিকসিত কুসুম গন্ধ প্রবাহ, লোক সমাগম তাহাতে আকর্ষিত না হইলেও, নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন পুরাণীনা ভারতে এককালে বল, বীৰ্য, শৌর্য, সাহস, বীরত্ব

ও যুদ্ধ কৌশলদিগের বরপূজ্ঞগণের আবির্ভাব, এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উড্ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্কজিৎ অর্জুন, অসমুদ্র করগ্রাহী রাজরাজেশ্বর হর্ষ্যোদন, অরাসন্ধ, রত্নদেব ইত্যাদি

নাম মহাকবিগণ তাঁহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্যকলাপহেতু অলৌকিক জীব অংশে তাঁহাদের জন্ম নির্দেশ কবি যাছেন। প্রাচীনগণ ভক্তিতাবে সেই সকল গুনিয়া অথবানীষ সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন কবিযাছিলেন। আমবাও সেই সকল গুনিতেছি কিন্তু পূর্বকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন তুমি বিশ্বাস কব না, আমি করি, এইকপ। তোমার প্রমাণ, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ সঙ্গ্রে মিস খায় না বা তজ্জপ সাববান্ যুক্তি, আমাবও প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৪০০৪ মানি না বা তজ্জপ, স্মৃতবাং বিশ্বাস কবা না কবার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদ স্থলে কায়েই স্বীকাব কবিতে হয় যে, প্রাচীনা ভাবতের গোবব স্থলে আলেকজান্ডার, সিজব, হানিবল বা নোপালিয় নেব ন্যায় যোদ্ধা, গ্রিসীয় কডরস বা তেলবিটিয় উইঙ্কিলবিডেব ন্যায় স্বদেশ হিতৈষিতায় আত্ম বা আত্মতুল্যা প্রাণ ঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্মপিলিব ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীনা ভাবতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞানশূন্য নব-মাংসভোজী আজটেক জাতিও ইতিবৃত্ত বন্ধনের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে আর্য্যসন্তানেরা উচ্চ বিদ্যাবিশারদ হইবাও তাহাব মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়েন

নাই। যাহা হউক, সে সকল তৎকালব বশতঃ যদিও কালগর্ভে নিহিত হউক এবং নাম বিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যাউক, কিন্তু যদি সে সময়ের লোকচ-বিত্ত এবং সমাজচিত্র জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষ-য়ের আভাস উপলব্ধ কবিতে অল্পকণই লাগিবা থাকে। লোকচবিত্ত সমূহের সজ্জটনে সমাজচিত্র। যে সমাজেব বিবরণ আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা-বুদ্ধি, বল, বীৰ্য্য, বীৰত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপক্ষে প্রতিফলিত, সে সমাজেব লোক চবিত্তও স্মৃতবাং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীৰ্য্য, বীৰত্ব ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত। প্রাচীনা ভারতের লোকচবিত্ত ও সমাজ চিত্র তজ্জপ। অতএব লোকস্মৃতি কাল সমীপে হৃদয়মণীষ হইলে, নিঃসন্দেহভাবে নাম বিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পাবে না। ভাব তের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যখনই কিঞ্চিৎ টুকবা উদ্ধাব হয়, তখনই দেখিতে পাই যে তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতি-বহির্ভূত সময়ে উজ্জব কুকবর্ষ পবিত্যাগা-বধি, ডাঙ্কিবেব পবাজয় বা নাসাহুদাস কুন্তবুদ্ধিনের ভাবতে আগমন পর্য্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ক্লম করিতে পা-বিত না, যাহাব বংশাবলী অদ্ভুত বীরত্ব জগজ্জতা আলেকজান্ডারকেও ভঙ্গিত করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোম স-ম্রাট আগষ্টুসেব সহ সম্বন্ধনিবন্ধন তাঁহাব

সভার দূত প্রেরণ দ্বারা রাজত্ব মীমাংসা করিতেন, যাহার বংশাবলী গ্রীকভূমি পরাজয়ার্থ পারস্যরাজের সৈন্যমাধ্যমে গণ-
নীয় পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বংশা-
বলী জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে জগৎকে
শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহার বংশাবলী
ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্ম্যদাতা, সেই
জাতি যে প্রাচীনকালে কোন গৌরব-
যুক্ত নামের কান্দাল ছিল, একথা স্ত-
নিব না, এবং স্তনিবার যোগ্যও নহে।
কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত
বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে;—সেই
সকল পূজনীয় নাম সাগরগর্ভস্থিত মহার্ষি
রত্ন এবং বিজ্ঞান অরণ্যস্থিত সুবাস কুসু-
মের সহ সমভাবস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বান্দীকির সাময়িক সমাজ বীরবীর্ষ্য
সাহস ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপর্কে প্রতি-
ফলিত। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বীরত্ব
সাহস এবং স্বপক্ষ হিতৈষিতার আভাসে
পরিপূর্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষ রক্ষণ-
চাতুর্য্য নাবাবিধ ও চমৎকার। যুদ্ধপ্র-
ণালী বাহ রচনাপ্রভৃতি, গোমারিক
সময়ের তত্ত্ব বিষয়ের সহ সমজাতীয়।
যুদ্ধস্থলে সেনাপতিই সর্বো সর্বা, তাহা-
দের হারিকিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধা-
নতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। আত্মবলিক
সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে।
জয়োল্লাসে নগর সকল প্রাকার পরিধায়
সমাবৃত, শত্রুগণের পক্ষে সহসা স্তম্ভ
নহে। দেশরক্ষার্থে যজ্ঞপ জুগাদি স্থা-
পিত, রক্ষিত এবং অবরোধকালীন ও

অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেক্রপ জব্যাদি
সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজধর্ম্য প্র-
স্তাবে তাহা যথায়থ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চারিবিধ। হস্তী, অশ্ব, এবং
রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে,
তাহারা এবং পদাতি।(১) অস্ত্র নানা-
বিধ। শরাসন, চর্ম্ম, শর, খড়্গ, মুদগর,
পট্টিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি,
পরিঘ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতদ্রী
নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে।(২)
রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে,
বিশ্বামিত্র যেস্থলে রামকে মন্ত্রপুত্র বহু
অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূত-
পূর্ব্ব অশ্রুত বহু বিকট নামযুক্ত অস্ত্র
সমূহের নামোল্লেখ আছে। উহা কবি
কল্পনার পুরাকাষ্ঠা। যাহা হউক উপরে
যেক্রপ অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুর্বিধ সৈন্যের
বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক
এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে
৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটোর যুদ্ধে অরকসিসের
পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তা-
হারা পদাতি এবং অশ্বারোহী এই দুই
অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ
ভারতীয় তাহা বলিতে পারি না। ইহা-
দের বৃত্তান্ত হিরোডোটস তাহার পু-
স্তকে(৩) যজ্ঞপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি

(১) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্টি হয়, রথী
ও পদাতি।

(২) বঙ্গদর্শন ২য় সংখ্যা ৪৯৪ পৃষ্ঠা এই
প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ।

(৩) Herodotus Book VII. 65. 86,
IX 28 32.

কথিত বৃত্তান্তের সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীরেরা কখন সমুদ্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাস্তবিকিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের ত্রিভীকর্ণকাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অশ্বসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার হ্রস্বভিক্ষি সন্দেহ কবিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশেব আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন।

“নাবাং শতানাং পক্ষানাং কৈবর্তানাং

শতং শতম্।

সন্নানানাং তথা যুনাতিষ্ঠিত্যভ্য

চোদয়ং ॥” ৮

“অসংখ্য কৈবর্তযুবা কবচাদিধাবণ পূর্বক যুদ্ধ প্রতীক্ষায় পক্ষশত নৌকায় আবোহণ করিয়া রহক।” ইহার সাদৃশ্য মেস্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো ব্রহ্মের নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুদ্ধের বলে স্প্যানিয়ার্ডরা একরাত্রি এত দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন যে আজি পর্যন্ত তাহা “মহাকু-রাত্র” (Noche Triste) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপরে যত প্রকার অস্ত্রের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অস্ত্রবিশেষে পারদর্শিতালাভ করিয়া খ্যাতি-বুদ্ধ হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনু-র্কানেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে সজ্জিত

হইতেন। শরীর বস্ত্রাবৃত, শিরে শির-জ্ঞাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তুণ, কটিতে লম্বমান খড়্গ, এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অঙ্গুলিতে গোদাচন্দ্রনির্মিত অঙ্গুলিজ্ঞাণ। রথের আকারে একরূপ একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

“তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।

হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যমরকুববম্ ॥১৩

মংসৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চক্রহৃদৈশ্চ
কাঞ্চনৈঃ।

মাস্কলৈঃ পক্ষিসজ্জৈশ্চ তারান্তিষ্ঠ

সমাবৃতম্ ॥১৪

ধ্বজনিম্নিংশ সম্পন্নং কিকিণীতিবি-

ভূষিতম্।

সদশ্বযুক্ত—“১৫” ৩২২

উহা মেরু শিখরাকার (তদ্বৎ উন্নত) তপ্তকাঞ্চনভূষিত, হেমচক্র ও বৈদূর্য্যমরকুবব সম্বলিত। উহাতে কাঞ্চন নির্মিত নানাবিধ মংস, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চক্র হৃদ্য, মাস্কলা পক্ষী এবং তারাগণে ইত-স্ততঃ পবিত্র। ধ্বজ এবং খড়্গ সম্পন্ন, কিকিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বদ্বারা বাহিত।(৪)

রথের সারথী সম্ভ্রান্ত বা বন্ধুদ্বারাও সম্পন্ন হইত। জাতীয় ধ্বজ এবং যুদ্ধ-কালীন ধ্বজবহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট হয়, (৫) তখন যে রামায়ণের সময়েও

(৪) রথের আকারাদি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত ঋঃ বেঃ ৫.৬২-৬, ৬-২২-২, ৮-৩৩-১১, ১৬২ ইত্যাদি দেখ।

(৫) “যজ্ঞ মরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজঃ” —১০-১০৩ ঋঃ বে।

তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে উল্লেখ করা বাহ্যল্যমাত্র। রঘুবংশীয় রাজা-দিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ। নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুতরাং যুদ্ধকৌশলের দৃষ্ট দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতা-স্বয়ম্বরে রামের দৈহিকবলপরীক্ষা যত্ন উত্তোলন ও ভঞ্জে অভিনীত হইয়াছিল। বাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, মৃত হুন্দভির কঙ্কাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্বক নিঃক্ষেপ করিতে অমুবোধ করিয়াছিলেন। বালি হুন্দভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব বালির যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ। ইত্যাদি। (৬) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগযুদ্ধ হইল, তৎপরে “বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক, যেমন পর্বতের উপর বজ্রনিষ্ক্ষেপ করে, সেই

(৬) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্বে—

“সদ্যশ্রোষঃ ক্রাসকঃ ক্রতমধ্যে জলন্তঃ, দোর্ড্যাঃ হতঃ ভীমসেনেন।” ইত্যাদি।

রূপ বালির উপর তাহা নিষ্ক্ষেপ করিলেন। তখন বালি বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভাবাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রক্তাশ্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চক্রে সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটপ্রধর নথ, মুষ্টি, জানু, পদ, ও হস্তদ্বারা পরস্পরকে বার-বার প্রহার করিতে লাগিলেন।” (৭)

বৃহৎ যুদ্ধাদিব ব্যবস্থা একপ। (৮) চতুর্বিধ সৈন্য যথাক্রমে বাহ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ষ প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত

(৭) এখানে নিজে অমুবাদের পরিশ্রম বাঁচাইয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক এই অমুবাদ টুকু গ্রহণ করিলাম। ইহা আমার উপরি লাভ।

(৮) এই সংগ্রাম পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম পদ্ধতি মিলাইয়া দেখায় আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রোট একপ লেখেন। “The mode of fighting among the Homeric heroes is not less different from the historical times, than the materials of which their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites or the heavy-armed infantry, maintained a close order and well-dressed line, charging the enemy with their spears protended at even distance, and coming thus to close conflict without breaking their rank: there were spe-

কবিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান
হইল। রণবাদ্য নির্ঘোষে চতুর্দিক্ আ-
ন্দোলিত হইল। উভয়দিকে সিংহনাদ

cial troops, bowman, slingers, &c. armed with missile, but the hoplite had no weapon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and Odyssey, on the contrary, habitually employ the spear as a missile which they launch with tremendous force: each of them is mounted in his war chariot drawn by two horses and calculated to contain the warrior and his charioteer, in which latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to serve. Advancing in his chariot at full speed, in front of his own soldiers, he hurls his spear against the enemy: sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is usually near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield, helmet, breastplate and greaves, but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described”—*Grote's*

ধমুইকাব এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল,
তৎপরে বাগ্-যুদ্ধ। তৎপরে যদুজ্ঞা কি
ধর্মযুদ্ধ হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুদ্ধ

Greece, Vol. I pp. 494. এক্ষণে দেখিবে যে হোমারের বর্ণিত বণবৃত্তান্ত বায়ীকিব সহ কত সামান্য অস্ত্রব। ফলতঃ অগতের সকল আদিম সভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির বর্ণপাণ্ডিত্য প্রায় এইরূপ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক অর্ধসভ্য জাতিব রণবৃত্তান্তেব সচ মিলাইয়া দেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের আদিম অধিবাসীবা স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে।—“Many of the Indians were armed with lances handed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces and battle-axes of the same metal. Their defensive armour, also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads of wild animals, garnished with rows of teeth that grinned horribly above the visage of the warrior.....the Spaniards were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and atabal, mingled with the fierce warcries of the barbarians, as they let off volleys of missiles of every description,.....But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in same bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire.” &c.—*Prerott conquest of Peru.*

বাস্তবিক। রথীতে রথীতে, পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, মলে মলে যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধর্মযুদ্ধ হইলে, যে দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ কবিত্তে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হারি হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধেব ফল অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পূর্বকথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেক্ষেপে পাবিবে সে সেইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা কবিবে। সমজাতীর সৈন্যেব মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহাব বাহাতে সুবিধা তদনুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ, এবং সন্নিকটবর্তী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা খড়্গ শূল পবণ প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ হইত। প্রথমে বৃহৎ বচনা দ্বারা সৈন্য সমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব প্রথমে বৃহৎভেদ করা। যুদ্ধারম্ভেই যে পক্ষের বৃহৎভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতির বিবিধ মণি রত্নাদি বীরসাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজপতাকাশোভিত রথারোহণে সর্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধর্মুর্কাণা

দির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন। উভয় সেনাপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া যল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদেব পার্শ্বে আরও রথ থাকিত, পূর্ব বথ ভয় হইলে অপর রথে আরোহণ কবিতেন; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত ও মুচ্ছিত হইলে, সাবধি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রথীর প্রাণ বক্ষা করিতেন। এই দুই কাবণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং শেষোক্ত কারণ হেতু সারথি গর্জিত রাবণেব নিকট অনেক বার তিরস্কারও সহ করিয়াছিল।

বাসাযণেব সকল যুদ্ধেব বর্ণনা দৃষ্টে উপবে ঐ সারাংশ সম্ভব বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রমায়ণের অবিকল বর্ণিত যুদ্ধ অল্পত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্বত পর্য্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পবিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষ জনের লক্ষ শর নিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটি বীর। এসকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্পনাবৎ তাহাই, কেবল বাস্তবিকব ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সম্ভব। বাস্তবিক ঋষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধবর্ণনের মূলমন্ত্র। বাস্তবিকবর্ণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি এক বিদ্রুপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহা কর্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র

সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপবে প্রদ-
র্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে দ্বিধাস
করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় বহ-
ুলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্লেশে
জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্বদর্শী,
বহুবিদ্যাবিশাবদ ও সর্বজনপুঞ্জনীয় এক-
জন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়া-
ছেন একথা অসম্ভব। যখন আমবা
বান্দীকির সাময়িক অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও
সেনানিবেশ এককণ নিঃসন্দেহ ভাবে
জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি
যে সেই সকল, আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য
জাতিদের তত্ত্ব বিষয়েব সহ কিছু কিছু
ইত্ব বিশেষতা বাতীত সমজাতীয়,
আবাব সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধ
সভ্য জাতিদের মধ্যে সমব প্রণালী প্রায়ই
একজাতীয়, তখন বান্দীকির সাময়িক
সমবপ্রণালীও যে তদ্বৎ সমজাতিক
হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

বাবণ ও বামের নিমিত্ত স্ত্রীবেব
সৈন্য সংগ্রহেব ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অসু-
ভূত হব যে, প্রত্যেক বাজেম্বেব আত্ম-
বাক্ষধানী রক্ষণার্থে বাণ আবশ্যক সেই
পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য বকিত হইত।
অধীনস্থ সম্ভ্রান্তগণ যাহা আপন আপন
নির্দিষ্ট সীমার রাজাকে করমাত্র প্রদান
করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে
রাজার যুদ্ধসময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং
আত্মপ্রদানে রাজাকে সাহায্য করিতে
হইত। সম্ভ্রান্তগণ ডাকিবারাত্র ক্ষত্রিয়
প্রজাবর্গকে যুদ্ধার্থে আপন আপন অস্ত্র

শস্ত্র লইয়া তদাজ্ঞানুবর্তিতর উপস্থিত
হইতে হইত। অস্ত্র ব্যবহারসময় ব্যা-
তীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্ম-
বৃত্তি অথবা শূত্রের উর্দ্ধে অপর যে কোন
বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক
কিরাত যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়,
এজন্য বোধ হয় তাহাবাও নির্দ্ধারিত বে
তন বা বৃত্তিতোলে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত
হইত। যে ব্যক্তি আপন প্রভুর আত্মান
মত অস্ত্রচক্ষে আসিতে কোন কারণে স-
মর্থ না হইত, তাহারা তন্নিমিত্ত ইউরো-
পীয় ফিউডাল সাময়িক এসকুয়েজ (es-
cuage) নামক কব্জের ন্যায় ক্ষতিপূর্বক
কোন কব দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা
জানি না। সৈন্য সংগ্রহ প্রথা যেকপ
দেখা যাউতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে
প্রজাবা যখন প্রভুব আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র
গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন বাতীত অপর সময়
যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, এমন
অবস্থায়, তাহাবা দৈহিক বলের পবি-
চালনা যদিও ঘবেঘরে করিত, কিন্তু নিত্য
নূতন যুদ্ধ কৌশল শিক্ষার সুযোগ অল্পই
পাইত; সুতরাং তাহারা যে বশস্তলে পালে
পালে নিপাত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব
নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান
ও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহা-
দের অশিক্ষার সহিত প্রভুস্বহানিরূপ
কল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানা
রূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌ-
শলী হইতে হইত। এই নিমিত্তই বোধ
হয় প্রাচীন সাময়িক যুদ্ধের জন্য পরাজয়

তরুণ লোকের এক। যুদ্ধে এক। জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তদ্বিপরীতে রাবণেব পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা দেন্দীপ্যমান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরব ইহার বহির্ভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে তৎ বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্ত অকা তবে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গ প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাত্রাব এ ভ্রমতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষতা জনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তেব অত্যাৎকর্ষতা লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্ত পক্ষে পক্ষে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল পেরু যেক্সিকো প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির তরুণ সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল গ্রা-নেডাহইতে মুসলমান এবং ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্ধাসন প্রভৃতি। মধ্যযুগের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল লক্ষণ সেনের বাঙ্গালা দেশ, অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশজন্মে যখনই অত্যাৎকৃষ্ট মানসিক

উৎকর্ষতার হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহার অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিদ্ধিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস ইহার মূল এক মাত্র দৈহিক বল। একথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিকবল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্ত ভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে বাসনার মূল গায়ের জোর, একথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়। কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই? এক জাতির স্বাধীনতায়, অপর চিত্তের উৎকর্ষতায়। কৃকি সাঁওতালেনব যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকাল ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, 'ডাইল কুটি' ভোজী সর্বলক্ষ্য হিন্দুস্থানিতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদের স্বর্গীয় বংশ-রক্ষকেরা ভাল মাঝিয়া বৃহৎ গাছকেও দোহুলামান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নিজজীব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা। ফলতঃ বাসনার মূল পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, অমূল্য সমাজে পূর্ক হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষতায় অভাব

বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষতা। এই উৎকর্ষতা যখন যেকোন পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসাবে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গল-লেব আব কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা সেখানেও জয়ন্ত্রী বিচরণ কবিতা থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধ্যম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া পাকে। ইহাব দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত ঋষি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া ভাবিতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনার্য্য দস্যবা এই ভাব-তের সর্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্য-গণের তুলনে, তাহাবা সংখ্যার সমুদ্র-তীববর্তী বালুকাবৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সত্যেব অপেক্ষা, আহাবপ্রচুব দেশের অসত্যের গায়েব জোব এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা কবিলে, শেষোক্তেরা সিংহেব নিকট মশক সদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহা-দেব বাসনাও বিপুল ছিল, নতুবা তাহারা এত বক্তৃপাত কবিতো পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব, অতি অধ্যম দাসত্ব স্বীকার করিতে

হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাটবে যে, আর্য্যেরা অল্পবল ও অল্প-সংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত অধিক, সুতরাং ইহাব কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঐরূপ মেক্সিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চাবিশত পদাতি ও পনেবটি অশ্ব লইয়া লাসকালার (Flascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলের সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, ক্রুর সাহস ও বীরত্ব সহ বারম্বার স্বদেশবক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেঙ্কাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল। ইহাব স্বভাব চবিত্র আলোচনাম্ব একরূপ বোধহয় যে এই ছুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অমুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহাহইলে বিখ্যাত-নামা নূতন পুর্বাতন অনেক মহাবীরের যশোববি মলিন কবিতা ফেলিত, কিন্তু এটিও অবশ্য কুস্তম। এততেও কোর্টেসেব পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালার অর্দ্ধলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। তৎপবে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাম্রাজ্যেব রাজধানী টিনক্টিটলানে উপনীত হইলেন। এই সাম্রাজ্যেব দেববৎ পূজিত অধিতীয় অধীশ্বব কোর্টেসের অমুচর বিলাসকেজের জুকুটীভঙ্গীতে ভ্রম পাইয়া

স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হইলেন। যাহার ক্রকটীয়াত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি হেলনে পতঙ্গপালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্রাটের স্বল্প ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অন্নক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেশ হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষভাজনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেক্সিকোবাসীরা যত রক্তপাত করিয়াছে, এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহাব তুলনা দেখা যায় না। ঐকপ জরক্সিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুদ্ধেও উৎকর্ষতার জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত লাভণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিক মণ্ডলেব অধিনায়ক রুসিয়রাজ পিটার, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্রসেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চালর্স কর্তৃক কুরুপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পিটার তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডবা তাহাদিগেরই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত একপ ভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পিটারের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এবাক্যেব সত্যতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

আবার যে, যে ওয়ালিদ খলিফ আস-সুন্ন করগ্রাহী সন্ড্রাট্, উদয়গিরি হইতে অন্তাচল পর্যন্ত যাহার রাজ্য বিস্তার, তিনিও ভারতে সিদ্ধ প্রদেশের অংশমাত্র

জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসামুদাস কৃতবুদ্ধি স্বচ্ছন্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোম-রাজ্য বিশ্বব্যাপিনী, কয়েকজন বর্ষেরে তাহাব ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পূর্বার্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না, পূর্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে, উৎকর্ষতার মলভাগ বিলাস এখন সর্বস্বয়ন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে?

বিজ্ঞানোত্তর কৃত্রিমবলেব পূর্বে মল্লযুদ্ধ বহুপরিমাণে রণস্থলে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ কবে। সেদিন একটি মল্ল যুদ্ধ দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব, কিন্তু এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদ স্থলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরাকৃত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎকর্ষতা এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এযুগের অধিনায়ক। ভারত-সন্তান! শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

শ্রীপ্রকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক পরিচ্ছেদ ।

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রাব্যাকাব্য বলে। শ্রাব্যাকাব্যের ন্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা অন্য ছই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকাব শেষ হয়, সেই সেইস্থলে পবিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদেব নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত একরূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথা বার্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ গ্রাম্যভাষায় কথা বার্তা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

অভিনয় বা রূপক ।

কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়দ্বিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি দৃশ্য কাব্যের নাম রূপক।

অভিনয় চারি প্রকার। আঙ্গিক, বাচিক, আহাৰ্য্য ও সাঙ্গিক।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনয় কাব্যকে) দশভাগে বিভক্ত কবেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়। নাটক, প্রহসন ও মাস্ক।

অঙ্কের লক্ষণ ।

নাটকের প্রত্যেক পবিচ্ছেদ বা সগের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে যাহার প্রসঙ্গ থাকে তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কূটার্থ বা অপ্ৰসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার হয় না। অনাবশ্যক কাণ্ডের সংশ্রব মাত্রও থাকে না। আবশ্যকীয় বিষয়েব চমৎকারিত্ব থাকিলে বর্ণন বিবিধপ্রকাৰে বর্ণিত হইতে পারে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিম্ন-নীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য বলিয়াই কথিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষায় নাটকে অনেকে সকল শাসন স্বীকার করেন না।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়। বাক্যভঙ্গী দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম

বাটিক, বেশ ভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অমুকরণের নাম বহুকণী ও শুভ্র খেদাদি সম্বন্ধে নৃত্য অভিনয়ের নাম সাবিক অভিনয় কথা যায়।

নাটকেব নায়ক ও নায়িকা ধীবোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারিপ্রকারের যে কোন একপ্রকারের হইতে পারে। আদ্য অথবা বীরস নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আত্মবিক্রম অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্যব্যাপদেশে অভূত রসের আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন কবিত্তে পারিলে নাটকের চমৎকারিত্ব আছে।

এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গভীরাঙ্গুণে পৃথক সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতে হয়।

নাটকে কোন বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ববর্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাক্যাদি নাটকে পূর্বরঙ্গাদি নাই। কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে। তদনুসারে পূর্বরঙ্গাদির স্থল স্থল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্বরঙ্গ।

রক্তকী (রক্ত তামাসা) দেবাইবার পূর্বে নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌর চক্রিকা) করে, তাহার নাম পূর্বরঙ্গ।

নান্দী।

পূর্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে

অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে তাহার নাম নান্দী। কোন কোন নাটকে কেবল পূর্বরঙ্গ থাকে, কোন টীতে দুইটিই দেখা যায়।

নান্দীর উদাহরণ।

শিশুশশী শোভে ভাল, বপুবিভূষিত কালে
গলে কালকূটের কালিমা।

রক্তত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোভোভা,
একপের দিতে নাহি সীমা ॥

বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমাশশী,
পুলকে প্রকুল কলেবর।

নিতান্ত কিঙ্কর জনে, কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর ॥

কুলময়ী কুলারাধা, কুলভক্তজনবাধা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।

অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্মূল,
সত্যকুল বৃদ্ধি বিধায়িনী ॥

কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মা গো জগৎ সংসারে।

তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
পড়ে আমি অকুল পাথারে ॥

কুলীন কুলসর্কস্ব।

নান্দীর পরেই হৃদধারের কথা প্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত এক প্রকার অবতারণা করিয়া দেন।

প্রস্তাবনা।

নটী, বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় হৃদধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে তথায়ই প্রস্তাবনা কথা যায়।

হৃদধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

প্রস্তাবনা পাঠ প্রকার। যথা—উদ্ঘা-
ত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক
ও অবলম্বিত ।

উদ্ঘাত্যক ।

যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কপাব অভি-
ধেয়কে অপরিবিধ অভিপ্রায় গ্রহণপূর্বক
রক্তভূমিতে পাত্রপ্রবিষ্ট হয় তথায় উদ্ঘা-
ত্যক প্রস্তাবনা কহা যায় ।

মুদ্রা রাক্ষস—“প্রিয়ে সেই ছবায়
ক্রুরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চক্রে বলপূর্বক
অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে ।”

সুত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া
নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন,

“আঃ আমি জীবিত থাকিতে কুব-
আগ্রহবিশিষ্ট কোন ছবায় সার্কভৌম
চক্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করি-
তেছে ।”

এখানে অন্য ব্যক্তিব প্রকাস্তবিরয়ের
অর্দ্ধোক্তিব অভিধেয় তাৎপর্যবশতঃ অর্থা-
স্তরে পরিণত করিয়া পাত্রপ্রবেশ হই-
য়াছে, এনিমিত্ত এইখানে উদ্ঘাত্যক কহা
যায় ।

কথোদ্ঘাত ।

সুত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয়
কথাব তাৎপর্য অবধারণপূর্বক পাত্র প্র-
বিষ্ট হইলে কথোদ্ঘাত নামে প্রস্তাবনা
কহা যায় । যথা রত্নাবলীতে—

“বিধাতা যদি অমুকুল হন তবে কি
দীপান্তরিত কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা
কি দিগন্তরগত প্রিয় বস্ত্র তাহার সহিত

অনায়াসেই মিলন হইতে পারে । তদ্বি-
ষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মে না ।”

সুত্রধারের এই বাক্য শুনিয়া নেপথ্য
হইতে যৌগন্ধরায়ণ সুত্রধারের বাক্যের
সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,

“সকলি মত্যা! নতুবা দেখ কোপায় বা
সিংহলেখনের কুহিতা কোথায় বা তাহার
বানভঙ্গ এবং কোপায় বা তাহার কৌশা-
স্থীযদিগের সঙ্গিত মিলন এবং এখানে
আনয়ন ইত্যাদি ।”

বেণীসংহারেও দেখ ।

“পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দ-
লাভ করুন । যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা
এক্ষণে তাঁহাদিগের দৈবনির্গাতনরূপ অগ্নি
নির্ঝাপিত হইয়াছে । এবং বাহাদিগের
কধিবে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে সেই ক্ষত
নিষ্কত শবীর কোরবগণও সত্য্য সূহ
হউন ।”

সুত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া
নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন,

“রে পাণিষ্ঠ চরাঙ্গন আর তোব বৃথা
মাজল পাঠের আবশ্যকতা নাই । এখনও
আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃত-
রাষ্ট্রতনয়গণ সূহ থাকিবে ?”

এই কথা বলিয়া সুত্রধার প্রস্থান ক-
রিলে ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয় ।

প্রয়োগাতিশয় ।

যেখানে একরূপ প্রয়োগে অপরিবিধ
প্রয়োগের অবতারণা অমুসারে পাত্র
প্রবেশ সম্পূর্ণ হয় তথায় প্রয়োগাতিশয়
কহা যায় । যথা—

যথা কুন্দমালা নাটকে

নেপথ্যে—“আর্য্যা এইস্থানে আগমন করিতে পারেন।”

সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল,

“এ আবার কোন্ ব্যক্তি আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন।”

চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া

“আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লঙ্কেশ্বর ভবনে বাস করিয়াছিলেন এই লোকপবাদ ভয়াকুল রাম-কর্তৃক নির্কালিতা জনকনন্দিনীকে লক্ষণ নিতান্ত গর্ভমস্তুরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে আনয়ন করিতেছেন।”

এখানে সূত্রধারের নৃত্যপ্রয়োগ বিষয়ে স্বীয় ভাষ্যার আহ্বানের ঠোঁটটি লক্ষণ কর্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগ বিশেষ হুচনা কবিতা আপন প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্তক।

যেখানে বর্তমানকাল আশ্রয়পূর্বক সূত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয় তথায় প্রবর্তক কহে। অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলম্বিত।

যেখানে সদৃশ কার্য বা সদৃশ বস্তুর কখন বা স্মৃতিহেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয় তথায় অবলম্বিত প্রস্তাবনা কহা যায়।

যথা—শকুন্তলায়

“রাজা হৃদয় বে প্রকার বেগবান যুগ

ধারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন আমি সেই প্রকার তোমার গীতরাগে বিমোহিত হইয়া সমাক্রান্ত হইয়াছি।”

এই কথা শ্রবণ দ্বাবাই হৃদয়ে প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা সম্পাদন করিয়াই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্কান্ত হয়।

প্রহসন—হাস্যরসোদ্দীপক নাটকে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা—নভেলে প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ববঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতি নাম নাই। প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যক তাহার নামই স্পষ্টরূপে লেখা থাকে।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দেশপূর্বক সত্য ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকুক কিন্তু সেইপ্রকার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

ভদ্র লোকের কথাবার্তা ভদ্ররীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষা সামান্য ও চলিত, কথাবার্তা হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদ প্রমোদ প্রিয় ও ভোজনপট্টরূপে বর্ণিত হয়।

সজ্জাত জীলোকেরা নীচ পদবীহীন ও দাসীদিগের প্রতি ওলো হ্যাণো ওরে প্রতৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকেন। সম্মানযোগ্য জীজনদিগকে লোকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন।

মমযোগ্য কামিনী গণেব মধ্যে পব-
স্মর সখী বা প্রিয়সখী বলা রীতি।

কথাবর্তী

স্বগত—অন্যের অগোচরে আপনি

একাকী প্রকাশ্যে যে কথা কহে তাহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপব ব্যক্তির সহিত. কথোপকথনের নাম জনান্তিক।

আকাশবাণী—দেববাণী অর্থাৎ যে কথা অপব ব্যক্তি জ্ঞানিতে পার না কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে কথিত হয় সে ব্যক্তি জ্ঞানিতে পায়।

বাক্সালার পূর্ব কথা।

উপক্রমণিকা।

বাক্সালা অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথায় সকলে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমবা বিশ্বাস কবি এবং এক গলা গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করিয়া তাহা বলিতে পারি। বাক্সালার যে কোন আশাই একেবারে নাই, এরূপ কঠোর কথা আমবা জদয়ে স্থানদান করিতে পারি না; অথচ নবযুবকগণের যেকপ রীতি নীতি হইতেছে, তাহাতে বাক্সালার যে কিছু ভরসা আছে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে একেবারে হতাশও নহি।

কিঞ্চিৎ আশা আছে বলিয়াই, বাক্সালার হৃদয়শার কারণানুসন্ধান করিতে প্ররুতি হয়। যখন স্বয়ং শতপীড়নে পীড়িত হইয়া, এবং শত সহস্র স্বদেশী-রকে নিষেধিত দেখিয়া মনে হয়, যে

“এযন্তণা আব কতকাল ভুগিতে হইরে? কি প্রায়শ্চিত্ত কবিলে এ নরক হইতে নিরুত্তীলাত কবিব?” তখনই সজ্জাত মনে হয়, “কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? এবং না জানি কত পাপই করিয়াছি?”

পাপেব স্বরূপ নির্বিশেষ উপলব্ধি কবিতে না পাবিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রথমে জানিতে হইবে, বাক্সালা কি কি পাপ কবিয়াছে, তবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সংসারের নিয়মই এই, আপনার জন্ত আপনাকে ভুগিতে হয়, আর পরের জন্ত আপনাকে ভুগিতে হয়। জাতিসাধারণের সম্বন্ধেও তজ্জগ। কোন এক জাতির শুভাশুভ যে কেবল সেই জাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে এমন নহে,

অপর দশ জাতির বল বিক্রমে বা আচার ব্যবহারেও নিরীহ একজাতির ভালমন্দ ঘটিতে পারে, ও ঘটিতেছে। যদি বাবর শাহ বা তাঁহার পূর্বপুরুষ ও স্বজাতীয়গণ ভ্রমণশীল, যুদ্ধক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, দিগ্বিজয়া-কাজী না হইতেন, তাহা হইলে শৌবা-লিক হিন্দু সম্ভান হয়ত আবও শতশতবৎ-সর বজনাধারন ও ঈশ্বর চিন্তায় যাপিত করিত। যদি অর্জুনস্পৃহ বণিগ্জাতির কবতলে বঙ্গদেশ এই শতাব্দিক বৎসব যাপন না করিত, তাহা হইলে কি এখন-কাব মত বঙ্গসম্ভান, মানমর্যাদা, লোক লৌকতা, সম্ভ্রম, সৌজন্ম—সর্বস্ব খোয়া-ইয়া কেবল ধমসঞ্চয় কবিতো বাস্তব হইত?

কোন একজাতির শুভাশুভ যে নানা-দেশবাসীর জাতিগত চবিত্তের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল বিলাতীয় বিখ্যাতনামা পণ্ডিত শুদ্ধ দেশবিশেষেব অবস্থা হইতে জাতিবিশেষেব চবিত্ত নিকাশিত কবিতো প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাবা অর্দ্ধদর্শী। সকল জাতির শুভাশুভেব কাবণ কেবল জড় নহে; শুভাশুভেব কারণ জড় এবং জীব। যখন আমবা আমাদের বীর্ঘাহী-নতার উল্লেখ করিয়া বলি, যে, “শাক সিদ্ধার শর্কর সেবনে আমাদের আর কত বীরত্ব হইবে?” তখন আমরা জড় প্রকৃতিকে আমাদের দূরবস্তার কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তাহারপর অবার যখন বলি, “আর শত শত বৎসর দাসত্বের পর বীরত্ব থাকিবেই বা কি

প্রকারে?” তখন আমরা জীব প্রকৃতিকে আমাদের দূরবস্তার কারণ বলিয়া নির্দেশ করি। বাস্তবিক জড় জীব উভয়েই আমা-দিগেব বিস্ত্রাবী। বোধ হয়, জন্মলগ্নকাল হইতে জড়জগৎ আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে; আব জীবজগৎ একটির পর একটি আসিয়া, কেন্দ্রে ভর করিয়া, অনি-ষ্টসাধন করিতেছে। শুনিতে পাঈ আমা-দেব হিন্দু শাস্ত্রে সকল ব্যবস্থাই আছে, এ কুগ্রহ শাস্তি-স্বস্ত্যবনের কি কোন বা-বস্থা নাই?

এই কুগ্রহ জড়ের অত্যাচাব নিবারণার্থ বঙ্গ সম্ভান কার্যে কোন চেষ্টা ককক বা না ককক, অন্ততঃ কথায় স্বীকাব কবেন, এবং হয় ত কেহ কেহ মনেও বুঝিয়াছেন। আহাব পবিচ্ছদের পবিবর্তন করিতে, পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কবিতো, উচ্চ ভূমিতে বাসকরিতে, প্রশস্ত গৃহে শয়ন কবিতো—বান্ধালি এখনও অভ্যাস কবেন নাই খটে, কিন্তু বোধ হয় যেন কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

জীবপ্রকৃতিব কার্যকাবিৎ সম্বন্ধে বা জ্ঞানি বুঝেন—কেবল বর্তমান সম্বন্ধ। সেই জন্যই বান্ধালায় সম্বাদপত্রের সৃষ্টি, সেই জন্য সভা, সেই জন্য বক্তৃতা; সেই জন্যই বান্ধালায় রাজনীতি, সম্বাদ-নীতি একপ সম্বায়ত। বান্ধালির ইতি-হাস নাই, বান্ধালি বর্তমান হইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন; মহাভূতের সমীপে শিষ্য স্বীকার করেন না; স্মরণ্য চিব-দিন কেবল গুণগোণ করেন। ইতিহাসে

উপেক্ষা করিয়া বাল্যলি যে সকল মতপ্রচাব করেন, তাহা সম্পূর্ণ গহ্বরিত। বাল্যলি হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। বাল্যলি বর্তমান পর্য্যবেক্ষণ কবিয়া দেখিলেন, যে বাল্যবিবাহে, কুলীন বিবাহে, বিক্রয় বিবাহে, বাণিজ্য বিবাহে, বাল্যলার মহা অনর্থপাত হইতেছে, অমনই আশা-ভুবি হৃদয়ে বলিলেন, “এগুলি উঠাইয়া দাও।” একবার অতীত স্মরণ করিলেন না, কেন যে এগুলি এদেশে প্রচলিত হইল, একবার তাহার অনুধাবনা করিলেন না। একবার মনে হইল না, যে, যে বে কাবণে এই সকল প্রথা বাল্যলায় প্রচলিত হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেগুলি যদি এখনও থাকে তাহা হইলে, যত দিন না সে কাবণগুলির ধ্বংস হয়, তত দিন পূর্কোন্নিখিত প্রথাগুলি কখনই দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে না। কাবণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের নাশ হইবে না। সমাজসংস্কারের পূর্ক প্রথমে কারণানুসন্ধান করা, ইতিহাস শিক্ষা করা, যে নিত্যকর্তব্য একথা বাল্যলি আজিও স্বীকার করেন না।

জীবপ্রকৃতির তাড়নায় কোন জাতির আচাব, ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বৈলক্ষণ্য সম্বটন হয় ইতিহাসে তাহাই বিবৃত থাকে। কোন কোন বিভিন্ন জাতি কর্তৃক বাল্যলা কতবার এইরূপ ভাঙিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এক ইংরাজদিগের কথা দেখিতেছি, আর এক মুসলমানের কথা

ওনিয়াছি। কিন্তু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমানবিজয়ের পূর্ক বাল্যলা অস্তিত্ব আরও দুই তিন বার ভিন্নজাতি বা ভিন্নধর্মীকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নিশান বঙ্গবাসীর অন্তর্বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে; আমরা অদ্যাপি সেই সকল কলঙ্কতিলক সর্কাজে ধাবণ করিয়া রহিয়াছি। বৌদ্ধেরা আসিয়া মঠমন্দির নির্মাণ কবিল; আমরা ভক্তি নাই; যে একটু আধটু ধর্মশিক্ষা দিয়াছে, তাহা এখনও ভুলি নাই। সন্তাল আসিয়া বাল্যলাব সর্কাজে কালী ঢালিয়া দিল, এখন বুচে নাই; বংক রক্ত ছিটাইয়া দিল, আমবা তাহা এখনও মুছি নাই। সেনবংশ কুলধ্বজা প্রোণিত করিয়াছেন, গৃহে গৃহে এখনও উড়িতেছে। মুসলমান আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে; বাল্যলা এখনও গুড়িতেছে।

আমরা অমাবিক; কিছুতেই আমরা-গেব পক্ষাঘাতগ্রস্ত শবীরে বেদনা বোধ হয় না। আমবা রোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। এখন অনেকই সমাজসংস্কাররূপে বাল্যলার অব-তীর্ণ হইয়া নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। ইতিহাসেব সাহায্য না লইয়া সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ মত প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা বাল্যলার পূর্ক কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দেশের কোন একটি সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃস্থ ব্যাপার। কেবল ধর্মশাস্ত্রে বেদা বিভিন্নতা, স্বতন্ত্রো বিভিন্নতা; হইলে ক্ষতি ছিল না, তদ্রূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে। আমাদের কোন একটি কথার স্থির নাই। সংস্কৃতে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, এদিকে আবার সংস্কৃতে সকল কথাই লেখা আছে; ফলে হইয়া উঠিয়াছে, এই, যে হিন্দু সম্ভান ক্রমে সত্য মিথ্যা প্রতিভ্র করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে; একই পদার্থকে কেহ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া গুরু বলিলে বিশ্বাস করে; আর একজন সেইরূপ আখ্যায়িকার শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইয়া দিলে, তখনই বলে যে “হাঁ উহা কৃষ্ণবর্ণ।” দুই জনে একেবারে পীড়াপীড়ি করিলে বলে যে, “দুইই হইয়া থাকে।”

সকলের বোধগম্য হইবে বিবেচনায় সামান্য ‘পঞ্জিকা’ হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পঞ্জিকায় লেখা থাকে, যে বিষ্ণুর দশাবতার। সত্যযুগে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও অীরামচন্দ্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। কলিতে (হইবে) কঙ্কী। পৌরাণিক এসকল কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁহার পুরাণে আরও শুনা যায়, যে পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক—দশরথ জামদগ্ন্যের ধনুর্কর্ষন করিতেন; জ্ঞানকীর সহিত পরিণয়ের পরই অীরাম-

চন্দ্র পবনুরামের সহিত পথিমধ্যে দম্ভযুদ্ধ করেন। উত্তম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক হইলেন। দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। দ্রোণাচার্য্য অর্জুনাদির গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। সূতরাং তিনটি অবতাবের সময় অব্যবহিত পবে পরে হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে। কলির আরম্ভেও যুধিষ্ঠির রাজা এবং দ্বাপরের মধ্যেই বুদ্ধাবতার সূতরাং এক যুধিষ্ঠিরের সময়েই (কৃষ্ণ ও বুদ্ধ) দুই অবতাব হইয়াছেন। অতএব পরশুরাম, দাশরথি রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব চারিটি অবতারই এক সময়ে হইয়া উঠিল। অথচ মধ্যে একটি পৌরাণিক দ্বাপরযুগ গিয়াছে। দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসব। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের সময়ে, যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। পৌরাণিক প্রথা অনুসারে এক একজনের জীবনকাল দশ সহস্র বা বিংশতি সহস্র বর্ষ স্বীকার করিলেও, কিছুতেই আট লক্ষ বা নয় লক্ষ বৎসর হইবে না। গণিতের সহিত, জমা খরচেব সহিত, এসকল কথার কোন সম্পর্ক নাই। শুন, বিশ্বাস কর, আর নিদ্রা যাও।

এইরূপ সকল কথাতেই। একটু পরীক্ষা করিতে যাইলেই মহা বিপদ; কিছুতেই বুঝা যায় না, সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। ভারতবাসিগণ একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন, কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সকল কথায় সম্মতি-

দান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। একজন সেকেন্দর মাকিউন হইতে ভারতবর্ষ অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহার নাম অরণ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর একজন সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন; অমরিক ভারতবাসী জানেন ছুইই এক। নানা সময়ে নানা বিক্রমাদিত্য ভাবতে রাজ্য করিয়াছেন, ভারতবাসী জানেন বিক্রমাদিত্য একজন। অষ্টাদশ পুরাণ, একই জনের কৃত; মহাভারত—সেই মহাভারতই কৃত; বেদ গ্রন্থ—তিনিই করিয়াছিলেন, দ্বাপরে চন্দ্রবংশের তিনিই—ওরস পিতা; প্রধানদর্শন বেদান্ত—তাঁহাবই কৃত। শৈব বৈষ্ণবে বন্দ—তাঁহা হইতেই আরম্ভ হয়। ব্যাসকাশী—তিনিই পতন করেন, বদরীনাথ মহাদেব—তাঁহাবই স্থাপিত। এসকল কথায় কোন তর্ক নাই। পুরুষাক্রমে বিশ্বাস কর; আর লীলাস্বরণ কর।

এইরূপ বিকৃতবাদে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমাদের বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাসের “বিসমলয় গলং” আছে, ইহার “সিদ্ধিবন্তে” বর্ণিত আছে। এখন যে সমাজ দেখা যাইতেছে, এ সমাজের বীজ এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্তৃক উৎপন্ন হয়; আর এক সময়ে আর এক ব্যক্তি কর্তৃক তাহার অঙ্কুর সমস্ত রোপিত হয়। ব্রাহ্মণ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। কায়স্থ আনিল কে? আদিশূর।

শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। আদিশূর রাজা, রাজবংশীয়েরা বৈদ্য। উপবীত প্রদান করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিল কে? সেই বল্লাল সেন। বণিক বঙ্গে কবে আসিল? আদিশূরের সময়ে। সেই বণিককে শ্রেণীবদ্ধ কবিয়া, এক জাতিকে হীনগৌরব করিল কে? বাঙ্গালার ইতিহাসেব সেই দ্বিতীয় নায়ক বল্লাল সেন। বর্তমান সামাজিক বিভাগ সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর এইরূপ একই। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থেব শ্লোক ও বাঙ্গালী কারিকা এই অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল বচনে বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালী কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার পূর্ব কথাব পরিকৃতিসাধন জন্য আমরা এইরূপ বালক বয়স প্রবাদ যে কখনই সত্য নহে, তাহাই প্রদর্শনেব চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইতে আমরা এই কথাব বাচনিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি; আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন, একথায় বিশ্বাস মাত্র সংশয় আছে, শুনিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ শিহরিয়া উঠেন, যেন তাঁহাদিগের নিজের ও পূর্বপুরুষগণের গৌরব লোপ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করেন। এটা কুসংস্কার বাতীত আর কিছুই নহে। মুখ্যো মহাশয়েব পূর্বপুরুষকে কোন রাজা আনেন নাই, ও একখানি গ্রাম দান কবিয়া স্থাপিত করেন নাই, তাহার বাঙ্গা-

লায় ছুই সহস্র বৎসর বাস করিতেছেন ।
তাহাতে কতি কি ? ইহাতে অগোরবের
কথা কিছুই নাই ।

অতএব ভবসা করি আমাদিগের
দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব সমীপে বিশেষ
আলোচিত হইবে ।



দরিদ্র যুবক ।

১

চন্দ্রমাশালিনী নিশা গভীর স্মৃতি !
নির্মল নীলমাকাশে, সুধাংশু নক্ষত্র হাসে,—
হাসায় পার্শ্বব, মৈশ শোভার প্রকৃতি !
ভূধব, প্রাস্তর, বন, মদ মদী প্রস্রবণ,
হাসির তরঙ্গে ভাসে বিকাশি মুরতি !
হেসে পাগলিনী হল ধরাকপবতী ।

২

পাদপ পাতার আয় শ্রোতস্বতীকূলে
ধবলফুলিত কাশে, সোহাগে ধন্যোত হাসে
শশীমুখী সন্ধ্যামণি হাসে মন খুলে ;
মৃদুশৈল বায়ুতরে, আদবে গলিয়া পড়ে ;
ধবল তুহিনকণা মুক্তাহার গলে !
এসব থাকিবে কোথা, নিশি পোহাইলে ?

৩

ওই যে ভূধর হতে নির্ঝর নির্ঝল
বারিবিষ ভেসে যায় চন্দ্রমাতে দীপ্তিপায়,
পলকে মিশায়ে হবে যে জল সেজল !
গাঢ় জলদের ঘটা চল সৌদামিনী ছটা
গভীর অশনি, ঘোর বৃষ্টি অবিরল
হইলে সহসা কোথা যাবে এসকল ?

৪

ওই যে নৈশিক বাহু মৃদুল ছলিয়া
ছলায় বৃক্কের পাতা, ছলায় বনের লতা,
ছলায় শারদী নদী থাকিয়া থাকিয়া

সৌধ গবাক্ষেতে পশি বেদসিক্ত মুখশলী
কার মুছাইছে ওই আদরে গলিয়া
ওই যে মৃদুলানিল মৃদুল ছলিয়া !

৫

চঞ্চল শঠের প্রেম হীরক রতন
উপরে অমিরময় গোপনে গরল বয় ;
আপাত সুখেব পরে সংহারে জীবন !
পৃথিবী কম্পিত করি-ভূধর উপাড়ি পাড়ি
গভীর কম্বোলি নীল সাগরে যখন
ভীম ছর্নিবার ঝড় হবে নিমগন

৬

তখন কোথায় রবে এসব সম্পদ ?
ধীরে কি যমের লতা, ধীরে কি গাছেরপাতা
ধীরে কি গবাক্ষে লয়ে স্মৃতি আনন্দ
ছলিবে ? ছলাবে সব ? কোথায় নিবাসে যাবে
কৌমুদী চন্দ্রমা হাসি অমৃত আশ্রয় !
মেঘেতে মিশাবে সব হইবে বিপদ !

৭

হেসনা হেসনা এত হাসি ভাল নয়
নির্মল হৃদয়াকাশে, অমনিই হেসে হেসে
আশার সুধাংশু হয়েছিল যে উদয়,
সেই দিম সাধ করি, হেসেছি মূখভরি,
অমনি আঁধার হল এ পোড়া হৃদয়
তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয় !

৮

এট বে মধুবা নিশা নিদ্রিতা ধবণী,
নিদ্রা আসিলনা চখে, কিতাবিচ্ছিন্ন মনোরথে ?
কি ভাবনা—কাহাবে বা বলি সে কাহিনী ?
হৃদয়েব মধ্যে উঠে, হৃদয়েব মধ্যে ছুটে
হৃদয়েই লয় হব, আপনা আপনি,
কে শুনিবে অভাগা হৃৎস্বের কাহিনী ?

৯

সংসার ওড়াগ মাঝে জীবন মৃণালে
সোদর কমল নিধি, প্রতিভাব প্রতিকৃতি
বিদ্যান আদর্শ হাযর্চিল যত্ববলে,
বিকাশ হতে না হতে সুরাব ভীষণ স্রোতে
জীবন বন্ধনে মোর অতলে ডুবালে
স্বখেব প্রদীপ নিবাইয়া দিলে কালে !

১০

আশ্রয় বিহীন, লয়ে শৈশব জীবনে
অপূর্ণ পাষণ গলে, সংসার সাগর জলে,
ডুবাইছে দেহ ভাবি উৎকর্ষ বতনে
হৃদয় উৎসাহ হীন, ততশৈশবীর ক্রীণ
কি কবির কি তইবে যাব কোন স্থানে
ভাবিয়া কাদিছি নিত্য বসিয়া নির্জনে।

১১

দরিদ্র মানব চিত্ত মকভূমি প্রায়
আশা বাবি বিন্দু নাই, আশ্রয় পাদপ নাই
ভিক্ষাব আকাশে ঋণ মার্জিত পোড়ায়।
অনন্ত আকাজক্ষা মাঠে, হুবাশা পাবক উঠে
হুশিচ্ছতা বালুকাকণা হতাশে উড়ায় !
দরিদ্র মানব চিত্ত মকভূমি প্রায়।

১২

সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীব পুতুল
উত্তাপে গলিবা যার, বুমাগে জাগান দার,
নিতান্ত শৈশব প্রিয় জীবনের মূল,

বিদেশে পবেব ঘরে, পরের দাসত্ব করে,
শিক্ষার আশায় হার। বিধি প্রতিফুল !
সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীব পুতুল !

১৩

সকল স্বখেব স্রোত স্বখাবে গিয়েছে !
তব খুজে দেখি দেখি, কোন স্বখ আছে নাকি ?
আছেইত মকভূম কমল ফুটেছে !
একটি বিগুহ নালে, দুটি পুণ্ডরীক দোলে
স্ববাসে পূর্ণিত, প্রাণ কাড়িয়া লতেছে
চিব তপ্ত মকভূমে কমল ফুটেছে !

১৪

এত কালে মকভূম করি পর্যাটন
মৃগতৃষিকাব ফাঁদে গুহ বঠে কেঁদে কেঁদে
এখন পেয়েছি এক স্বধাব সদন।
যখন যন্ত্রণাতবে প্রাণ ছাড় ছাড় কবে
পৃথিবী আকাশ সম কবি দবশন,
তখন আকাশে আঁকা সূজদ বন্দন !

১৫

সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়েব নিবি,
লজ্জাব লেপনি দিয়ে, সবলতা মাখাইরে
নিভূতে নির্মাণ বুঝি কবেছিল বিধি,
কোমলহৃদয়া সতী, প্রাণয়েব প্রতিকৃতি,
দবিজ আনন্দময়ী সোহাগের নদী
সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়েব নিবি !

১৬

ভ্রমি অনাবৃত দেহে হিমালীৰ শীতে
নিদ্রাব সস্তাপে পুড়ে ভিক্ষা কবিদ্বাবে দ্বারে
দিনান্তে বদ্যপি শাই সে মুখ দেখিতে !
ভূর্গম কাস্তারে থাকি যদি শশীমুখ দেখি,
কারাগাবে বন্ধ যদি হই তার সাথে
তথাপি স্বর্গেব স্বখ তুচ্ছ করি চিতে !

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী ।

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত।

মেল বন্ধন। তাহার সময় নিরূপণ।

আত্মবক্ষিক তৎকালিক সামাজিক অবস্থা।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক-জনের দৌহিত্র। তদনুসাবে এই দুইজন পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর কুলীনপুত্র। দেবীবর বংশজ গোষ্ঠী সন্তুত। স্তত্রাং সমাজ মধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানা দেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে, যে তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয় আপামব সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদুচ্ছা প্রযুক্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমন বার্তা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথা বিহিত স্নেহ সম্ভাষণ পুংসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর বিনয় বচনে অতি নম্রভাবে

তদীয় মাতৃস্মার ত্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, বাছা জলপান কর, আমি তোমার জন্তে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে বাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃস্মার সেই কথা শুনিয়া উত্তর কবিলেন, মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কূলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কূলে পদ প্রক্ষালনও কবিনা। অতএব আপনি আহারের জন্ত আমার বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসি আপনার অন্ন পরিত্যাগ কবিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমরাগের মর্যাদার হ্রাস হয়। স্তত্রাং আপনাব অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন।

দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্লেশের পূর্বাপর সমস্ত

কাষণ শুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন কবিয়া কহিলেন বাপু, যদি যোগেশ্বর আমাব বাটীতে আসিয়া সাধা সাধনা পূৰ্ণক অন্ন দ ও বলিয়া ভোজন কবে, একপ কোন উপায় কবিতে পাব, তবেই প্রাণবন্ধা কবিব, নতুবা আমাব এ মৰ্যাদা হীন তুচ্ছজীবনে প্রয়োজন কি! দেবী বব কহিলেন মাতঃ আস্ত হও, মনেব খেদ মনেই বাধ। অ'মি প্রীতিষ্ঠা করি তেছি যে অচিরেই তোমাব মনোমালিন্য দূৰ কবিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই তাহা হইলে তোমাব নিকট এ মুখ দেখা ইব না ও জীবন রাখিব না।

দেবীববের জননী কহিলেন বাজা তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমাব পনামশ শ্রবণ কব; কালীৰ আবাধনা কব, সিদ্ধমনো রথ চইতে পাবিবে।

দেবীবব যখন দেবীব বব পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনই তাহাব নাম দেবীবব হয়। ইতি পূৰ্বে ইট'ব অস্ত্র এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহাব সে নাম লোপ পাব। তিনি দেবীবব নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। অতরাং তাঁহাব প্রকৃত নাম পাওবা যায় না। দেবীবরটী তাঁহাব উপাধি স্বরূপ ধরা যায়।

দেবীবর বাক্সিদ্ধ হইয়া কোলীনা মৰ্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাট ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পবিত্রমণ পূৰ্ণক কুলাংশে কে কত দূৰ পরিভ্রম অবস্থায় অবস্থিত আ-ছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি কবিতে লাগি-লেন। বিশেষ পর্যালোচনা ও পর্য্য-

বেক্ষণ দ্বাৰা জানিতে পারিলেন, যে কু-লীনদিগের অধিকাংশই মৎস্যগণবিহীন হইয়াছেন। তখন বিবেচনা কবিলেন, আমাব নিজেব কৃতিত্ব দেখাইবাব এই প্রকৃত অবসব ও সময়।

তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চুড়া মন্দিদিগকে আহ্বান কবিলেন। তাঁহা-দিগব নিকট কুলীন দিগব দোষোল্লেখ পূৰ্ণক কোলীনা মৰ্যাদাব পুনঃ সংস্থাবের বাবস্তার উল্লেখ কবেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য চইয়া দেবীববের অভিপ্রায়েব অন্তকল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ কবিলেন। তাহাদিগকে স্বপক্ষ পাইবা দেবীবব দিন-স্থিব কবিলেন।

যেদিন সভাৰ উপবিষ্ট হইয়া সভাম-ণ্ডলীৰ মধ্যে সকলেব গুণ বিচাব পূৰ্ণক সভাব অগ্রে মৰ্যাদা সংস্থাপন কবিলেন মনে কবিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পূৰ্বে চঠাৎ একটী দৈববাণী হঠল যে বৎস দেবীবর! তুমি যেদিন কোলীনাদিব নিষম নির্দাবণ পূৰ্ণক বিশেষ সভা কবিবে সেদিন সমস্ত দিবসেব জন্ত কো-লাস্ত্র বিষয়ে তোমাব সৰ্ব্বতোমুখী প্রভূতা থাকিবে না। তুমি তোমাব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সভাব নির্দ্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল মধ্যে কুল মৰ্যাদা প্রদান বিষয়ে অ'দ্বীতীৰ কমতালী থাকিবে; নির্দ্ধা-রিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমৰ্যাদা প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকি-বে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ

বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ মণ্ডলীর নিকট আকাশ বাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়ি-কাল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবী বব দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দলনিবদ্ধ কবেন। তদনুসারে এক একটা মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটা মেলে বিতরিত কবেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীর মুখ হইতে নিম্নলিখিত কাবিকাটা নির্গত হইয়াছিল। যথা

শশে যদি বিবাণঃ স্ত্রী-
দাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বক্ষায়াং।
তদা যোগেশ্বরে কুলং ॥

যোগেশ্বর পণ্ডিত খডদহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীর সমসাময়িক লোক। কেননা তিনি দেবীর মাস-তুত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীর বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিম্নলিখিত হন। দেবীর কেন যোগেশ্বরকে নিম্নলিখিত করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে যোগেশ্বর অনুভব করিতে পাবেন নাই। তৎপরে দেবীর অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্বার কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হন ইহা অসিদ্ধ কিম্বদন্তী।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়,

সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় কুলসম্ভূত।* ইনি দেবীর মনোদাতা গুরু ছিলেন। এই হেতু মনে করিলেন কুলমর্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীরকে অবশ্য আমার সর্বপ্রধান করিতে হইবেক। তদনুসারে তাহার অন্তঃকরণে আব একটি ভাব উদয় হইল। সে ভাবটা এই, দেবীর পরম পণ্ডিত, ও সিদ্ধ ব্যক্তি। সিদ্ধ হইলেও সে সর্বদা সর্বকর্ম্মারম্ভের পূর্বে গুরুর নাম গ্রহণ পূর্বসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চাসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া, তাহার প্রীতি-বিধান করিতে পাবি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরু দর্শনে পবন পবিত্র হইয়া আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।

এই মনস্তাগনা স্থিতি কবিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভাগণের বিনামুমতিতে উচ্চাসনে উপবেশন যে অতীব দুষ্ট ইহা দেবীর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভারা মনে কবিল দেবীর ইচ্ছার অশিষ্টতা অবগত হইয়া-ছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা

* বহুরূপঃ শুচো নায়্য অরবিন্দো।

হলায়ুধঃ।

বাঙ্গালশ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্ট-

বংশজাঃ ॥

ঐবানন্দ মিশ্র দ্বিত কুল পদ্ধতি।

আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। তথাপি সকলেই কর্ণাকর্ষিপূর্ণক তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীঘর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিক্রম করে এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীঘরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস দেবীঘর আমি তোমার গুরুদেব, যেন আমার মর্যাদা সর্বাংগে সন্মানান্বিত হইত হয়।

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবেব নিরন্তর উত্তেজনার কহিলেন, প্রভো নির্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ॥

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই,—

ডাক দিয়ে বলে দেবীঘর।

নিজুল শোভাকর ॥

ডাক দিয়ে বলে শোভাকর।

নির্কংশ দেবীঘর।

মেলমালা

এখন দেবীঘর বাহাদিগের প্রতি কুল-মর্যাদা প্রদান করিলেন ও বাহাদিগের কুলধ্বংস করিলেন তাঁহারা কতকালের লোক তদনুসারে বিচার কর। নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমানমেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।

১। যোগেশ্বর পণ্ডিত।

২। দিনকর চট্টোপাধ্যায়।

৩। হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

৫। ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। সূসেন মুখোপাধ্যায়।*

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষের গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটি ধর; প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে $25 \times 13 = 325$ বৎসরকাল পূর্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৭৯৭ উছা হইতে ৩২৫ বৎসর অন্তর কর।

১৪৭২ দেখিবে

* যোগেশ্বরো, দিনেশচ, হরিবংশধরত্বা।
পঞ্চাননো সূসেনচ বড়োতে টেক-

মেলকাঃ ॥

ধুবানন্দ মিশ্র।

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।

সূসেন হয়েন মূল বৃষ্টিংহের অংশে ॥

সূসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সঙ্গ।

জগদানন্দের সঙ্গে আইসে যে গঙ্গা ॥

পঞ্চানন পূর্বে ছিল সেই অংশে মেলা।

খড়দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা ॥

হরিবন্দ্য গয়গড় পাণ্ডী মূল হয়।

বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়

যোগেশ্বর খড়দহে বংশ সার হয়।

চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুল রয় ॥

(বলাগড়ী নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপা-

ধ্যায় কুলচক্রিকা)

যদি বার পুরুষ ধর তাহা হইলে ৩০০
তিন শত বৎসর অন্তর কর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ
হইবে এবং দেখিবে যে পঞ্চদশ শকাব্দার
শেষভাগে দেবীবরের কোলীন্য মর্যাদা
ব্যবস্থাপিত হয়। এখন দেখ ঐ সময়টি
কোন সময়; তখন কোন্ ভাবের স্রোত
চলিতেছে; তখন নবদ্বীপনিবাসী নি
মাই ভূমণ্ডলে চৈতন্য দেব বলিয়া
বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গ সমা-
জের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হই
তেছে। বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব মত সকল
হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে
প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্য দেব
লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্তির গুণ
দোষের স্তুতি নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন।
যথা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতবি।

অষ্ট চরিত্র বৎসর প্রকট বিহারী ॥

চৌদশ শতাব্দীতে জন্মের বিধান।

চৌদশ শতাব্দীতে তাহার অন্তর্ধান ॥

চৈতন্য চরিতামৃত ॥

সে সময়ে বঙ্গ সমাজের সকল বিষয়ে-
রই পরিবর্তনের সূত্রপাত। যখন স্মার্ত
চূড়ামণি বন্দ্যোপাধ্যায় বসুন্ধর ভট্টাচার্য্য
মহাশয় স্বর্গবাসী হইরা বঙ্গবাসীদিগের
নিকট মহর্ষি মনজি বিষ্ণু হারীত প্রকৃতির
জ্ঞানধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ
করিতেছেন, যে সময়টি আর একজন
মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসী-
দিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের
সময়। তখন কানা ভট্ট শিরোমণি (বসু

নাথ শিরোমণি) পঞ্চধর মিশ্রের নিকট
পাঠ সমাপ্তি পূর্বক মিথিলাহইতে জ্ঞান
শাস্ত্রের স্রোত কিরাইয়া নবদ্বীপে অংন-
য়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্বক
সর্বদেশীয় নৈমায়িক দিগেব মুখ হইতে
স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাহা বা
শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্র
বুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা কবিতোছেন।

উপরি কথিত মহোদয় দিগেব মত
সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেলবন্ধন
ও কোলীন্য মর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জ্ঞান
তামরা কান্তকূজাগত দ্বিজপঞ্চকের অধ-
স্তান বংশাবলীর উল্লেখ করিব।

বনালের কোলীন্ম মর্যাদা ব্যবস্থাপনের
ত্রয়োদশ পর্যায় অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ
পুরুষে কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্যায়ে
কন্তা সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এইটাই দেবীবরের দৃষ্টান্তে হয়। পুরন্দর
বসু এই নিয়ম স্থির কবেন। তিনি দশরথ
বসু চাইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। দেবী-
বরের পূর্বে সর্বদাবী বিবাহ প্রচলিত
ছিল। দেবীবরের সময় হইতে সমান
সমান পর্যায়ের কন্তা পুত্র বিবাহের
ব্যবস্থা হয়। পিতা বরে পুত্র ও পৌত্র
পিতা পিতামহের সমান পর্যায় থাকিয়া
কুল বন্ধা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীন দিগের মধ্যে স্বীয়
স্বীয় দলে আবার অবাস্তব ভেদ হয়।
সেটা এই;—আর্জি কেমা ও উচিত।

১. আর্জি:—শিরোভূষণ ২. কেমা:—পদভূ-

বণং । ৩ উচিতঃ সমানং । ঘটকবিশারদ
দেবীবর পিতৃ পর্যায়ের লোকের সহিত
কন্তাদানকে আর্জি শব্দে ব্যাখ্যা করেন ।
পুত্র পর্যায়ের সহিত কন্তাদানকে ক্ষেমা
শব্দে নির্ণয় করিয়াছেন । সমানে সমানে
কন্তাদানকে উচিত শব্দে নির্দেশ করেন ।
আর্জিকুল হইলে শিবোত্ত্বরণ রূপে মান্য
হন । ক্ষেমা কুল হইলে পাদভূষণ রূপে
পরিগণিত হন । উচিত কুল হইলে
দোষ গুণ কিছুই হয় না ।*

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল একপ
সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়া
ছিল । পরে এই নিয়মাহুসারে চলা
কুলীন দিগের পক্ষে অতি শ্রুতিনি বিবে-
চিত হইলে অন্ত্যস্ত ঘটক বিশারদেরা
সমান পর্যায়ের দান উত্তম বলিয়া
ব্যাখ্যা করেন । যথা

সপর্যায়ঃ সমাসাদ্য দানগ্রহণ যুক্তমং ।
কন্তাভাবে কুলত্যাগঃ প্রতিজ্ঞাবা পরম্পরং ॥

রাষ্ট্রীয় কুলীনগণ পর্যায় সমান রাধি-
বার জন্ত বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ
কুলকর্তা নিজের মর্যাদা পুত্র পৌত্র ভাতৃ-
পুত্র দিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন ।
তাহারা পিতা পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের
জ্ঞান সম্বানান্ধদীভূত পদে অবস্থান ক-
রিতে লাগিলেন তাহাদিগের গুণ দোষ-

* পিতৃস্থানঃ ভবেদাতিঃ পুত্র স্থানঃ
ক্ষেমকং ।

উচিতঃ সমানঃ স্ত্রাং জিবিধং
কুল মুচ্যতে ।
দেবীবর কারিকা ।

বরদাতার ক্ষেপে পতিত হইতে লাগিল ।
যথা

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্ত বরদাতামতস্তচ
পৌত্রস্ত ভাতৃপুত্রস্ত কুলকর্তৃর্ভবেৎকুলং ।
কুলদীপিকা

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে
পুরন্দর বসু কারককুলের সম্মান পর্যায়
লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা
করেন ।

কান্যকুজাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম
পুরুষে ধুই শুই নামক দুই সন্তানের
যৌবনকালে সমাজবদ্ধ হয় ।* তাহাদি-
গের সমাজের নাম বড়িষা টেকা ।
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কান্যকুজাগত
ব্রাহ্মণ ও কারককুলের আট দশ পুরুষ
গত হইলে, কৌলীন্য মর্যাদা সংস্থাপিত
হয় । এবং কৌলীন্য মর্যাদা সংস্থাপ-
নের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কারক-
দিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণাহুসারে
সপর্যায় বিবাহের নিয়ম হয় । সুতরাং
পূর্বাগত দুইটিকে সমষ্টি করিলে তৎকালে
কান্যকুজ দিগের ২৩ ত্রয়োবিংশতি পুরুষ
হইয়াছে ধরিতে হয় । কারকদিগের
পর্যায় বন্ধন হইতে এইক্ষণে কাহার ১২
বার কাহার বা ১৩ তের পুরুষ হইয়াছে ।
এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ ক-
রিলে তখন ইহাদিগের বার পুরুষের
সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে ঘটক

* শব্দকর ক্রমে কারকদিগের কৌলীন্য
দেখ ।

বিশাবদ দেবীবর ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্বে কুলীনদিগের মেল বন্ধন করেন।

আর একটা প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে দেবীবরের মেল বন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে।

বারেস্ত্র কুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অতেন্দ্রিয়া বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার আব এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয় তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্বকনিষ্ঠ। ইহাকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ কবিতেন।

এক সময়ে এমন বলিযাছিলেন যে, অচ্যুতের যেই মত সেই মোব সাব, আব সব পুত মোর হোক ছাবখাব,

অদ্বৈত বাক্য চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সময় হইতেই ইহাদিগের কুলের গোবব হয়। তৎকালে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয় হন। ইহাদিগের মেল (পটা) বন্ধনের পাবিপাটা এই সময় হইতেই হয়। এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা কবিলেও দেখা যায় যে তৎকাল ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। দেবীবর বীরভদ্র সংস্কেত ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকেব অন্তর্গত কবেন। বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩২৫ সওয়া তিনশত বৎসর পূর্বে দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় ৩২৫ সওয়া তিন শত বৎসরের

অগ্রবর্তী হইতে পারে না। বরং পরবর্তী হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখন দেখ সে সময় আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি না; সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না, তদনুসারে দেখা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপাধিত ব্রাহ্মণ বাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহবে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত প্রভাব বর্ণিত দেখা যায়। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

তৎকালে ভাবতেব রাজধানী হস্তিনা নগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আকবর সা অধিকৃত ছিলেন।

দেবীবর কুলীন দিগকে ৩৬ প্রধান শাখায় বিভক্ত কবেন। যথা—

১ কুলিয়া	১৯ হরি মজুমদারী
২ খডদা	২০ ত্রীবন্ধনী
৩ বল্লভী	২১ প্রমোদনী
৪ সর্কানন্দী	২২ দশবথ ঘটকী
৫ সুবাই	২৩ শুভবাজ খানী
৬ আশ্চর্য্য শেখবী	২৪ নড়িয়া
৭ পণ্ডিত বড়ী	২৫ বাব মেল
৮ বাঙ্গাল পাশ	২৬ চট্ট রাঘবী
৯ গোপাল ঘটকী	২৭ দেহাটা
১০ ছয়ান বেঙ্গী	২৮ ছয়ী
১১ বিজয় পণ্ডিত	২৯ তৈববী ঘটকী
১২ চাঁদাই	৩০ আচরিতা
১৩ মাধাই	৩১ ধরাধরী
১৪ বিদ্যাধরী	৩২ বালী
১৫ পাবিহাল	৩৩ বন্দ্যব ঘোষাল
১৬ ত্রীরঙ্গ ভট্টী	৩৪ শুক্লোসর্কানন্দী
১৭ মালধিরখানী	৩৫ সদানন্দ মানী
১৮ কাকুছী	৩৬ চন্দ্রবতী

এই ছত্রিশটা মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক; তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও বহিমা কীর্তিত হইয়া থাকে। কুন্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য কি? কৌলীনা মর্যাদার ফুলিয়া সর্বাগ্রগণ্য স্থান স্মৃতরাং স্বর্গ তুল্য। যথা

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গাথ ভিন্ন মনে অভিনাষ ॥

অবশ্য কাণ্ড।

কুন্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামেব নামে আপনার মনকে প্রকৃত মনে করিতেছেন তখন দেবীঘরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামেব প্রভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপেব সাব বলিয়া বর্ণন করিতেন না। চৈতন্য রঘুনন্দন কাণা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেল বন্ধনের পরে এসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিবোভাব হয়। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। স্মৃতরাং ১৪৫৬ সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটি যোগ করিলে

১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্বাংশের একতা হইতে পারে। ১৪৮১+৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে ত্রীতীয় ১৮৭৫ এক্ষণে এই অব্দ হইতে ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ববর্তী হইলে মেলবন্ধনের পববর্তী ১২১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই আনা যায় যে কুন্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা গঙ্গাবে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া। আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥ সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম। এক বাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম ॥ বথে চড়ি ভগীরথ যান আশ্রয়ান। আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্ত গ্রাম ॥ সপ্ত গ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান। সেস্থান হইতে গঙ্গা কবিলেন প্রয়াগ ॥*

স্মৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কুন্তিবাস মেল বন্ধনের পর রামায়ণ রচনা করেন।

একপ অমুমান যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল নহে, তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন অন্য কবিকল্পের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দবাম নিজগ্রহে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার সম্রাট পদ প্রাপ্ত হন। কবিকল্পের গ্রহে তাঁহার

* আদিকাণ্ড সপ্তমবর্ণ উক্তার রামায়ণ।

মহিমা বন্ধন বৰ্ণিত হইয়াছে তখন কবি কঙ্কণেৰ চণ্ডী বচনাৰ সময় ১৫৮৯ খৃঃ অক ধৰিতে হয়। ইহাৰ ৩০ বৎসৰ পূৰ্বে কৃত্তিবাসেৰ স্বামায়ণ বচনাব সময় নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিলে কৃত্তিবাসকে আমাৰা ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীষৱেৰ মেলবন্ধন হয় দেবী-বৰেৰ আৱাই ফুলিয়াৰ নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাসেৰ স্বগ্রামেৰ প্ৰশংসা কৰা অগৌষ্ঠিক ব লিয়া প্ৰতীয়মান হয় না; বৰং স্বদে শামুবাগেবই লক্ষণ প্ৰকাশ পায়।

কেহ কেহ একপ আপত্তি কৰিতে পাবেন যে, কবিকঙ্কণে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে তাহাব অর্থ কবিলে কবিকঙ্কণেৰ বচনাব সময় ১৪৯৯ শাক হব। যথা

শাকে বসবস বেদ শশাক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হবেব বণিতা ॥

এ শ্লোকটিকে কবির নিজেৰ বচিত বলিয়া প্ৰতীতি কৰিতে গেলে কবিকঙ্কণেৰ স্ববচনেৰ বিবোধ হয়। যথা

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাশুভ ভূম,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।

অধৰ্ম্মী বাজাৰ কালে, প্ৰজাৰ পাণেৰ ফলে,
খিলাত পাগ মাযুদ শবীপে।

কবিকঙ্কণ ॥

মেলবন্ধনেৰ পৰ ধাৰাবাহিক পুৰুষ গণনা কবিলে ১১১২ পুৰুষেৰ অতিৰিক্ত দেখিতে পাই না। সুতৰা এখন হইতে ৩০০ শত বৎসৰ মাত্ৰ কাল অগ্ৰবৰ্ত্তী হ-

ইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণেৰ সমকাল বৰ্ত্তী বলিতে হয়, কাৰণ এখন ১৭৯৭ শক ইহা হইতে ৩০০ বৎসৰ অন্তৰ কৰিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটা যদি সত্য বল তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০—৪০ বৎসবেৰ অধিক অগ্ৰবৰ্ত্তী কালৈৰ লোক। কৃত্তিবাসকে কেন আমবা কবিকঙ্কণেৰ ৩০।৪০ বৎসৰ অগ্ৰবৰ্ত্তী বলি, তাহাব কাৰণ এই কৃত্তিবাসেৰ পূৰ্বে কোন বঙ্গীয় কবি ত্ৰি পদী ছন্দবচনা কবেন নাই। উক্ত মহোদয় জয়দেব প্ৰণীত নিম্ন লিখিত গীতকে আদৰ্শ কবিয়া গীত ত্ৰিপদী বচনা করেন। পূৰ্বকালে কোন নতন বিষয় অত্যন্ত কালমধ্যে সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচাৰিত হইতে পা বিত না। তৎকালে একটি বিষয় সৰ্ব্ববাদিসম্মত কৰাইতে হইলে নানকল্পে ৩০।৪০ বৎসৰ লাগিত। তদনুসাৰেই কৃত্তিবাসকে আমবা মুকুন্দৰামেৰ ৩০।৪০ বৎসব অগ্ৰবৰ্ত্তী কহিতে ইচ্ছা কবি। কৃত্তিবাসেৰ পবেই মুকুন্দবাম লঘু ত্ৰিপদী ছন্দ গ্ৰহণ কবেন ইতি পূৰ্বে অত্ৰ কেহ গ্ৰহণ কবেন নাই।

গীত
গোবিন্দ

{ পততি পতত্ৰে বিচলতি পত্ৰে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং,
পশ্চতি ভব পহানং ॥
মুখব মধীবং, ত্যজ মজীবং,
বিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলং ॥

লঘুদ্রুপদী কথা—

বাণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।

তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্ঘ্যোগ,
কে লইবে হেন ভার ॥

রাবণ হরস্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।

গীত বামাগণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃতিবাস ॥

কিঙ্কিণী কাণ্ড।

অতরাং ঐ সংস্কৃত শ্লোকটী আমবা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা নিতান্ত উচ্চাঙ্কিত কবির রচিত বলেন, তবে উচ্চাঙ্কিত গ্রন্থ রচনার স্বভাবপাত্রে কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খ্রীঃ অঃ ১৫৭৫) ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে হইতে সমাজে অবস্থা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে একরূপ নিশ্চয় হইল, যে দেবীবর ও যোগেশ্বর ৩২৫ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছেন। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব-নামক স্মৃতির নিয়মামুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীক্ষিত গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা জ্ঞান শাস্ত্রের চর্চার প্রকৃত পথ পরিচিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অজ্ঞানদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন

বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তামুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈত বাদের বীজ বোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ পুনঃপ্রবর্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাসধর্ম যে অস্ত বর্ণের বিশেষ প্রতীক্ষিত নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতি যোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মজী মুললমান বংশোদ্ভব রূপ সনাতনেব দৃষ্টান্ত অনুসারে অনেক মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব জাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে দেখিতে হয়, ইহা এই সময়েই প্রথমতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের হৃদয়ে হয়। এই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমান দিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দুদিগের মাথা-গণতিকর (জীজীয়া নামক কর) ও তীর্থ যাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দু ভূপতি তোড়রমল্লকর্তৃক কর সংগ্রহের স্বাবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই সময়েই

শশে যদি বিষাণঃ শ্রা

দাকাশে কুসুমং যদি

সুতো যদিচ বজ্রায়াং

তদা যোগেশ্বরে কুলং

এই পাঠের পরিবর্তে “তদা যোগেশ্বরে কুলং” এইরূপ পাঠ স্থির হয়।

ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তর্স্থিত
একারের পর অকারের লোপ পায় এই
সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্যসমর্থন পূর্বক
যোগেশ্বরের কুলরক্ষা হয়। "

দেবীবর বাঞ্চাল ঘটক ছিলেন। তিনি
নিমেষস্থান তাঁহার মেলবন্ধন ধারাই তিনি
লোক সমাজে দেবীপ্যমান রহিয়াছেন।
দেবীবরের পিতার নাম সর্বানন্দ ঘটক,
পিতা মহের নাম (লক্ষণ) লখাই। প্রপিতা-
মহের নাম আনো বা অনন্ত। বৃদ্ধ
প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়।
সঙ্কেত লাগরের ভাই।

কেহ কেহ বলেন বাবেঞ্জ কুলের মধু
মৈত্রের, ধের (ধেঞী) বাগ্‌চী, উদয়না-
চার্য্য ভাহুড়ি, মণ্ডল মিশ্র প্রভৃতি কয়েক
জন প্রসিদ্ধ লোক, দেবী বরের কিশ্বিংকাল
পূর্বে জীবিত ছিলেন।

যধু মৈত্ৰেয় হইতে কাণেব স্ৰষ্টি। ইনি

শাস্তি পুরের গোবামী দিগের ঘরে বিবাহ করেন। খেণ্ডী বাগ্‌চী ইহার ভগিনী-পতি। উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ি বারেক্রবংশে কংশনারায়ণ কুলাচার্য্য একজন প্রবলপ্রভু-পাশ্বিত সমৃদ্ধিশালী জমিদার মণ্ডল মিশ্র বারেক্রবংশের কুলাচার্য্য; উদয়নাচার্য্যের নীলাবতীনাম্নী কস্তার পাণি গ্রহণ করেন। তদ্বারা মধু মৈত্রৈয়ের কুল রক্ষা পায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কাপ হন। শাস্তিপুত্রের পক্ষের সম্ভানগণ কুলীন থাকিলেন। মধুমৈত্রৈয় অদ্বৈতেব ভগিনীপতি। অদ্বৈতেব পিতার নাম নৃসিংহ লাড়ুলী। নৃসিংহের পুত্র অদ্বৈতেব সহচর। নিত্যানন্দের পুত্র বীবভদ্র। দেবী বর বীব ভদ্রেব সমকালীন লোক স্ততরাং দেবীববকে আগরা চৈতন্যেব গববস্তী বলি।

ঐশ্বৰ্য্যমোহন শৰ্মা



উত্তর ।

নিবৃক্ নিবৃক্ শ্রিমে! দাও তাবে নিবিবারে
আশাব প্রাপ্তি ;

এই ত নিবিত্তেছিল, কেন তারে উজ্জ্বলিলে,
নিবুক্ সে আলো, আমি
ডুবি এই শারাবারে।

କତ ଦିନ, କତ ମାସ, କତ ବର୍ଷ, ସ୍ୱଗତ,—
କତ ଯୁଗାନ୍ତର;

এই আগে লক্ষ্য করি, জীবন'সিদ্ধর নীরে,
 দ্বিবস যামিনী প্রিয়ে !
 তাসিয়াছি অনিবার !

৩
এখন সে আশা আলো, হায়। দূর দরশন,
সুদূর!—স্বপন।
কতবার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই
চকোবের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পবশন।

৪
কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ দেশান্তরে
জাগতে নিদ্রায়,—
স্থিৎ নেয়ে অনুক্ষণ, কবিতা ছি দ্বন্দ্বন,
এই আশা আলো প্রিয়ে,
হায়বে! বিষাদ ভবে।

৫
প্রচণ্ড তপন দ্রাস, কালের তিমিরে হায়।
এই ক্ষীণালোক,
হয়ে ক্রমে ক্ষীণতব, হতেছিল নির্দোষিত,
কেন অকারণ প্রাণে
আলাইলে পুনবার?

৬
নিবৃক্—নিবৃক্ প্রিয়, দাও তারে নিবিবাবে
আলিও না আর;
উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত জীবন জলে,
অন্ত থাক শেষ তারা,
হক্ সব অন্ধকার!

৭
“পাষণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—”
আনি প্রিয়তমে।
“পাষণ মীনব মন, সময়েতে সব সয়,”
কিন্তু সে পাষণ মন
আশা ছাড়িবার নয়।

৮
প্রেমেব অমর বর্ণে, আশাব কোনল করে,
চিহ্নিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রকালনে,
পাষণ মনের ছবি
প্রকালিতে নাহি পাবে।

৯
আশার আলোকে, যেই, বিশ্ব বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষণে,
পাষণ হৃদয়ে ধবি, ভাসি আশালোক চেয়ে
আশাময়ী আলিঙ্গনে
তরলিত হয় যদি।

১০
কিমে আশা?—কারছবি? জীবন কাহার ধান
বলিব কেমনে?
বলিব কেমনে হায়। প্রেমসি তোমাব কাছে
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী—তুমি প্রাণ?

১১
কমাকর প্রিয়তমে, ছরাশয়ে মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামব;
কমাকর দয়াময়ি, বিদীর্ণ-হৃদয় জনে,
কমাকব কলপ্রভা।
উন্মত্ত প্রলাপবাণী।

১২
হায় যেই আশা স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে ময়
ছিল লুক্কায়িত,
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তর বাসী,
আদবে রাখিয়াছিহু
দরিলেব ধন সম।

১৩

“পাষণ মানব মন, সময়েতে সব সন্ন—”

ওনিলাম হবে

শোণিতে বিভলি কলি, হৃদয় বিদীর্ণ হলো,

আজি সেই স্বপ্ন কথা

হইল অগত ময়।

১৪

নির্দীপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি

বিশৃঙ্খল উজ্জ্বল!

আবার পাষণে প্রিয়ে, তব চিত্র দেখা দিল,

জীবন সিন্ধুর জল

হাসিল আলোকে সাজি।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা প্রিয়ে, যাবে দিন যাবে মাস,

বর্ষ যুগান্তর;

ফলিবেনা আশাময়, জীবনের এই তীরে,

কিন্তু অতীবে, প্রিয়ে!

পুণ্যইব অভিনায।



আদিম মনুষ্য।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বাসপন্ন হইতে হয়। এই ক্ষমতা কেবল মাত্র বুদ্ধিসত্ত্ব, বস্তুতঃ শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক জন্তু অপেক্ষা হীনকর। কত শত বৎসরে মনুষ্যবুদ্ধি চালিত ও মার্জিত হইয়া যে বাস্তবিক কল ও তড়িতবার্তাবহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোন পূর্বাবৃত্ত নাই। মনুষ্যজাতি এত কাল পৃথিবীতে বর্তমান আছে তাহার সহিত তুলনার ঐতিহাসিক কাল গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অযথা উক্তি হয় না। যে সকল লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্টি খ্রীষ্ট জন্মের কেবল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে নির্দেশ করেন তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ ভ্রাম্যক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যজাতি শত শত শতাব্দী পূর্বে এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।

কোন এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা সাহায্যে উন্নতি সাধনে আবোহণ করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত; মনুষ্য হীনাশ্রয় প্রাপ্ত হইলে অসভ্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও কোন না কোন স্রমোগ পাইয়া মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বলে সভ্যপদাঙ্ক হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা মীমাংসা করা কঠিন। লিখিত ইতিহাস অতি সামান্য কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫০০

বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যজাতিগণের সহিত ইউরোপীয় অসভ্য জাতিগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০০ বৎসর ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে অসভ্য জাতীয় লোকের সহিত সভ্যজাতীয় লোকেব সাক্ষাৎ হয় সেই সময় হইতেই অসভ্যজাতির অবস্থা পূর্ব-মত থাকে না স্ত্রতবাং ঐতিহাস বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপরোক্ত দুই মতের কোন এক মতের পোষকতা করা সুকঠিন। পরন্তু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোন অনিবার্য প্রতিকূলক নাই সেই সেই স্থানে মনুষ্যের বুদ্ধি ও কার্য কুশলতা উত্তরোত্তর পরিপকতালভ করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের প্রথমে যদিও গ্রীক, রোমক ও হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়া ছিল কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয়গণের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। যদি মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার্য হইতে পারে যে আদিম মনুষ্য ঐতিহাসিক কালেব মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকর ছিল। অকাটা প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিবিবৃত্ত হইয়াছে যে আদিমাবস্থার মনুষ্যজাতি সমূহ নিঃসহায় ও আত্মরক্ষা জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে এক প্রকার পশাদির রাজত্ব ছিল। তখন আহাৰ্য্যবষণ ও আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্যের যত সময় অতি-

বাহিত হইত। যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই সময়ের উন্নতির জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুষ্যের আদিমাবস্থার কোন লিখিত পুর্নাবৃত্ত নাই। কিন্তু পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্বারা তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্তমান শতাব্দীতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত্তকালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্বকালে মানবজাতি বাটানিশ্চাণকৌশল জানিত না। আত্মরক্ষাব উপাযান্তর না থাকায় গিরিগুহার বাস করিত; ক্রমে পর্ত্তাবৃত্ত স্থান সকল অধিকৃত করিয়াছিল ও সুবিধা মত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নিশ্চাণ করিয়া তথায় বাস করিত। এই সকল গিরিগুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থানে ও তাৎকালিক সমাধি মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দ্বারা আদিম মনুষ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডারউইন, হক্‌সলি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু

মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুষ্য ও বানর স্বতন্ত্র জাতি। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুষ্যের সন্ততি নহে। ঐতিহাসিক কালে বা তৎপূর্বে বানরের অবস্থা যে কখন উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বানর চিরকালই শাখামৃগ আছে। তাহাব হস্ত পদাদি গঠন স্বতন্ত্র। বানর কখনই অগ্নিব ব্যবহার জানে না ও শিখিতেও পারে না, বানর কখনই বন্ধন পদ্ধতি শিখিতে পারিবে না ও এপর্যন্ত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত কবিতো পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে মনুষ্যের উন্নতি ইচ্ছা নাই। প্রথমে মনুষ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণে সকল সময় অতিবাহিত কবিত। অতি আগ্রাসে ও বহুকষ্টে দিনে বন্য পশুবাপক মাংসে উদর পূরিত কবিত, সময় বিশেষে মনুষ্য মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুবেব মাংস তাহাব অভক্ষ্য ছিল না। ক্রমে অগ্নিব আবিষ্কৃতি হইল, তখন দগ্ধ মাংস ভোজন, প্রস্তুত নির্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির গঠন ও ব্যবহার ও পশুদি পালন আবস্ত হইল। তৎপবে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষি কার্যের আরম্ভ, শেষে লৌহেব আবিষ্কৃতি ও কৃষি কার্যের উন্নতি। গুহাবাসী মনুষ্য পর্যায় ক্রমে শিকারী, পশুপালক, কৃষিজীবী হইয়া শেষে বাহ্যিক সমস্ত

বিষয়ে নিকষেগ হইয়া আনোপার্জনে সক্ষম হইয়াছে। মনুষ্য প্রথমে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে মনুষ্য পৃথিবীর অধিপতি। জ্ঞানবলে মনুষ্যের অবস্থাব আরও যে কত উন্নতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ইউরোপখণ্ডে গিবিগুহা প্রভৃতি পূর্ব কালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধিমন্দিবে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্বা পণ্ডিতেরা স্থিৰ করিবাছেন, যে আদিম মনুষ্যের পূর্বাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত কবা যাইতে পারে, প্রথম প্রস্তব কাল, দ্বিতীয় ধাতু কাল। ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব উপসংহার কবা যাইতেছে।

১ম প্রস্তব কাল—এই কালে কোন ধাতুব আবিষ্কৃতি হয় নাই। মনুষ্য ধাতুব ব্যবহার জানিত না। এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমুদায় প্রস্তব নির্মিত। কোনে অস্ত্র পশাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্মিত। এই কাল তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম কাল ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত হস্তী ও গুহাহিত ভল্লুক, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড জীব সকল বর্তমান ছিল। এই সকল জন্ত এক্ষণে পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এককালে তাহারাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত ও অতি কষ্টে সামান্য

প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এই সময় কেবল গিরিগুহাই মনুষ্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে কেশরবৃদ্ধ হস্তী প্রভৃতি নড় পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ তখনও হিমপ্রধান দেশ ছিল। বেনেডিক্টর প্রভৃতি যে সকল পণ্ড এক্ষণে হিম প্রধান দেশে আশ্রয় পাইরাছে, এই সময়ে তাহারা ইউরোপের প্রায় সকল দেশে বিচরণ করিত। এই কালে মনুষ্য পূর্বাপেক্ষা নির্ভর হইয়া ছিল। গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া পর্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদ মধ্যে দ্বীপ নির্মাণ করতঃ তথায় কাষ্ঠ ও চৰ্ম্ম নির্মিত কুটার প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। এই কালের অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তর ও বেনেডিক্টরের শূল নির্মিত দেখা যায়। এই কালে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে মনুষ্য শিকারে বিশেষ পটু ছিল। তৃতীয় পোষিত পশুর কাল। এই কালে গো অথ কুকুর প্রভৃতি অনেক পশু মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক আহার বিষয়ে মনুষ্যের পূর্বমত অনিশ্চিত ছিল না কিন্তু পশুপালনের সুবিধা জন্য সময়ে২ বাস পরিবর্তন করিতে হইত। এই সময়ের প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাট্য ও বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়।

২য় ধাতুকাল। এই কাল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার

শিথিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখিতে পারে নাই। Bronze বা পিত্তল প্রস্তুত করা অতি সহজ কিন্তু ধনিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সহজ নহে। ধাতুর আবিষ্কার হইলে পর প্রথমতঃ কেবল পিত্তল নির্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ নির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায় না; এই কালে কৃষিকার্যের আরম্ভ হইয়া থাকিবে কাবণ কেবল কৃষিকার্যোপযোগী পিত্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কালে মনুষ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় কিন্তু পিত্তলের দ্রব্যাদি ব্যবহারজনিত অনেক কার্যের অসুবিধাও ঘটিত। শেষে লৌহের আবিষ্কার হয়। কি প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মনুষ্যের পরিচিত হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অভাব অমুভূত হইলেই মনুষ্য বুদ্ধি স্বয়ং অভাব পূরণ করে। লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হওনাবধি মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ। মনুষ্য জাতি লৌহের নিকট যে কত প্রকার ধনী আছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় লৌহের আবিষ্কার না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিসর, মেক্সিকো ও পেরুদেশের আদিম সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপদস্থ থাকিত।

কুঞ্জবনে কমলিনী ।

১

না আইল কালাচাঁদ, যার বে বামিনী;
কুঞ্জবনে কমলিনী হইল মলিনী;
দেখা দিল সুখভারা, না উদিল সুখভারা,
কেন নাহি কান্তিহারা হইবে কামিনী ?

২

সুরশর অর অর ক্লান্ত কলেবর;
কম্পমান অলুক্ষণ হিয়া ধর ধর,
আশামাশে হীনবল, তনুতরী ঠলমল,
আঁখি করে ছল ছল বিপদে বিস্তর ।

৩

কতক্ষেপে মনকথা অতি দীর্ঘে ধীরে
কহিল। কাতরে রামা, সঘোষি সখীরে ।
কেনা ভান্ধে-সিদ্ধনারী, হৃদয়ে ধরিতে নারি,
বর্ষাপমে ফেলে বাব উছলিয়া ভীবে ?

(প্রভাতের তারা)

১

সখিলো
বিকলে রজনী যায় প্রাপকান্ত এল না ।
এ মনেব ঘোবতব প্রেমজালা গেল না ।
ওই দেখ সুখভারা, দিবাদুতী দিব্যাকারা,
আমারে করিতে সারা, বিকশিত বদনা,
নিশার আঁধার বাবে, আমাবে আঁধারে পাবে,
সহে না সজনি আর এ বিষম যাতনা ।

২

সখিলো
অচিরে উদয়াচলে হৈম উষা হাসিবে,
আমার সকল আশা একেবারে নাশিবে ।

হেরি তার মল হাসি, যেনরে জলদরাশি,
শরীরে প্রবেশি আসি, সুখশশী প্রাসিবে ।
দেবতা হইরা কেন, তাহার স্মৃতির হেন ?
উচ্চ কি নীচের চুখে রত্নরসে ভাসিবে ?

৩

সখিলো

কেন আজি রসরাজ আসিবারে তুলিল ?
মিছা অঙ্গীকার করি এদাসীরে চলিল ?
বল, সেই, বল, বল, দেহে আর নাহি বল,
বিকল হিয়াব কল, একি ভাব ধরিল ?
অথবা কি দেখি দোষ, শ্রাম করিয়াছে রোষ ?
অভাগিনী সে চরণে কিসে দোষী হইল ?

৪

সখিলো

শুনিব না আর কি লো সে মধুর বচন ?
দোষবনা আর কি সে প্রেমোৎকল লোচন ?
আব কিসে মুখে হাসি, মেঘে সৌদামিনীরশি
সকালে বিকাশি আসি, রঞ্জিবেনা জীবন ?
আব কি প্রণয়োল্লাসে, বসিয়া আমার পাশে,
তুষিতে আমারে নাথ কবিবে না যতন ?

৫

সখিলো

সে অঙ্গ—পরশে পুনঃ বহিবে কি শরীরে
সুধাময় সুখানিল নিম্নি মল্ল সমীরে ?
পাইয়া নূতন বল, হৃদয় জলধিজল
উথলিয়া ঢল ঢল করিবে কি অঁচিরে ?
লোমাবলী কলেবরে, শিহরিকি প্রেমভরে,
মনের আনন্দ পুনঃ প্রকাশিবে বাহিরে ?

৬

সখিলো

ওই দেখ জলধর রোবাবেশে আসিয়া
অর্ণবরী স্তম্ভতায়া ফেলিল লো গ্রাসিয়া ।
আমাব অন্তরাক্ষে যেতগেব তাবা হাসে,
সেও লো বিবহগ্রাস যুতপ্রার বিধিয়া ।
পশি যেন বাছা কবে, বিম্বতির সর্বোবরে,
যাই যেন একেবাবে অন্ধকাবে মিশিয়া ।

৭

সখিলো

সখিল জলদলঃ নাচিলিল দেখ না
প্রভাতেব প্রিযতায়া প্রফুল্লিত-বদনা ।
ঘটিবে কি এ কণ লে, বিচ্ছেদ-বারিদজালে
ছেদিতে পাবিব কালে, বল, সই, বল না ?
হুর্ল অবশ্য তম্বু, প্রতিকণে হর তম্বু;
কোথা পাব নব বল পুঁবিত্তে এ বাসনা ?

(অস্তাচলগামী চন্দ্র)

১

ওই দেখ লাডাইয়া আকাশের পাশে
যামিনী বিলাসী;
পাণ্ডুর কলসবর, কাপিতেছে ধর ধর,
কপোল নয়নজলে সাইতেছে ভাসি,
ছাড়িতে-প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া;
প্রেমবিনা এ সংসার অন্ধকার বাসি,
কেমনে গোকুল চাঁদ ভুলিল আশারে ?
বিষের জলান জলি ভব কারাগারে ।

২

বিরহ রাহুর ভয়ে শশীর এলনা

গগন অন্তলে,

দেবতার বুদ্ধি হত, রাহুবেব সহে কত,
হুর্ল মানব কুল সকলেই বলে,

অবলা মজ্জেন নারী; বজ্রণা সহিতে নারি,
জীবন জলিছে যেন বাডব অনলে,
বল স্বজনিলো বল বাঁচিব কেমনে ?
অথবা মরণ ভাল প্রেমের বিহনে ।

৩

প্রেমের কমল, হার, মানস সরসে

ফুটিবে কি আর ?

হৃদয় গগনরবি, সংসারবজ্র-ছবি,
উষাব সহিত দেখা দিবে কি আবার ?
লোকে মোবে কমলিনী, বলেবেন নিতম্বিনি ?
আমাবে যেবিয়া আছে চিব অন্ধকাব ।
এ নিশাব অধসান হবে কিলো সই ?
আব কার কাছে মোর মনকণা কই ।

৪

কেন সই তোর আঁখি করে হল হল

বল না আমাবে ?

কি ভাবি হৃদয়ে তোব, উথলে যরণাঘোর ?
কিসে তোর ক্লম্মুখ গ্রাসিল আঁধারে ?
বুঝিলাম ঘোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,
সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিস্তারে ।
যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে কুলকুল;
বথায় শীতের গতি, মৌসুম্য নিশ্চল ।

৫

স্বজনিলো সরোবরে দেখনা কাঁপিতে

ভয়ে কুমুদিনী,

নয়ন মুদিত প্রায়, যেন অবসন্ন কায়,
নাথ বার, বলি হার, এমন মলিনী ।
না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ
যাপিতে হইল মম বিবম যামিনী ।
নিশা ভো হইল গত, বিবহ না বার ।
কেন হরি নিদাকুল হইলে আমার ?

৩
বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস,
বুঝাবন ধন ।
কত প্রেমকথা করে, আমার ক্ষদ্রে লবে,
কবিত্তে পুলক করে সাদবে চুখন ।
একেবারে স্নানবৎ, হইল কি সে তাবৎ ?
অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন ?
অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনি ।

(কোকিল)

১
ওই গুন, স্বদনিলো, সুললিত হবে
কে যেন গাইছে গীত, বিহবি অধরে,
রাগের তরঙ্গ উঠে, যথা পুতধারা ছুটে
বিষ্ণু পাদপদ্ম ছুটে, যবে মোক্ষতরে
বাধিতে আশাব সেতু, পাণবিনাশের হেতু,
উড়াতে ধর্মের কেতু, এ বিশ্ব ভিতরে,
বিশ্বরূপ নিরঞ্জন, সৃজিতা সর্ষমন
জ্যোতির্গম্যী নীরময়ী গঙ্গার সত্তরে ।

২
সঙ্গীত গাইবা যদি ভ্রমিছ গগনে
দয়াময় দেব কেহ, নিবেদি চরণে ;—
কহ এ দাসীকথা, নীলকান্তমণি যথা,
শুনিলে অবশ্য ব্যথা হবে তাঁর মনে ।
না পাইয়া কালাচাঁদে, বৃকভাঙ্গু হুতা কাদে,
পড়িয়া বিষম ফাঁদে বিরহ দহনে ;
অবসন্ন কলেবর, কান্ধিতেছে নিরস্তর,
ব্যাকুল বিকল প্রাণ মিকুল কাননে ।

৩
যে বরণা অলিতেছে কদরে আমার,
নিবাইব কি প্রকারে ? এ রে অমিরার ।

শরীরে চন্দন দানে, বোধ হয় অগ্নি হানে;
সলিল মৃণাল ছানে নাহি প্রতীকার ।
পদ্মপত্র পদ্মদলে, বিগুণ এ দেহ অলে;
চন্দ্র যেন হলাহলে বর্ষে বারম্বার,
মলয় পবন ছায়া, হইরাছে উষ্ণ কান্দা,—
ছায় বিধি ঘটাইলে কি ঘোর বিকাব !

৪
শুন পুনঃ, সহচবি, কে আবার গায় ?
এ বুঝি বসন্তসুখা অমৃত চড়াব ।
যোর হৃথে পিকবব, হইয়া কি সকাহব,
এরূপ বিলাপ কব, বল না আমার :
দেখিবা আমার মুখ, তোমাব কি নাহি শ্রুথ,
মলিন কি তব মুখ হইরাছে হার ?
যে যাহারে ভাল বাসে, তাব হৃথে হৃথে ভাসে,
প্রণয়ের এই বীতি সত্যত ধবার ।

৫
ভাল বাস মোবে তুমি জানি হে কোকিল,
বরষিতে তুমি হেথা সুস্বব সলিল,
যখন শ্যামের সনে, যদি হৃথে একাসনে,
প্রণয়ের আলাপনে আভিল গাভিল,
বকিতাম কব কত, মন্তভাবে অবিরত,
বর্ষাবাবি শ্রোতমত উল্লাসে আবিল,
আনন্দ তবঙ্গ সঙ্গে, উৎসাহে অস্তব সঙ্গে,
লোমাক্ষিত কলেবর পুলকে শিথিল ।

৬
হে পিক, তোমাব ডাকে আসেন তপন,
প্রফুল্লিত করবারে নলিনীবদন,
শুনিলে তোমার গীত, বসন্ত হইয়া প্রীত,
কিতরের চারিত্তিতে সৌন্দর্য্য শোভন ;
নরে রাই কমলিনী, অহঙ্কণ বিবাদিনী,
অকৃত্যাগ বিলাসিনী করে ঘন ঘন ;

তাহার বসন্ত রবি, বিশ্ববিমোহন ছবি,
আনি দেহ মধুবু, যৌর নিবেদন ।

(উষা)

১

সৌরভ মণ্ডিত হেম কলেবর;
কপালে উজল তারকা অলে;
কোকিল কুজন ভাব মনোহর;
বিকচ কুম্ম মালিকা গলে,
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

২

শ্রেণে প্রিয়কর বিকশিত হাসি,
বদন বসন খুলিয়া ধীরে,
অলি গুন গুন মধুর সস্তাষি,
নাচয়ে নলিনী সরসীনীবে ।
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

৩

রসে টস্ টস্ বসন্ত বরষী
গাঁথিয়া পরিয়া ফুলের হার,
প্রিয় চূততরু অড়াইয়া ধরি
বিস্তারি হৃথের অগুরু ভার ।
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোকবসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

৪

রসাল মঞ্জরী, বকুলের ফুল,
ফুটিয়া কেমন রয়েছে গাছে;
চুড়িয়া আনন্দে দেব অলিফুল
গুঞ্জরিয়া গান করিছে কাছে ।
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

৫

বিগত বিরহ নিশা অবসানে
চক্রবাক্ যুগ সহর্বস্থখে,
চাহে পবন্যর গরল্যর পানে,
মগন নূতন প্রণয় স্থখে ।
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

৬

মিলনে সকলে পুলকে বিহ্বল,
নাহিক মিলন এ পোড়া ভালে;
আমায় কেবল, ঘেবে অধিবল,
বিষম বিরহ তিমির জালে ।
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা ।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিহু এ বেশ ভূষা ।

(মলয়ানিল)

১

বন পরিমল বাসিত নীতল
মলয় অনিল মধুরভাষী,

“দিনেশ আইল,” বলিতে ধাইল;
বন্ধে কুলকুল আনন্দে হাসি।
কি কাজ সমীর একুশে আসি?
বাহু কি বহিতে বিবাহরাশি?

২

অবলা বালার, হেথাঘ জালায়—
বিকট কবল বিবহানল;
হিয়া উথলিয়া, নয়নাস্ত দিবা
বহে অবিরল শোকাশ্রুজল;
নাথের বিহনে হারাই বল
কেমনে অধীনী সহে সকল?

৩

আশ্রয় বিহনে ভবের ভবনে,
রমণী বাঁচিয়া রহে কেমনে?
লতিকা ললিতা, ওকর আশ্রিতা;
চপলা নিয়ত জড়িত বনে;

নলিনী জীবিত সরজীবনে;
কৌশুদীর স্থান চতু বদনে।

৪

জানি এসকল, দলে অবিরল,
রমণী মণ্ডলে পুকষ দল;
ফিবে ফুল কুল, জিনি অনিকুল,
জিনিয়া অনিল, সদা চপল,
নূতন অমিবে চাহে কেবল।
না গণি আশ্রিত জন কুশল।

৫

নির্ম্মম এমন, তথাপি আনন
সতত সুধার সুধারা চালে;
কথায় ভূলায়, অবলা, বালার,
কেমন মোহন মায়ার জালে।
জদে হলাহল অমির গালে;
জুটিয়াছে ভাল নারীব ভালে।



রজনী।

চতুর্থ খণ্ড।

(পুনর্জীব পটীক্স বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্য হাবাইরা, কিছুদিন পবে আমি
পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দাবিজ্যো
পতনে, মনে কোন বিকার উপস্থিত
হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজ্ঞা এই পীড়ার
উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন
চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ
বলিব।

সন্ধ্যাব পূর্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত
হইলে পব, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্য-
য়ন করিতে ছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্য-
য়ন করিয়াছিলাম। জগতের হুহু গুণ
তব্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম।
কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছু-
তেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত
পড়ি তত পড়িতে সাধ করে। শেষ

প্রাতি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হাতে লইয়া, চিত্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিজার ভায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে; ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহু বস্ত সকলই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে, প্রভাতবীচিক্ষেপচপলা কল কল নাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা উষার উজ্জল বর্ণে পূর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—বেশি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, সৈকত-মূলে, রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কৃষ্ণিতক্ৰ, বিকলা, অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিনীতলা ভাগীরথীর স্নায় গঙ্গীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর স্নায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবযুগ্মরীর সুগন্ধের স্নায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের স্নায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনী! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীবে রজনী, ধীরে! কুমি সর্ষভ্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী,—সুবদনী, সুহাসিনী—

আমার মুচ্ছা হইল। মুচ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। বাহা পক্ষাৎ

গুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্বার চেতন প্রাপ্ত হইলাম, তখন স্নানিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই যুগ্মনাদিনী গঙ্গা, আর সেই যুগ্মগামিনী রজনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদ্রিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! বিপত্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে। উর্দ্ধে চাহিলাম—উর্দ্ধেও আকাশবিহারিনী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিনী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অনাদিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরন্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনী রূপ তিলেক জমা অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি বোগ বলিয়া—চিকিৎসকেণা কি চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ওহে ধীবে, রজনী ধীবে! ধীবে, ধীরে,
আমাব এত দয়ামন্দিরে প্রবেশ কব।
এত ক্রতগামিনী কেন ? তুমি অন্ধ পথ
চেন না, ধীবে, রজনী ধীবে। ক্ষুদ্রা এত
পুৰী, আঁধার, আঁধাব, আঁধার! চিৎকার!
শীপশলাকাব ন্যায্যইহাতে প্রবেশ
করিয়া আলো কব;—শীপশলাকাব দ্বার
আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধাব পুরী
আলো করিবে।

ওহে ধীবে, রজনী ধীরে! এ পুরী
আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে
জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—
তোমার ত পাষণগঠিতা, পাষণময়ী
জানিতাম, কে জানে যে পাষণেও দাহ
করিবে? অথবা কে না জানে পাষণ ও
লৌহের সংঘর্ষেই অগ্ন্যুৎপাত?—
তোমার প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরদুর্দর্শন,
প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি শুভই দেখি, ততট
দেখিতে ইচ্ছা হব। অহুদিন, পলকে
পলকে, দেখিয়াও যেন হয় দেখিলাম
কই? আবার দেখি। আবার দেখি,
কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

শীড়িতাবস্থায়, আমি প্রায় কাহারও
সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা
কহিতে আসিলে তাল নাগিত না।
রজনীর কথা যুগে আনিতাম না—কিন্তু
প্রাণপকালীন কি বলিতাম না বলিতাম,

তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতে পারি না।
প্রাণপোক্তি সচবাচরই ষটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শু-
ইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহা
বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম,
সমবক্ষেত্রে যবন নিপাত চইতেছে—
বক্ষে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম,
সুবর্ণ প্রান্তরে হীৰক বৃক্ষে শুবকে শুবকে
নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম,
আকাশনাগ, অষ্টশলিসমস্থিত শনৈশ্চর
মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর
মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ
সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল—
আঘাতোৎপন্ন বলিতে সে সকল জলিয়া
উঠিয়া, দহমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্ব-
মণ্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে।
কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ময়
কান্তরূপধর দেবদোনিব মূর্তিতে পরিপূর্ণ;
তাহারা অবিরত অক্ষর পথ প্রভাসিত
করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের
অঙ্গের নৌরভে আমাব নাসারক্ত পরি-
পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বাহাই দেখি না
—সকলের মধ্যস্থলে—বঙ্গনীর সেই
প্রস্তবময়ী মূর্তি দেখিতে পাইতাম। হায়!
রজনী! পাথবে এত আশুন!

ধীরে, রজনী, ধীরে। ধীরে, ধীরে,
রজনী, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর।
দেখ, আমার দেখ, আমি তোমায় দেখি!
ঐ দেখিতেছি—তোমার ময়নপদ্ম ক্রমে
প্রকৃতি হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে,
ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, নরনারাজীর

ফুটিতেছে! এ সংসারের কাহার না নয়ন আছে? গো, মেঘ, কুকুর, মাক্কার, ইহা-দিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই?

নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।



শিবজি ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মুসলমান রাজত্বকালে আর্ধ্যকালে যে সকল বীরগণ জয়পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বোধ হয়, কেহই শিবজির ন্যায় ক্ষমতামণ্ডলী ছিলেন না। তিনি কেবল ভারতবিজয়ী মোগল পতাকা দলিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এমনত নহে; তিনি স্বজাতিকে একরূপ সজীব ও সতেজ করিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর অন্তর্যকাল পরেই মহারাষ্ট্র-দিগের প্রাচ্যে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত স্থল কম্পাঙ্কিত হইয়াছিল। ঐদৃশ মহাক্ষার জীবনচরিত যত পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই উপকার লাভের সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিবরে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বালাকালে আমরা বৃদ্ধলোকের মুখে যে বর্ণিদিগের দৌরাণ্য বৃত্তান্ত শুনিতাম, তাহাদিগের অপর নাম মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাট্টা। মহারাষ্ট্র প্রদেশের পূর্বসীমা বরদা নদী; উত্তর সীমা সাতপুর গিরিমালা; পশ্চিম সীমা সাগর; দক্ষিণ সীমা গোয়ানগর হইতে মাণিক জুর্গ পর্যন্ত

একটি কলিত বক্ররেখা। এই ভূভাগে সম্ভ্রান্তি বা ঘাট পর্বত সমুদ্রসলিল হইতে দুই তিন সহস্র হস্ত উর্দ্ধে শৃঙ্গ নিকর তুলিয়া সিঙ্কুলকে পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দক্ষিণোক্তর ধাবিত হইয়াছে। শৈল-পদতল হইতে অর্ধবতীর পর্যন্ত ভূমিখণ্ডের নাম কঙ্কণ: তথায় নিবিড় কানন, উচ্চপর্বত, শ্রুত ক্ষুদ্র নদী, ছুরারোহ গিরিসঙ্কট, প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। পার্বত্যের বিভাগে অনেক গুলি স্বাভাবিক জুর্গ আছে; অগ্নাবাসেই সেগুলিকে ভূভেদ্য করা যায়।

সাধারণতঃ মহারাষ্ট্র শৈলময়; এবং তাহার জল বায়ু এত উষ্ণ যে বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাপি এমন নাই। এই প্রদেশে নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা এবং কৃষ্ণা প্রবাহিতা রহিয়াছে; এই সকল নদীর উত্তর কূলস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্বরা; এবং তথায় অনেক শস্য জন্মিয়া থাকে। গোদাবরী ভীমা এবং তংশাখা নীরা ও যান, ইহাদিগের তট-

কর্তা স্থান সমূহে ভাল ভাল অশ্ব আছে ; তাহারা উৎপত্তিস্থল ভেদে গজধবী,* ভীষ্মধরী, নীরধরী, এবং মানদেশী নামে খ্যাত।

অপরূপ পার্শ্বতীর দেশবাসীদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা পরিশ্রমী এবং অধ্যবসারী। যদিও তাহারা রাজপুতদিগের ন্যায় সূত্রী ও দীর্ঘদেহ নহে, তথাপি সাহসে ও শক্তিতে তাহারা রাজপুতগণ অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে; এবং বুদ্ধি ও চতুরতার বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন জাতিই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অন্যান্য স্থানীয় হিন্দু কামিনী কুলের ন্যায় অস্তঃপুরনিরুদ্ধা নহেন। তাঁহাদিগের অনেক দূর স্বাধীনতা আছে; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অশ্বারোহণ করিতে জানেন।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বিবরণ অপ্রাপ্য। কিন্তু বিবেচনা হয় যে এককালে তাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ছিল। খৃষ্টাব্দের সার্ব্বভিশত বর্ষ পূর্বে এই প্রদেশের উপর নগরে মিসরের বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিতেন; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গ্রীকেরা তথায় বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে আগমন করিতেন। এই প্রদেশের গোদাবরীতটস্থ প্রতিষ্ঠান পুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরাক্রান্ত শালিবাহন শকাব্দা প্রচলিত করেন; এবং এই প্রদেশেই লগধিখ্যাত কৈলাশধাম সম

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোলাবরীকে গজা বলিয়া থাকে।

স্থিত ইলোবাহ কোদিত গিরি গহ্বরমালা স্থিতল জিতল গহ, বিচিত্র গঠিত স্তম্ভ ও দেবমূর্তি প্রভৃতি অত্যুচ্চা শিল্পকার্য্য সমূহে পবিশোভিত হইয়া কোন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন প্রতাপশালী জাতির পূর্বাধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পবিত্রাজক হয়েঙ্গসং এদেশে আগমন করেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের এত বল বিক্রম, যে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্তী কান্যকূজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন সমুদায় আয্যাবর্ত করতলস্থ করিয়া মহাবাঈ হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন কবেন। মুসলমানদিগেব দক্ষিণাপথ প্রবেশকালে এই প্রদেশস্থ দেবগিবিতে যাদববংশীয় রাজা রামদেব রাজত্ব করিতেছিলেন;† প্রচণ্ড আলা উদ্দীন তাহার রাজ্যধ্বংস করিলে পর অনেককাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের আর কোন জীবিত লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমানদিগের লিখিত ইতিবৃত্তে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। মহাবাঈ তৎকালে দক্ষিণাপথস্থ বিজয়পুরের আদিলসাহী ও আহম্মদ নগরের নিজামসাহী রাজ্যভুক্ত ছিল। উক্ত

* খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

† রাজা বামচঞ্জের রাজত্বকালে বৈরাগ্যবোধে বোগদেব প্রোদ্বর্তিত হন। তিনি ভাগবতপুৰাণ লেখক বলিয়া প্রবাদ আছে। হেমাঙ্গি রাজা রামচঞ্জের মন্ত্রী ছিলেন।

রাজ্যবর্ষের চক্রবর্তীদিগের মধ্যে সর্বদা বিবোধ ঘটিত, এবং পার্শ্ববর্তী মূল্যবর্গের সহিতও তাঁহাদিগের অনেক সময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইত। এজন্য মাঘহাট প্রজাগণের মধ্যে হইতে তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদের কেহ কেহ সেনাপরিপোষক জায়গির ও সম্মানসূচক পদবী পাইয়াছিলেন। এক্ষেপে মহাবাহ্মীগণ দিন দিন এত উন্নতিলাভ করেন যে শতাব্দী পঞ্চদশ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতে হইতে বিজয়পুত্রপতি হিসাবপত্রে পাবন্য ভাষার পরিবর্তে মারহাট্টা ভাষা ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন এবং দলিলদস্তাবেজ উভয় ভাষায় লিখিতে বলেন। শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম্মদনগরে দুইটি, এবং বিজয়পুত্রে মাত্রটি, মহাবাহ্মীগণের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নিবন্ধ সংগ্রাম ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া মাঘহাট্টা সাহসী ও সমবুদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্বদেশের গোবব বৃদ্ধি নাঃ এবং বিধর্মী যবনদিগের মহিমাবৃদ্ধি নিমিত্ত সমধর্মী ও মায়ীদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একতা, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বধর্মামুগম মহামন্ত্রে দীক্ষিত কবিয়া যে প্রতাপশালী ঐজ্ঞাতনিক তাতাদিগকে দাক্ষিণাত্য হিন্দুকুলের অলঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষেপে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা আবস্ত কবা যাইতেছে।

পুনানগরীর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে শিবনারী দুর্গে ১৫৪৯ শকের বৈশাখ মাসে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসবে উদয়ে শিবজি জন্ম, তাহার অন্তকালে সাজাহানের দিল্লীসিংহাসন সমাবোধ। বহুনির্মিত ময়ূর সিংহাসন, বিচিত্রচিত্র তাজমহল, নগরসদৃশ বৃহদায়তন সুদৃশ্য পটমণ্ডপ প্রভৃতি মোগল সমৃদ্ধির চরমোন্নতিসূচক চিহ্ন নিচয়ের সূচনা না হইতেই, মোগল সাম্রাজ্য বিলয়কারী আবির্ভাব হইল। মুসলমানরা বলিতে পাবেন, পুন্নাটী ভাল কবিয়া প্রকৃষ্টিত না হইতে হইতেই, মধ্যে কীট জন্মিল। হিন্দুবা বলিবেন, কাহাবও অতিবুদ্ধি হইতে দিবাব পূর্বে বিধাতা তাহার পদন বিধান করেন।

পঞ্চজাত পদসদৃশ শিবজি নীচকুলোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি বহু হইতে প্রজন্মিত বর্জিব ন্যায় শূবংশসম্মত। তাঁহার পিতা সাহজি ভৌসলা বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত। সাহজি আহম্মদ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কার্য্যবিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পূর্বক বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন, এবং পতনোদ্ধ 'নিজামসাহী' রাজ্যবক্ষার্থ ব্যবস্থাব মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তচ্ছ্বেদ নিবারণে অসমর্থ হইলে বিজয়পুত্র বাদসংসাবে কর্ণগ্রহণানন্তর, কর্ণাটে বিজয়পতাকা উড্ডীন করত একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের সূত্রপাত করেন।

শিবজির মাতা জিজিবাই* লক্ষজি যাদববাও দেশমুখেব† কন্যা। লক্ষজি আহম্মদনগবাসিপতির নিকটে দশ সহস্র অশ্বাযোহী প্রতিপালনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ কারাগির পাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পূৰ্বপুরুষগণ দেবগিরির বাজা মনে আসীন ছিলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদববাও মহাবাহুবীষ দিগেব মধ্যে সর্বাশেফা সম্রাট ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

শিবজির পিতামহ মল্লজি ১৪৯৯ খ্রিঃ লক্ষজির অঙ্গুষ্ঠে নিজামসাহী বাজ্যেব একটি সামান্য অশ্বাযোহীদলের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৫১৬ খ্রিঃ তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। আহম্মদনগবাস সহ সবিক নামক পীরেব প্রার্থনায় পুলকামনা সিদ্ধ হইবাছে ভাবিয়া, সম্রাটের নাম সাহজি রাখিলেন। সাহজিব বয়স পাঁচ বৎসর হইলে একদা মল্লজি তাঁহাকে সঙ্গে কবিয়া দোলযাত্রাব উপলক্ষে যাদববাও দেশমুখের আলবে গমন করিলেন। লক্ষজি সাহজিব সৌন্দর্য ও প্রদীপ্তা মনননে শ্রীত হইয়া তাহাকে আফ্লাদ সহগবে নিকটে ডাকিলেন এবং আপনাব হিন চারিবর্ষব্যস্তা নন্দিনী জিজিবাইর পাখে

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বাই সম্রাট দ্বীলোক দিগেব উপাধি।

† দেশমুখ শব্দে দেশপ্রধান, দেশাধিকারী-বা অধীশ্বর বুঝায়।

বসাইলেন। বালক বালিকা আনোদে খেলা কবিত্তে লাগিয়া, দেখিয়া মানন্দ্রদয়ে যাদববাও পরিশ্রমজনে ত্রুটি থাকে বলিলেন “দেখ তোমাব কেমন এব আসিয়াছে;” এবং সভাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করিলেন, “ইহাদিগেব বিবাহ হইলে কেমন সাজে।” এই সময়ে ভৌলী কুমার এবং যাদব কুমারী পব-সম্ভব প্রতি আবিব নিক্ষেপ কবতে, সভায় হাসি উঠিল। এই হাস্যপ্রসঙ্গ মধ্যে মল্লজি উঠিয়া বলিলেন, “সকলেব যেন স্বৰ্ণ থাকে, লক্ষজি আমার পুত্রকে কন্যাদান কবিত্তে অস্বাভাব এক হইলেন।” ইহাতে কেহ কেহ সম্মতি প্রদান করিল, কিন্তু যাদববাও বিস্মিত এবং অবাক হইব, নহিলেন। পবদিন লক্ষজি নদীতে নিমন্ত্রণ কবিলে, মল্লজি বলিয়া পাইলেন, “যাদববাও আমার পুত্রকে কন্যাতা বখিয়া গ্রহণ না কবিলে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব না।”

যাদববাও শুনিয়া সম্মত হইলেন, বরং ক্রুদ্ধ হইলেন। কেন না হঠাৎ তাহার প্রসাদেই মল্লজি সামাবিক উন্নতি। আর যে বংশে মল্লজি জন্মিয়া ছিলেন, সে বংশ কি দেবগিরিব বাজকুণ্ডেব ভূলা? উত্তরকালীন মহাবাহুবীষ পুরা বৃত্তান্তকগণ যে ভৌমগা এবং চিত্তোরের ‘হিন্দু’ কুল সমুদ্রত বলিয়াছেন, যে বোন কারণেই হউক যাদববাও সে বংশেব স্রীদৃশ মহত্বে জানিতেন না।

লক্ষজিব অসম্মতি দেখিয়াও মল্লজি

সংকল্প কবিলেন যে, যদবতুহিতার সহিত অবশ্য অবশ্যই পুত্রের বিবাহ দিবেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অনেক অর্থ সমাগম হইল। কিন্তু সে হইল, কে জানে? মহারাষ্ট্রীয় কিংবদন্তী এই যে ভগবতী ভবানীদেবী স্বয়ং মন্দিরকে দেখা দিয়া ধনবাশির সন্ধান প্রদান করেন এবং বলেন “তোমার বংশে এক জন শত্ৰু সূচক শুণ্ণবিশিষ্ট নবপাল জন্ম গ্রহণ কবিয়া মহাবাহু সৈন্যের সংস্থাপন কবিলে। এবং তাহার ব্রাহ্মণের হিংসা কবে ও দেবতার মন্দির অপবিত্র কবে, তাহাদিগকে দ্বন্দ্ব কবিতা দিবে। তাহার রাজ্যকাল হইতে নূতন সময় আরম্ভ হইবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ সম্ভবিসংখ্য পুরুষ পর্যন্ত রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে।”

সং কি অসং যে উপায়েই মল্লজি ধন সংগ্রহ করুন, তদ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইল। তিনি, অনেক গুলি ঘোটক ক্রয় কবিতা, স্বীয় অশ্বাবোহী সৈন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেন, এবং কপতনন, পুরুষিণী খনন, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি লোকপ্রিয় পুণ্যকর্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ কবিলেন। অর্থবলে কোথায় কি না হয়, বিশেষতঃ মোসাহেব পূর্ণ সুসজ্জমান বাজসংসাবে? আহম্মদ নগরের সুলতান সন্তুষ্ট হইয়া মল্লজিকে রাজ্য উপাধি দিলেন এবং পাঁচ হাজার সোনারেব অধ্যক্ষ কবিলেন। পরগণা পুনা এবং সোণা জয়গিরি রূপে মিলিল,

শিবনাবী ও চাকুন দুর্গ এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সমস্ত হস্তগত হইল। বাদশ্ব রাওর আদর্শে সন্তুষ্ট হইয়া আপত্তি থাকিতে পারে? ১৬২৬ শকে (১৬০৪ খ্রিঃ) সুলতানের সমক্ষে মহাসমারোহে সাহজি এবং জিজি বাইর বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল।

জিজি বাইর গর্ভে সাহজিব হই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ শাহজি, কনিষ্ঠ শিবজি। শাহজি শাহজির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিতেন। ছোট ছেলের প্রতিই মাত্রেব আদর; শিবজি জননী সন্নিধানেই থাকিতেন।

যৎকালে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লির মোগল সম্রাটই আখ্যা-বর্ত্তের হর্ষা কর্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিণপথে আহম্মদ নগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড নামক তিনটা পাঠান রাজ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আকবর বাদশাহ আহম্মদ নগর আক্রমণ কবিতা বহু কষ্টে জয়লাভ করেন কিন্তু মালিক অম্বব নামে মন্ত্রী প্রতিনিধিবলে নিজাম সাহী রাজ্য পুনর্জীবিত হইয়াছিল। শিবজি জন্মবাব পূর্বে বৎসর মালিক অম্ববের মৃত্যু হয়, এবং প্রায় সেই সময়েই বিজয়পুরে বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা মহাসমারোহে রাজ্য করিয়া কাল কবলে কবলিত হন। গোলকুণ্ডপতি পূর্বে এবং দক্ষিণে কুজ কুজ হিন্দু রাজ্য

সকল আপনাব অধিকারভুক্ত কবিত্তে নিযুক্ত ছিলেন।

শিবজিৰ বয়স যখন ছই বৎসব মাত্ৰ (১৬২৯ খৃ.) আহম্মদনগৰপতি, খাঁ জাহান লোদি নামক বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতিৰ পক্ষাবলম্বন কৰিয়া, দিল্লীৰেব ক্ৰোধে পতিত হন। সুলতান মৰ্ত্তিজা আলিয় সাহ মালিক অম্বরেব পুত্ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ফতে খাঁৰ প্ৰতি বিবৰ্ত্ত হইয়া, তাহাকে কাৰাকদ্ধ কৰিয়াছিলে, কিন্তু মোগল দিগেব সহিত যুদ্ধে বাবস্থায় পৰাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থিৰ কৰিতে না পাৰিয়া, তাহাকে মুক্ত কৰিলেন এবং মন্ত্ৰিতপদে পুনৰ্নিযুক্ত কৰিলেন। ফতে খাঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈব নিৰ্যা তনেব পথ দেখিতে লাগিল এবং সুযোগকমে সুলতান এবং প্ৰধান ওমৰা দিগকে বধ কৰিল। অনন্তৰ নিজাম সাহী বংশীৰ একট শিশুক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কৰিয়া দিল্লিৰ অধীনতা স্বীকাৰ পূৰ্বক সম্ৰাটৰ প্ৰিযপাত্ৰ হইতে চেষ্টা কৰিল। ইতিমধ্যে বিজয় পুৰাধিপতি আহম্মদ নগৰ ধ্বংসে আপনাব বিপদ বুঝিয়া সংগ্ৰাম জন্ত প্ৰস্তুত হইলেন, এবং ফতে খাঁ সেই বডবস্ত্ৰে মিলিত হইলে, মোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তৰাসস্থান দৌলতাবাদ লম্বন্ধে অববোধ পূৰ্বক অধিকার কৰিলেন। ফতে খাঁ দিল্লিতে প্ৰেৰিত, এবং তৎপ্ৰতিষ্ঠিত ৰামকুমার গোয়ালিয়ৰ দুৰ্গে চিহ্নকদ্ধ হইল। সাহজি ইহাৰ পৰে প্ৰাৰ চাবি

বৎসবকাল নিজামসাহী বাজ্যেব পতন নিবাবণার্থে চেষ্টা কৰিলেন; কিন্তু কিছুই কৰিয়া উঠিতে পাৰিলেন না। তাহাৰ প্ৰধান সহায় মহম্মদ আদিল সাহও মোগলদিগেৰ প্ৰতাপে প্ৰপীড়িত হইলেন। তিনি বিজয় পুৰেব চাৰিদিগে দশ ক্ৰোশ যক্ৰভূমি কৰিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্ৰমণ হইতে আপনাব বান্ধধানী বন্ধা কৰিলেন বটে; কিন্তু শত্ৰুদিগকে দেশ হইতে দূৰীকৃত কৰিতে পাৰিলেন না। পৰ্যায়ক্ৰমে তয় পৰাজয় ঘটতে লাগিল; প্ৰজাদিগেব দুঃখেব সীমা পৰিসীমা বহিল না। পৰিশেষে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয় পুৰপতি মোগলদিগেৰ সহিত সন্ধি কৰিলেন। এই সন্ধিহাৰা সাহজি বিজয় পুৰেব ৰাক্ষসংসাৰে কন্মগ্ৰহণ কৰিবাব অনুমতি পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; বিজয়পুৰাধিপতি আহম্মদ নগৰেব কিয়দংশ লইয়া সম্ৰাট্কে বৎসবে বিংশতি লাখ টাকা কর দিতে স্বীকাৰ কৰিলেন, এবং নিজামসাহী বাজ্যেৰ অবশিষ্টাংশ দিল্লিসংম্ৰাদাত্ত হইল।

এইকালে শিবজিৰ বয়ঃক্ৰম দশ বৎসব হইতে না হইতেই, মোগল পাঠানেব দ্ৰুত দ্ৰাবা দক্ষিণপথেৰ একটী মুসলমান বাজ্য বিনষ্ট হইল। বিজয়পুৰও এই যুদ্ধে এত হীনবল হইয়াছিল, যে দক্ষিণে ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিয়া বলত্ৰিবি চেষ্টা কৰিতে লাগিল।

এই সংগ্ৰামসময়ে শিবজি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, ভাল ক'ৰিয়া জানা

যায় না। সমরপ্রাপ্তে (১৬৩৯ খৃ.) সাহজি, লোদির সহিত বিবাহ করিয়া, দিল্লীখরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তৎক্ষণাৎ সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে পুনরায় জারগির সম্বন্ধে একখানি সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিব্রত হইয়া পুণাতন প্রভু আহমদ নগর পত্নির দশে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি তুকাবাই নামী একটা নবীনা কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন; তা হাতে তেজস্বিনী যাদবনন্দিনী জিজিবাই অতিমানিনী হইয়া শিশু শিবজিকে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। তদবধি নূতন প্রেমের কুহক বেশেই ইউক, বা যুদ্ধের বিবাহাভাব প্রসূতট হউক, সাত বৎসরব্যাপ সাহজি, শিবজি এবং তৎক্ষণাত সহিত সাঙ্গা করেন নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বিজয়পুরে গমন করেন, জিজিবাট তাঁহার সঙ্গে যান এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া শিবজির বিবাহ দেন। অনন্তর সাহজি পুনা জারগিবেব তত্ত্বাবধারক দাদাজি বর্ণদেবসরিধানে শিবজি এবং তাঁহা বমাতাকে বক্ষণ বেক্ষণার্থে প্রেরণ করিয়া সুলতানের আদেশে কর্ণাট যাত্রা করেন।

দাদাজি বর্ণদেব অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও সচিবচক ছিলেন। তিনি শিবজিকে যোদ্ধার উপযোগী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবজি, লিখিতে পড়িতে, এমন কি আপনার নাম সাক্ষ্য করিতেও শিখি

লেন না, কিন্তু ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, ভ্রম-প্রহার, তীরনির্ক্ষেপ, অগ্নিসঞ্চালন, প্রভৃতি কার্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষকের যত্নে হিন্দু ধর্ম্মাভি-মোদিত মিত্র নৈমিত্তিক জিরাকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। তিনি কণকদিগের মুখে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অমৃতময় কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। কবিবর্গিত প্রাচীন বীৰগণের গুণগান শ্রবণ করিতে কবিতে তাঁহার হৃদয় সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি কল্পনাপথে তাঁহা-দিগেব দেবতুল্য মূর্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদিগেব আশ্চর্য্য কার্য্য পবনস্রা নিরীক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহাদিগেব মহৎ দৃষ্টান্তেব অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইতেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মানুরক্তিতে যবনগণ প্রাকালেব পবাক্রান্ত দৈত্য বাক্ষসবৎ প্রতীতমান হইত, এবং কবে তাহাদিগেব দাক্ষণ দৌবায়্য হইতে পুণ্য ময় ভারতভূমিকে মুক্ত করিতে পারিবে, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর আলোড়িত হইত। যে দেশে বায় লক্ষণ, কৃষ্ণ বলরাম, ভীমার্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ, প্রাহ্লভূত হইরাছিলেন, যে দেশে স্বগাবহীণী ভাগীবথী প্রবাহিতা, যে দেশে দেবগণের একমাত্র প্রিয়লীলাস্থল, সে দেশের ছিন্ন মুকুট মুসলমান পদতলে দলিত দেখিয়া তাঁহার তেজস্বী মনে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। তিনি আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহন

বাক্যে বিশ্বাস কবিয়া ভাবিতেন, ঐশ্বর্য-
গর্ভিত যখনগণের গর্ব খর্ব করিবেন,
স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন,
এবং “হরহর ভবানী” ধ্বনিত “হিমাদ্রি
হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মনদ
পর্যন্ত, প্রতিধ্বনিত কবিবেন।

শিবজি যেখানে বাস করিতেছিলেন,
সেখানেও তৎসদৃশ উন্নতমনা বীরধর্মী
ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অস্বকূল। পুনানগরী
সমতল ক্ষেত্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের
সংযোগস্থলে অবস্থিত। অনতিদূরেই
সহ্যাদ্রি শৈলের শিখরমালা ছুই তিন
সহস্র হস্ত উচ্চে শিরোভোলন কবিয়াছে।
গিরিশ্রেণী অধিকাংশ স্থলে চির-হরিত-
তরুণ পরিশোভিত; কেবল মধ্যে মধ্যে
অস্তভেদী, বন্ধুব, বিশাল, জীবোদ্ভিদপরি-
শূন্য শূন্যকিঞ্চিৎ বিবাজিত। বর্ষাকালে
গখন পর্বতপার্শ্বে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে
থাকে; বৃষ্টির ধাৰা নাচিতে নাচিতে, খে-
লিতে খেলিতে, পড়িতে থাকে; বজ্র
গর্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে, চপলা চম-
কিতে থাকে; জলদরাশি কর্তৃক ভগ্ন ও
প্রতিবিম্বিত সৌরকিরণলহরীতে সহস্র
সহস্র মুহূর্ত পরিবর্তনশীল বর্ণে অচলকূল
সাজিতে থাকে; তখন প্রকৃতির মনোহর
অখচ ভয়ঙ্কর মুক্তি দেখিয়া কোন্ চিত্তা-
শীল ব্যক্তির চিত্তে না ধ্বংসজনিত গভীর
ভাবের উদ্ভব হয়? অমরা যে সকল
পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকি, আমাদের
অজ্ঞাতসারে তাহারা আমাদের মনো-
বৃত্তি সকলের উপর আধিপত্য করে।

ঋষিগণের কানন, ঈশার পর্বত, মহা-
দেব গিরিগুহা, মহতী চিত্তাবস্থল। কে
বলিতে পারে, সহ্যাদ্রি শিবজির পক্ষে
ভয়ঙ্কর ছিল না?

সহ্যাদ্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ
ও ছলবোহ। স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ,
তন্মধ্যে কোথায় বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে;
কোথায় বা বর্ষাকালীন জল ধরিয়া রা-
খিয়া সমুদ্র বৎসর চলে। এই সকল
শৃঙ্গ অর পরশ্রমেই ভাঙে। দুর্গরূপে
পরিণত হয়। বৈশাখ হইতে কাঠিক
মাস পর্যন্ত এ প্রদেশ আক্রমণ করা
অতীব দুঃসাধ্য। তৎকালে এখানে বন
জঙ্গল এত বাড়ি, সর্বদা এত বৃষ্টি হয়,
বহুসংখ্যক সামান্য সামান্য নদ নদী জল
পূর্ণ হইয়া একপ হস্তর হয়, এবং যে বায়ু
বহিতে থাকে তাহা বিদেশীয়দিগের পক্ষে
এত অস্বাস্থ্যকর, যে তখন ইহাবস্ত্রায় দুর্ভা-
জ্য মেষ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই পর্বতের উপত্যকাগুলিকে মহা-
রাষ্ট্রীয়েরা মাওল বলিত। মাওলী বা
উপত্যকাবাসীরা দেখিতে কদর্যাকৃতি ও
নির্বোধ; কিন্তু তাহারা পারশ্রমী, বি-
খ্যাসী, কার্যদক্ষ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়।
দাদাগি তাহাদিগের অনেককে জয়গি-
রের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত
কর্মচারীদিগের সহিত শিবজি গিরিভ্রমণে
ও যুগরায় যাইতেন। এইরূপ পর্যটন
কালে তিনি শৌর্য ও মিষ্টভাষিতাগুণে
মাওলীদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠি-
য়াছিলেন, এবং ঘাটগিরি ও কঙ্কণের পথ,

গিরিশঙ্কর, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণ
রূপে অবগত হইয়াছিলেন।

কিছুতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন
করবেন, কিছুতে আপনার সামান্য
শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী কবি-
বেন, চিন্তা করিতে কবিত্তে ঘোড়শ বর্ষ
বয়ঃক্রমকালে শিবজির অন্তঃকরণে একটি
নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবি-
লেন “কঙ্কণপ্রদেশে একটি বিলক্ষণ
পরাক্রান্ত দস্যুদল আছে; আমি সেই
দলে মিশিয়া তাহাদিগের বাজা হইব;
এবং যে শৌর্য্য তাহারা এক্ষণে সাধুলো-
কেব অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছে,
সেই শৌর্য্য যখনবলবিনাশার্থে নিয়োজিত
করাইব।” শিবজি-সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে
যে করণ্য সেই কার্য্য। তিনি দস্যুদলে
মিশিলেন। তিনি স্বাধীন বাজা হইবেন
একপ ইচ্ছাও প্রকাশ কবিত্তে আবস্ত
কবিলেন। তিনি সময়ে লগয়ে গৃহ
পরিভ্রমণ কবিয়া অনেক দিন পর্যান্ত
কঙ্কণপ্রদেশে থাকিতেন। দাদাজি তাঁ-
হাব অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিবে-
চনা করিলেন যে, শিবজি অসদমুঠানেই
বসত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্যায়
বন্দী হইতে সুপথে আনিবার জন্য তাঁ-
হার প্রতি অধিকতর যত্ন দেখাইতে
লাগিলেন এবং জায়গির তত্ত্বাবধানেব
অনেক ভাব তাঁহার উপর অর্পণ করি-
লেন। এই প্রকার ক্রমতাপ্রাপ্ত হইলে,
পুনাব নিকটবর্তী ভদ্র মহারাত্রীসন্ধ্যায়
সহিত সর্বদা তাঁহাব সাক্ষাৎ হইত :

এবং তাঁহার সন্দেশ ও সদালাপে সন্দেশ
লই সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

সহ্যাদ্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অ-
নেকগুলি দুর্গ ছিল। কোন কোন দুর্গে
দুর্গাধ্যক্ষ থাকিত, এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত
হইলে তথায় ভাল ভাল সৈন্যও প্রেরিত
হইত। কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়া অধি-
কাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না;
এবং সেগুলি প্রায় জায়গিরদারদিগের
অধীনেই ছিল। বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের
সহিত ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইবাব পরে,
বিজয়পুরপতি কর্ণাটবিজয়ের অভিলাষে
সেই প্রদেশেই উত্তমোত্তম ঘোড়গণ
পাঠাইয়াছিলেন; এবং ঘাটপর্কতের দুর্গ
সকল প্রথমে অন্নাধীনেই করত হইয়া-
ছিল বলিয়া তাহারা যে দুর্ভেদ্যও বিশেষ
প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া
তাহাদিগকে এক প্রকাব অবক্ষিতাবস্থায়
বাগিয়াছিলেন।

পুনাব দশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে
নীলানদীর উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে টর্ণা
নামে একটি পার্বত্যীয় দুর্গাক্রম্য দুর্গ
ছিল। শিবজি দুর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৬
খ্রীষ্টাব্দে উনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে
দুর্গটি হস্তগত কবিলেন; এবং বিজয়পুরে
বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ
কবিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যেই কেহাটি
দখল করিয়াছেন, এবং ইহার প্রমাণ
স্বরূপ তজ্জন্য তৎ প্রদেশস্থ দেশমুখ্যপেক্ষ
অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন।
টর্ণাব নাম প্রচণ্ডগড় রাখিলেন, এবং

তাহাকে অধিকতর ছুরাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন প্রাচীরনির্মাণ ও পুরাতন প্রাকারাদি সংস্কার করাইতে লাগিলেন। ছুর্গের মধ্যে একটি স্থান খনন করিতে করিতে সহসা স্বর্ণরাশি পুট হইল। কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল! শিবজি এই ঘটনার ভগবতী ভবানীর কৃপা দেখিলেন, এবং উৎসাহ সহকারে ছুর্গসংস্কার সমাপন ও অত্র শত্রু ক্রম করিতে প্রবৃত্তশীল হইলেন। তদনন্তর টর্নার দেড় কোশ দক্ষিণ পূর্বে মর্কুধ পর্বতোপরি একটি ছুর্গনির্মাণের উদ্যোগ করিলেন; এবং সমাপ্ত হইলে তাহার নাম রাজগড় হইল (১৬৪৭)।

রাজগড় নির্মাণসম্বাদ বিজয়পুরে পৌঁছিলে, সুলতান সাহজিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহজি তখন বিজয়পুরপতি-প্রদত্ত বাঙ্গালোর সন্নিহিত জায়গিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের কার্যের চিন্তাংশ কিছুই জানেন না, সুলতানকে এই মর্মে উত্তর পাঠাইলেন; এবং শিবজি ও কর্ণদেবকে লিপিবদ্ধা যৎপরোনাস্তি অহুযোগ করিলেন। মজলাকাংক্ষী দাদাজি শিবজিকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন “বিজয়পুরে তোমার পিতার যেমন মান সম্মান, বিশ্বস্তভাবে সুলতানের চাকরা করিলে তুমি একজন বড় লোক হইবে। আর যেকোন কার্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে পথে পথে শত্রু ও বিপদ লক্ষ্যবনা।” শিবজি মিষ্ট কথার আপনায় বশ্যতা

জানাইলেন; কিন্তু যুদ্ধ কর্ণদেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্প অণুমানও পরিবর্তিত হইল না। দাদাজি একে পীড়ার ও অরায় জীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুবংশের বিপদাশঙ্কার জর্জরিত হইয়া আর অধিক দিন প্রাণধারণ কবিত্তে সক্ষম হইলেন না। যুত্ময় অব্যবহিত পূর্বে তিনি শিবজিকে নিকটে ডাকাইলেন; এবং সেই অন্তিম শব্দ্যায় পূর্ব প্রদর্শিতভাবে পবিত্রাণ পূর্বক কহিলেন “বাছা, তুমি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টা করিতে হইও না; গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিও; দেবগন্দিব অপরিজ্ঞ করিতে দিও না; এবং লক্ষ্মী তোমার যে পথে লটরা বান সেই পথেই অগ্রসর হইও।” অনন্তর শিবজি বহুস্তে আপনায় পবিত্রাবর্গকে সমর্পণ করিয়া কর্ণদেব গতাশ্রু হইলেন।

সেই যুদ্ধ প্রক্ষাংশদ শিক্ষাগুরু ও প্রতিপালকের পরলোক গমনকালীন বাঁকাগুলি বধর্ম্মাধুরক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী যুবার অন্তঃকরণে দৈববাণীর ন্যায় অঙ্কিত রহিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার এবং জায়গিরের কর্ম্মচাবীদিগের চক্ষে পবিত্রতাব ধারণ করিল। শিবজির বাল্যকাল শেষ হইল; তাঁহার জীবনের কার্য্য স্থিরীকৃত হইল।

এ সময়ে শিবজির বয়সক্রম বিংশতি বৎসর। তিনি ঈদৃশ অল্প বয়সেই দুইটা ছুর্গের অধিকারী হইয়া রাজ্যসংস্থাপন

কবিবার দুজপাঠ কবিরাছেন। একবার সমালোচনা করিয়া দেখা বাড়িক তাঁহার ভাবী উন্নতির কি কি উপকরণ ছিল।

প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে, শিবজির পিতা বীরপুরুষ, এবং মাতাও শুবকন্যা। জনকজননীৰ গুণ যে সম্বন্ধে বৰ্ণিত, তাকা অনেকটী জানেন। যেমন বাহী আকাৰে পিতামাতার সহিত সম্বন্ধানর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যেমন পীড়ার বীজ পিতামাতার শরীর চত্বরে সম্বন্ধে যায়, তেমনই পিতামাতার ন্যায় মানাশক্তি সম্বন্ধ গণ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আব আশ্চর্য্য কি? পর্যালোচক মাজেই অবগত আছেন যে, কোন কোন বংশে কোন কোন ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির অধিক প্রোত্ৰুর্ভাব দেখা যায়। বোম্বেৰ ইতিহাস যিনি পাঠ কবিরাছেন, তিনি কি কুড়িয়াস বংশের দান্তিকতা এবং কেবিয়াস বংশের ধীরতা ভুলিতে পাবেন? যে বংশে পাই সিস্টেট্‌স্, সোলন, ও পেরিক্লিস জন্মগ্রহণ কবিরাছিলেন, সেটী গ্রীসদেশীয় আলকমিওনীৰ বংশ যে বিশেষ লক্ষণ ক্রান্ত কে না বলিবে? যে কুল হইতে ফিলিপ, আলেকজান্ডর, পিরহাস ও টলেমিগের উৎপত্তি, সে কুলের যে একটা নির্দিষ্ট প্রতিভা ছিল, কে অস্বীকার করিবে? কার্থেজের হামিঙ্কার ও হানি বন্ বিজুবিত বার্কী বংশ, ইংলণ্ডের বিজরী উইলিয়মের বংশ, ফ্রান্সের বিখ্যাত ফ্রেড্রিকের বংশ, ক্রিস্টিয়ান মহাশয় পিটের বংশ, ভারতবর্ষের ঔরংজেব

পর্যন্ত বাবর বংশ প্রভৃতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে শৌর্য্য কোন কোন কুলের অঙ্গগামী। ভৌমলা এবং বাবর দুই শুব বংশ সংযোগে শিবজির জন্ম; সুতরাং তিনি শৌর্য্যপ্রভা লটরাই ভ্রমণে অবতীর্ণ হইরাছিলেন।

শিবজি যে কেবল স্বভাবতঃ বীরতা-প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, এমত নহে; বাল্যকালে তিনি একপ্রকার বীরত্ব বাবুতে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার তিন হইতে দশবৎসর বয়স পর্যন্ত সাহজির আহম্মদ নগর বক্ষার্থে যুদ্ধ। এই সময়ে শিবজি কতবার শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে পরিজ্ঞান পাইরাছিলেন। পবে যখন নিজামসাহী বাজা উচ্ছিন্ন হইল, মোগল সম্রাটের সহিত আদিলসাহী সুলতানের বন্ধি চটল, তখন বিজয়পুর পতিব সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইরা সাহজি কর্ণাট সমবে জয়পতাকা তুলিলেন। তদবধি অহবহঃ পিতার শৌর্য্যকথা ও বিজয়বার্তা কর্ণদেব প্রভৃতির মুখে শিবজি শুনিতে পাঠিতেন; এবং জনকের ঘোণা পুত্র হইবেন, একপ বাহা তাঁহার হৃদয়ে কেননা বলবতী হইবে? বিশেষতঃ রামারণ মহাত্ম্যত ভাগবত প্রভৃতি যেসকল ধর্ম্মগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ তিনি শ্রবণ কবিত্তে ভাল বাসিতেন, সে সমুদয়ও বীররসপরিপ্লুত। আব যে মাওলীরা তাঁহার চিরসঙ্গী, তাহারাও সাহসী ও সংগ্রামপ্রিয়। বীরবীর্য্যে বাহার জন্ম, বীরকন্যার স্তন্যে বাহার বালদেহ বর্ধিত,

বীররূপী পিতার বিজয়সংবাদ দিন দিন
বাহার কর্ণে ধ্বনিত হইত, বীর বাহ্যার
উপাসাদেবতা এবং বীর বাহ্যার সহচর,
সেই শিবজি কেননা বীরধর্মী হইবেন?

এই বীরের সমুখে দক্ষিণাণ্ডেব
বিচ্ছিন্ন মুসলমান বাজাগুলি পড়িল।
তাঁহার ঠেশেই আহম্মদনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত
হইয়াছিল। বিজয়পুর মোগলদিগের
সহিত যুদ্ধ করিয়া চূর্ণ হইয়াছিল, এবং
দক্ষিণে বাজাবিস্তারে বাস্তব পাকিয়া শিব-
জির প্রথম উদ্যম বিফল কবিতো পারিল
না। কিন্তু বাজ্যের প্রথম সোপানগুলি
সংস্থাপন কালেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা
কবা যায়, ক্ষমতা একবার বন্ধমূল হইলে
তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ কবা অতীব
দুষ্কর। অধিকন্তু বিজয়পুরের প্রধান
অবলম্বন মহারাজারগণ। তাঁহারা শিব-
জির স্বজাতি ও সমধর্মী : স্মৃতবাং ইহাও
একটি স্থলতানের দৌর্ভাগ্য ও শিবজির
বলের কারণ। হিন্দুধর্মের পতাকা উদ্-
ভীন কবিলেই শিবজির অমুচরবর্গের
উৎসাহবুদ্ধি এবং বিপক্ষপক্ষের শক্তি-
হানি হইল।

এহলে আব একটি কথা বলাও অস-
ম্ভব হইতেছে না। দিল্লীখবের দক্ষিণা
পথ আক্রমণ শিবজির উন্নতির একটি
প্রধান পরোক্ষ হেতু। এই আক্রমণে
মোগলদিগের এবং দক্ষিণাত্য জুলাল
বর্গের বিস্তার বলকর হয়; মুসলমান

গণের গৃহবিচ্ছেদ বাড়ি এবং ধর্মবন্ধন
অনেকদূর শিথিল হইয়া যায়, নিজাম-
সাহী রাজ্য একেবারে বিমর্ষ হইয়া যখন
প্রভাবের বিলম্বন হ্রাস উপস্থিত হয়,
এবং মহারাজার হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি,
সমরকুশলতা ও আবলম্বন বহুল পরি-
মাণে বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত দক্ষিণে আহম্মদ
নগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড সম্মিলিত
পাকিত, এবং যদি দিল্লিপতি তাহাদিগকে
চূর্ণ কবিস্যব চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের
সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্বক আর্ঘ্যা
বর্জে স্বীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে বন্ধমূল
করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে মুস-
লমানদিগের প্রভাব এত প্রবল হইত
যে কোনক্রমে কেহই তাহাদিগের বি-
রুদ্ধে অস্ত্রধারণ কবিস্যব লাভ কবিতো
পারিত না। তথ্যলয়ে বৃষ্টিধারাও
প্রবেশ কবে, বিবোধবিভক্ত অনৈকা-
জ্ঞীর্ণ মুসলমান সাম্রাজ্য কেননা নবীন
চিন্দুশক্তি প্রভাবে বিদীর্ণ হইবে?

শিবজি জীবনেই প্রথমাক্ষ লিখিত হ
ইল। যেরূপ বঙ্গভূমে তিন অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন, যেরূপ অবস্থায় তাঁহার
নিত্যনবক্ষুণ্ণিশালী প্রতিভার প্রথম বি-
কাশ হইয়াছিল, যেরূপ জ্ঞান ও কার্য
মণ্ডলে তাঁহার বালাকাল অতিবাহিত
হইয়াছিল, একপ্রকার ঘণিত হইল।
সমসাময়িক এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ
লিখিবাব বাধ্য বহিল।

শৈশব সহচরী ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভ্রম ।

“সোনার বরণ হলো কাল
ওণ দেখে মোর মন হারাল ।”

কোথা হইতে কে এই গীত গাইতে-
ছিল, তাহা কেবল বৃহৎ তিস্তিড়ী বৃক্ষে
উপর বসিয়া একটি চিল জানিতে পারিত-
ছিল। বৃক্ষে সরিকটে উচ্চ ত্পনোপবি
একটি শিবের মন্দির; তাহাব পশ্চাত্তাগ
প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহাব পার্শ্ববর্তী
একোষ্ঠ সকল ভগ্ন, এবং তাহার চারি-
দিকে অতি নিবিড় বন। সেস্থল মনুষ্য-
সমাগম চিহ্নমাত্র রহিত। নিকটে অতি
বৃহৎ প্রান্তর—বৃক্ষহীন, জনহীন, পশু-
হীন, শোভাহীন প্রান্তর। তদ্ব্যতিরিক্ত
গ্রাম্য পথ। কদাচিত্ সে পথে মনুষ্য
যাইত। যদি কেহ বাইত তবে ভগ্ন
একোষ্ঠের মাধ্য মনুষ্য থাকিলে তাহাকে
তাহার দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাকাল; মেঘাচ্ছন্ন; অল্প বৃষ্টি
হইতেছিল। সেই ভগ্ন একোষ্ঠ মধ্যে
লুকাইয়া দশ বাব জন মনুষ্য। তাহারই
মধ্যে একজন মৃদু গান করিতেছিল,
তিস্তিড়ী বৃক্ষারূঢ় পক্ষিদের আর কেহ
তাহাদিগকে দেখিতে পাতিতছিল না।
অকস্মাৎ গান বন্ধ হইল, গায়ক কহিল।

“কে আসিতেছে।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল “বে আসিবার
সে আসিতেছে।”

ইতিমধ্যে ঋক্সাকৃতি অশ্বচ বলিষ্ঠ এবং
মল্লবেশী এক ব্যক্তি একোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ
করিল। একোষ্ঠস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে
বাগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল “কি
সংবাদ আনিবে?”

আগন্তক কহিল “ঠিক সন্ধ্যার সময়
বাবু পাড়ীতে উঠিবে।”

“এই পথদিয়া যাবে?”

“হাঁ, এই পথ দিয়া।”

“সঙ্গে কয় জন বেহারী?”

“বার জন।”

“আর কোন লোক সঙ্গে আসবে?”

“তা বুঝলুম না।”

“বেহারীদের কেমন দেখলে?”

“দ্বিবি কালো কোনো নন্দঘোষের
মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের
মত লাড়ি আছে।”

“আহা! তামাসা ছাড়, বলি আশ্বা
দশ জনে বাব জন বেহারীর মোহাড়া
নিচে পার্শ্ববা?”

“পারবে, আশ্বাদেব চীৎকার শুনেই
তাহাবা মোহ যাবে।”

ঐত্যবসরে দূরনিঃসৃত অশ্রুট ভ্রম
ওণ গুণবৎ শিবিকাবাহকদের কোলাহল
নৈশগগন ভেদ করিয়া প্রতিঘোচব হইল।
রজনী ঘনাকার, নিকটের বাতাস লক্ষ্য

হয় না স্মরণে শিবিকা কোন্ পথ দিয়া আসিতেছিল তাহা দৃষ্ট হইল না। সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরপথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, তজ্জন্য বাহকদিগের পা মধ্যে পিছলিয়া বাইতেছিল। বাহকেবা দেবতাকে, বাঠিকে, এবং কখনও শিবিকা-রোহীকে গালি আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহা-দিগকে গালি দিয়া তৃপ্তিলাভ না হওয়াতে, কেহও সমস্তিষ্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। এই প্রকার বিবাদ করিতেই বনমধ্যে ভ্রমশ্রমের নিকটবর্তী হইল, কিন্তু এইখানে শুক স্থান পাইবা কাঁধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল। একজন বাহকের পা আর এক জনের পায়ের উপর পড়াতে দুইজনে বচসা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে বেহারা-দিগের উপরে প্রাণের ধারাবৎ বষ্টির আঘাত হইতে লাগিল। বাহকেরা প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল। পরে আপ-নাদিগের দলের মধ্যে বষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহাদিগের দেখাদেখি শিবিকারক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানি মন্ম-বেশীও পলায়ন করিল।

ষাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দির।

দুহারা এক্ষণে নির্জন দেখিয়া শিবি-কার আরোদ্যতন করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে রজনী বাবুর পরিবর্তে একজন অব

শুভনবতী রমণী রহিয়াছে। তদ্বৃটে দম্ভার্ঘ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিশ্ববিস্ময় হইয়া রহিল। তৎপরে শিবিকারোহী রমণী বলিল—

“তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পাকী ধরিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ— আমার সঙ্গে টাকা নাই, গায়েও অলঙ্কার নাই, আমি বিধবা। কিন্তু যদি আমাকে সুবর্ণপুবে আমার বাটী পর্য্যন্ত পৌছিয়া দাও তা হলে আমি পুরস্কার দিব ও এই ঘটনা গোপন করিব—”

একজন দম্ভ্য কহিল, “তোমার বাড়ী সুবর্ণপুরে?”

রমণী। হাঁ

দম্ভ্য। তোমাদের কোন্ বাড়ী, রজনী-বাবুদের বাড়ী?

রম। হাঁ সেই বাড়ীই বটে।

দম্ভ্যারা চুপিং পরামর্শ করিতে লাগিল।

একজন কহিল, “ওরে গোবরা, আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রজনী বাবুর সুবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা, কিন্তু এ পাকী ঠিক উল্টা দিক দিয়া এসেছে, এ পাকী সুবর্ণপুরে যাবে; সুবর্ণপুর থেকে ত আসছিল না। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।”

একজন প্রবীণ দম্ভ্য কহিল, “যা হবার হয়েছে এখন কি পরামর্শ।”

গোবরা কহিল, “যেহে যাহুঁচটা বোধ হয় রজনী বাবুর বন, উহাকে রজনীর বদলে আমাদের বাবুর নিকট নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্ রে?”

দম্পত্য সঙ্কেত এই পরামর্শ সঙ্কেত
বিবেচনা করিয়া চারিজন দম্পত্য দ্বারা
শিবিকাসহিত রমণীকে লইয়া চলিল।
রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। আকাশ
মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার
হইয়াছে। দম্পত্য প্রান্তর পার হইয়া
গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া অন্ত এক পথ ধ-
রিল; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল,

“তোমরা কোথায় বাইতেছ? এত
সুবর্ণপুরের পথ নয়—”

দম্পত্য উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী
চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাহাদিগের অনু-
নয় বিনয় অথবা ভয়প্রদর্শন বৃথা বোধে
আপনার অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া
মোনাবলম্বনে রহিলেন। দম্পত্য বাহক-
গণ রমণীর এই প্রকাব নির্ভীকতা দে-
খিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, “বাবুবা
হলে এতক্ষণ কত কাদিত, কত আমা-
দের পারে পড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
এ ছুঁড়ি একবার চোঁচালে না!” ক্রমে
শিবিকাব দুই পার্শ্ব গাঢ় অন্ধকারময়
হইল। রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোন
নিবিড় অবগামধ্যে প্রবেশ করিতেছে।
কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড়
অরণ্য অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে
শিবিকা থামিল, এবং পবক্ষণেই একজন
দম্পত্য কহিল

“বেবিয়া এসগো ঠাকুক্ষণ—”

রমণী শিবিকা হইতে অবরোধন করিয়া
দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মন্দির,
চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার, এবং মধ্যে২

বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আদেশ মত
একজন দম্পত্য পশ্চাৎ ঐ মন্দিরের মধ্যে
প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুহুদিনী।

রমণী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া
দেখিলেন গৈবিকবসনপরিহিত, অশ্রু-
মুখমণ্ডল, এক যুবা সম্মুখে পাষাণময়ী
কালীমূর্তি পূজা করিতেছেন। রমণী
গাঢ় অবগুষ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া এক-
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎ-
ক্ষণের পর তাহার সম্মতিবাহাবী দম্পত্য
কহিল, “বাবু মহাশয়!” পূজক কিঞ্চিৎ
বিলম্বে দম্পত্যদিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন “কি, সফল হইয়াছে?”

দম্পত্য উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিত
নেত্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।
তাহার কারণ এই যে পূজকেব কণ্ঠস্বরে
অবগুষ্ঠনবতী হঠাৎ অক্ষুট চীৎকার ক-
রিয়া উঠিয়াছিলেন। পূজকও দম্পত্য বে-
দিকে চমকিতনেত্রে চাহিতেছিল, সেট-
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ
কহিলেন, “এ কে, এ যে জীলোক!”

দম্পত্য। আজ্ঞে, একটা ভ্রম হয়েছে,
তাহাকে ধরিতে গিয়া একটা জীলোককে
ধরে ফেলেছি।

পূজক ক্ষণকাল অবগুষ্ঠনবতীকে
আপাদ মন্তক অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা
করিলেন “আপনি কে?” কিন্তু জীলোক

কোন উত্তর না করাতে পূজক পুনরপি কহিলেন,

“আপনি ভীতা হইবেন না। স্বচ্ছন্দে পরিচয় দিন কোন ভয় নাই। রমণী অবশুষ্ঠন হইতে আত মুহুর্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে কি কারণে দম্পত্যারা আমায় ধৃত করিলেন।”

উত্তর, আমার চিরশত্রুকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধরিয়াছে। আপনার কোন আশঙ্কা নাই।

র। কোন আশঙ্কা নাই তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর, বিশ্বাস এই যে আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব না বা অন্যায় কার্য্য করিব না।

অবশুষ্ঠনবতী দম্পত্যকে মন্দিরহইতে যাইতে ইচ্ছিত করিয়া কহিলেন, “কিন্তু যখন এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার অভিলাষে রজনীকান্তকে ধৃত করিবার অহুমতি করিয়াছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাস কি?”

যেমন নিকটস্থ কোন বস্তুতে বজ্রাঘাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, পূজক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকালপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“আপনি কে?”

রমণী ছই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবশুষ্ঠন কিঞ্চিৎ উদ্ভোচন করিয়া কহিলেন, “আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী।”

পাঠক এতকণে বোধ হয় অশ্রুবিষিষ্ট

পূজককে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনীকান্তের পিতার দ্বারা দত্ত-সর্বস্ব হইয়া উদাসীন হইয়াছেন। তিনি কণেক নীরব রহিলেন; পরে বিহ্বলের দ্বারা অশ্রুটস্বরে স্বগত বলিতে লাগিলেন “ইনি এখানে কেন?”

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্ববে কহিলেন, “তুমিই আমার ধরিয়া আনাইয়াছ?”

রতিকান্ত অতি কাতর স্ববে বলিলেন, “আপনার কি আমার এ অবস্থা দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভৎসনা!”

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী কাদিতেছেন, তাহার পাষণ নিশ্চিত হৃদয় আর্জ হইল, চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। কিয়ৎকাল পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, “এ দুঃখ কি জনা? কেন স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিবে চল।”

রতি। গৃহে যাওয়া কি খাইবে?

কুম। আমার বহুমূল্য অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইবে।

রতিকান্তের পুনরায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

রতি। আমি আপনার অমুরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক ঐশ্বর্য্য যে রজনীকান্ত আমার সম্মুখে ভোগ করিবে তাহা আমার অসহ্য হইবে।

কুমু। রজনীকান্ত ধর্মভীত লোক—
সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার পৈ-
তৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে
পারেন।

রতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তর হইল
এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, “কি!
ভিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হ-
ইব, আর সে আমাকে দ্বারবান্ দ্বারা
বহিষ্কৃত করিবে।”

কুমু। রজনীকান্ত আমার ভগিনী-
পতি, আমি অহুরোধ করিলে তোমার
সহিত কুব্যবহার করিবেন না।

রতিকান্ত ক্রণেককাল ওষ্ঠদংশন ক-
রিতে লাগিলেন, তৎপরে কহিলেন,

“আমার স্বরণ ছিল না যে, রজনী
আপনার সম্পর্কীর ও এত আত্মীয়—
আপনি আমার অন্তরের অতি গুহ্য কথা
জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা
রজনীকান্তকে জ্ঞাত করাইবেন।”

কুমু। এ অতি অন্যায় কথা, আমার
রজনীও যেমন ভূমিও তেমন, আমি দিবা
রাত্র কারমনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট
প্রার্থনা করিয়া থাকি যেন নাইতেও
তোমার মাথার কেশ ছেঁড়ে না।

রতি। আপনি যাঁহা বলিতেছেন
সকলি সত্য, কিন্তু আমি অতি পাবণ্ড,
আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইরাছি।
আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ
করুন যে, রজনীর প্রতি আমার যে অভি-
প্রায় তাহা গোপন রাখিবেন।

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, ক্রোধে

তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।
অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলি-
লেন,

আমি তোমার কে, তাহা কি বিস্মৃত
হইয়াছ?

রতি। আপনি আমার ভ্রাতৃভায়া,
তাহা বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু রজনী যে
আপনার ভগিনীপতি তাহা বিস্মৃত হইয়া-
ছিলাম।

কুমু। তবে আমার সহিত এমত কু-
ব্যবহার করিতেছ কেন?

রতি। কেবল আত্মরক্ষার্থ।

কুমু। আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা
কেন, আমি কি তোমার শত্রু?

রতি। আমার শত্রু নন, কিন্তু রজ-
নীর ত মিত্র।

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি
কুৎসিত হইয়াছে।

রতি। শপথ করুন।

কুমু। আমি শপথ করিব না।

র। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন?

কুমু। তাঁহার বিপদ তাঁহাকে জানা-
ইব।

র। শুনুন, যদি আপনি শপথ না ক-
রেন, তবে অদ্য রাত্রেই আপনার ভগিনী
স্বর্ণপ্রভাকে বিধবা করিব।

কুমু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম।
রতিকান্ত দ্বারদেশে দুই হস্ত বিস্তৃত ক-
রিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

“যতক্ষণ না রজনীর মৃত্যু হয় তত-
ক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিলেন।”

কুয়ু। তুমি আজিও এমন পাষাণ হও
নাই, এ সকল কার্য তোমার দ্বারা অস-
ম্ভব।

র। তবে দেখুন।

এই বলিয়া রতিকান্ত, দম্ভাদিগের দল-
পত্রিকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের সোপা-
নের নিকট দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি বলিতে
লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই মন্দিরমধ্যে

প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে কুমুদিনী
তথায় নাই। আশ্চর্য্য হইয়া আলোক ল-
ইয়া মন্দিরের চতুর্কোণ ও অন্যান্য স্থান
অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দে-
খিতে পাইলেন না। তখন সমুদ্র বিপদ
বিবেচনা করিয়া দম্ভাদিগের সহিত স্বয়ং
যাত্রা করিলেন।



পদ্য।

সংস্কৃত ২৫৮০ অনুবাদ।

“ওরে বেচপল মন, কচই কন ভ্রমণ,
পাতাল পর্য্যন্ত এস ঘুরে।
কতু ভ্রম দিও মণ্ডলে, কখন বা নতঃস্থলে,
উল্লসিবার যাও স্বর্গপুরে ॥
কিঞ্চিৎ তব অভ্যস্তরে, লীন ব্রহ্ম পরাংপরে,
প্রমেত্ত না কবহু প্রবণ।
বিসি সরিকট হেন, বল ভাই কেন কেন,
ভীর প্রতি বিরতি এহন ॥

শান্তিশতক

হিংসাহীন বক্রাতাবে স্থলভ্য অনন।
সর্পগণ ছেতু বিবি স্থজিলা পবন ॥
শতকুল তৃণাকুর ভোগে পুষ্টিকার।
ত্বনিত্তে লয়ন করি স্থখে নিজা বার ॥

কিন্তু এ সংসারবিন্দু লভন কারণে।
দিবাচেন উপযুক্ত বুদ্ধি নরগণে।
অবেষণ করিলেই যে বুদ্ধি বলে।
সকল প্রকার গুণ নাত্ত কবতলে ॥

বৈরাগ্য শতক

কই সে মুখারবিন্দু মধুর অধর।
কোথায় আরত সে কটাক্ষ কটুতর।
কোথা সে কোমল কথা প্রতি সুখকারী।
জুরুর ভলিমা, শব্দধনু দর্পহারী ॥
এবে অস্থি পঞ্জবেতে প্রকট দশন।
মগ্ন মগ্ন গুঞ্জরিছে তাহে সমীপণ ॥
মহা মোহ জালরূপ শরের কপাল।
রাগাক্ষেব মত হাসে হেরিতে কবাল ॥

শান্তিশতক

দ্রোপদী।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতি-রায়ণা, কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা ও গৌরব বিশেষ অধিকারিণী—উনিষ্ট অর্থাৎ সাহিত্যের আদর্শমূলাভিধিকারী। এই গঠনে বৃদ্ধ বাগ্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকহৃদিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অর্থের অর্থ্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, লময়ন্তী, রত্নাবলী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধা নায়িকাগণ—সীতার অমূল্যকরণমাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্থ্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমন কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতারূপত্বিনী নায়িকারই বাহ্য। আজিও, যিনিই সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবল নাটকাদিতে বিদ্যাপ্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বলেন।

ইহার কারণও দুঃস্বপ্নের নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় সুন্দর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই অর্থ্যজ্ঞাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্থ্যজ্ঞীগণের এই জ্ঞাতীর উৎকর্ষই সচরাচর আশ্রয়।

মহাভারতকার যে বাসায়গকে এক প্রকার আদর্শ করিয়া কিঞ্চদস্তীমূলক বা

পুবাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাস স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এই বঙ্গদর্শনে পূর্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমরা কণার আভাস দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিবপেক্ষ। মহাভারতে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতার চরিত্রাত্মবর্ত্তিনী নায়িকারও আভাস নাই কিন্তু দ্রোপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার অপূর্ণ নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অমূল্যকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রোপদীর অমূল্যকরণ হইল না।

সীতা সত্যী, পঞ্চপতিকা দ্রোপদীকেও মহাভারতকার সত্যী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেমন না, কবিব অতিপ্রায় এই যে পতি এক হোক, পাঁচ হোক, পতিমাত্র ভজনাই সত্যী। উভয়েই পত্নী ও বাজীর কর্তব্যমুঠায়ে অকুরমতি, ধর্মনিষ্ঠা এবং শুদ্ধজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা বাজী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধু; দ্রোপদী কুলবধু হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী বাজী। সীতার স্ত্রীজ্ঞাতির কোমল স্তম্ভ ও লিন পরিষ্কট, দ্রোপদীতে স্ত্রীজ্ঞাতির কঠিন-গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্য

আমি, জ্যোপদী ভীমসেনেনই সুবোধ্যা
বীবেক্রাণী। সীতাকে হরণ কবিত্তে রাব-
ণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু বক্ষোবাজ
লঙ্কে যদি জ্যোপদীহরণে আসিতেন,
তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় ঐশ
হারাইতেন, নয় অরজ্ঞের ন্যায়, জ্যোপ-
দীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

জ্যোপদী চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ
হুকুম; কেন না মহাভারত অনন্ত সাগর
তুলা, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে
একটি নারিকা বা নারকের চব্বিশ তৃণবৎ
কোথায় যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ কে ক-
রিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে
বিশ্লেষণে যত্ন কবিত্তেছি।

জ্যোপদীর সরস্বতী। জ্যোপদীজার পণ,
যে, যে সেই দুর্বেধনীর লক্ষ্য বিধিবে,
সেই জ্যোপদীর পাণগ্রহণ করিবে। কন্যা
সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ,
বীৰগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহা
সভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুমুম
শুকাটরা উঠে। সেই বিশাখামাণা
কুমারী লাতার্থ, দুর্গোদধন, জবাসক, শিশু
পাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীৰ সকল
লক্ষ্য বিধিতে যত্ন করিতেছেন। এবে
একে সকলেই বিক্রমে অক্ষম হইয়া কি-
রিয়া আসিতেছেন। হায়। জ্যোপদীর
বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ষবীর শ্রেষ্ঠ
অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিধিতে উঠিলেন।
কুন্ত কাব্যকাব এখানে কি কবিত্তেন বলা
যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট।

কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে জ্যোপ-
দীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য
বিধিতে তাহা হয় না। কুন্ত কবি বোধ হয়,
কর্ণকেও লক্ষ্যবিধানে অশক্ত বলিয়া পরি-
চিত কবিত্তেন। কিন্তু মহাভারতের মহা
কবি জ্ঞান্যামান দেখিতে পাইতেছেন,
যে কর্ণের বীৰ্য্য, তাহার প্রধান নায়ক অর্জু-
নের বীৰ্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিবন্দী এবং
অর্জুনহন্তে পরাভূত বলিধাই অর্জুনের
গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যে
সঙ্গে কুন্তবীৰ্য্য কবিলে অর্জুনের গৌরব
কোথা থাকে? একপ সঙ্কট, কুন্তকবিকে
বুঝাইয়াদিলে তিনি অবশ্য স্থির করি-
বেন, যে তবে অত হাল্যমায় কাজ নাই
—কর্ণকে না তুণিগেই ভাল হয়।
কাব্যের যে সর্ষাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়
তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল বাধ্যই
যেখানে সর্ষাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য
বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবল
পবাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন
না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে
কর্ণকে লক্ষ্যবিধানে উত্তীর্ণ করিলেন,
কর্ণের বীৰ্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন,
এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই
একই উপায়ে, আব একটি গুরুতর উ-
দ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। জ্যোপদীর চরিত্র
পাঠকের নিকটে প্রকটিত কবিলেন।
যেদিন জয়দ্রথ জ্যোপদীক হুকুম ভূতলশাষী
হইবে, যে দিন দুর্গোদধনের সভাতলে

দ্যুতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হই-
তেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উদ্ধৃতি নী হইবেল,
সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পা-
ইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন।
একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য
সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড
প্রভাপ সম্বিতা মহাসত্য কুমারী কুমুম
তাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী,
সেই বিবম সত্যতলে, রাজমণ্ডলী, বীর-
মণ্ডলী, ধর্মমণ্ডলীমধ্যে, জগদরাজ কুলা
পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নকুল্য জাতার অপেক্ষা না
করিয়া, কর্ণকে বিক্রোনোদ্যত দেখিয়া বলি-
লেন, “আমি হৃতপুত্রকে বরণ করিব
না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্থ্য
হাস্তে স্বর্ঘ্যসন্দর্শনপূর্বক শরাসন পরি-
ত্যাগ করিলেন।”

এই এক কথার যতটা চরিত্র পরিষ্কৃত
হইল তত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ
করা হুঃসাধ্য। এখানে কোন বিস্তারিত
বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে
তেজস্বিনী বা গর্ভিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত
করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ
রাজহুহিতার হৃদমণীয গর্ভ নিঃসঙ্কোচে
বিস্ফাবিত হইল।

ইহার পব দ্যুতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপ-
দীর চরিত্র অবলোকন কব। মহাগর্ভিত,
তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জুন দ্যুত-
মুখে বিসর্জিত হইয়াও, কোন কথা ক-
হেন নাই, শত্রু দাসত্ব নিঃশঙ্কে স্বীকার
করিলেন। এখানে তাঁহাদিগের অসুগা-
মিনী দাসীর কি করা কর্তব্য? স্বামিকর্তৃক

দ্যুতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ভ্রাতা
দাসীত্ব স্বীকার করাই আধ্যাত্মিক স্বভাব-
সিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি
প্রতিকারীর মুখে দ্যুতবার্তা এবং দ্রুষ্টো-
ধনের সত্য্য তাঁহার আহ্বান শুনিয়া
বলিলেন,

“হে হৃতপুত্র! তুমি সত্য্য গমন
করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি
অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যুতমুখে
বিসর্জন করিয়াছেন। হে হৃতপুত্র!
তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া
এখানে আগমন পূর্বক আমাকে লইয়া
যাইও। ধর্ম্মরাজ কিল্লপেণ রাজিত হইয়া-
ছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।”
দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত
করিবেন।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ
স্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প,
ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি
লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত
নহে। মহাভারতকাব এই দুই লক্ষণ
অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়া-
ছেন; ভীমসেনে, অর্জুন, অশ্বখামান,
এবং সচবচব ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে
মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প
পূর্ণমাত্রার, এবং অর্জুনে ও অশ্বখামান
অর্ধমাত্রার, দেখা যায়। দর্প লক্ষ্যে এ-
খানে আশ্চর্য্যপ্রায়তা নির্দেশ কবি-
তেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমা-
দের নির্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদী-
তেও পূর্ণমাত্রার ছিল। অর্জুনে এবং

অভিযুক্ত হই। আত্মশক্তিনিষ্ঠতার পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বল বুঝির কারণ হইয়াছিল; কেবল শ্রোপদীতেই ইহা ধর্ম্মানুগ অপেক্ষা প্রবল। নহিলে তিনি স্বয়ং সত্তাভলে পিতৃ-সত্যের ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন না যে, “আমি স্তম্ভপুত্রকে বিবাহ করিব না।” তা না হইলে দুর্গোধনের সত্তার স্বামীর পণ ব্যতিক্রম করিয়া কুটপ্রসন্ন করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, জীলোকের গর্জ, সহজে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এত স্তম্ভ কারুকার্যে শ্রোপদীচরিত্র নিশ্চিত হইয়াছে।

সত্তাভলে শ্রোপদীব দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমার সহায় হন, তথাপি বাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্বসমীপে মুক্ত কর্ত্তে বলিলেন, “ভরতবংশীরগণের ধর্ম্মে শিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ভীমাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম শ্রোণ, ভীম, ও মহাত্মা বিহুরের কিছুমাত্র স্বস্তি নাই।” কিন্তু অবলার তেজঃ কতক্ষণ থাকে! মাহাত্ম্যের কবি, মনুষ্যচরিত্র সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কণ শ্রোপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধের আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল

না—তরাধিক্যে কনক শ্রবীভূত হইল। তখন শ্রোপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রহ্মনাথ! হা কৃষ্ণনাথ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিশ্বের চরমোৎকর্ষ।

বলিয়াছি, যে শ্রোপদী জীজ্ঞাসিত বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল, যে তা হাতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইবা না দাঁড়ান, তখন জনম-গুলে তাদৃশী ধর্ম্মানুগাগিনী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুগাই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডেব স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুগের বসণীর সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বসগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিচ্ছট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শতবার পাঠ কবিয়াছেন, তিনি তাহা আব একবার পাঠ কবিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

“হিতৈষী বাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্গোধনকে এইরূপ তিরস্কার কবিয়া সাস্ত্রনাবাক্যে শ্রোপদীকে কহিলেন, হে ক্রপদন্তনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সপুত্র্য বধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রোপদী কহিলেন হে ভরতকুল-

দ্রৌপদী! যদি এসব হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্বধর্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিক্রা যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিক্রা রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আব এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহাবাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনি! আমি তোমাব প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কব। এটী ছুই বর দান দ্বারা তোমাব যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দাক্ষণ্য পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুন-

রায় উদ্ধৃত হইলেন, উহারা পুণ্য কর্ম্মান্তান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্বেয় সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন অরুণ্ডত তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হইলেন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতুষ্ট করিতে বিলম্ব বহু করেন; পরে অরুণ্ডত আপনায় ছুরতিসন্ধি ব্যক্ত কবার, ব্যঙ্গীয় ভাষা গর্জন করিয়া আপনার তেজোরামি প্রকাশ করেন। তাঁহাব সেই তেজোগর্ক বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। অরুণ্ডত তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন; যিনি ভীমার্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যায়ের ভগিনী তাঁহাব বাহবলে ছিন্নমূল পাদপের দ্বারা মহাবীৰ্য্য সিদ্ধ সৌবীর্য্যধিপতি ভূতলে পতিত হইলেন।

পরিশেষে অরুণ্ডত পুন্সর্কার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীবনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না, অজ্ঞান স্ত্রীলোকের দ্বারা একবারও অসবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশে তৎসনা করিলেন না; কেবল ক্লমপূরোহিত ধোঁমোর চরণে প্রণিপাতপূর্বক অরুণ্ডতের রথে আরোহণ করিলেন।

পরে বধন জরজর দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জরজরের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্জিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে 'অবলীলা-ক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

“জ্যোপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উইয়া সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অমুজগণের সহিত ধর্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা কনিলে; আমি ধর্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক সুষুম্ব মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ত্রাষ গোব; নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আরত; উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী সমুদ্যোতা ধর্মার্থবেত্তা বলিয়া উইয়ার অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাপন্ন শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার প্রেম ইচ্ছা কর; তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কৃতাজলিপুটে অবিলম্বেই উইয়ার শরণাগত হও।

যিনি শাল বৃক্ষের জায় উন্নত; যাঁহার বাহুবল আজামূল্যবিত; আনন ক্রকুটী-কুটিল ও ক্রবর পরম্পর সংহত; যিনি মুহমুহ ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন; উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আমা-নের নামক মহাবল অশ্বেরা প্রকুল মনে উইারে বহন করিয়া থাকে। উইাব কর্ম সকল অলোকসামান্য এবং উইার ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সূত্র-চার হইয়াছে। উইার নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শাস্তিলাভ করেন না।

ইইার নাম বশস্বী অজুঁন। ইনি ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপবতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম-পথ পবিত্রাগ করেন না এবং নৃশংসা-চারেও নিরত নহেন। ইতি ধর্মদ্বিগা-গণ্য, সর্বধর্মার্থবেত্তা এবং ভয়াক্তের ভ্রাতা; ইইার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রি-লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অস্ত্র শস্ত্র ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অজুঁনের রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যদৈন্য মধ্যবর্তী দেববাজ ইন্দ্রের জায় রণস্থলে ইইার অদ্বুত কর্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ ক-রিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতি-মান ও মনস্বী এবং ধর্ম্যাহুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম-

রাজ বুদ্ধিরকে নিরন্তর লক্ষ্যে করিয়া থাকেন। আর বাহারে স্বর্গাসন্ন ভেদে সম্পন্ন দেখিতেছ; উনি আমার পতি, সর্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহার তুলা বুদ্ধিমান ও বক্তা আর নাই। উনি অন্যরূপে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম ব্যবহারে কদাচ প্রযুক্ত হইল না এবং কিছুতেই অগ্নির লক্ষ্য করিতে পারেন না। উনি আখ্যা কুড়ীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং কজিরধর্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ঘ্যবন্দ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা

মকরপুটে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়; এক্ষণে আমি ঈশন্যপন্থ্যে তজ্জন বিকোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপন্নবশ হইয়া বাহাদিরকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ; সেই পাত্ত-বেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিকূল প্রদান করিবেন কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাদিগের নিকট পরিজ্ঞাপ প্রাপ্ত হও; তাহা হইলে তোমার পুনর্জন্ম লাভ হইবে; সন্দেহ নাই।”

ক্রমঃ।



সম্পাদকীয় উক্তি।

দেবীর বটক বিষয়ে যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহা ঐযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত “সংস্কৃত-নির্ণয়” নামক উৎকৃষ্ট অতিনব পুস্তকের এক অংশ। ঐ পুস্তক প্রকাশের পূর্বে বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্গদর্শনে

প্রকাশার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাজ নামে ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গ-হইয়া প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ বঙ্গদর্শনে প্রচারে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

• এই প্রবন্ধ বাহা মহাত্ম্যে হইতে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাত্ম্যে হইতে।

চৈতন্য।

প্ৰথম অধ্যায়।

(চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা।)

মানব সমাজের প্ৰকৃতি মানবদেহেব ন্যায়। দেহ যেকপ প্ৰতি মুহূৰ্ত্তে পৰিবৰ্ত্তিত হইতেছে—প্ৰাচীন মাংস, বস্ত্ৰ, মজ্জা, অস্থি, শিবা ধমনী কয়প্ৰাপ্ত হইতেছে ও নূতন মাংস, বস্ত্ৰ, মজ্জা, অস্থি, শিবা ও ধমনী তৎস্থলাভিষিক্ত হইতেছে, মানব সমাজও সেইরূপ প্ৰতি মুহূৰ্ত্তে পৰিবৰ্ত্তিত হইতেছে—প্ৰাচীন আচাৰ, বাব হাব, বীতি, নীতি, কৌশল, পৰিচ্ছদ ও ধৰ্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে ও নূতন আচাৰ, বাব হাব, বীতি, নীতি, কৌশল, পৰিচ্ছদ ও ধৰ্ম্ম প্ৰবৰ্ত্তিত হইতেছে। তোমার অদ্য যে দেহ দৃষ্ট হইতেছে সাত বৎসব পাবে তাহার কিছুই থাকিবে না কিন্তু তুমি পৰিণতবয়স্ক, তোমার আকাংক্ষিত অনেক বৈলক্ষণ্য হইবাও এত সৌন্দৰ্য্য থাকিবে যে তোমাকে চিনা যাইবে; কিন্তু তুমি যে ভাগিনেবেব মুখে অগ্ৰপ্ৰাশন কালে অগ্নি দিবাছিলে, দশ বৎসব পাবে তাহাকে দেখিলে কি চিনিতে পাবে? মানবসমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ইজাই ঘটয়া থাকে। বৰ্দ্ধিত অৰ্থাৎ সভ্যসমাজ যদিও পৰিবৰ্ত্তনশীল, তথাপি ২১ শতাব্দীৰ মধ্যে তাহার গঠনগত বিশেষ রূপে পৰিবৰ্ত্তন হয় না। পক্ষান্তরে অসভ্য অথবা অৰ্দ্ধসভ্য সমাজে কোন বিশেষ

উন্নতিৰ কাৰণ নূতন প্ৰবৰ্ত্তিত হইলে, স্বল্পকাল মধ্যে উক্ত সমাজকে এত বিপৰ্য্যস্ত কৰে যে ঐ সমাজেব সঙ্গে পূৰ্ব্বতন সমাজেব কোনট সৌসাদৃশ্য থাকে না। ভাবতেব আধুনিক অবস্থা প্ৰথমোক্ত স্থলেব উদাহৰণ এবং ইদানীন্তন জেপান সাম্ৰাজ্য শেষোক্ত স্থলেব উদাহৰণ।

মানব সমাজেব এই রূপ ক্ৰমশঃ পৰিবৰ্ত্তন ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কাৰণে শতাব্দেব বা শতাব্দেব পৰিবৰ্ত্তেব ন্যায় একএকটা বিশেষ পৰিবৰ্ত্ত হইয়া থাকে। তবে উত্তমৰ ন্যায় পাৰ্থক্য এই যে ব্যাবহৃত শাৰীৰিক পৰিবৰ্ত্ত নিবৰ্দ্ধিত হয়, আৰু এতরূপ সামাজিক বিপ্লব ঘটত পৰিবৰ্ত্তে সমাজ সময়ে সময়ে যে জন্য অপকৃত হয় আবার সময়ে সময়ে সেজন্য উপবৰ্ত্ত হইয়া থাকে।

যেমন শব্দেব অদ্য যে লাবি অন্তৰ্ভূত হয়—অন্তৰ্ভূত কবিলে জানা যায় তাহাৰ কাৰণ অনেক পূৰ্বে (হয়ত জন্ম কালে) উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেই রূপ ইতিহাস অনুসন্ধান কবিলেও জানাযায়, যে বিপ্লব অদ্য সমাজকে আলোড়িত ও বিপৰ্য্যস্ত কৰিতেছে তাহাৰ কাৰণ সহস্ৰ বৎসর পূৰ্ব হইতে উদ্ভাবিত হইতেছিল। বাস্তবিক বিবেচনা কবিলে বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তক নহেন। যে দিন ব্রাহ্মণগণ ভারতে একাধিপত্য করিলেন, ভাবতে বমান মর্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখসম্পত্তি এবং পরিণামে ধর্ম পর্য্যন্ত একচাটীয়া করিয়া গইলেন, সেই দিনই ভারতে বৌদ্ধধর্মের হ্রস্বপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, মহাত্মা শাক্যসিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া তাহাতে নবীন আহুতি দিয়া বে অগ্নি জ্বালিলেন তাহা সমুদয় ভাবত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল।

এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য অমুসন্ধান করিয়া আমরা কোনমতে চৈতন্যদেবকর্তৃক বঙ্গসমাজের পবিবর্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কাবণমূলক নহে একথা বলিতে পারি না। দৃষ্টি-নিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে বাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে বঙ্গ সমাজের ইতিহাস অমুসন্ধান করিলেও তাহাই জ্ঞাত্যমান প্রমাণিত হইবে। এই আন্দোলনের কারণও বহুকালহইতে সঞ্চিত হইতেছিল।

সাধাবণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতন্যদেব কেবল মাত্র ধর্ম সংস্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড কখন বা কর্মকাণ্ড প্রধান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগবে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে ভক্তি-মাহাত্ম্য

প্রচাৰই চৈতন্যদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গার্হস্থ্য সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে রঞ্জিত করিয়াছিল। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, স্নাত্ত্যভাব সংস্কাপন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বে সমুদয় সামাজিক পরিবর্তনের* জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্বদা চীৎকার ও অনেক “টেবল খাবডাউয়াও,” সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্তব্যাক্রমের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্ম প্রচাৰ দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়া ছিলেন।

চৈতন্যদেবকর্তৃক বঙ্গসমাজের আন্দোলন ধর্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র ধর্ম সঙ্কীর আন্দোলন নহে। এই জন্য উক্ত আন্দোলনের কাবণ অমুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গসমাজের সকল শাখা প্রশাখা অবস্থাই পর্যালোচন আবশ্যিক।

ঋগ্বেদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় আৰ্যোপনিবেশী দিগেব স্বাধীনতা পূর্য্য অস্তে যাব। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি অমেকেই হিন্দু ছিলেন। দাস-

* ইহার সকলগুলিনকে আমরা প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করি না এই জন্য উন্নতি আখ্যা প্রদান না করিয়া পরিবর্তন মাত্র বলিলাম।

রাজের সেনাপতি বখ্তিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, “বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য যে হেতু শাস্ত্রে লেখা আছে।” বখ্তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে শাস্ত্রের বচন অখণ্ড। রাজা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুঝিয়া বিজ্ঞের কার্য্য করিলেন—সিংহাসন পবিত্যাগ কবির, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপবিবারে পলায়ন করিলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজত্বের প্রতি মমতা এতাদিক!! বঙ্গ দেশাধিপতির এত বীৰ্য্য ও তেজস্বিতা!! পৃথিবীর ইতিহাস অমূল্যমান করিলে একপ হাস্যজনক বাজপরিবর্ত আর প্রায় দেখা যায় না। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশূন্য রাজা নিরাপদে রাজত্ব কবিতো পাবেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত চূৰ্ণলপ্রকৃতি ও অভিমানশূন্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তেজস্বিতামূল্য জাতির উচ্চাভিলাষ বা ঐহিক মান সম্বন্ধে প্রতি বিশেষ আস্থা নাই, পক্ষান্তরে মানবমন কদাপি নিস্তেজ থাকিতে পাবে না। এই জন্য যে বহুয্যের অথবা যে জাতির মান সম্বন্ধে প্রতিবীরজনোচিত গুণ না থাকে তাহারা স্বতঃই ধর্মপরাগণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে কৌলীক প্রথা প্রচলন বৌদ্ধধর্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্ম দূরীকরণে তাত্ত্বিক মত প্রচার, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২০৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পাবেই বঙ্গদেশে যবন শাসনাধীন হইল। এই সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নামে ধর্মবাজক কিছু কার্য্যে সর্ব্ব সর্ব্ব। বিদ্যা তাঁহার, বুদ্ধি তাঁহার, ভোগ তাঁহার, ক্ষমতা তাঁহার, মান তাঁহার, সমুদ্র দান তাঁহার, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার তাঁহার, ধর্ম তাঁহার, দৈব তাঁহার। শূত্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাঁহার ক্রমক, বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসক। একপ উপদ্রব লোকে করদিন সহ্য করিতে পাবে? নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিবকাল কাহার দাস হইয়া থাকিতে বাসনা কবে? এতদিন কতক ধর্ম শাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ আপনাদেব কার্য্য সিদ্ধ কবিরাজেন। কিন্তু বাজপরিবর্ত হইল। যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল। আর সে প্রাধান্য কোথায়? লোকেব মন বহুকাল যে নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, রাজবল দূর হইলে, আপনা হইতে তাহা ভাঙিতে উদ্যত হইল। হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে লাগিল। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইল। ব্রাহ্মণ শূত্র অনেকাংশে সমান হইল। তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল

পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টি মধ্যগত
নহে—ইহার আরও অনেক বিস্তৃতি
আছে—এমন অনেক লোক আছে যাহাবা
তাহাদিগের ন্যায় পবলোকের চিন্তা করে
কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রের দ্বারা তেমন জ্বালাতন
হয় না, ধর্মের জন্য ঐহিকের স্বখে
একেবারে জলাঞ্জলি দেয় না, প্রতি পাদ
বিক্ষেপে—আহাবে, বিহাবে, শয়নে,
উথানে, প্রতি মুহূর্তে শাস্ত্রের ব্যবস্থা
লইয়া চলে না, স্বেচ্ছাক্রমে অনেক সুখ
সন্তোষ কবিত্তে পাবে অথচ পরলোকের
হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ
কেহ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের দীক্ষিত
হইল এবং পবোক্ষে জাতিসাম্রাজ্যের
অনেকে ক্রমশঃ স্বধর্মের প্রতি গতবাগ
হইয়া ইসলাম ধর্মের সত্য বিশেষের
পক্ষপাতী হইতে লাগিল।

যখনাদিকায়ে বঙ্গদেশে যেমন এই
সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আ
বার তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা, সুখ
লিপ্সা ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে
লোককে পাপে প্রবর্তিত কবিয়াছিল।

একদিকে জাতিভেদ রহিত ও বিলাস
বাসনার চবিত্তার্থতা এবং অপবদিকে
আর্য্যজাতির বহুকাল বর্জিত ঈশ্বরবন্দনা
পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে
আকর্ষণ করিতেছিল তখনই তন্ত্রের মত
ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর

কিছু পূর্বে সর্ববিদ্যা (১) উপাধিধারী
জনেত্র ব্রাহ্মণপূর্ব বঙ্গে আবির্ভূত হইয়া
অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গ
দেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার
কবিলেন। তন্ত্র যদিও হিন্দুধর্মের অন্ত-
র্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়া-
ছিল, কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে বলা
যাইতে পারে তন্ত্রোক্ত আচরণ দ্বারা
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বন্ধন অনেক পরিমাণে
শিথিল হইয়াছিল; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের
বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে তন্ত্র
কখন বচিত হইতে পারিত না।

প্রবৃত্তি ভৈরবী চক্রে সর্বের বর্ণা

দ্বিজোত্তমাঃ।

নিবৃত্তি ভৈরবী চক্রে সর্বের বর্ণাঃ পৃথক্

পৃথক্ ॥

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত বচনোচিত আচ-
রণ যে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারা-
ঘাত কবিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন
যে জাতিভেদ প্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল
না হইলে বচিত হয় নাই এ কথাতে
কে সন্দেহ করিবে?

সামাজিক পরিবর্তন ক্রমশঃ ও অননুভূত।
মহুয়া হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত
আচরণ কবিত্তে বা চির সংস্কারের বিপ-
রীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। অন্য
আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে
আমার বিজ্ঞতা অনুযায়ী অল্প অধিক

† অবশ্য এ স্থলে মহানির্দোষ তন্ত্রের
বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

(১) ইহার নাম আমরা অনুসন্ধান
করিয়া জানিতে পারি নাই।

বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং তন্ময়ের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চৈতন্য কদাপি এক জীবনে আচণ্ডালঃ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং

চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-

পরায়ণঃ।

হরিভক্তি বিহীনস্ত দ্বিজোহপি স্বাপদাধমঃ॥

এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

যদিও বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অনতি দীর্ঘকাল পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল-বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিকার ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম এতদূর নিস্তেজ ও নিস্ত্র হইয়াছিল যে পরবর্তী সেনবংশীয় আদি ভূপতি আদিশূর কোন রাজ্যিক কার্য্যের অমুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বল্লালসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণন করেন। বল্লাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন কি না—তদ্বিবর অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। “তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী

‡ কেবল চণ্ডাল কেন চৈতন্য সকলকেও স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

ছিলেন” ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ থাকাতোই অমুভূত হয় সেনবংশীয় ভূপতি দিগের সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্ম একেবারে অপ্রচলন হয় নাই। কালে ভারত-বিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্তৃক বৌদ্ধ মত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে নিস্ত্র হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার আচরণ ও সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দী ব্যাপক কল কোথায় যাইবে? অদ্যপর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালির মুখে শুনা যায় অহিংসা পরমো ধর্ম। কেহ ক্রমেও একথা মনে করেন না, এবাক্য হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। যদিও চৈতন্য দেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বহুকাল প্রচলিত থাকার লোকে

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পণ্ডবাতনঃ।

অত স্বাং স্বাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধো-

ইবধঃ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্বস্বীবে সমদয়া প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সত্যবটে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য সময়ে পান ভোজন সম্বন্ধে যারপর নাই প্রতিবন্ধক ছিল; এবং তাহার অভ্যাস হইলে, ধর্ম্মাচরণ তাৎকালিক স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া

উঠিয়াছিল। (এই জনাই তত্ত্ব দীপ্ত ব্যক্তিত্বের আধিক্য দৃষ্ট হয়।) তথাপি সর্বজীবে সমদয়া প্রকৃতি বৈষ্ণব দিগের প্রধান নীতি বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাদিক্য থাকার অন্যতর কল।

যখন বঙ্গদেশেব একদিকে পৌত্তলিকতা,* অপরদিকে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ লোকের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী বামামুজ আচার্য্য সংস্থাপিত শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধ মত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চ নীতি প্রচাৰ হইতেছিল, অপর দিকে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ও তত্ত্বের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ ব্যক্তিচার স্রোতে ভাসিয়া বাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মের মত+ স্পষ্ট ভাবে ছুই এক জনের মনে উদয় হইতেছিল। ক্রমে উহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় হইল এবং তাঁহারা তৎপ্রচার জন্য যত্নশীল হইলেন। কয়েক জন কবি (জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) এই মতেব পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণ

বাধার প্রেম (১) বর্ণন কবিত্তে লাগিলেন। এই সকল কবিব লেখা লোকেব চিত্তকে বিগলিত করিল। আরও অনেক লোক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে আসিতে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য দেবের অগ্নের কিছু পূর্বে অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহাব পার্শ্ববর্তী শান্তিপুর প্রভৃতি আলোকিত কবিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থ কাব কৃষ্ণদাস কবিবাজ বলেন;

আগে অবত বিলা যে গুরু পরিবাব,
সংক্ষেপে কহি যে কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুৰী, কেশব
ভাবতী আব শ্রীঈশ্বর পুরী ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আব পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্য বঙ্গ বিদ্যানিধি ঠাকুর হরদাস ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সমুখ প্রধান ॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পবমানন্দ পদ্মনাভ সর্কেশ্বর ॥
জগন্নাথ মিশ্রবব পদবী পুবন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্বে সঙ্গুণ মাগব ॥
তাঁব পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
ধাব পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥

* হিন্দু ধর্মে একেশ্বরবাদ আছে, কিন্তু তাহা তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না।

+ সংক্ষেপতঃ জীবের প্রেম ভক্তি ও জীবে পরা।

(১) বৈষ্ণবদিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কৃষ্ণ বাধিকার প্রেমক্ষেপে ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিষা কৃষ্ণ রাধার প্রেম বর্ণন শ্রবণই ধর্মের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিল।

স্বাভাৱে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত মুরারি মুকুন্দ ॥

অসংখ্য ভক্তের করিয়া অবতার।

শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার ॥*

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্বে হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম, সকল বৈষয়িক সত্য প্রচারই এই সাধারণ নিয়মানুগত। ইসার জন্মের পূর্বে জোহান প্রভৃতি ধর্ম প্রচারক, মাটিন লুথারের পূর্বে উইক্লিক প্রভৃতি সংস্কারক, পূর্বেসংস্কার যুক্ত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত পার্কারের পূর্বে রামমোহনরায় প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয় মূলক ধর্ম বাদী এবং চৈতন্যের পূর্বে অষ্টোতাচার্য্য, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম পবিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী মহাত্মা যে সত্য প্রচার করিবেন তাহার পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া ছিলেন। কেবল ধর্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। নিউটনের বহুকাল পূর্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আভাস বুঝিয়াছিলেন। নিউটনের জন্মের পূর্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে

ঐ নিয়ম যে বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ যে নিয়মে যুদ্ধ হইতে পত্র ঝলিত হইলে ভূপতিত হয় সেই নিয়মেই সমুদ্র বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ যথা স্থানে রক্ষিত হয় একথা নিউটনের পূর্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটয়াছিল।

ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্তক কেন তাহা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হন না? কিজন্ত উইক্লিক রাজা কর্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে কি জন্য পরবর্তী ঐ মতাবলম্বী কালীন ক্রায়ের প্রভৃতি সংস্কারকগণ কোনরূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই? ইহার কারণ এই যে যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিষ্কার করে, প্রথম সময়ে তাহা তাঁহার মনে অপরিষ্কৃত ভাবে অবস্থান করে হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটাও থাকে না। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইলে; লোকের প্রতিকূলচরণ একাকী সহ্য করিতে হয়। এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ লোকে তৎপ্রতিপালকের উপর যারপর নাই অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সত্য কিছুকাল প্রচারিত হইলে অনেক উহার উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তদনুযায়ী হয় এবং জনসাধারণও স্বাভাবিক সত্যানুগতগতঃ কিয়দংশে

* কৃষ্ণ। ইহাকে বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রজেন্দ্র অবতার বলেন।

তাহার পক্ষগত হয়। এইজন্য কোন নবীনসত্য প্রচারের কিছু কাল পরে তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে ক্রুতকার্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, কালে যে রূপ উৎপীড়নের গূঢ় ও উৎপীড়কের সংখ্যার হ্রাস হয়, সেই রূপ তত্ত্বতাবলম্বীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার অনেকে একত্র হইয়া উৎপীড়ন সহ্য করে সুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। (একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে হুঃখ ভার একক বহন কবা অপেক্ষা দশজনে একত্র হইয়া বহন করা সহজ।) এই জন্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্বে তত্ত্বতাবিকারক ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন না, কিন্তু দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যকরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারেন না এবং তাঁহার পর বর্ত্তী শিষ্য সেইমত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিয়াও জীবনে পরিণত করে। এই জন্য কোন ধর্ম সংস্কারক অথবা কোন নবধর্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কয়েক জন সাধারণ অথবা সাধাবণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়া তত্ত্ব সত্য কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে একজন অসাধারণ ক্ষমতামানী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পূর্বে অষ্টৈতাচার্য্য প্রভু-

তির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা এই সত্য বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র পুরন্দর নামক জনৈক বৈদিক শ্রীশ্রী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র খ্রীষ্ট পন্থী শতীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া গতানু হয়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপের পর শচী আর এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন—ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোণামাঙ্কিত মহাত্মা চৈতন্যদেব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল।

চৈতন্য ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন। গৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলা শুভক্ষণ॥ সিংহবাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ক শুভক্ষণ॥ অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আব কোন প্রয়োজন॥ এত জানি চন্দ্রে রাহ করিলা গ্রহণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে জিভুবন॥ জগত ভরিয়া লোকে করে হরি হরি। সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যের জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল স্মরণ্য ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ প্রাণ-মুঘারী জনসাধারণ হরিনাম কীর্ত্তন, ও হরি! হরি! ক্রনি ও নানাকপ দানধর্ম ও জপ তপ অমুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও এই সকল অমুষ্ঠান অন্য কারণে হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয়গণ মনে করিল একপ পবিত্র সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অবশ্য কোন শাপভ্রষ্ট মহা পুরুষ হইবেক। কালে হয় ত ইহাও চৈতন্যের জীবনকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ দশ জনে একজন লোকের স্মৃতি রাখিলে, তাঁহার প্রশংসিতগুণ থাক বা না থাক, অন্ততঃ প্রশংসাকারীদিগের সম্মুখে ভাল করিয়া বলা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক স্থলে প্রশংসিত লোক বস্তুতঃ সে সকল গুণ জীবনে পরিণত করেন। স্মরণ্য চৈতন্য কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোক-মুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার সার্থকতার অন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? পঞ্চাশত্রে বাদৃশী ভাবনা মন্য, সিদ্ধিভবতি তাদৃশী। একান্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে করিতে যথার্থই মানবসমাজে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই, জীবন-চরিত লেখকগণ আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্যের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই চরিত্রের পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া চলেন নাই। চৈতন্যকে তাঁহার মাতা ত্রয়োদশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার সময়

হরি বলি নারীগণ দেয় হলাহলি।
স্বর্গে বাধ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ নদীজল।
স্বাবর জঙ্গম * হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

কথিত আছে শৈশবাবস্থার চৈতন্যের হস্তপদে ধ্বজবজ্রাকৃশ চিহ্ন ছিল। এই সকল চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ।

বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অবৈতাচার্য্যের গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী নববীপে আসিয়া একপ স্নানক্রান্ত শিশু দর্শন করিয়া পরমানন্দিতা হইলেন এবং দীন হৃৎখীদিগকে বিস্তর অর্থদান করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। ডাকিনীর হস্তহইতে শিশু প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কুৎসিত নাম রাখা হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের বাল্যাবস্থা ঘটিত বিস্তর অলৌ-

* কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্য হইতে এই ভাব লওয়া।

† অদ্যাপি অস্বদেশীর অনেক ক্রীলোক মৃত বৎসর সন্তানের একরূপ ক্রতিকটু নাম রাখেন।

কিন্তু ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। শৈশব-
বস্থায় একদা চৈতন্য গৃহান্তরে ক্রীড়া
করিতে করিতে মাটি খাইতেছিলেন,
ইহা দেখিয়া শচী তাঁহাকে অমুযোগ
করিলেন। শিশু বলিল “সমুদ্র বস্তুই
মাটি, যে হেতু মাটি বিকৃত হইয়া উদ্ভি-
দাদি হয়। সুতরাং উদ্ভিদাদির ন্যায়
মাটি আহা— করার দোষ কি?” শচী
বলিলেন “বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ও
বিকৃতাবস্থা সমগুণ বিশিষ্ট নহে।” এই
কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য দৌড়িয়া
নাতার অঙ্কে উঠিয়া বলিলেন “মা!
আব আমি মাটি খাইব না, আমি তো
মার স্তন্যপান করিব।” অন্য দিন এক
জন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আলয়ে অতিথি
হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ষ্য দ্রব্য রন্ধন
করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন,
নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, নিমাই
আহাব্য কবিত্তেছেন। জগন্নাথ এই সংবাদ
শ্রবণ করিয়া পুত্রকে নানাক্রপ তাড়না
করিয়া গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পুনর্কীর্তন রন্ধন
করিতে অমুবোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ
তাঁহার অমুরোধ এড়াইতে না পারিয়া
পুনর্কীর্তন রন্ধন কবিলেন। রন্ধনান্তে
যখন পুনর্কীর্তন বিষ্ণুকে নিবেদন কবিত্তে
বসিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, অমনি নি-
মাই পুনর্কীর্তন আহাব্য করিতে বসিলেন।
পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরি-
ণামে হুঁত্বিতে পাবিলেন নিমাই সামান্য
শিশু নহে—বিষ্ণুর অবতার। তখন
সানন্দচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ও

নিমাইকে নানাক্রপ স্তবজ্ঞতি করিয়া
বিদায় হইলেন।

চৈতন্য বালা কালে বড় হৃদ্য ছিলেন।
জ্ঞান করিতে গিয়া ঘাটে বরসাদিগের
সহিত কলহ করিতেন ও কুমারীদিগের
আনীত দেবপূজার্থ নৈবেদ্যাদি অপহরণ
করিয়া আহাব্য করিতেন।

ক্রমে চৈতন্যের বিদ্যারস্তুর কাল
উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে
নবদ্বীপনিবাসী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গা-
দাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ কবি-
লেন। তথায়, চৈতন্য স্বাভাবিক বুদ্ধি-
প্রাণের্যে অত্যন্তকালেই ব্যাকরণ সমাধা
করিলেন।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র
চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ কোমারাবস্থা
অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করি-
লেন। জগন্নাথ বিশ্বরূপের বিবাহের
জন্য অহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু
বিশ্বরূপ সংসারে যারপর নাই নির্লিপ্ত
ছিলেন এবং সর্বদা মনেঃ সন্ন্যাস
ধর্মের উৎকর্ষ চিন্তা করিতেন। পিতা
বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন
জানিতে পারিয়া, বিশ্বরূপ নিভূতে
সংসারাত্মক ত্যাগ কবিষা, জনক জননীকে
ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত

‡ ভাগবতে কৃষ্ণের বালা কাল ঘটত
এইরূপ একটি বর্ণন আছে। হয়ত বৃন্দা-
বন দাস চৈতন্যের প্রাধান্য বিস্তার
জন্য তাহাবই অমুকরণ করিয়াছেন।

হইলেন। বুদ্ধ জনক জননী অপত্য-
বিরহে অনেক রোদন করিলেন। হাঃ।
নিষ্ঠুর বিধাত। তোমার অন্তর পষণ
ময়! অন্যথা সৃষ্টিতে কিজনা একজনের
কর্মকল অন্য জনে ভোগ করে; এক
জনের কৃত অপবাধ অন্য অন্য জনে দণ্ড
পায়।

বুদ্ধ জনক জননী অনেক বোদন
করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল?
তাঁহাদিগেরই শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল।
কাল সর্বসংহর্তা। কালে যেমন সুরম্য
হর্য্য ভগ্ন হইয়া ধূলিসাৎ হয়, দিগন্ত-
ব্যাপী বৃহৎ রাজ্যেব নাম লোপ পায়,
সেইরূপ আবাব মরুময় স্থান বৃহৎ অট্টা
লিকাশোভিত হ'য় এবং অপত্যবিরহ-
বিধুব অনেক পরিমাণে শোক বিম্বত হইয়া
শাস্তি লাভ করে। যদি প্রিয়জনবিহ-
শোকের তীব্রতা কালে লঘু না হইত
তাহা হইলে সংসাবে আর কে সুখ
পাইত? কেই বা তাদৃশ শোকভারবাহী
জীবনভার বহন করিতে পারিত। কারণ
কে না প্রিয়জন হারাইয়াছে? এই কালের
মোহিনী শক্তিতে জগন্নাথ ও শচী চৈত-
ন্যের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া বিশ্বকপের
কথা কিরদংশে ভুলিয়া গেলেন। কেনই
বা না ভুলিবেন, চৈতন্যের ন্যায় গুণবান্
এক পুত্র সহস্র পুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয়।
এদিকে বালম্ব্যতাব চৈতন্য অপত্য-

বিরহবিধুব-জনক-জননীর দুঃখ দেখিয়া
যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। নানা
রূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন।
এবং স্বয়ং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগেব চরণ
সেবা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।
চৈতন্যের বিদ্যাভ্যাস সমাধা হইতে
না হইতে জগন্নাথ মিশ্র মানবলীলা
সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগেব এক বৎসব পব
একদা চৈতন্য চতুপাঠী হইতে গৃহে
ফিবিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে
পথিমধ্যে ব্রজভাচার্য্যের কন্যা পরম
কণবতী লক্ষ্মী দেবীকে নয়নগোচর
করিয়া বিমোহিত হইলেন। দৈবে
বনমালী ঘটক (ইনি বোধ হয় নবদ্বীপে
আধুনিক ঘটক দিগের ন্যায় বিবাহের
ঘটক ছিলেন) সেই পথে গমন করিতে
ছিলেন। ঘটকবর সহজেই চৈতন্যের
প্রণয়লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং উক্ত-
য়েব কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাত করা-
ইলেন। দ্বারায় মহানন্দে চৈতন্যদেব
লক্ষ্মী দেবীঃ সহিত পরিণয়গাশে বদ্ধ
হইলেন।

কণবতী লক্ষ্মী দেবীকে গৃহে আনিয়া
চৈতন্য পরম সুখে কালান্তিপাত করিতে
লাগিলেন।

‡ বৈকুণ্ঠেবা বলিয়া থাকেন লক্ষ্মী রা-
ধার অবতাব স্বরূপ।



ভাবী বসুমতী।

বিশ্ব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ কয়েকটা সাধারণ নিয়মাস্ত্রগত। পবিত্রত্ব-শীলতা সাধারণ নিয়ম। এই প্রকাণ্ড বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত কর এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না যাহা এই নিয়মাতীত। তোমার সম্মুখে যে বস্তু বহিরাছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ, ক্ষয় অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তোমার সম্মুখে যাহা নাই তাহাবও এই দশা। যদি বল একথাব প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসব সহস্র সহস্র মনুষ্য এইকপ দেখিয়াছে—কেহই ইহাব ব্যক্তিতাব দেখে নাই, অথবা শুনে নাই। তুমিও আত্মা-বন ইহাই দেখিবাছ এবং শুনিবাছ এবং কখন ইহাব ব্যক্তিতাব দেখে নাই, অথবা শুনে নাই। সুতরাং যাহা কদাপি হয় নাই বিশ্বের নিয়ম পবিত্রত্ব না হইলে তাহা কিরূপে হইবে?

তোমার দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সাতবৎসবে আব কিছুই থাকিবে না। তোমার গৃহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কয়েক বৎসব জীর্ণতানিবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইবে। কেবল সামান্য সামান্য পদার্থ কেন জ্যোতির্বিদেয়া অনেক গ্রহ উপগ্রহেবও গতি পবিত্রত্ব ও ধ্বংসবর্ণন করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকর্তারা এই প্রলয়ের কথা অনেক বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের

মতে বসুমতীব প্রলয় হইবে এবং প্রলয় কালে স্বাদশাদিত্য উদয় হইবে। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত; এ সকল হট করিয়া উড়াইয়া দেও। যদি শাস্ত্রের কথা শুনিতে ইচ্ছা না কব, শ্রবণ কব, বিজ্ঞান কি বলে। “নাস্ত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ বিষয়। কামনিক বা আত্ম-মানিক নহে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হর্শেল সাহেব ৪২ বর্জিনিসকে দেখিতে পান নাই। কখন কখন একেবারে কতকগুলি তাবকা দৃষ্টিগোচর হইয়া এক কালেই প্রলীন হইয়াগিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালেও অনেক পণ্ডিত একপ নাস্ত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন। ১২০ খৃষ্টাব্দে হিগার্কস এইকপ একটা প্রলয় প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। ৩৮৯খৃঃ অব্দে আলফা আকুইলি নামক নক্ষত্রের নিকট আর এক অভিনব তাবকা হঠাৎ দেখা যায়; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্র-গ্রহেব দ্বারা উজ্জ্বল ছিল পবে একেবারে অদৃশ্য হইল। ১০৬ খৃঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর তাবিখে স্বর্ণপুঞ্জের মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা এক বৎসব যাবৎ দেখা গিয়াছিল। ১৬৭০ অব্দে হংস পুঞ্জের শীর্ষদেশে এক অভিনব নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়; পুনর্বার দেখা যায়।

তখন বিবিধরূপ আলোক পরিবর্তন দেখাইয়া দুইবৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। এপর্যন্ত এইরূপে যত নক্ষত্রকে প্রলীন হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাসীও পিয়া নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে যে এক তারকা দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্তারকর। সেই নক্ষত্র শীঘ্র-শীঘ্র সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতে লাগিল—এমন কি শেষে বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জল হইয়াছিল। ক্রমে তাহার জ্যোতির হ্রাস হইতে লাগিল। দাহমান পদার্থের যে সকল বর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্তনই উক্ত নক্ষত্রে ক্রমে ক্রমে লক্ষিত হইয়াছিল এবং একবৎসরচারিমােস পরে স্থান পরিবর্তন না করিয়াই একেবারে অদৃশ্য হইয়াগেল। যে নক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে এক্রপ স্পষ্ট লক্ষিত হয় সে দাহন কিরূপ ভয়ঙ্কর আমাদের কল্পনাও তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদের বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয়েব কক্ষার মধ্যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ অনুমান করেন, ধূমকেতুর আঘাতে কোন গ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভগ্ন হওয়ার এক্রপ হইয়াছে।”

যখন আমরা বিশ্বের সমুদয় অংশই পরিবর্তনশীল দেখিতেছি, তখন কি মনে করিতে পারি, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা বসুমতীই এক মাত্র চিরকাল

সমান থাকিবে। এই বসুমতীর অতীত কালের ইতিহাস + অনুসন্ধান করিলেও জানা যায় পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার অবধি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে আকার আমরা অদ্য দেখিতেছি, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা বহুকালে গঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল কারণ অদ্যাবধি বিরাজিত থাকায় এক্রপে যে আকার রহিয়াছে, নিশ্চয় অমুভব হয়, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চির উষ্ণ তরল পদার্থের উপর ছুঁকের সরের ন্যায় আবরণ নিরন্তর পুট হইতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর স্থলভাগও ক্রমশঃ পুটতালিত করিতেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আরও বলেন আদৌ ভূমণ্ডলে আগ্নেয় গিরির + বহুল পরিমাণে আধিক্য ছিল। সেই সকল আগ্নেয়গিরিসমুখিত কর্দম ও ধাতুনিঃস্রব হইতে স্থলবিভাগ পুটতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও সাগর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত। বিভিন্ন স্তর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে কারণে এক স্তরের উপর আর এক স্তর সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই কারণ অদ্যাবধি বর্তমান থাকায় নিশ্চয় অমু-

+ ভূতত্ত্ব বিদ্যা।

‡ একবার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই বলিতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত আগ্নেয়গিরি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অধিকাংশই শীতল হইয়াছে।

ভব হয়, বহুমতীর বর্তমানস্তরের উপর আর কত স্তর হইবে তাহাব অন্ত নাই । বস্তুতঃ কাষণেব বিনাশ না হইলে কদাপি কার্যের বিনাশ হইবে না । সুতরাং এই সকল কাষণ বর্তমান থাকিতে কদাপি বহুমতীর পরিবর্তনশীলতাব অন্যথা হইবে না ।

(২) সর্বদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি বলিয়া থাকে এক কালে পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়াছিল । একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হয় না । যদি কোন কালে কোন কাষণ বশতঃ একপ তাপাধিক্য হয় যে পৃথিবীতে যত তুহিন সঞ্চিত আছে তাহা এককালে বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অতি উচ্চতম স্থলভাগও জলমগ্ন হইয়া যাইবে । যদিও একপ তাপাধিক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই যেহেতু তাপাধিপতি সূর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে । তথাপি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ চাপ ও তদুপরি বর্তমান সময়ের সূর্য্যবশিষ্টতন বশতঃ কোন বৃহৎ তুহিনখণ্ড বিগলিত হইয়া এক দেশ বা নগর ধ্বংস করিতে পারে একথাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই ।*

(৩) হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি অদ্যা-

বধি সাগরবাসী প্রাণীর অবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হওয়ার বোধ হয় পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশ হিমালয়ও এক কালে সাগরগর্ভস্থিত ছিল । বিখ্যাত ভূতত্ত্ব-বিৎ এমণ্ডিলক বলেন জনপ্রাচীন পৃথিবীর সকল অংশ জলমগ্ন হয় নাই, কেবল জলভাগ স্থল ও স্থল ভাগে পরিবর্তিত হইয়াছে ।

(৪) ভূমিকম্প অথবা কোন কারণ বশতঃ জোয়ারের আধিক্য হইলে সময়ে সময়ে সাগর এত ক্ষীত হইয়া উঠে যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নগর সমুদ্র ধ্বংস হইয়া যায় । এক্ষণেও এক্ষণে বহুমতীর যে আকার আছে তাহাব অনেক পরিবর্ত হইতে পারে ।

বিশেষ কোনই নিয়ম পরিবর্তিত হয় নাই সুতরাং একথা কিরূপে বলা যাইতে পাবে একপ জলপ্রাবন আর হইবে না । যদি একপ জলপ্রাবন পুনর্বার হয় তাহা হইলে বহুমতীর বর্তমান অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইবে ।

(৫) যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যে তুহিন সঞ্চিত হইয়া পরিণামে নদীরূপে পরিণত হয় অথবা বাষ্পাকারে আকাশে উড়ীন হইয়া কবকা বা বৃষ্টি রূপে ভূপতিত হয়, যে নদী নিম্ন ও সমুদ্রস্থ বালুকা ও কর্দম আনয়ন করিয়া ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যে তরঙ্গমালাবিতা নদী অতিনিরন্ত তীরকে সবেগে আঘাত ক-

* সারজন হর্শেলের পিতা পূর্ব্বসূর্য্যের তাপাধিক্য ছিল একথা বিশ্বাস করিতেন । পুত্রও বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগে পিতার বাক্য অসম্ভব নহে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন ।

রিয়া + সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাতে
প্রতিনিয়তই বসুমতীর এক স্থলের যুতি-
কা অন্যস্থলগত হয়। কে না প্রত্যক্ষ
করিয়াছেন বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে এবং
সাগরের তীরে এইরূপে কত পরিবর্তন
হইয়া থাকে ‡ চারি সহস্র বৎসর পূর্বের
বসুমতীসহ আধুনিক বসুমতীর তুলনা
করিলে (এই সকল কারণ দৃষ্ট্যঃ) অনেক
পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যদি প্রতিদিন

† এষ্ট জন্য পদ্মানদী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ
নদীও তীরে নিয়ত জমি পরোষ্ণি ও
শিক্তি হয়।

‡ ধান্দা, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, প্রভৃতি
ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বসুমতীর একএকতিল পরিবর্তন হয়,
কাল অনন্ত এবং বসুমতী সীমাবদ্ধ এই
জন্য নিশ্চয়ই এক কালে বসুমতী সম্পূর্ণ
রূপে পরিবর্তিত হইবে। এক দিন বা
চুইদিনে হইবে না। এক সহস্র বা চুই
সহস্র বৎসরে হইবে না। কিন্তু কোটি
কোটি বৎসর গেলেও কালের সীমা
হইবে না। সুতরাং এককালে বসুমতীর
সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয় *।

* ভাবী বসুমতীর জীব জন্তুর প্রকৃতি
বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা
থাকিল।



সূর্য্যমণ্ডল।

“—তৎ সবিতু বরেন্যং ভর্গো দে
বস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

অসীম বিশ্ব মণ্ডলে যতকিছু পদার্থ
দৃষ্টগোচর হয়, ওষ্মধ্যে সূর্য্যের জ্বা-
লিতাকর্ষক আর কিছুই নাই। অতি
প্রাচীন কালাবধি ইহা লোকেব মনঃ ও
নেত্র আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রা-
চীন আর্ধ্যগণ, প্রাচীন পারসিকগণ—
প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই অত্যাশ্চর্য
প্রতাপপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে ঈশ্বরের

অতিক্রম স্বীকার করিয়া উপাসনা করি-
তেন। বাস্তবিক, যদি প্রাকৃতিক কোন
পদার্থদ্বারা জগদীশ্বরের মহিমা ব্যক্ত
কবিত্তে ইচ্ছা হয়, তবে সূর্য্যই সর্ব্ব-
প্রধান। সুতরাং সরলচিত্ত প্রাচীন
লোকেরা সূর্য্যকে স্রষ্টার অতিক্রম করিয়া
উপাসনা করিতেন, তাহা বড়
বিশ্বয়কর নহে।

এরূপ অতীব বিশ্বয়কর সূর্য্য সম্বন্ধে
আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের
মতামতসরণ করিয়া কতকগুলি কথা
বলিব।

সুতপ্ত সোণার থালার ছায়া গোল সূর্য্য প্রতি দিন আকাশমার্গে গমন করিয়া আমাদের ক্রিয় দান করিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। এই সূর্য্য আস্তানে যে সৌরজগৎস্থ গ্রহ উপগ্রহগণ অপেক্ষা বড়, তাহা আজি কালি সামান্য পাঠশালাব চাত্রেবাও অবগত আছে। সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১১গুণ বড়; অর্থাৎ তাহার পরিমাণ ৮৮২০০০ মাইল। এই পরিমাণের স্থান কতখানি, তাহা বোধ হয় এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। কোন রেলগাড়ী যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে চলে, তবে উক্ত গাড়ির সূর্য্যমণ্ডলের একপ্রান্ত হইতে অপবপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে তিনবৎসর সাতমাসেরও অধিক সময় লাগিবে। কিম্বা যদি পৃথিবীকে লইয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে স্থায়ায়, তবে পৃথিবীর চারি পার্শ্বে সূর্য্যমণ্ডলের এতস্থান থাকিবে, যে এক্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যত দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টিত করিতেছে, তত দূরে থাকিয়া বেষ্টিত করিলেও, চন্দ্রের কক্ষাব বহিঃস্থ স্থান, চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা অতি অল্প কম হইবে।

সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় গোলাকাব; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যের উপরিভাগে কতকগুলি অস্থির কুঁড়ি দেখা যায়। সেগুলি সূর্য্যমণ্ডলের একপার্শ্বে হইতে অন্যপার্শ্বে গমন করে। তাহাতে জানা যায়, যে

গ্রহ উপগ্রহগণের ন্যায়, সূর্য্যও আপনাব মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে। এরূপ একবার আবর্তন করিতে আমাদের ২৫দিন পরিমাণ সময় লাগে।

সূর্য্য তাপ আর আলোকের আকব। সূর্য্যমণ্ডল হইতেই সৌরজগৎস্থ গ্রহ ও চন্দ্রগণ তাপ আর আলোক পায়। পৃথিবীর যে পার্শ্বে যখন সূর্য্যাস্তমুখে থাকে, তখন সেই পার্শ্বে তাপ আর আলোক পায়; আর তাহার বিপরীতদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এই আলোক ও অন্ধকারের নামান্তর দিন ও রাত্রি। সূর্য্য হইতে পৃথিবী উপরে নিপতিত তাপ আর আলোকের পরিমাণ নির্ণয় কবিয়া একজন পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে কোন স্থানে ৫৫৬৩টা মমবাতি একসঙ্গে জালিলে, তাহার একফুট দূরে যত আলো হয়, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে পতিত রশ্মির আলোক পরিমাণ তত। আর একটা মাত্র বাতি জালিলে, তাহার ১২ফুট দূরে যে আলো হয়, চন্দ্রালোকের পরিমাণ তত; সুতরাং চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্যালোক প্রায় ৩০০০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্য অপরিমিত প্রচণ্ড তাপের আধার। সূর্য্যের ত্রাসবৃদ্ধি নাই; সূর্য্যমণ্ডলে দিবস রজনীরূপ আলোক ও অন্ধকারের পরিবর্তন ঘটে না; ঋতু পরিবর্তন নাই; এবং স্থল জলাদিকপ কোন বিভাগ নাই। তাপের আধিক্য এত যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ, স্বীয় কাঠিন্য রক্ষা করিতে

পারে না। সোণা, প্লাটিনম, বা অন্য কোন কঠিন ধাতু সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে, বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সূর্য্যমণ্ডলের প্রতিবর্গ ফুট হইতে এত তাপ নির্গত হয়, যে তাহা অতি প্রচণ্ডতম কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ডের প্রতি বর্গফুট হইতে নির্গত তাপের সাতগুণ অধিক। পৃথিবী সূর্য্য-ভিত্তিতে ১২ ঘণ্টা কাল মাত্র থাকে; আর বাকি ১২ ঘণ্টা শীতল হইতে থাকে; এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৫,০০০,০০০ মাইল, (দূরত্ব অনুসারে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে স্মরণ করা উচিত;) তথাপি পৃথিবীর উপরি-ভাগের প্রতিবর্গ ফুটে বার্ষিক এত তাপ পড়ে, যে সেই তাপে ৫৫০০ পাউণ্ড বরফ দ্রব হইতে পারে।

সূর্য্যের ভৌতিক রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিত-গণের নানা মতভেদ আছে। তাঁহাদের সেই মতগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—এক মতের প্রথম প্রচারক গালিলীয়, এবং প্রধান সমর্থনকারী কার্চহফ। আর দ্বিতীয় দলের প্রধান নেতা সার উইলিয়ম হর্শেল। আমরা এইক্ষেণে বলিয়া রাখিব, যে অধুনাতন নব্যপণ্ডিতগণ পুনরায় সূর্য্যমণ্ডল বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উৎকৃষ্টতর যন্ত্রের সাহায্যে এবং উৎকৃষ্টতর গণনা দ্বারা যেসকল নূতন মত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে উপরোক্ত দুইটামতের একটীও যে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে

না। বাহা হউক, আমরা সার উইলিয়ম হর্শেল প্রচারিত মতের কথাই সংপ্রতি বলিব। পরে নূতন যে সকল মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারও কথা কিছু বলা যাইবে। সার উইলিয়মের মতে সূর্য্য তেজোময়; কিন্তু তদন্তর্গত সমুদায় পদার্থ তেজোময় নহে। স্থির হইয়াছে যে সূর্য্যের শরীর তেজোময় নয়; তাহা অন্ধকারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণগোলক। তাহার দুইটা আবরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ ঠিক সূর্য্য শবীরেব উপরি-ভাগস্থ আবরণটাই তেজোময়। এই তেজোময় আবরণ কখন কখন ছিন্ন হইয়া যায়; সেই সময়ে সেই ছিন্নাঙ্গুরাল দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখা যায়। এই কাবণে সূর্য্যশরীরকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির কবা হইয়াছে। ইতিপূর্বে সূর্য্যেব উপরিভাগে পরিদৃশ্যমান যে সমস্ত কৃষ্ণচিহ্নের কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি সূর্য্যাবরণের ছিন্নাঙ্গুরাল দিয়া দৃশ্যমান সূর্য্যশরীরের অংশ মাত্র। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে দেখিলে, তাহার উপরি-ভাগে এক অথবা ততোধিক কাল দাগ দেখা যায়। কখন২ এরূপ কতকগুলি দাগ একস্থানে পুঞ্জীকৃত দেখা যায়। তখন চাই কি সহজ চক্ষুতেও সেগুলিকে দেখা যাইতে পারে। একথও কাচকে দীপশিখাতে তাহাইয়া তাহাতে কালী পড়িলে, তাহার ভিতর দিয়াও সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে। অথচ চক্ষুর কোন কষ্ট হয় না। এই কৃষ্ণ দাগ সকলের

কৃষ্ণ প্রায় মধ্যস্থলে সমান থাকে; কিন্তু তাহার পার্শ্বের কৃষ্ণ তত থাকে না। যখন এই কাল ছিন্নসকল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে দেখা যায়, তখন উক্ত ছিন্ন খেটনকারী ঈষৎ কৃষ্ণস্থান সকলকে গোলাকার এবং সর্বত্র সমবিস্তৃতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সেগুলি সূর্য্যের পার্শ্বে গিয়া পড়ে, তখন সেই অল্প কৃষ্ণ পার্শ্বের বহির্দেশে স্পষ্ট দেখা যায় না; এবং তাহার চারিতে কৃষ্ণতম অংশও আবৃত হইয়া পড়ে। সর উইলিয়ম হর্শেল একরূপ একটি কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এবিষয় ভালরূপ বুঝা যাইতে পারে;—“১৩ অক্টোবর ১৭৯৪। গত দিবস সূর্য্যমণ্ডলে আমি যে চিহ্নটি দেখিয়াছিলাম, অদ্য তাহা কিনারার এত নিকটে হইয়াছে, যে তাহার পশ্চাদ্ভাগের উচ্চদিকে সমস্ত কৃষ্ণতম অংশটুকু চাকিয়া ফেলিয়াছে; তবুও সেই গহ্বরটিকে দেখা যাইতেছে, এত সুন্দর দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণতম চিহ্নের নিম্নে এবং কালীম পার্শ্বদেশের উচ্চতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।”

অপিচ এই ছিন্ন সমূহকে সূর্য্যমণ্ডলের একস্থানে সন্নিবিষ্ট দেখা যায় না। তাহাদের স্থান পরিবর্তন ঘটে। সূর্য্যের যে অংশ বিষুব রেখার উত্তর পার্শ্বে ৩০ ডিগ্রির মধ্যগত, সেই অংশেই এই চিহ্নগুলিকে সচরাচর দেখা যায়।—এই অংশের মধ্যে সেগুলি বিচলিত

হইয়া বেড়ায়। অপর ইহারা সময়ে২ স্বয়ং আকাবও পরিবর্তন করে।—প্রতি ঘণ্টায় একরূপ আকৃতি পরিবর্তন হইয়া থাকে। যেখানে দুঃসহ চাকচিক্যময় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ ছিল, সেখানে হঠাৎ একটি ছিন্ন উৎপন্ন হয়। সেই ছিন্ন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পুনরায় কুঞ্চিত হইয়া ছোট হইয়া যায়; এবং শেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কখন কখন এইরূপ অদৃশ্য হইবার পূর্বে একটি রক্ত ভাঙ্গিয়া গিয়া, ছোট২ কতকগুলি রক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ আকৃতিপরিবর্তন হারা এই অনুমান হয়, যে তাহারা তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কখন২ কোন ছিন্নের সীমা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০ মাইল বেগে অন্য কোম রক্তের নিকটবর্তী হয়। তরল পদার্থ নহিলে আর কোন পদার্থের একরূপ গতি অসম্ভব।

সূর্য্যের বিষুব রেখার উত্তরপার্শ্ব অংশে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া এই অনুমান করা যায়, যে সূর্য্যের গতির সহিত উক্ত চিহ্ন সকলের উৎপত্তির অতি নিকট সংশ্রব আছে। কেন না কোন আবর্তনকারী গোলকের মধ্যস্থলের পদার্থ সকল সর্বাঙ্গের প্রবলবেগে আবর্তন করে। সুতরাং সেই আবর্তনের ফল গোলকের মধ্যস্থলেই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই জন্য একরূপ অনুমান করা যায়, যে পৃথিবীর উচ্চ কটাবকের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ যে রূপে মধ্য২ প্রচণ্ড বাত্যাভিহিত হইয়া থাকে

সেইরূপ সূর্যেরও মধ্যস্থলে মহা প্রচণ্ড সৌরবাত্যা সকল উদ্ভিত হইয়া, তাহার (সূর্যের) উপরিভাগেব আবরণকে স্থানে২ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়; এবং সেই কারণে ঐসকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদেব ভিতর দিয়া সূর্যের মিরিড কক্ষবর্ণ শীতল শরীর দেখা যায় বলিয়া, ঐ ছিন্নসকল কক্ষবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ্ময় আবরণকে বাম্পা কৃতি তবল পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই আবরণেব উপরিভাগ সৰ্বত্র সমানভাবে উজ্জ্বল নহে। রক্তস্ব স্থান সকল অধিকতর উজ্জ্বল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রেখানিচয় আবার বক্রাকৃতি এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই রেখাগুলিকে কেহ২ জ্যোতিষ্ময় আবরণের প্রবলতর তবলমালা বলিয়া জ্ঞান করেন। সূর্যমণ্ডলে কি মহা প্রচণ্ড অদ্ভুত আন্দোলনই ঘটয়াছে!!

পৃথিবী যেমন বায়ুবদ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্যও সেইরূপ আব একটা অসম্পূর্ণ স্বচ্ছ বাম্পাকৃতি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বিতীয় আবরণটি প্রথম আবরণের উপরি-ভাগে থাকিয়া সূর্যকে বেঠন কবিয়া আছে। তাহাকে “সৌরবায়ু” আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় এই অর্ধস্বচ্ছ সৌরবায়ু সূর্যের চারিদিকে প্রতিভাত হয়। এই বায়ু আছে বলিয়াই, সূর্যের মধ্যস্থল অপেক্ষা চারিশাৰ্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্প শুভ্রোন্নয় দেখায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে কার্জনিক উপরোক্ত মতের বিপরীতবাদী। তিনি বলেন, সূর্যের শীতল শরীর পরিবেষ্টন কাণী প্রকার প্রচণ্ডতম উজ্জ্বল সৌর আবরণের অস্তিত্ব অনুমান করা, কেবল অলীক কল্পনা মাত্র; কেন না, তাহা ভৌতিক নিয়মের বিপরীত। তিনি আপ-নার মত সমর্থনের জন্য যাহা বলেন তা-হাব সারমর্ম এই;—সৌর কক্ষচিহ্ন সক-লেব উৎপত্তি আদিব কারণ বুঝাইবার জন্য সূর্যেব ভৌতিক বচনাসম্বন্ধে উপ-লোক যে মত প্রচাৰিত হইয়াছে, তাহা কতকগুলি নির্দিষ্ট অনাস্ত্র ভৌতিক নিয়-মেব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এমন কি যদিও উপরোক্ত মতে কক্ষচিহ্ন সকলের উৎ-পত্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমবা না দেখাইতে পাবি, তথাপি সূর্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে উক্তমত কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পাবে না। উক্ত মতাবলম্বীদিগেব কল্পিত জ্যোতিষ্ময় আবরণ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহাব তেজঃ অবশ্য চতু-দিকে ব্যাপ্ত হইবে; সূর্যের শীতল শরীরেব দিকেও যেমন যাইবে, বহিঃস্থ সৌরজগতের দিকেও তেমনই ভাবে আসিবে। তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য শরীর নিজে শীতল এবং যত অধিক কেন হউক না, শীতলতর আবরণে আ-বৃত থাকিলেও, কালে উক্ত আবরণ এবং সূর্যশরীর উত্তপ্ত হইয়া, তেজঃ এত অধিক হইবে, যে সূর্যশরীর জলদগ্নিবৎ

উত্তম হইয়া উঠিবে। সূর্য্যবংশীতল
অন্ধকাবময় সূর্য্যশরীর জলন্ত অনলবৎ
তাপ আর আলোক বিকীর্ণ কবিবে।
ইহা অসম্ভব।

বড় বড় পণ্ডিতগণের একপ বিবদমান
মত সমূহ পাঠ ও আলোচনা কবিলে,
মন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, তাহা
ভাবিতেই বিচলিত হয়। বাস্তবিকও
আমাদের সৌবঙ্গগতের পবিচালক সূর্য্য
অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সম
ভাবে বিস্তারক হইয়া বহিষাছে। তাহাব
মধ্যে অভ্যুত কি সকল ভৌতিক কাণ্ড
চলিতেছে এবং তাহাব শাবীবিক বচনাদি
কি প্রকাব, তাহাব ঙ্গ ও অভ্যন্তমত
অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। উপবে
যে ছই মতের কথা বলা গেল, সংপ্রতি
আব একজন পণ্ডিত আবাব সেই ছই
মতই খণ্ডন কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন;
এবং যদিও আধুনিক পণ্ডিতবর্গ প্রথমে
তাঁহার নবপ্রচারিত মতে বিশ্বাস কবিতে
কিছু কুণ্ঠিত হইবাছিলেন, কিন্তু এক্ষণে
আবার অনেকে তাহাত বিশ্বাস কবিতে
প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিতবর ন্যাসমিথ
বলেন, যে সূর্য্যের জ্যোতির্ময় আবরণ
উইলো পত্রাকৃতি জ্যোতির্ময় পদার্থে
বিরচিত। উক্ত পত্রাকৃতি পদার্থসকল
অনবরত সূর্য্যশরীরের উপরিভাগে মৃত্য
কবিতেছে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া, সমস্ত সূর্য্যশরীরকে ঢাকিয়া বাধি
য়াছে। এই বিচিত্র পত্রাকৃতি পদার্থ
গুলিকে, যেখানে আলোকবশি কৃষ্ণচিহ্ন

সকলের মধ্য দিয়া সেতু আকারে পড়িয়া
থাকে, সেইখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
আবাব সেগুলিকে অতীব বিস্তারজনক,
প্রচণ্ডবেগে নাচিতে এবং পরস্পরের
প্রতি ধাবিত হইতে দেখা যায়। এই
নূতন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের উৎপত্তি
ও রচনা সম্বন্ধে কোন কথা কল্পনাও
বলিতে সাহস কবে না।†

† “Mr. Nasmyth (1862) described the spots as gaps or holes, more or less extensive in the luminous surface or photosphere of the sun. These exposed the totally dark bosom or nucleus of the sun. Over this appears the mist surface;—a thin, gauze—like veil spread over it. Then came the penumbral stratum, and, over all, the luminous stratum, which he had the good fortune to discover was composed of a multitude of very elongated, lenticular-shaped, or, to use a familiar illustration, willow-leaf-shaped masses, crowded over the photosphere, and crossing one another in every possible direction These elongated, lens-shaped objects he found to be in constant motion relatively to one another. They sometimes approached, sometimes receded, and sometimes they assumed a new angular position, by one end either maintaining a fixed distance or approaching its neighbour, while at the other end they retired from each other. These objects, some of which were as large in superficial area as all Europe, and some even as the surface of the whole earth, were found to shoot in thin streams across the spots, sometimes by crowding in on the edges of the

সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যমণ্ডলের বহির্দেশে যে সূক্ষ্ম লোভিত বর্ণ উচ্চ প্রতিকৃতি সকল দেখা যায়, এবং যাহাবা

spot they closed it in, and frequently at length thus obliterated it. These objects were of various dimensions, but in length generally were from ninety to one hundred times as long as their breadth at the middle or widest part."—*Meeting of the British Association—1862.*

কখন কখন সূর্য্যের শরীরের উপরিভাগে ৪০ সহস্র মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া থাকে, সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত মত প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত শোণিতবর্ণ আকৃতিসমূহেব উৎপত্তি, সেই সকল মতেব সহিত কোন রূপে সামঞ্জস্য হয় না। সূর্য্যমণ্ডল কত আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাত কাণ্ডেরই আকর!!

ক্রমশঃ

আত্মাভিমান।

আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। কেহবা আপনাকে ধনে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন, কেহবা আপনাকে মান সম্বন্ধে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ক্ষমতাতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন, কেহবা আপনাকে ধর্ম্মেতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন, এবং কেহবা আপনাকে মদ্যপান অথবা অন্য কোন অসৎ কার্য্যে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন। লোকে যে রূপ সংকার্য্যের জন্য অভিমানী হয় আবার সেই রূপ অসৎ কার্য্যের জন্যও অভিমানী হয়। আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে বিবেচ্য এই যে আত্মাভিমান

হইতে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়—আত্মাভিমান কি সকল প্রস্থ, অথবা আত্মাভিমান হইতে মনুষ্য জাতি অবনত হইতেছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। আপনাকে বড় বিবেচনা করিলে, তদনুযায়িক আচরণ কবিত্তে প্রয়াসী হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। তবে যিনি যে বিষয়েব অভিমানী তিনি তদ্বিষয় বক্ষার্থেই চেষ্টা করেন।

১ ধনাভিমান।

ধনাভিমानी লোক কি রূপে আপনার ধন বৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে যত দূর যত্নশীল হয়েন বা না হয়েন কিরূপে ধনপৌরব বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ কিরূপে আচরণ করিলে লোকে ধনী বলিয়া গৌরব কবিত্ত তাহাব প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলেন।

ধন শব্দের অর্থ কি। যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা যাহার বিনিময়ে যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে। কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ হইতে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত পর্য্যন্ত সমুদয়ই ধনসাপেক্ষ। এইজন্যই লোকে ধনের জন্য লালারিত। পক্ষান্তরে যাহার অধিক ধন থাকে, লোকে ধনপ্রাপ্তি আশয়ে তাহার বশীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ধন থাকিলে লোকেব গুণাদির একপ শোভা হয় যে স্বতঃই তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে হরণ করে। ধনশালী লোক যে যে কারণে বশতঃ লোকেব প্রীতিভাজন হয়, তাহা ব্যয়মূলক। * লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশয়ে ধনাভিমानी লোক ব্যয়শীল হয় এবং তদ্বারা দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু, শিল্পী ভিক্ষুক এবং সময়ে সময়ে জন সাধারণে যাবপরি নাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীই লোক কখন নিতান্ত অসাধ্য না

* যাহার গৃহে ধন প্রোথিত থাকে, তাহার দ্বাৰা সমাজে কেহই উপকৃত হয় না। সে যেমন দানাদি করে না, সেইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ অথবা অন্য কোন শিল্পকাজ পদার্থ দ্বারা গৃহ অথবা শরীরের শোভা সম্বন্ধে অন্য যত্ন করেন না। একপ প্রকৃতির লোক ধনের অভিলাষ করেন। লোকে তাহাকে ধনশালী বলিলে যাবপরি নাই চিন্তিত হয়, পাছে দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব অথবা ভিক্ষুক ধন প্রার্থনা করে, কিম্বা চৌরাদি তাহা অপহরণ করিয়া লয়।

হইলে ব্যয়কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং জন সাধারণে তাহার হস্তে নানা রূপ উপকার লাভ করে। পৃথিবীতে যত সংকার্য্য সংস্থাপিত † হইয়াছে তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধনাভিমান অন্যতর।

সংসারে সকল বস্তুরই দুই দিক আছে ধনাভিমানের অশেষগুণ সত্ত্বেও দুই একটা কুফল দৃষ্টি হয়;

(১) অবস্থাভীত ধনাভিমান বশতঃ অনেক সময়ে লোকে কুকর্মান্বিত হয়। এই জনাই লোকে “গক মেয়ে বামুনকে জুতো দান কবে।” অভিমান বশতঃ লোকে কতকগুলি কার্য্য অবশ্যকর্তব্য জ্ঞান করিয়া, তদনুরূপ অবস্থা না থাকিলে, অর্থের জন্য প্রায় কোন রূপ অসং কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। অস্বদেশীয় প্রাচীন জমিদারের বংশস্থ কেহ অপেক্ষাকৃত দুঃখবহাগ্রস্ত হইলে যে প্রমোদীভূত হয়, ইহাই তাহার অন্যতর কারণ।

(২) ধনাভিমান জন্য অনেক সময়ে লোকে অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করে এবং লগ্নগ্রস্ত হইয়া পরিণামে সর্বস্বান্ত হয়। এইরূপে অস্বদেশীয় কত ধনশালী পরিবার যে দরিদ্র হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যত ধনশালী বংশ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই আধুনিক। প্রাচীন ধনী

† এবিষয় যশোভিমান বর্ণন সময়ে সম্যক্ বিবৃত হইবে।

সন্তানগণ প্রায় দরিদ্র হইয়াছেন। ইহার অশেষ কারণ মধ্যেও ধনাভিমানমূলক কার্য অন্যতর ও প্রধানস্থলীয়। অধুনা আমাদিগের দেশে ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে ধনসহ প্রধানতঃ মান সত্ত্বমাদি যুক্ত হওয়ার লোকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এই জন্যই ঘাহার পিতা পিতামহ মাসিক একশত* টাকা আয় করিয়া ছয় আনার চটা ও চৌদ্দ আনাব কাপড় পরিধান করিয়া সন্তুষ্টিতে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র ৩৪ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আঠশতাব্দিং বিংশতি বৎসর কালেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া মাসে ৪০।৫০ টাকা আয় করেন এবং ৫ টাকা মূল্যের বিনামা ও দশ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়াও সন্তুষ্টি হইতে পারেন না। এই জন্য বর্তমান বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সঞ্চয়শীল নহে, তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক ক্রেশ ও যত্নগা সহ্য কবে এবং সঞ্চয়-শীলতা হইতে যে মহান উপকার সকল সাধিত হয় তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে বর্তমান বংশীয় লোক ধনগৌরব করিয়াই নষ্ট হইতেছে। আমাদিগের আঁষ অতি অল্প, তথাপি সাহেবদিগের সজ্জিত বাহ্যিক আড়ম্বরে সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করি।

(৩) ধনাভিমাত্র মনে স্থখ নাই।

* দ্রব্যাদির মূল্য বিবেচনা করিলে তৎকালীন একশত টাকা অধুনাতন ৩০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

সর্বদা ধনগৌরব লাভের জন্য ব্যস্ত। এক দণ্ড স্থখে কালাতিপাত করিতে পারে না। প্রচুব আয়বান্ না হইলে সর্বদা ঋণগ্রস্ত থাকে এবং তন্নিবন্ধন অশেষ যত্নগা সহ্য করে। প্রাচীন ধন-শালী ভগাবত্ লোক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক উভয়েই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(৪) এই ধনগৌরবাকাজ্ঞা বশতঃ অনেক সময়ে আধুনিক লোকে, যেমন লোকের নিকট অধিক আয়বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য ঋণ করিয়াও বাহাড়ম্বর করে, সেইরূপ আবার কখন কখন অবস্থা সঙ্কটে অন্ত বাক্যও প্রয়োগ করে।

এইরূপ ধনাভিমানের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা কেবল তাহার অযথা পরিমাণোৎপন্ন। পরিমিত সীমা অতিক্রম করিলে সকল বিষয় হইতেই কুফলোৎপত্তি হয়। দয়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের ভূষণ—ঈহলোকে দেবজ লভ গুণাবলীও যদি অযথাপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাহইলে যারপরনাই কুফলোৎপাদন কবে। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নির্দিষ্টসীমা অতিক্রম করিলে কুফল প্রসূ হয় না। এই জন্য ধনাভিমানের অযথা পরিমাণোৎপন্ন অনেক কুফল মধ্যেও তাহা মানবসমাজের অপকারী না হইয়া উপকারী পদের বাচ্য।

যশোভিমান।

যশোভিমান মনুষ্যের মনে যার পর নাই প্রবল। জগতে যত সংকার্য্য অনু-

ষ্টিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহলোকে চিরস্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে মূলক—এ কথা বোধ হয়, যিনি মানব প্রকৃতি একটু মনোযোগ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া লোকের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জন করে—এরূপ দেব প্রকৃতিক কয় জন লোক সংসারে দেখা গিয়া থাকে। দার্শনিকপ্রবর লক অথবা অগস্ত্য কোমৎ যাহাই কেন বলুন না, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে পবোপকাব কল্পনা-প্রধান বাগকের স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। অল্প কোন বিশেষ স্বার্থ বর্জিত হইয়াও স্তন্যম লাভ আশায় লোকে সদহুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি সংকল্পশালী লোককে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট উচ্চ উপাধি দ্বাৰা সন্মানিত না করিতেন, তাহা হইলে, অস্বদেশে কদাপি সদহুষ্ঠানের এত বাহুল্য হইত না—এত বিদ্যালয় এত চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়া লোকের অশেষ উপকার সংশোধিত হইত না, এত প্রশস্ত রাজবন্দ্র প্রস্তুত হইয়া লোকের গতিবিধির স্বেদুশ সুবিধা হইত না।

কেবল সংকল্পাধুষ্ঠান নহে, যশোভিমানী লোক অনেক সময়ে স্তন্যম হানিব অভিপ্রায়ে ছক্কর হইতে বিরত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অভিমানী লোক প্রায়শঃ নীচপ্রকৃতি লোকের ন্যায় ছক্করাসিত নহে। আমাদিগের ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে পর-

লোক ভীতি ও পরমেশ্বরের উপর প্রকার ভাগ পূর্ববর্তী বংশীয়দিগের অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইয়াছে, তথাপি কে না স্বীকার করিবেন বর্তমান বংশীয়দিগের নীতি পূর্ববর্তী দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। অন্ততাতার, অন্তত কখন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ঘণিত কার্য পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেক কারণ সত্ত্বেও যশোভিমান অন্যতব।

এই ভাব লোকের মনে এতই প্রবল যে দার্শনিকবর বার্ণার্ড ডি মাণ্ডীল বংশোভিমানই লোকের স্তায়স্তায় নির্ধারণের উপায় বলিয়া বর্ণন করেন। সকল স্তনীতি এই অভিমান (১) অর্থাৎ লোকাভুবাগ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্তমান দার্শনিক বেন বলেন, “মহুব্য নিশ্চেষ্ট ও ভীকপ্রকৃতিক—কোন বিশেষ ভাব প্রধান নহে। স্তরায় আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা হইতে উন্নত হইতে পারিত না। তথাপি ধর্মশাস্ত্র লেখকেরা আত্মাভিমানের উপর দোষারোপ করেন। অভিমান নির্দেশ করা বড় কঠিন। আমি বড় নিরভিমানী এই বালিয়াও সময়ে সময়ে অভিমান হয় এবং ছক্কর করিয়াও লোকে সময়ে সময়ে অভিমানী হয়। আত্মাভিমান অনেক সময়ে মহুব্যকে সংকল্পশালী

(১) “The Moral Virtues are the political offsprings which flattery begat upon pride.” Mandeville's Fable of the Bees.

করে। সতীর সতীত্ব ও বীরের বীরত্ব
অভিমান মূলক।” (১)

আমরা মাণ্ডীবীল ও বেন সাহেবের
সহিত অনেকাংশে ঐকমত্য প্রকাশ
করি। যদিও এই পাপ পুণ্যময় সং-
সারে এমন অনেক লোক আছে ধর্ম্মই
যাহাদিগেব জীবনের একমাত্র ব্রত এবং
পরলোক ভয়েই যাহাবা সমুদয় সদহুষ্ঠান
কবে, তথাপি অধিকাংশ সংকল্পশালী
লোকই যে সম্মান প্রত্যাশী এ কথাতে
অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অন্যদেশে এই ভাব এতাদিক প্রবল
যে অত্যাতি হইবে দশ জনে হাঁসিবে বা
দশ জনের কাছে মুখ থাকিবে না—এই-
রূপ বাক্য আবার বুদ্ধবণিতাবমুখে সর্ব-
দাই শুনা যায়।

ধনাভিমানের ন্যায় যশোভিমানও
অযথা প্রবল হইলে লোকে নানারূপ
কুকর্মান্বিত হয়; যশোলাভ প্রত্যাশায়

(১) Man is naturally innocent, timid and stupid, destitute of strong passion or appetite, he would remain in his primitive barbarous state were it not for pride yet all moralists condemn pride, as a vain notion of our superiority. Is is a subtle passion not easy to trace. It is often seen in the humility of the humble and the shamelessness of the shamesless. It stimulates charity; pride and vanity have built more hospital than all the virtues together. It is the chief ingredient in the chastity of women and in the courage of men.”

Bain.

যারপর নাই অবশ্যের কার্য্য করে। রাজ-
পুত্রগণ একমাত্র বংশ মর্যাদা রক্ষা
হেতুই অনেক স্থলে কন্যা সন্তান ভ্রূমিষ্ট
হইলেই প্রাণবধ করে।

সমবে সময়ে নোকে দুর্দশে খ্যাতি-
লাভের জন্যও ব্যস্ত হয়। মাতাল অধিক
পরিমাণে মদ্যপান ও লম্পট দুষ্টিয়াতে
চাভুখ্যালাভ গৌরবের বিষয় মনে কবে।
এইরূপে যে যে কার্য্যে রত হয়, সে
তাহাতেই বাহবা লাভের জন্য সমিচ্ছুক
হয়। মহাবীর আলেকজান্ডার একমাত্র
সম্মান লাভাকাজ্য লক্ষ লক্ষ লোকের
প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, ও শত শত নগর
ও পল্লী লুণ্ঠন কবিয়া নির্ধন ও নির্মম্ব্য
কবিয়াছেন। এবং কর্ত্তেজ, পিজাবো
মণ্টজ্যাব একমাত্র সম্মান লাভাকাজ্য
ধর্ম্মেব নামে সহস্র সহস্র নিবপরাধী
আমেবিকাবাসী প্রাণ বিনাশ করিয়া-
ছেন। একমাত্র পৌত্তলিকতা বিনা
সম্মানাকাজ্যই গড়নীষ মহম্মদ সোম
নাগের মন্দির জয় করিলে পাণ্ডদিগেব
অনেক অমুরোধ ও অর্থ প্রদানের প্রতি-
শ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াও প্রতিমা ভগ্ন করি-
য়াছিলেন। এবং একমাত্র সম্মান-
কাজ্যেব কোন গ্রীক সম্রাট্ মক্ষিকা বধ
জীবনের প্রধান কার্য্য কবিয়াছিলেন।

সম্মানাকাজ্যের এই সকল দোষ দে-
খিয়া কি আমরা তাহাকে মম্ব্যের অগ-
কাবী আখ্যা প্রদান কবিব? আমরা
এই মাত্র বলিতেছি যে সম্মানাকাজ্য
লোকে কার্য্যে উৎসাহশীল করে। কিন্তু

কার্য অন্য মূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে যে বিষয় ভাল বুঝে যাহাব কর্তব্য সে সেই বিষয়েই অনুসরণ করে। সুতরাং যাহাবা সম্মানাকাজ্জা বশতঃ নীচগামী হন তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমভ্রমে আবদ্ধ। সম্মানাকাজ্জাব কোনই দোষ নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা বিদ্যাভিমান :

স্বাভাবিক বুদ্ধির নিমিত্ত অভিমানী লোক সৰ্বদাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা নূতন মত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ সংসারে এই সংখ্যক লোক গণ অধিক হয়, মানব সমাজ ততই নূতন মত এবং নূতন তত্ত্ব জানিতে পাবে। বুদ্ধির জন্য অভিমান না থাকিলে কে বহুকাল প্রচলিত সহস্র সহস্র পণ্ডিতামুদিত আপামব সাধাবণেব মতের বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত? জগতে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যাহাবা অনেক নূতন বিষয়ে চিন্তা করেন, চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে অনেক নূতন তত্ত্বও অবধারণ করেন কিন্তু অভিমান না থাকায় তাঁহাবা জন সাধাবণেব বিশ্বাসী ভীত মত প্রচার করিতে সাহস পান না। বস্তুতঃ নিম্নভিমান যে মানব সমাজকে কত নূতন মত সুতরাং তজ্জাত উপকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহা আমবা বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে স্বাভাবিক বুদ্ধির অভিমানী লোক অনেক সময়ে যথোচিত চিন্তা না করিয়াই নূতন মত ব্যক্ত করেন এবং তদনুসরণকারীকে যাবপৰ নাই ক্ষতি-গ্রস্ত করেন। অনেক সময়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অর্থাৎ অন্যের মত গ্রহণ পক্ষে এত উদাসীন হইয়া যে, বিবেচ্য বিষয় সকল ভাবে বিচার করেন না। কিন্তু এজন্য আমবা অভিমানের উপর দোষাবোপ করিতে পারি না। স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক যদি অন্যের বুদ্ধি ও মত শুনে, তাহা হইলে কদাপি তাঁহাব বুদ্ধি মলিন হয় না, বরং প্রথমে ও মার্জিত হয়। বুদ্ধির নৈসর্গিক অবস্থা পুষ্কো-বকবৎ। যেকপ সূর্য্য রশ্মি প্রভৃতির অভাবে কোবক প্রক্ষুটিত হইয়া পুশে পবিণত হয় না, সেইরূপ উচিতরূপে চর্চিত ও মার্জিত না হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রক্ষুটিত হইয়া উচিতরূপে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। তবে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক অন্যের মতাদি পক্ষে যাব পর নাই উদাসীন হয় তাহা প্রকৃত অভিমানমূলক নহে—তাহা তাঁহাদিগের মনঃসংযোগাত্মক ফল।

বিদ্যাভিমানীলোক নিরন্তর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তন্নিবন্ধন স্বয়ং অনেক উন্নতিলাভ এবং মানব সমাজকেও অশেষ রূপে আবদ্ধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা বিবর্জিত হইয়া সৰ্বদা গ্রন্থ অধ্যয়ন ক-বিলে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষমতা হারাইতে হয় এবং অস্বদেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়

নিগের ন্যায় সাধারণ বুদ্ধি হারাইয়া পশু বৎ হইতে হয়। অধুনা অনেক বিদ্বান্ লোক জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। প্রাচীন কালোপেক্ষা বিদ্যালোক কত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক লোকেই স্বীকার করিবেন চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পূর্বোপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীন কালের শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অধুনাতন শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক অধিক একথাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বস্তুতঃ অধিক অধ্যয়ন ও অল্প চিন্তাবশতঃ একপ ধটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমুদয় কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা বিদ্যাভিমানকে অপকাবী বলিতে পাবি না। বাহারা চিন্তা অপেক্ষায় অধিক অধ্যয়ন করেন, তাহারা মনে কবেন না যে তাহাতে বিদ্যাব বৃদ্ধি হয় না। মূলে ভ্রান্তিমূলক মতই এই অনিষ্ট প্রসব করিতেছে। বিদ্যাভিমান কদাপি একপ করে নাই।

ধর্ম্মাভিমান।

ধর্ম্মাভিমান বশতঃ সংসারে অনেক সৎ কার্যের অনুষ্ঠান ও অনেক পরিমাণে অসৎ কার্যের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভিমান শূন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক হইতে সংসারে যত উপকার হয়, ধর্ম্মাভিমानी হইতে তদুপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক হইয়া থাকে একথা কে সন্দেহ

করিবে? কারণ প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকোপেক্ষা ধার্ম্মিকাভিমানীর সংখ্যা অশেষ গুণে অধিক। ধর্ম্মাভিমানীর মনে দৈবর চিন্তা ও বিশ্বাস যত দূর প্রবল থাকুক বা না থাকুক সে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ও তাহার সংকল্পানুষ্ঠানশীলতা প্রবল হয়। এবং তাহা হইতে জনসাধারণে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। অস্বদেশে যত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে দীন দুঃখী যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অনেক কারণ সম্বন্ধে ধর্ম্মাভিমান অন্যতর। অস্বদেশে অনেক দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক একমাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃ যার পর নাই সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবিষয় সর্ব্বদাই চাক্ষুষ কবা যায়। যে মহাপাপী পরম স্বার্থপর বুদ্ধমাতা অথবা বনিতার ভবণ পোষণ ভাব বহন করিতে অনিচ্ছুক সেও অনেক সময়ে সাধাবণ হিতকর ব্যাপাবে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। (১) একপ গর্হিত আচরণ আমাদিগেব অনুমোদিত বিষয় বলিতেছি না। এখানে আমাদিগেব বক্তব্য যে মহা পাপ

(১) আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে টহাব দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিবল নহে। একপ একজন ব্যক্তির সহিত আমার একদিবস অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন “আমি ভগবানের একটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি বটে কিন্তু তাহা না করিলে অর্থাৎ পরিবাব প্রতিপালনে উচিত রূপ অর্থ ব্যয় করিলে আমি কদাপি ভারতমাতার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিব না।”

পীর মনেও ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কোন কোন হলে সংকল্পশালী করে।

ধন্যভিমান, যশোভিমানের ন্যায় ধর্ম্মাভিমান বশতঃও লোকে অনেক সময়ে অনেক অসৎ কার্য ও উন্নতবৎ ব্যবহাব করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্য যে উৎপীড়ন হব ধর্ম্মাভিমানই তাহাব একমাত্র কারণ। নরশোণিততৃষ্ণাবিধুবা মেরী এক মাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃই কএক বৎসব মধ্যে ২৭৭ জন পোপ-বিবোধী খৃষ্টানেব প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। বেকেট পোপের পদাভিষিক্ত হইয়া স্বাভাবিক শম প্রকৃতি পবিত্রাণ কবিষা তাৎকালীন ঐপদস্থলত চর্কিত ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুই একদিনে বহুতব লোকেব বক্তৃতা কবিষাছিলেন। অনেক ক্রমীয় সম্রাট্ প্রথমসাময়িক খৃষ্টানগণেব পবিত্র শোণিতে বস্ত্রমতীকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইসাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কত নিদোষী লোকেব প্রাণ-সংহার করিয়া আপনাদিগেব চিত কলঙ্ক ঘোষণা কবিষাছেন। ডাংগাস আক্রমণ কালে খালেড পবিত্র প্রণয়াদক্ক দম্পতিব বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী নবপতি নিবপবাহী নৌকদিগেব প্রাণহানি ও অশেষ বিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত করিয়াছিলেন। অধুনা হিন্দুগণ ব্রাহ্মা ও খৃষ্টান দিগেব উপর কত অকথা অত্যাচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ কত

লোক কত অমানুষী কঠোর করিয়া জীবন-ক্লেশে অতিবাহন করিতেছেন। কেহবা উর্দ্ধহস্তে কেহবা অধোমুখে কেহবা শিত কালে বস্ত্রাভাবে, কেহবা দারুণ নিদাঘ সমুপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য কীরণে যার পর নাই ক্লেশ সহ কবিষা ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কেহবা অনশনে শরীব ক্লয় ও (হয়ত) প্রাণত্যাগ করিয়া মর্ত্য লোকেব দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গবাসী হইতেছেন!!

এই সকল দোষ সবেও ধর্ম্মাভিমান মনুষ্যেব পবমোপকারী। এসকল ধর্ম্মাভিমানেব দোষ নহে। লোকেব অজ্ঞতার দোষ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক অনৈসর্গিক বিষয় সহ ধর্ম্মাভিমান যুক্ত হইয়া এইকপ কুফল উৎপাদন কবে।

বীৰ্য্যাভিমান।

বীৰ্য্যাভিমান জাতিসাধারণেব উন্নতির প্রধান কাবণ। বীৰ্য্যাভিমানপব্যয়ণ জাতি কখন অন্যেব অধীনতা স্বীকার করে না, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি এক জনের দেহে প্রাণ থাকিতে ও সমবানল নির্দোষ হইতে দেয় না। যখন সিপায়ী কার্থেজ আক্রমণ করিলেন, অধিবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং দেশেব সমদয় ধন নিঃশেষ হইলে ঘোষিৎ গণ আপনাদিগেব গাত্রাভরণ ও মস্তকেব কেশ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে লাগিলেন। এই

দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা, বলিয়া দাসীয়ে ঘৃণা,
কবোনা কবোনা প্রিন্স বেথোহে স্বরণে ॥
ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্তু পিতৃভক্তিআলো
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমণ ।
কালো বলে অবহেলা, করনা প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আব জল ॥
জননী বলা গিয়ে, বলিবে হে বিববিয়ে,
ভক্তিবৎসলা তিনি করুণাব ধনি।—
আমাব যাওনা যত, সকলি ত অবগত
আছেন ইন্দিবাকুণা ইণ্ডিয়াজননী ॥

এক কথা আছে বাকি, একথাটী সত্য নাকি,—
তুমি মোরে স্বপনে করিতে দরশন?
একথা শুনিয়া আর, সুখেব নাহিক পার,
আনন্দেব পাবাবাবে মম মম মন ॥
এসাবত কুলবালা, সাভায়ে ববণ ডালা,
ঘন ছলাছলী রবে ছাও হে গগন ।
ব্রাহ্মণ পড়ই বেদ, আব কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥
রুদয়রঞ্জন মম নয়নঅঞ্জন।—
দুর্গতিগঞ্জন মম দাসীদত্তজন ॥



নৃত্য ।

অল্পম বৈশাখ্য অল্পমরুপিণী কত
শত চাপল্যো নৃত্য করিতেছে; যেন
আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই বিভোর
হইয়া পরিবেষ্টমান অসংখ্য দর্শকদিগকে
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা অকাতবে বিতরণ
কবিতেছে; যেন মুগ্ধা অসীমোৎসাহে
নাবী-স্থলভ রূপণতা হারাইয়াছে—বহু-
রুপিণী অসংখ্য চক্ষুগণে নিমেষ পরিবর্ত-
মান নবনব লক্ষচ্ছবি নিমেষে নিমেষে
বিলাইতেছে—নানাতঙ্গী মধুব নানা-
কপের নানা জ্যোতি দেখাইতেছে—
প্রকুর উৎসের জ্বালা চারিদিকে সৌন্দর্য্য
বর্ষণ করিতেছে। আসরের মধ্যস্থলে
নর্তকী; রমণীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া
চারিদিকে মণ্ডলাকারে লোকেব শক্ত
জমাট বাধিয়াছে। নর্তকীব করদ্বয়ে ডমরু-

বেণুব-প্রোৎসাহিত গভীর-ভূজঙ্গ-রূপায়
ধীর মুহূচ্চাপল্য একবাব অভিনীত হইল।
পরক্ষণেই বাহুদ্বয়ে, উড্ডয়নচতুর ক্রীড়-
মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার লীলাবিধি-
ন অভিনীত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল
মন্দ বাতান্বলিত বস্ত্রবী গঙ্গাদ বিলাসে
খেলিতে লাগিল। নর্তকীকত নারীর
পুষ্পাবচয়ন অভিনয় করিল, কত
লজ্জাবতীব দেহের সলজ্জভাব, চরণের
সলজ্জগতি, কত বুঝতীবিলাসিনীর বিলাস
ভাব, বিলাসগতি, কত খণ্ডিতার ক্রোধ
কত নবযৌবন চপলার নানা চন্দ্রে বক্ষ-
গত করতল শয্যাশায়ী শিশুসোহাগ অভি-
নয় করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাবিহীন ভঙ্গীজীবন নৃকের
অভিনয় তালিলয়বদ্ধ, যেমন কথা-জীবন

কাষা মাটক ছপে বন্ধ। ভঙ্গী সকল তাল
লয়ে আঁটা না হইলে তাঁদের শিখিল তাঁ-
ডামী হইত, নৃত্য হইত না। তাল লয়ের
মধুব বন্ধান বন্ধিনী স্তম্ভবী নানাচ্ছন্দে
নাচিতেছে, যেন ভুজঙ্গ বিলোল বিদ্যুচ্চপ-
লাব দেহের ভাব নাই, মাংসাস্থি নাই;
যেন জ্যোতির্ময় পদার্থ মাটি মাড়াইতেছে
না, দর্শকদিগেবনেত্রেনেত্রেনাচিতেছে।
সাবাস সাবাস! এইবার নর্ত্তকীর পুণ্ডল
কলেবরবব তবতব মণ্ডলগতি হইতেছে,
যেন চতুর্দিকেব অসংখ্য চকুতাবকাব
আকর্ষণে, কামুকেব ইহলোক বিপুল
ভূমণ্ডল শন শন ঘুবিতেছে। এই কলেবর
ঘূর্ণনের সৌন্দর্য্য কি? গমন কালে গজ-
গামিনীর অঙ্গবিশেষ ধিকি ধিকি ঘুরিয়া
থাকে, এই অঙ্গ দোলন মুহুমুহবচলন
এতদেশেবড়ট বমণীর বলিয়া পবিজ্ঞাত;
বাজাবের প্রয়োজন বুঝিয়া মনোজ্ঞভঙ্গী-
সঙ্কলনকারী নৃত্য এই দোলনি অমুকবণ
কবিত্তে শিখিল; অমুকরণে এই মন্দা-
দোলন কেবল তাললয়ে বন্ধ করা হইল
না, আব বিস্তর পাবিপাট্য বর্দ্ধিত কবা
হইল—স্বভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধিকি ধিকি
ঘূরে, ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর
মুহুমুহর গতিও হইতে থাকে, কিন্তু
অমুকবণ নৃত্যে তত্তদঙ্গ শন শন ঘুবিতে
লাগিল অথচ নর্ত্তকীর ঈষদপি গতি
হইল না। অধিতীর ইন্দ্রজাল! অধিতীর
নয়ন ছলনা। অতি ক্রতগতিবোধক
অঙ্গ ঘূর্ণন হইতেছে বস্তত: কিন্তু গতি
নাই—চমৎকাব! চমৎকার!! স্বভাবকে

অত্যন্ত টাচা ছোলা করিতে গেলেই এই
রূপ বিকৃতি ঘটয়া উঠে; কবির অতি
নৈপুণ্যে নৈবদ্যাদি কাব্যও এইরূপ বিকৃত
ভাবাপন্ন হইয়াছে;—আপাদ নৃত্যক মূর্ছ-
নালঙ্কৃত, গিটকাবীতে বিভূষিত; যে অতি-
ওস্তাদী দেখাতে যার তাহাব গীতও এই
রূপ অতিভূষণে কদাকার হইয়া পড়ে।
নৃত্যকালে নর্ত্তকীকে পুঙ্খকর্কশা শৈবিনী
জ্ঞান কবিলে দর্শকের মনে মধুব ভাবতবঙ্গ
উঠিতে পারনা। অভিনয়কালে শকুন্তলাকে
যেমন ওপাড়াব বেচায়ে ছোঁড়া ভাবিলে
ব্রাঙ্কিস্থেব বাঘাত পড়ে; কাবণ নৃত্য,
ভঙ্গীব্যক্ত অভিনয় বিশেষ, নৃত্যভিনয়ে
নাবীব নানা মূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে বিকসিত হ-
ইতে থাকে। উপরোক্ত নাবীনৃত্যেব
গুঢ় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু
সাদা চোকে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না,
কামমদোপ্তক চকু চাই—করুণাচক্রে স্নেহ
চক্রেও দেখিতে পাওয়া যায় না—জলা-
ববণে চকু ঢাকিয়া আসে—স্বন্দৃষ্টি চলে
না।

হার নাবি! তুমি এতগুণে গুণবতী,
বিশ্বাঙ্গ হইয়াও গুণগ্রাহী পুরুষেব কাছে
তোমাব এত অপমান কেন? কামনয়নে
তোমার দেখা আদব করা নহ, তোমাব
অপমান করা। তাললয়শূন্য ভঙ্গী—
তাঁড়ামী; আবার সতাল ভঙ্গী বাজনা-
বিহীন অর্থাৎ কোন প্রকাব মনোভাব,
মনোবৃত্তি ব্যঞ্জক না হইলে নৃত্য, ছন্দে
গাথা কসলং হইয়া পড়ে;—যেমন উড়ি-
ষ্যার “গুটি পোর” (একটি ছেলেব) মাচ,

দেশীয় যাত্রায় ভিত্তীয় নাচ, উপরোক্ত অতি নৈপুণ্যবিকৃত বর্ণ্য মান নারীঅঙ্গ স্পন্দন।

এখনকার অনেক কাব্যও ছন্দে গাঁথা কসলং। মার্জিতকৃষ্টি সজ্জন দিগেব মনোজ্ঞ হইতে নৃত্যেব ভঙ্গী সকল সুপবিত্রকৃষ্ণে মনোভাব ব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্ত মনোবৃত্তিব তাবতমো দর্শকেব অঙ্গাদেব তাবতমা হয়—লাস্যে নারীর কামোদ্ভাদ সূচক ভঙ্গীগুলি অপেক্ষা লজ্জাবিনয় অমায়িকতা সূচক ভঙ্গী-গুলি, সজ্জনদের কাছে নিঃসন্দেহ অধিক-তর মনোহর। এতদেশীয় নৃত্যেব প্রধান অভাব এই—বালক বালিকাব নৃত্য নাই, পুরুষেব নৃত্য নাই—বালক বালিকাব নিম্নলি কোমলানন্দ ভঙ্গীগুলি অভিনীত হয় না—পুরুষেব দর্প, বীর্ষ্য, প্রেমাবেশ প্রভৃতি নানাভাবব্যঞ্জক কোন ভঙ্গীই অভিনীত হয় না। প্রাচীন নৃত্যেব পুরুষনৃত্য তাৎপৰ্য্যভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে উজ্জ্বলাস্য ভাব আধমরা হইয়া আছে। এখন পুরুষকে নৃত্য কবিত্তে হইলে নারী সাজিত্তে হয়, নহিলে পুরুষেব ভাব ভঙ্গী অভিনয় অসংলগ্ন উপহাস ও বিবিক্তিজনক হইয়া পড়ে।

বালিকা নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিলে, এই ক্ষুদ্র প্রাণী এত শিথিয়াছে ভাবিয়া বিরক্তি-হন না বটে, কিন্তু হাঁসিতে হাঁসিতে প্রাণ যায়, এমনি বয়স্হাব উপযুক্ত অসঙ্গত অঙ্গ-ভঙ্গী কবে, যেন যুগতী দিগকে ব্যঙ্গ কবি-

তেছে বোধ হয়। শেষে পাকামী আব সহে না বলিয়া উঠিয়া পলাইতে হয়। এত-দেশীয় নৃত্যের পুঞ্জিপাটা কেবল মাত্র কতিপয় স্ত্রীভঙ্গী। তাহাও অধিক নয় এবং তাহাব অধিকাংশই বিলাস ভঙ্গী—অতি মাননীয় নারী চিত্তেব স্বর্গীয় ভাবসূচক বিগুপ্ত ভঙ্গী নাই বলিলেও বলা যায়। কেহ বলিতে পাবেন জ্ঞান গভীরগোষ প্রতিকৃতি; পুরুষেব নৃত্যই অসঙ্গত—নাচুক স্বল্পনতি বালক, নাচুক চপলতবল মতি বয়সী, নাচুক শবীবসর্গস্ব ইংবাজ, নাচুক মৃঢ়মতি সাঁওতাল, তা বলিয়া কি মহামতি আর্ধ্যসত্তান নাচিবে? ভেলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গী স্বল্প তবঙ্গে নাচে সত্য, কিন্তু সময়ে মহত্তবঙ্গ ত উঠে; তখন ভাসমান গ্রামকণা অর্ণব পোতেবাও নাচিতে থাকে। যোগি-শ্রেষ্ঠ, নির্ঝিকাব শূশপানি নাচিতেন; তাঁবই নৃত্যেব নাম তাওব। দ্বিধিজয়জিৎ নিমাই পণ্ডিত, জ্ঞানপ্রতিম চৈতন্যদেবও সগণে সেদিন নাচিয়াছেন। মহোন্মাদ স্রোতে স্থস্থিব থাকে কোন মর্ত্ত্যেব সাধ্য? ইংবাজদেব ন্যায় আবাল বৃদ্ধেব নৃত্যশিক্ষা, নৃত্যচর্চা অতি কর্তব্য এত দুব প্রতিপন্ন কবিত্তে আমরা এত কথা কহিলাম না—পুরুষেব নৃত্য, পুরুষের ভঙ্গী অভিনয় অসঙ্গত নয়, এই মাত্র আমাদের বলিবাব অভি-প্রায়। যেমন নারীচিত্তেব মধুব মর্দব ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটা তাললয়ে অভিনয় কবে, তেমনি পুরুষেব মধুব বীর্ষ্য গাভীর্ষ্য ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটে অভিনয় করিলে,

দেশীয় নৃত্যের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য্য সাধিত হয়--আমাদের শৈব কথাগুলির এই মাত্র লক্ষ্য।

পুরুষের নৃত্য এত অসঙ্গত বোধ হই-
বাব আর এক কারণ এই; আশৈশব
দেখিয়া দেখিয়া নৃত্য নামের সঙ্গে আর
হাত ঘূবান, অঙ্গ ছানান প্রভৃতিব সঙ্গে

মনে মনে যে দৃঢ় সংকল্প বাধিয়া আছে,
সে সংকল্প বিচ্ছিন্ন করা, একটু স্থিরকল্প-
নার কাজ।

গ্রন্থে বর্ণিত কুঞ্চনাচ, বাত্রাব কুঞ্চনাচ
এবং আর আর কথা দ্বিতীয়বারে লিপি-
বার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শৈশব সহচরী।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণপ্রভা।

“আজ কেন আমার মন এত অস্থির
হইয়াছে।” স্বর্ণপূর্ণ পূর্বের গগনম্পর্শী এক
অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে
এক অপূর্ণ পর্যাকোপরি বসিয়া একটি
দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পর্যাকশায়ী একটি
যুবা পুরুষের মুখ প্রতি চাহিয়া এষ্ট বাক্য
বলিল, “আজ কেন আমার মন এত
অস্থির হয়েছে।” শয়ন কক্ষে দীপালোক
অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। রাত্রি ঘনায়-
কার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; পৃথিবী নিশব্দ;
কেবল নিরুটস্থ জলাশয় হইতে ঘর্ষার অনু-
চরবর্ণের কলরব, আর এই নিভৃত কক্ষে
ছইটি স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন হইতে-
ছিল।

সুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া

বসিয়া বাম হস্ত বালিকার বামকর্ণে
আবোপণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার বদন
ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেন স্বর্ণ, কি জন্য তোমার মন এত
অস্থির হইয়াছে?”

“তা জানিনে” বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজ-
নীকান্তের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া ফু-
কারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

“কেন কেন, কি হইয়াছে?” রজনী
বাস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি
দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে বলিলেন “কেবলই
মনে হতেছে যেন আর তোমাকে দেখিতে
পাইব না।” বলিয়া আবার রজনীর বক্ষঃ-
স্থলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।
ছই এক কোঁটা নয়নবারি বঙ্গনীকান্তের
চক্ষু হইতে আস্তে আস্তে স্বর্ণপ্রভার গওদেশে
পড়িল। অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া

রজনীর চক্ষে হতদিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রজনীর গলাধরিয়া গঙ্গদ স্বরে কহিলেন, “আমার মন স্থির হইয়াছে সব অশুখ সেরে গিয়াছে, আর কাঁদিব না।” এই বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রজনীর ক্রোড়ে অবোধ বালিকার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী দুঃখিত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার অমুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, এই গাঢ় প্রেমের পরিবর্তে স্বর্ণপ্রভাকে কেবল মাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রণয় দিতে অক্ষম হইরাছিলেন, সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনীর জন্য রাখিয়াছিলেন। এবস্থি চিন্তা করিতে রজনী অশ্রুমনস্ক হইলেন। পৃথিবী নিশ্চয়, স্বর্ণপ্রভা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের প্রতিচ্ছবি আছেন। অকস্মাৎ রজনীকান্ত সাবধান স্রুচক রমণীকণ্ঠে “বিধু বিধু” বলিয়া খিড়কী দ্বারদেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন। রজনীকান্ত চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে পুনঃপুনঃ উভয়েই সেই মৃদুস্বরে “বিধু বিধু” বলিয়া ডাকিতে শুনিতে পাইলেন। এই ভীষণগভীর তিমিরাবৃত যামিনীতে সেই স্বর শুনিয়া স্বর্ণপ্রভার শরীর ঘোমাক্রান্ত হইল, বাল্যভাব স্রুচক উহাকে অনৈসর্গিক জ্ঞান

করিলেন। রজনীকান্ত আশ্চর্য উঠিয়া কক্ষদ্বার উদঘাটন পূর্বক ছাদের উপর আসিলেন। স্বর্ণপ্রভা দৃঢ় মুষ্টিতে রজনীর করধারণপূর্বক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমণ্ডল অনন্ত মেঘাচ্ছাদিত আবৃত, কেবল কোথাও দুই একটু নক্ষত্র অসংখ্য খদ্যোতমালায় হীরকখচিত বৃক্ষের শাখা জনিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার অম্লচরগণের কলরব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে আসিয়া পুনঃ সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি?” কোন উত্তর পাইলেন না—জীলোক বোধ করিয়া স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন “কেগা তুমি?” জীলোক উত্তর করিলেন “আমি কুমুদিনী। শিগুগীর দোর খুলে দিতে বজা।” স্বর্ণপ্রভা অতি কাতর স্বরে রজনীকে কহিলেন “ঐ দেখ আজ কি বিপদ ঘটয়াছে। নহিলে দিদি কেন এতরাত্রে এখানে আসিবে।” তৎপরে বিধুকে জাগরিত করিয়া তাহাকে সবিশেষ অবগত করাইয়া খিড়কী দ্বার খুলিতে অনুমতি করিলেন। বিধু পূর্বে স্বর্ণপ্রভার পিতৃালয়ের পরিচরিকা ছিল। এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে ঐ পদাভিষিক্ত। বিধু চক্ষু মুছিতে উঠিয়া “বড়দিদি এখানে

কেন” বলিতে খিড়কি দ্বার খুলিয়া দিল। কুমুদিনী অতি দ্রুত গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, “বিধু, শীঘ্র আয়, স্বর্ণ কোথায়?”

বিধু। দিদি কি হয়েছে?

কুমু। “বল্চি, তুই শীঘ্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয়।” দুই জনে অতি দ্রুত চলিলেন। বিধু খিড়কি দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল, কিঞ্চিৎ দূরে স্বর্ণ প্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদিনী স্বর্ণ-প্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুসন করিয়া কানো কি বলিলেন। স্বর্ণপ্রভা ওমা কি হবে বলিয়া, চীৎকার কবিয়া কাঁদিতে রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “পলাও, ওগো পলাও।” রজনী বিস্মৃত হইয়া স্বর্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “পলাইব কেন, কি হইয়াছে?” স্বর্ণপ্রভা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে বলিলেন, “তোমার খুন করিতে আসিতেছে—”

র। কে?

স্ব। তোমার শত্রু।

র। রতিকান্ত?

স্ব। হ্যাঁ।

র। তা ভয় কি, আসুক না কেন।

স্ব। সে অনেক লোক নিয়ে আসি য়াছে, ওগো পলাও।

র। ছি!

ইত্যবসরে উভয়েই বমণীকণ্ঠনিঃসৃত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে পাইলেন। রজনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেই

দিকে আসিয়া দেখিলেন, যে ছুইটি স্ত্রী-লোক অচেতনপ্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া অসংখ্য দস্যু একে একে প্রবেশ করিতেছে। ঘোবন কালেব উষ্ণ শোণিতের হৃদমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি অর্গল লইয়া পতঙ্গবৎ সেই অগ্নিতুল্য দস্যুদলের মধ্যে ঝাপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী কবিলেন। তৎপরে তিন চাবিজন দস্যু কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অনেকক্ষণ আত্মবক্ষা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল হওয়াতে যেমন পদাশ্লিত হইয়া ভূপতিত হইলেন অমনি এক জন দস্যু অসি নিক্ষেপিত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। কিন্তু অসি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রজনী কান্তের দেহ আবরণ কবিয়া আপনার অঙ্গে সেই অসির আঘাত গ্রহণ কবিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল “স্বর্ণ কি করিলি, আপনাকে নষ্ট কবিলি।” অভাগিনী স্বর্ণ “এ খনও শীঘ্র পলাও,” এই কথা বলিতে আর কথা কহিতে পারিল না। পাখও দস্যু এই ঘটনা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তৎপরে যখন পুনরায় রজনীকে আঘাত অভিপ্রায়ে অসি উত্তোলন করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে দস্যুগণের মধ্যে ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, বহুসংখ্যক পুলিশ কর্ম

চারী ও রজনীর দ্বারবান্দিগের দ্বাৰায় দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে আক্রমণকারীর উজ্জোলিত হস্ত দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড অসিসহিত ভূপতিত হইল। রজনীকান্ত দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক অতিশুদ্ধব এক যুবা পুরুষ আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রাণবক্ষা করিল। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আন্তর স্বর্ণপ্রভাব দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং সমস্ত্রে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষণ করিয়া তাহার বদনচূষন করিলেন এবং দ্বারদেশে একজন পবিচারিকা রক্ষক রাখিয়া “স্বর্ণকে বুলি তাবাইলাম, কিন্তু কুমুদিনীকে যদি না বাঁচাইতে পাবি তবে এ ছাব জীবন বাখিয়া কি সুখ!” এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন যে, দস্যুবা পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিশ কর্মচারিগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র চারি পাঁচটি আহত ব্যক্তি আর দুইটি স্ত্রীলোক পতিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্বস্থান হইতে অন্য এক স্থানে একটি যুবা পুরুষের বামহস্তে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে। রজনী চিনিলেন যে, স্ত্রীলোকটি কুমুদিনী, আর যুবা পুরুষটি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিশকে জিজ্ঞাসা কবাত্তে জানিলেন, যে দস্যুবা পলায়ন সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল,

এমন সময়ে ঐ যুবক আসিয়া তাহা-দিগের হস্ত হইতে কুমুদিনীকে উদ্ধার কবেন, কিন্তু ঐ সময়ে দস্যুদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনী সহিত ঐ স্থানে পতিত হইলেন। রজনী ক্রত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সিঞ্চন কবাত্তে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়া মস্তকে অঞ্চল টানিতে অতি মৃদু স্ববে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বর্ণ, স্বর্ণ কোপায়?” রজনী তক্রপ মৃদু স্ববে বলিলেন “স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে।”

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন “দস্যুবা আপনাকে কোনস্থানে কি আঘাত করিয়াছে?”

কু। না—কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত পাঠিয়াছি, তাহা কিছুই নয়। তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক যুবা পুরুষ তাহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি পতিত ছিলেন। কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন, এবং রজনীকান্তের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। রজনী বুলিতে পারিয়া বলিলেন, “উনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু দস্যুবা বখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন উনি তোমাকে পবিভ্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে লইয়া এইস্থানে পতিত হইয়াছেন।” তৎপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে

উঠিয়া গেলেন। বাইতে ঘাইতে ছুই এক-
বার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই অপরিচিত যুবর
মুখপ্রতি অবগুষ্ঠন হইতে দৃষ্টি করিতে
লাগিলেন।

আর স্বর্ণপ্রভা? সে ক্ষুদ্র প্রদীপের
অন্ন তৈল ফুটাইবা আসিয়াছিল—আজি-
কার প্রচণ্ড বাতায় তাহা নিবিয়া গেল।

সে ক্ষুদ্র ভেলা অগাধ সাগরে পড়িয়া-
ছিল—এ ঘোর তবঙ্গে তাহা ডুবিল।
আজিকার প্রচণ্ড তাপে স্বর্ণ কুসুম শুকা
ইল;—স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল—
ধূলু বজ্রাঘাত বহিল। স্বর্ণসেই অস্ত্রাঘাতে
প্রাণত্যাগ করিল।



রজনী

পঞ্চম খণ্ড।

(লবঙ্গলতাব উক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম শচীন্দ্র একটা কাণ্ড
করিষে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে
আছে! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও
দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া
আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব
ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভাব। এখন
দাদা দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য
কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না।
তারা বোধই নির্ণয় করিতে জানে না।
রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ
দেখিলে, জিহ্বা দেখিলে তারা কি বুঝিবে?

যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া
বসিয়া আড়িপেতে ছেলেব কাণ্ড দেখত,
তবে একদিন বোগেব ঠিকানা করিলে
করিতে পারিত।

কথাটা কি? “ধীবে, রজনী!” ছেলে
ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে।
বজনী কি করিয়াছে? তা জানি না,
কিন্তু বজনীসঙ্গে এ চিত্তবিকাশের কোন
সম্বন্ধ নাই কি? না থাকিলে সন্দেহ।
বজনীসঙ্গে নাম করে কেন? ভাল, রজনীকে
একবার বোগীস কাছে বসাইয়া রাখিলে
হয় না? কই, আমি রজনীস বাডী গিয়া

ছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! তাহার যে অহঙ্কার হইয়াছে, একথা সম্ভব নহে। বোধ হয়, লজ্জায় আশে ন। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া 'পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই। অনেক দিন হইল স্থানান্তরে গিয়াছে। অমরনাথ বাড়ী আছে।

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। স্থানান্তরে, কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না। পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেও পারি না। মনেও বড় সন্দেহ হইল। স্থল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলাম। কাহার নিকট জানিব?

স্বয়ং অমরনাথ ভিন্ন আর কাহার নিকট জানিব?

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক নাই—আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না। তবে কৌশলে অমরনাথকে আমাদিগের গৃহে আনা যায়। সেই কৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর

সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? সে সম্বন্ধ কি? বোধ হয়, আমাদিগের এই বর্তমান দারিদ্র্য হুঃখজনিত মানসিক ক্রেশই শচীন্দ্রের এই মানসিক পীড়ার কারণ। রজনীই এই দারিদ্র্য হুঃখের মূল। অতএব রজনীর নাম শচীন্দ্রের মনে সর্বদা জাগরুক হইবে বিচিত্র কি? যদি, এই সিদ্ধান্তই যথার্থ হয়, তবে অমরনাথকে ডাকাইয়া কি করিব?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। একথা ওকথা পর রজনীর প্রসঙ্গ চলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া বহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুকা, আমাদিগের পুৰ্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না—শচীন্দ্র সে কথা চাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন।

একটা কথা স্থির হইল—রজনীর প্রতি শতীক্ৰেব মনের ভাব যাহাই হোক—তাঁহাব বাগ নাই। রাগ নাই, তবে কি—অহুরাগ? তাও কি সম্ভবে? অন্ধের প্রতি? আবার এত দিনের পর? যখন রজনী নিকটে ছিল—সুপ্রাপণীয়া ছিল, তখন ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই—এখন কেন হইবে?

যাহা হোক, একবার রজনীকে, আনিয়া বাছাকে, দেখাইতে হইতেছে। উপায় কি? তখন, কর্তার কাছে গেলাম। তাঁহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল আভাস ইঙ্গিতে নিবেদন কবিলাম। রজনীর যে সন্ধান করিয়া, অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহাও বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি? আমি বলিলাম “অমব নাথ ভিন্ন সবিশেষ সন্ধান আব কেহ বলিতে পারিবে না। তুমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন।” তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন? তাহাকে নিমন্ত্রণ কবিত্তে স্বীকার কবিলেন।

অমরনাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উকি ঝুকি মাঝিয়া আমাকে একবার

দেখিতে পান, সে লোভ ছিল। পবদিন প্রাতে আসিয়া, অমবনাথ সশরীরে আমাদিগেব ক্ষুদ্র গৃহে দর্শন দিলেন। আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাব কাছে অনুমতি লইয়া অমবনাথের মনের সাধ পুৰাইবার জন্য—তাহার, আহাবেব নিকট পুতনা হইয়া বসিলাম। পুতনা—কেননা বিষপান কবাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যেখানে বাক্য বিষ আছে সেখানে অন্য বিষেব প্রয়োজন কি?

নাবীজন্ম যেন কেহ গ্রহণ কবে না। না কবিত্তে হয় এমন কাজ নাই। যাহা তে মনের বড় বিবাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও কবিত্তে হয়। বিষ, অমৃত উভয়ই প্রয়োগ কবিত্তে হয়। সর্পী আমাদিগেব অপেক্ষা ভাল—তাহাব অমৃত নাই—কেবল বিষ আছে। সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ কবে। লোকে সর্পীকে চিনে, তাহাব নিকট দিয়া কেহ পথ ইঁাটে না। নাবী সর্পীব অমৃত আছে—সেই লোভে তাহাব নিকটে আসিয়া, মূৰ্খ পুঙ্খ জাতি অনায়াসে দংশিত হয়—বিশ্বাস-ঘাতিনী নাবী অনায়াসে দংশন কবে। হায়! লবঙ্গসর্পীর কি ইহঁবে?



রজনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি অমবনাথকে জিজ্ঞাসা কবিলাম,
“বঙ্গনী কোথায়?”

এটি বেন হুম্ কবিয়া কামান দাগি
লাম। অমবনাথ বিজ্ঞস্ত হইল। জিজ্ঞাসা
কবিলাম, “কথা কও না যে?”

অমব। এ কথা জিজ্ঞাসা কব কেন?
আনি। বঙ্গনীর সঙ্গে জানা শুনাছিল,
তাহাকে ভাল বাসিতাম—না জিজ্ঞাসা
কবিব কেন?

অমব। স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা
লোকপ্রসিদ্ধ—সে কোথায় এ কথা জি
জ্ঞাসা কেন?

আমি। রজনী তোমাব ঘবে নাই,
ইহা আমার কাছে বিশেষপ্রসিদ্ধ, কাল
লোকেব দ্বাৰা খবর আনিয়াছি, এজন্য
জিজ্ঞাসা কবি।

অমব। তবে সে স্থানান্তবে গিয়াছে।

আমি। কোথায় সে স্থানান্তব?

অমব। আমি যদি না বলি?

আমি। আমি যদি সকল কথা বলি?

অমব। তাহা হইলে আগার অনিষ্ট
হইবে। তুমি এতদিন আমার যে অনিষ্ট
কব নাই, এখন যে তাহা কবিবে ইহা
সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে
কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহা বুঝিয়াছি।

আমি। এখন তুমি আমার অনিষ্ট

কবিতছ, আমি তোমাব অনিষ্ট না ক-
বিব কেন?

অমবনাথ চমকিয়া উঠিল—“তোমার
অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি
না। তবে রজনীর বিষয়োদ্ধারের কথা
যদি বল—”

আমি হাসিলাম। অমবনাথ বলিল,
“তা জানি। সে অনিষ্টেব জন্য তোমা-
দিগেব রাগ নাই। তবে তোমার কি
অনিষ্ট?”

আমি। আমার পুত্রের অনিষ্ট।

অ। শচীজ বাবু? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন
আর কি অনিষ্ট করিয়াছি?

আমি। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া
সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেষ
বৃত্তান্ত বলি।

অ। এক্ষণে আহায়ে আমার বিশেষ
মনোযোগ।

আমি। আমি যাহা বলিব তাহাতে
তোমাব আহাব বন্ধ হইয়া যাইবে।

অ। এমন কথা কেন এখন বলিবে?
নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিয়া আহায়েব বিয়
করা অন্যায় কাজ হয়।

অমবনাথকে ব্যঙ্গপরায়ণ দেখিয়া আমি
ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম, “আমিও
বহস্য জানি। একটি বহস্যের কথা

বলি শুন। প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে কপবতী বলিত—”

অ। এটা যদি বহন্য তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পবে শোন। সেই রূপ দে খিয়া এক চৌব মুগ্ধ হইয়া, আমাবপিজ্ঞা-লয়ে, যে ঘবে আমি এক পবিচাবিকা সঙ্গে শয়ন কবিয়াছিলাম, সেই ঘবে সিঁদ দিল।

এই কথা বলিতে আবস্ত কবায়, অমব নাথ গলদদ্য হইয়া উঠিল। আহাব ভাগ কবিয়া বলিল, “ক্ষমা কব।”

আমি বলিতে লাগিলাম, “আহাবে মনোগোগ কর না? সেই চৌব সিঁদপথে, আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ কবিল। ঘবে আলো জলিতেছিল—আমি চৌবকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পবিচাবিকাকে উঠাইলাম। সে চৌবকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চৌবকে আদব কবিয়া, আশ্রিত কবিয়া পালকে বসাই লাম।”

অমব। ক্ষমা কর, সেত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্ববণ কবিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পবে, চৌবেব অলক্ষ্যে আমাব সঙ্কেতানুসারে পরি চাবিকা বাহিবে গিয়া দ্বাববান্কে ডাকিয়া লইয়া সিঁদমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সমর বুকিয়া, বাহিবে প্রয়োজন চলনা করিয়া, নির্গত হইয়া বাহির হইতে এক-মাত্র দ্বাবেব শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম। মন্দ কবিয়াছিলাম?

অমবনাথ বলিল, “এ সকল কথা কেন?”

আমি। পাবে চৌব নির্গত হইল কি প্রকাবে বল দেখি? ডাকিয়া পাডাব লোক জমা করিলাম। বড বড বলবান আসিয়া চৌবকে ধবিল। চৌব লজ্জায় মুখে কাপড দিয়া বহিল, আমি দয়া ক-বিয়া তাহাব মুখেব কাপড খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে, লোহাব শলা তপ্ত কবিয়া তাহাব পিঠে লিখিয়াছিলাম,

“চোর!”

অমব বাবু অতিগ্রীষ্মেও কি আপনি গাষেব জামা পুলিয়া শয়ন কবেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতাব হস্তাকব মুছিবাব নহে। আজি আমাব স্বামী চাবিজন পাহাৰাওয়াল আমাব বাড়ীতে উপস্থিত বাখিয়াছেন; প্রয়োজন হয়, তাহাবা আজ আমাব হাতের লেখা পড়িবে।

অমর নাথ হাঁসিল এবং বলিল, “ধমক চমক কেন? কাজটা কি কবিতে হইবে সহজে বলনা? বঙ্গনীব সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে?”

আমি। তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে।

অমব। সহজ কথা; সে এক্ষণে কাশী-বাস কবিতছে। বাঙ্গালিটোলা গো পাল অধিকারীব বাড়ীতে আছে।

আমি। একথা যদি মিথ্যা হয়?

অ। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমাব কি কবিলে?

আমি। এই কলিকাতা নগর মাথা বাষ্ট করিব যে, অমব নাথ চোব—চোব বলিয়া তাহাব পিঠে লেখা আছে। পু লিষ গিয়া, কামিজ খুলিয়া, পিঠ দেখিবে।

অ। তুমি কি তাহাতে বঙ্গনীকে পাইবে?

আমি। না।

অ। তবে?

আমি। তাইত। আহাব কব।

অমবনাথ আহাব সমাপন কবিয়া আচমন কবিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আচমনান্তে অমব নাথ বলিল, “সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। ধমক চমকে সত্য কথা আমি বলিব না—তত কাপুরুষ নই। তুমি আমাব অনিষ্ট কবিতে পার সত্য; তাহাতে তোমাব লাভ হইবে না—আমাব ক্ষতি হইবে। সত্য তুমি আমাব অনিষ্ট কবিলে কি? একথা সত্য বলিও—আমি আন্তরিক সবেলভাবে জিজ্ঞাসা কবিতেছি—তুমিও আন্তরিক সবেল ভাবে উত্তর দিও।”

অমবনাথ অতি বিনীতভাবে, সবেল, মধুবভাবে এই কথা বলিল। আমিও আব কপটতা কবিতে পারিলাম না—আমি বলিলাম,

“না—তোমার অনিষ্ট কবিব না—

অনেক অনিষ্ট করিয়াছি—একথা আন্তরিক বলিতেছি। তুমি আমাব উপকার কবিলে না—না কব, আমি তোমার অনিষ্ট কবিব না।”

অমবনাথের চক্ষে জল আসিল। গদগদ স্ববে অমবনাথ বলিল, “লবঙ্গ লতা, তুমিই দ্বিতিলে। আমি আবাব হাবিলাম। আমায় বিশ্বাস কব। আমায় কি বিশ্বাস কবিতে পার?”

সেত কঠিন কথা! যে তেমন গুরুতব অবিশ্বাসেব কাজ কবিয়াছিল, তাহাকে আবাব বিশ্বাস কবিব কি প্রকাবে? কিন্তু সংসাব অবিশ্বাসে চলে না। কেহ চিব দিন বিশ্বাসী নহে—কেহ চিবদিন অবিশ্বাসী নহে। কেন আবাব অমবনাথকে বিশ্বাস কবিব না? তাহাব মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম সর্দার সূন্দব সবেল বিশ্বাসভূমি। আমি বলিলাম, “তোমায় বিশ্বাস কবিব। শোন যাহা আমাব বলিতে থাকি আছে, বলি।”

এই কথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই বোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলাম। শচীন্দ্র যে সর্দার প্রলাপ বালে বঙ্গনীৰ নাম কবে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। যে অন্য বঙ্গনীৰ সন্ধান করি তেছিলাম, তাহাও বলিলাম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা কবিতে লাগিলাম।

অমবনাথ অনেকক্ষণ নিকন্তব হইয়া বহিল। অনেকক্ষণ পবে বলিল, “আজ আমি চলিলাম—আবাব একদিন আসি তেছি, শীঘ্রই আসিব। আসিলে তোমার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ত?”

আমি। হইবে।

অমর। এইরূপ নির্জনে?

আমি। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি।

অমর। তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সন্দেহ? গুরুদেব জানেন! দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, প্রচ্যন্ন শাশ্ব তোমার পুত্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের কাছে থাকিও না—আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অবিশ্বাস না করিবেন কেন? বিশেষ আমি সপত্নীর ঘর করি! আমি যুবতী, আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব হইতে আমাতে অহুরক্ত—কেন সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আজি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলিয়াছে—আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। দোষ নাই বটে, কিন্তু পাপ ছদ্মবেশেই প্রথম প্রবেশ কবে। আমি কুলের বউ—ববের ভিতর থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া অমরনাথকে বলিলাম “যদি সে কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে, তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে কতি ছিল না—আজি তোমাকে বিশ্বাস

করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্তব্য নহে।”

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম—মনে করিলাম বুঝি সে বলিবে, যে, “তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।” অমরনাথ তাহা বলিল না—আনি সম্ভ্রষ্ট হইলাম—এবং বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথও আমাব প্রতি সম্ভ্রষ্ট হইল।

অমরনাথ বলিল, “সাক্ষাৎ করা কর্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিব। তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—আমার একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে—এখন বলিব কি?”

আমি। কি?

অমর। না এখন না—আর একবার দেখা দিও—সেই সময় বলিব।

অমরনাথ প্রসন্নচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন কোথা হইতে সেই পূর্ব-পরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়াব সম্বাদ দিল তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া

নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম,

“মহাশয় সর্গজ; না জানেন, এমন তব্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।”

তিনি বলিলেন, “উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস।”

আমি বলিলাম, “তবে শচীন্দ্র সর্গদা রজনীর নাম কবে কেন?”

সন্ন্যাসী বলিলেন “তুমি বালিকা, বুঝিবে কি? (কি সর্গনাশ, আমি বালিকা! আমি শচীর মা!) “এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুপ্তা-য়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি এক বীজমন্ত্রাঙ্কিত যন্ত্র লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম যে, যে তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। প্রাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভাল বাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অমুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অমুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু

রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কাৰণে সে অমুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অমুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাঠিলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। পরে অগবনাথের গৃহে রজনীকে যে অবস্থায় শচীন্দ্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই পূর্ববোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন রজনী পরশ্মী, শচীন্দ্র সে ভাবকে মনে স্থান দেন নাই। তাহার লক্ষণ দেখিবামাত্র দমন করিয়াছিলেন। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্গাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর বাধা পাইলেন। অন্য মনে, দারিদ্র্য দুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আদিকা হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অমুরাগ পুনঃপ্রস্ফুট হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না, যে তদ্বারা তিনি সেই অবিহিত অমুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যেহেতু মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।”

আমি তখন কাতব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে “ইহার প্রতীক্যের কি উপায় হইবে?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগেব দ্বারা এবোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তাবেরা কখন এসকল বোগেব প্রতীকার করিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই।

আমি বলিলাম যে, “অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।”

স। সচরাচর বৈদ্যা চিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আপনি ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীব গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শটীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, আমি এমত ভরসা পাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীব আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অমুরাগ, রূপাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরজীর প্রতি স্থায়ী অমুরাগের অপেক্ষা কষ্টকর মহাপাপ আর কি আছে?

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার করিবাব আর সময় নাই। ঐ দেখুন রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পবিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমবনাথ স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত কবিয়াছিলেন, এবং আপনি বহির্কীর্টিতে থাকিয়া, পরিচারিকাব সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রজনী অনিষ্টকারিণী কি ইষ্টকারিণী হইয়া আসিল, তাহা বলিতে পারি নাই, কিন্তু আমি যে অমবনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কল্পপের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও ললিত লবঙ্গলতা ললিত লবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গুরু।



লজ্জা কেন করি।

কোপ ভয় প্রভৃতি অমৃতবের ন্যায় লজ্জা
সুখের অমৃতব নয়, লজ্জা দুঃখময়ী।
ক্রোধ ব্যতীত আর সকল প্রকার দুঃখের
অমৃতবে অমৃতাবীর শবীর যেমন ছড় সড়
কুণ্ঠিত হয় সেইরূপ লজ্জারও বাহ্য লক্ষণ
শরীরের জড়তা; বাড়ীর বাহিরে চলিতে
হইলেই লজ্জাবতী কণকামিনী বচবণে চ-
রণ বাধে। লজ্জার প্রকোপে হেট মস্তক,
বসিলে উঠা যায় না, উঠিলে চলা যায়
না। কখন কখন লজ্জায় আমবা অতি
ভীত দুঃখ সহিয়া থাকি; ইচ্ছা হয় যে
পৃথিবী দ্বিধা ভয় হউক ভূগর্ভে প্রবেশ
করিয়া লজ্জাব উৎপীড়ন হইতে এড়াই;
ইচ্ছা হয় সূর্য্য চিরদিনের জন্য নিবিয়া
যাউক, যেন কেহ মুখের এ কলঙ্ক কালিনা
না দেখিতে পায়। লজ্জা নম্রতা নয়,
লজ্জা অমৃতব বিশেষ, নম্রতা জ্ঞান বি-
শেষ। লজ্জায় নম্রতায় উভয় অবস্থায়ই
মনুষ্যের দীনভাব বটে, কিন্তু সলজ্জাব-
স্থায় আমরা দুঃখী, নম্রতায় সুখী।
অভিমানীর লজ্জা, নিয়তিমানীর নম্রতা।
লজ্জাগ্রস্ত লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিতে যত্ন-
বান্ হন, বিনয়ী ঘোর আঘাসে নম্রতা
ধরিয়া রাখেন। নম্রতায় দীক্ষিত হই-
য়াই ধার্মিক সদানন্দ হইতে শিখেন,
জালাময় জগৎ রূপী রোরবে থাকিয়াও
চন্দ্র দেহ অক্ষত রাখিতে পারেন, সশ-
রীরে স্বর্গভোগ করেন। লজ্জা যদি

নম্রতা না হইল, লজ্জা যদি এত দুঃখ,
তবে এ অমৃতব চিবকালই এত লোক-
প্রিয় কেন? সমাজ-শাসন-বিধি দোষীর
প্রিয় নয়, যাহাদের সুখের জন্য শাসন-
গুলি বিধি-বন্ধ হইয়াছে তাহাদেরই প্রিয়।
লজ্জা, লজ্জাবান্কে লোকের মন যোগা-
ইয়া চালায়; বৈদিককালে ভীকু আখ্যাকে
লজ্জা, অসিচন্দ্র্য পবিত্যাগ করিতে দ্বিত
না, এখন ভাবতীয় আর্গাকুলতিলক প্র-
থব বুদ্ধি বঙ্গীয় যুবক, মহোৎসাহে উৎ-
সাহিত হইলেও লজ্জার অসিচন্দ্র্য ধরিতে
পাবেন না। লোকের মন যোগাইয়া
চালাইলে, শুদ্ধ লোক-সামান্য প্রচলিত
ধর্ম্ম রক্ষা হয়; অতএব অলোক-সামান্য
অপ্রচলিত ভদ্রতানুশীলন কবাইতে লজ্জা
নিতান্ত অক্ষম; পবনসহায়ে পক্ষীর
অনন্ত উন্নতি হয় না, যাবৎ পবনের প্র-
তাপ তাবৎ উঠিয়া থাকে।

লজ্জার শাসনে সম্পূর্ণ উপকার হয়ই
না ত, সর্বদা অপকাবও হইয়া থাকে;
নবীন সৌখীন ইয়াব ছিন্ন মলিনবসনে
বাজারে যাইতে পারিলেন না, বর্ষীয়সী
জননী সেদিন অনাহারে রহিলেন; কু-
ন্তীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বসন ধরিল,
ভরে বিহ্বলা হইয়া বধু বস্ত্র ফেলিয়া নদী-
কূলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দৈতেন,
সম্মুখে, ওপাড়ার পাঁচুঠাকুরপো, এ-
বার লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া সলিল-বসন

পরিবার জন্য লজ্জাবতী, জলে ঝাঁপ দিলেন, নরু বলিল, “এ লজ্জা সগিন বসনে ঢাকে না, এস, তোমার উদবে লুকাইয়া বাখি।” দেখাগেল যে লজ্জার শাসন অসম্পূর্ণ আবাব অপকাবক; তবে লজ্জাব এত আদর কেন? এখন প্রায় সৰ্বলোকব্যাপী শাসন আর নাই বলিয়া। গর্জের শাসন সৰ্বব্যাপী হইলে কি হয়? ইহা অধিকতর অসম্পূর্ণ এবং অধিকতর অপকাবক।

একমাত্র উৎকৃষ্ট শাসন, প্রেমামৃতবেব শাসন, কিন্তু এশাসন আজও সৰ্বলোক ব্যাপী হইয়া উঠে নাই, ভগতেব দুই চাৰিটি মাত্র লোক যথার্থ প্রেমিক, প্রেমের শাসনে শাসিত। সেই সকল কোল অপকৰ্ম্ম কবিতো পাবেন না কাবণ, প্রেমে তিরস্কাব কবে, অন্যায় কবিলেই প্রেমের তাডনায় অস্তিব হইয়া কাঁদিতো হয়। কবে যে প্রেমের শাসন সৰ্বলোকব্যাপী হইবে বলা যায় না তবে এটি নিশ্চয় যে, সৰ্বলোকে প্রেমামৃতব বল বান্ হইয়া উঠিলে লজ্জাব আব আদব থাকিবেনা। কবি আব “Fie! for Godly shame!” বলিয়া, লজ্জা প্রভুর নামোল্লেখ কবিয়া, লজ্জাব ভয় দেখা ইয়া কৰ্ত্তব্যে অনাবিষ্ট মনকে উৎসাহ দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ আব লজ্জাব দোহাইদিয়া সেনাগণকে উত্তেজিত কবি বেন না। উত্তেজিত কবিবেন না—কাবণ,

যে জদয়েব অধিপতি প্রেম, সে জদয়ে লজ্জার প্রভু চলেনা। তখন সকলেই প্রেমের দোহাই দিবেন; আর সুযুগ মন জাগিয়া নাচিয়া উঠিবে। লজ্জাবতীব অভিধানে তখন স্তুখ্যাতি করা হইবে না; নির্লজ্জ বলিলে তখন আব নিন্দা কবা হইবে না। এই মহদ্বিপৰ্য্যয়ের কারণ আমাণ ক্রমে পৰিস্ফুট কবিতোছি।

যীশু খৃষ্ণ, চৈতন্য, কবীর, সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, নানক প্রভৃতি প্রেমের দাস হইয়া অবধি লজ্জা খোয়াইয়াছিলেন। শুদ্ধ বালা লীলায় চৈতন্যদেবকে কখন কখন লজ্জিত হইতে দেখা যায়, আব নঃ। কেহ বলিতে পাবেন লজ্জাব যন্ত্রণা ইহাদেব কখন সহিতে হয় নাই, কাবণ, কখন অন্যায় কাজ কবেন নাই। একথা মিথ্যা; পুণ্যময় জগদীশ ব্যতীত অন্যায় সকলেই কবিয়া থাকেন, তবে আমাদেব অন্যায় একরূপ, এই সকল মনুষ্য দেবতাদেব অন্যায় একরূপ। সেন্ট জেভিয়ার ভাবিলেন—কি অন্যায় কবিতোছি—পল্লীস্থ, গ্রামস্থ, দেশস্থ গুটিকতক মাত্র লোককে জীববেব মহিমা বুঝাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, আর এসিয়াব কোটি২ লোক আজ পর্যন্ত যীশু খৃষ্টেব নামও শুনিব না; ধন-দাস পোৰ্তুগিস্ বণিকেবা দাস্যভয় করিল না, কুৎসিত দেশেব নাবকীয় জন বায়ুর ভয় কবিল না, আমি জৈবের দাস হইয়াভীত হইব। হি! হি! আমার দিক্! আমার ভণ্ড প্রেমে দিক্! এই অন্যায় দেখিবা

* *Troilus and Cressida* Act II
Scene II.

জন্য আঙ্গু আমাদেব চোকে কুটে নাই।
বস্তুতঃ অন্যান্য দেখিবার চোকে অনন্ত
কাল পর্য্যন্ত পবিত্র হইতে থাকে।
ইহলোকে দর্শ্য হইয়া আমরা ছুইচাষিটি
মাত্র অন্যান্য দেখিতে পাই। যত ধার্মিক
হওয়া যায়, ততই পাপ দেখিবার চক্ষু কুটে।
বাম প্রসাদ যে গাঠিতেন “ওমা পাপ
কবেছি বাশি বাশি” এতধু নম্রতাব
কথা নথ, বামপ্রসাদের হৃদয়েব কথা।
তার পব, লজ্জার যন্ত্রণা সহিতে অন্যান্যট
যে কবিত্তে হয় এমন নহে, অন্যান্য না
কবিয়াও লোকে লজ্জিত হয়; ঠাকুর-ব্রি
আসিয়া বলিলেন—বো তুমি নাকি আজ
বড গলা বাব কব্যে গান কবেছ?
ওঁবা সর্কাই বল্ছেন। বো যদি মুখবা
গর্জিতা হন তাহলে বাগ কবিবেন, কো
মোব বাধিয়া ঝগড়া কবিত্তে ধাইবেন,
আব, সুশীলা হইলে, “ওমা কোথায় যাবো
আমি উঠিয়া পর্য্যন্ত ভাঁড়ারে” ইত্যাদি
বলিবেন, আব সেদিন লজ্জার কাহাব
ও সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পাবি-
বেন না। মিথ্যাপবাদ গুনিয়াও লজ্জা
হয়, কাবণ, অভিমান স্বেবেব অবসানে
লজ্জা দুঃখের উদয়, এবং স্বেয্যাতিই অ-
ভিমানের জীবন। যখন ধর্ম্মেব ক,খ,গ
ধবিলেই অভিমান প্রথমে ভাঙ্গিত্তে হয়
তখন উপরোক্ত মনুষ্য-দেবতাদেব লজ্জা
থাকিবে কেন?

কবীরের দোহা—নিম্কে বেচারা থা

ভলা মনকা ময়লা ধোয়।

অ্যায়সা ইয়ার মন্ গেয়া কবীর বৈঠকে
বোয়।”

চৈতন্যেব অহ বহ জপ—

“ভৃগাদপি সুনীচেন তবোবিব সহিসুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীযঃ সদা হবিঃ॥”
যীশু ক্রম্বেব মুখেব বুলি

“For the meek is the Kingdom
of Heaven”

শুদ্ধ এঁদেব কেন, ধার্মিক মাত্রেবই এই
এক বুলি। অতএব ধার্মিক মাত্রেই
নির্লজ্জ। কিন্তু প্রেমিক না হইয়া নির্লজ্জ
হটলে চট কল যায়; উভয় শাসনেব বহি-
ভূত থাকিয়া, সমাজেব কটকস্বরূপ মহা
অত্যাচারী হইয়া পড়িত্তে হয়। নির্লজ্জ
হওয়া কেবল প্রেমিকদেবই সাজে, আত্ম-
স্তম্ভি স্বার্থপরেব নথ। “মন বাস্তেব লজ্জা
তানা” খুলিয়া লইতে হটলে অন্য আব
একটি দৃঢ়তব তানা লাগান চাই। হৃদয়
প্রেমাধিকৃত হইলে কোপ, ভয়, লজ্জা
দর্প প্রভৃতি সকল অমুভবই অস্তর্হিত হয়;
একেশ্বর হইয়া, হৃদয়ে প্রেম, বাস্তব ক
বিত্তে থাকে। যথার্থ প্রেমিক একান্তভাবে
প্রেমময় চৈতন্যেব অর্থ, চৈতন্যেব প্রেম
ব্যতীত অন্য কোন অমুভব ছিল না;
চৈতন্য প্রেমেব প্রতিমা। কেহ বলিত্তে
পাবেন, যে চিত্তেব এই একাবস্থতা
বিকৃতিমাত্র। এখানে ইহাব প্রতিবাদ
কবিত্তে গেলে মূলকথা চাকিয়া পড়ে,
এই জন্য আমরা প্রবন্ধান্তরে ইহাব খ-
ণ্ডন ববিব। বাইবেল বলেন, (3rd
Genesis—The punishment of
Adam) পাপরূপা লজ্জার সঞ্চার হই-
য়াই, আদম ইবেব স্বচ্ছ হৃদয় প্রথম

কলুষিত হয়। কেন? মহাপুত্রক বাইবেল এমন অযৌক্তিক কথা কেন কহিলেন? লজ্জায় আবার দোষ কি? সে কি? খ্রীষ্টান কবি, খ্রীষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টান নাবী, খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই বে, পদে পদে লজ্জাব দোহাই দিবা থাকেন, তবে লজ্জা কলঙ্কিনী কেন? সত্যসত্যই লজ্জা কলঙ্কিনী। যাদের উপাস্য পুত্রকে লজ্জা সর্বনাশিনী বলিয়া বর্ণিত, তাঁরাই সে লজ্জার দোহাই দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ, খ্রীষ্টানেবা খ্রীষ্টানী উপদেশ বহুগুলি আজকাল চক্চকে বাইবেল-বাঞ্জে বদ্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্বার্থ-সাধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের সময় কখন বা ব্যবহার করেন। বাইবেলের আদম হবের উপকথা সগীচীন ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আমরা বাইবেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু গল্পটি সত্যমূলক অতি সুন্দর রূপক বলিয়া বিশ্বাস করি। বাইবেলের ইডেন নামক পার্শ্ব স্বর্গের বর্ণন; নির্দোষ, নিষ্পিত, অতএব জনকজননী-ঈশ্বরে নিতান্ত নির্ভর, অক্ষম, অহিংসক, কায়নিক আদি-জীব শৈশবের বর্ণন মাত্র; (কারণ প্রবীণ বিজ্ঞানের মতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণন হইতে পারে না)। তখন, শাদ্দূল শিশু, মেঘ শিশু, মহিষ শিশু, সমুদ্র শিশু, সকল শিশুই সঙ্কল্পে একত্রে বাস করিতে পারে। তার পরই জ্ঞানসঞ্চার বর্ণিত হইয়াছে, সঙ্গেই বাবলধন, স্বাধীনতা, অভিমান, লজ্জা, পাপ; শেষে পাপের

তরঙ্গ দেখা দিল। শিশুর যেমন আত্মতা, স্বাধীনতা থাকে না, জনকজননীর যা ইচ্ছা শিশুরও সেই ইচ্ছা, ঈশ্বর ভক্তেরা আত্মতা স্বাধীনতা তেমনি বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরের কাছে শিশু হইতে চান। তাই, শৈশবের ছবি দেখিয়া, প্রায়ই স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। লজ্জার মূল দূষিত; লজ্জা অভিমানপূর্ণ। জগতে দুঃখ মাত্রই পাপের ফল, লজ্জা দুঃখ, লজ্জাও পাপের ফল। লজ্জা অভিমান পাপের ফল। অভিমানে লজ্জায় আলোকাঙ্ককার সম্বন্ধ; একের আবির্ভাবে অপর অস্তিত্বিত হয়। অভিমানে সুখের অসম্ভব; কিন্তু ক্ষণিক সুখ, স্থায়ী নয়, অভিমান ভগ্ন হইবেই হইবে। কেহ বলিতে পারেন—যদি অভিমানসুখের অস্তিত্বানে লজ্জা দুঃখের উদয় হয়, তাহলে অভিমান যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেই চেষ্টাই ধর্ম। দিবার ন্যায় অভিমানকে ঘোর আয়াসেও বহুকণ ধরিয়া রাখিবার যো নাই, অন্ধকার আসিবেই আসিবে; প্রতিদিন একবার পরীক্ষা হইতে পারে; শুদ্ধ তর্কেও ইহার যাপার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাই এই চির-আবিসাদী যন্ত্রকে পরিত্যাগ করাই সুখ এবং ধর্ম। তার পর, অভিমানে আত্মোন্নতি এবং পরোপকার দুই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, এবং সর্বদাই অপকার ঘটয়া থাকে।

গ্রেমমরী মিরান্ডার (Miranda)

চরিত্র-বৈচিত্র্য, চরিত্রমাধুর্য এই, যে,

তাঁহাকে আশৈশব বনে রাখিয়া, সংসারের নানা প্রকার অভিমান লিখিতে দেওয়া হয় নাই; অন্তর্যামী কবিও তাঁহাকে লজ্জাবিহীন করিয়াছেন।

ঠিকিয়াঃ শেষ বেলায়, মানব কতক মত বুঝেন যে, অভিমানে পদে২ অনিষ্ট, পদে২ অসুখ। স্বভাব মত নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা মত চলাই সুখ। সূর্য্যাকিরণ ধবিয়া চাঁদ সাজা, আর পবের সুখে সুখী হওয়া কিছুই নয়, বড় বিড়ম্বনা; বুঝিয়া বুদ্ধ কতক মত নিলজ্জা হইয়া। পড়েন নির্লাজ দেখিয়া, বুদ্ধেব তরুণ তরুণী স্বপ্ননেরা সর্বদা মনে২ বড়ই বেজার হইয়া থাকেন।

লজ্জার স্বরূপ পরিষ্কৃত কবিবার জন্য আমবা অভিমান সম্বন্ধে দুইচারি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। জ্ঞানে অভিমানের ধ্বংস, অজ্ঞানেই অভিমানের উদয়, স্থিতি, প্রাদুর্ভাব। ময়ূবপুচ্ছচূড়, উকিচিকিভানন অসভ্য দলপতি আচার্য্য অশ্বেষণে দ্বীপের যে পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই কতিপয় যোজনময়েরা সমাগরা পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও আপনার অপেক্ষা বলশালী দেখিতে পান না; অজ্ঞানময় দর্প কিয়ৎ পরিমাণেও ভাস্কিবার জন্য দেশান্তরের শৌর্য্য অবিদিত; আবার, মনুষ্যমাহাত্ম্য মাপিতে বলবীৰ্য্য ব্যতীত, অন্যরূপ মানদণ্ডও যে হইতে পাবে তাহাও অজ্ঞাত; অতএব, অসভ্য দলপতি অক্ষুণ্ণ-মহিষগর্কে,

অতথ আশীবিষতেজে বিস্মকারী উগ্র-গতি বায়ুকেও আক্রমণ করিতে তেজ করিয়া উঠেন। কুমারসম্ভবে, তারকা স্রবের কথায়, এই আত্মবিক গর্কের অতি সুন্দর রূপক-বর্ণনা আছে। অবাধা হইলে এ গর্ক বিষধব, গুল্মকেও হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করেন; বরদ হইলে, অতীষ্ট দেবেব পূজা করিবেন, বিস্মকারী হইলে, দেবতার প্রতিও বস্তুচক্ষে খড়্গ-হস্ত হইতে কুণ্ঠিত নন; শরীরের কোন অঙ্গও যদি অসুস্থ হইয়া কথা না শুনে, কোপোন্মাদে তাহাকেও কাটিতে উদ্যত; প্রশংসাব জন্য লালারিত হন। স্তুতিগীতে ইহাকে দ্বৈতভূক্ত করা যাইতে পারে, বাধ্য করা যাইতে পারে না। ভাবেন, স্তুতিসায়ক কর্তব্যই করিতেছে, বাধ্য, চরিতার্থ হইব কেন? পর প্রশংসা সহিতে পারেন না, শুনিলে, রাগে জলিয়া উঠেন; নিজগর্কানুভব সুখেই পবিত্রপু, গদগদ; ইঞ্জিয় আর দত্তসুখ ব্যতীত অন্য সুখ জানেন না; আজ্ঞা কারী, সুখদ বলিয়া কন্যাপুত্র চান, ভৃত্য বলিয়া অপবকে চান। এই শুভ্র নিশুভ্র কংস রাবণ হিরণ্যকশিপু রাক্ষস-গর্ক কদাপি ক্ষুণ্ণ হইলে লজ্জা হয় না, লজ্জা দুঃখের পবিত্রের্ত্তে ক্রোধ দুঃখ হয়। জ্ঞানোদয়েব সজে২ এই আত্মরিক দর্প সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সভ্য-সমাজ হইতে কিন্তু অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তবে তমসা-চ্ছন্ন অসভ্য সময়ের মত এখন তেমন

প্রচণ্ড নয়, আভাঙ্গা কেউটার মত তেমন
ভীষণ নয়।

এখন এই গর্ক, যৌগিক পদার্থের
মূল ভূতের ন্যায় মিশ্রাবস্থায় নিজস্ব
হইয়া আছে। জলীয় হইয়া পড়িয়াছে,
তেমন গাঁটি দেখিতে পাওয়া যায় না।
এখনও কেহ দর্প ভাঙ্গিলে ক্ষণিক
লজ্জা ভোগ কবিস্বাই কুপিত হয়।
এখন ও কেহ পবপ্রশংসা শুনিলে
গর্ক নেশা ছুটিয়া যাইবাব আশঙ্কায়
বিরক্ত হন। অভিমান ক্ষে লজ্জাব
উৎপত্তি, ইহা এই আত্মবিক দস্ত
সম্বন্ধেই খাটে না। অভিধানে, অভিমান
শব্দেব প্রতিব্যাক্য গর্ক, দস্ত, হইলেও
প্রচলিত প্রাকৃতে অভিমানের যেকপ
কোমল অর্থ, প্রায় সেইরূপ কোমল
অর্থে আমরা এই প্রবন্ধে অভিমান ক
খাটি ব্যাহার কবিয়াছি। সেন্টিগ্রেড
চিন্তোত্তাপ-মানের (গবিমা তাপমানের)
শূন্য অংশে অভিমান, শততম অংশে
আত্মবিক গর্ক। গর্কিতের গর্কক্ষে ক্রোধ
উপস্থিত হয়, অভিমানীবি অভিমান ক্ষে
লজ্জা উপস্থিত হয়। গর্ক অভিমান
হই স্বঃ, কোপ লজ্জা দুই দুঃখ। অভি

মান মৃদুসামগ্রী, গর্ক অতি তীব্র উগ্র
পদার্থ। অভিমান লোকের কথা শুনিয়া
লোকেব মনোমত হইয়া চলে। পাছে
কেহ অক্ষম, হীন, ছোট বলে, এইভাবে
গর্ক, লোকেব কথায় জ্বলন্ত করে না,
সকল লোককে নীচ ভাবে, আপনাব
শুভাবে গোঁ মত চলে। অভিমানী,
আপন শুণ সংখ্যায় অসম্পূর্ণতা দেখিতে
পান, দেখিয়া, তর চাকিয়া বাখেন, নয়
পরিপূরণ কবিতো চেষ্টা কবেন; গর্কিত,
আপন শুণসংখ্যায় অসম্পূর্ণতা দেখিতে
পান না। লজ্জা মনের লুক্কায়িত অভি
মান দেখাইয়া দেয়, ক্রোধ লুক্কায়িত
দস্ত দেখাইয়া দেয়। ক্রোধ গর্কের জলন্ত
চিহ্নস্বরূপ। সেই জন্য, কতক মত
জানবান্ হইলেই, আমবা পিতা মাতা
শুকজনের সমক্ষে সাধ্যমত ক্রোধ প্রকাশ
কবি না এবং প্রকাশিত কোপ লজ্জিত
হইয়া সম্বরণ কবিয়া লই। গুরুজনের
সমক্ষে বাগ কবিলেই গর্ক দেখান হয়,
শুকজনের ক্ষমতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আ
পন ক্ষমতা প্রকাশ কবা হয়, গুরুজনকে
তুচ্ছ তাকিয়া করা হয়।



গড়ের মাঠেব ইডেন পার্কে কাননহইতে উঠাইয়া আনিবার সময়

বনস্থলীর প্রতি মিস ইডেনের উক্তি।

মবি কাব নয়ন জুড়াইতে
এত কপেব চড়াছড়ি—বনস্থলি !
যাই চল বাজ স্থানে,
নেচে বালক যুবতীযুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাই চল বাজ স্থানে ॥
বংশীধ্বনি উঠাবে কত,
হেঁসে বালক যুবতী যুবা প্রদক্ষিণে যাবে যত
ভেবীধ্বনি উঠবে কত ।
শুধু সঙ্গে নে তোব পাখীগুলি,
তোব হাবমোনিয়া মধুব-বুলি ;
এমনি মাথবে তাবা পুষ্পধূলি ॥
শুধু সঙ্গে নে তোব গুল্ম গুলা,
যেন নানা রঙেব ছত্র খুলা,
কিবা আপনি বাঁধা ফুলেব তোড়া,
যেন পুষ্প ভরা সবুজ ঝোড়া ॥
মরি সঙ্গে নে তোব পাদ্য-জল
তহু স্রোতস্বতী নিরমল,
চরণতলে সাপিনী ছলে
ধাক্বে পোড়ে অবিবল,
যেন ভূমি-তড়িৎ অচঞ্চল ॥

আবো সঙ্গে নে তোব তৃষ্ণ শাখা
গুচ্ছ ফুলেব লাল চূড়া,
ও তোব লতায গাঁথা ফুলেব দড়া ॥
শুধু সঙ্গে নে তোব ফল ফল,
সেথা বসাইব অলিকুল ॥
আমাদেবও শশী আছে—
দিন দিন ফুল ফলে সিনানিতে বিন্দুজলে:
আমাদেবও বায়ু আছে—
তোব পকপাতা পাকা চুলে তবেতবে ফেলবে
[তুলে
আমাদেবও শশী আছে—
বাত্রে অলি জুটাইতে ফুল কুলে হাঁসাইতে,
আমাদেবও ভানু আছে—
বসাইতে শিশুকুলে পডাইতে পাখীদলে ।
মবি কাব নয়ন জুড়াইতে
এত কপেব চড়াছড়ি বনস্থলি !
যাই চল বাজ স্থানে,
নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাইচল বাজ স্থানে ॥

সাম্য ।

তৃতীয় প্রস্তাব।—স্বীজাতি।

মহুষ্যে মহুষ্যে সমানাদিকাব বিশিষ্ট—
ইহাই সাম্যনীতি । জীগণ ও মহুষ্য
জাতি, অতএব জীগণ ও পুরুষেব তুল্য

অধিকার-শালিনী । যেং কার্যো পুরু-
ষেব অধিকাব আছে, জীগণেরও সেইং
কার্যো অধিকাব থাকা, ন্যায় সঙ্গত ।

কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর ক-
বিত্তে পাবেন, যে স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত
বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা,
পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীক, পুরুষ ক্রেশ
সহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা, ইত্যাদি ইত্যাদি;
অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে,
সেখানে অধিকাবগত বৈষম্য থাকাও
বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত,
সে তাহাতে অধিকারী হইতে পাবে না।

ইহাব দুইটি উক্তব সংক্ষেপে নির্দেশ
কবিলেই আপত্ততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথ-
মতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে
অধিকাবগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত,
ইহা আমবা স্বীকার কবি না। এ কথাটি
সাম্য তত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রী
পুরুষে যেকোন স্বভাবগত বৈষম্য, ইংবেজ
বান্গালিতেও সেইরূপ। ইংবেজ বলবান,
বান্গালি দুর্বল: ইংবেজ সাহসী, বান্গালি
ভীক: ইংবেজ ক্রেশসহিষ্ণু, বান্গালি কো-
মল, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল
প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকাব বৈষম্য
ন্যায্য হইত, তবে আমবা ইংবেজ বান্গালি
মধ্যে সামান্য অধিকাব বৈষম্য দেখিয়া
এত চীৎকার কবি কেন? যদি স্ত্রী দাসী,
পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচাব সঙ্গত হয়, তবে
বান্গালি দাস, ইংবেজ প্রভু, এটিও বিচাব
সঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে,
স্ত্রীপুরুষে অধিকাব বৈষম্য দেখা যায় সে
সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত
বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা

যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিষেধ
দোষে। সেই সকল সামাজিক নিষেধের
সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বি-
খ্যাতনামা জন টুয়ার্টমিলকৃত এতদ্বি-
ষয়ক বিচাবে, এই বিষয়টি সন্দেহরূপে
প্রমানীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা
এখানে পুনরুক্ত কবা নিম্নবোজন।*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী।
যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জবাবদ্ধ কবিয়া
না বাধে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরু-
ষের উপর নির্ভর কবিত্তে হয়, এবং সর্ব-
প্রকায়ে আত্মসম্মতি হইয়া মন যোগাইয়া
থাকিত্তে হয়।

এই প্রথা সর্বদেশে এবং সর্বকালে
চিহ্নপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমে-
রিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজ
তত্ত্ববিদ ইহাব বিবোধী। তাঁহারা সাম্য
বাদী। তাঁহাদের মত এই যে স্ত্রী ও
পুরুষে সর্বপ্রকায়ে সাম্য থাকাই উচিত।
পুরুষগণের বাহাতে বাহাতে অধিকাব,
স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার
থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি কবিলে,
ব্যবসায় কবিলে, স্ত্রীগণে কেন কবিলে না?
পুরুষে বাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায়,
সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না?
নারী পুরুষের পরী মাত্র, দাসী কেন
হইবে?

আমাদের দেশে যেপরিমাণে স্ত্রীগণ
পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায়
তাহাব শতাংশও নহে। আমাদের

* Subjection of Women

দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজ্যমাত্রে অকুণ্ঠিত হইয়া, উর্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আক্ৰান্ত, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত অন্যত্র কেহই ধর্মব্রাহ্মণের তাদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন, দরিদ্র ধনী পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আক্ৰান্তবর্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহাব দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী কবিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতা স্বরূপ; দেবতা স্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদূর, যে পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামা নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেবও পরিচর্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্ঘ্য পাতিত্বত ধর্ম অতি সুন্দর; ইহাব জন্য আর্ঘ্যগৃহ স্বর্গতুল্য স্তম্ভময়। কিন্তু পাতিত্বতেব কেহ বিবোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্য, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অন্যদেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য

তাহা এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণের কিছুই জদঘঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজসংস্কার অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা হইয়া থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্বিবাহ দারপবিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ কবিত্তে অধিকারিণী নহে; বরং সর্বভোগসুখে ভ্রাণ্ণলি দিবা চিরকাল ব্রহ্মচর্যাচরণে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পাবে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামী বৃত্তার পরেও অন্য স্ত্রীবিয়োগে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানই, যথেষ্ট বিবাহ কবিত্তে পাবেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেবও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না, যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? বাহা বা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ না হইলে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই কন্যাটি কথামালা

সমাপ্ত কবিলেই চবিতার্ত হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ ক-বিবে না, এপ্রশ্ন আরেক মাত্রও মনেস্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে তবে, অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখা পড়া শিখিয়া কি কবিবে? চাকরি করিবে না? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যা-ত্তরে বলেন, “কেনই বা চাকরি করিবে না?” তাহাতে বোধ হয় তাঁহাবা হরি-ষোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর কবিত্তে পারেন, ছেলের চাকরিই ঘোড়াইতে পারি না, আবাব মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাহারা বুঝেন, যে বিদ্যোপার্জন কেবল চাকরিব-জন্ম নহে, তাঁহাবা বলিতে পাবেন, “কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখা পড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন জ্ঞী বিদ্যা-লয় কই?”

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভাবতবর্ষে বলি-লেও হয়, জীগণকে পুরুষের মত লেখা পড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দে-শীয় সমাজমধ্যে সাম্য তত্ত্বাস্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পবিস্কুট হয় নাই—লোকে যে জ্ঞীশিক্ষাব কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি জ্ঞীশিক্ষার স্বার্থ অভিলাষী হইতেন

তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায়দ্বিবিধ। প্রথম, জীলোক দিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষবিদ্যালয়ে জীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্র, বঙ্গবাসিগণ জলিয়া উঠিবেন। তাঁহাবা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন, যে পুরুষের বিদ্যালয়ে জীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বাবাস্কাবৎ আচরণ কবিবে। মেয়েগুলো ত অধঃপাতে যাই-বেই; বেশীরভাগ ছেলেগুলোও যণেচ্ছা-চারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপ-ত্তির অভাব নাই। মেয়েবা মেয়ে কালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করা-ইবে কে? গৃহকর্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখা পড়া শিখা যাইতে পারে তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেননা ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকাবে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই, যে যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব-বিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, তত

দিন, কেবল আংশিক সাম্যের বিধান কবিত্তে পাবিবে না। সাম্যত্বসত্ত্বর্গত সমাজ নীতি সকল পবম্পবে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্বত্র সমাধিকার বিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্ত্রীর যে কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহ কর্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহ কর্মের চুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ভর হইবে, ইহা স্বভাব সঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্য সঙ্গত নহে। অপবঞ্চ পুরুষগণ নির্বিঘ্নে যেখানে সেখানে ঘাইতে পাবে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যা ইতে পাবিবে না, ইহা কদাচ সাম্য সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটতেছে বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর একপ্রকার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন “বিধেয় বটে।”

তার পর জিজ্ঞাসা, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকবীর জন্য।* বোধ হয় এতদেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে

* সাম্যবাদী বলিবেন, চাকবীর জন্যও বটে।

উত্তর দিবেন, যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জন এবং বুদ্ধি মার্জিত কবিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষান উচিত।

তার পর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যা শিক্ষা বরাইতে হয় কেন? দীর্ঘ বর্ণ দেশীগর্ভভ্রমণী বলিবেন, চাকবীর জন্য, কিন্তু তাহাদিগের উত্তর গণনীয়েব মধ্যে নহে। অন্যো বলিবেন, নীতি শিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন, এবং বুদ্ধি মার্জনের জন্যই পুরুষের লেখা পড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা গোণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গোণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান। (৫৭)

অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার কবিত্তে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার কবিত্তে হইবে, নচেৎ উপবিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কব, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কবনা কেন? শিশুপালন, যথেষ্ট ভ্রমণ, বা গৃহ কর্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কবনা কেন? সাম্য স্বীকার কবিত্তে গেলে, সর্বত্র সাম্য স্বীকার কবিত্তে হয়।

উপবে যে চাষিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ কবিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়াটি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে

পাশ্বে, কেহ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, ক্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল ক্রী লোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, ক্রীশিক্ষা অতি শয় মঙ্গলকর, সকল ক্রীশিক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদেরকে কেহ সেকণ প্রশ্ন করিলে আমরা সেকণ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবাবিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের উচ্ছাসমত বিবাহে অধিকার থাকে ভাল। যে ক্রী সাধনী, পূর্বপতিক আত্মবিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বিবাহ পবিণয় কবিত্তে ইচ্ছা কব না, যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিণয়ভা ববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধনীগণ বিধবা হইলে কদাপি আব বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোনবিধবা, কিছুই হউন, আব যে জাতিমা হউন, পতির লোকা স্তব পবে পুনঃপবিণয়ে উচ্ছাবতী হযন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকা বিনী। যদি পুরুষ পত্নী বিরোগেব পব পুনর্বিবাহ দাব্যবিগ্রহে অধিকারী হয তবে সামান্যত্ব কলে ক্রী পতিবিরোগেব পব অবশ্য, উচ্ছা করিলে, পুনর্বিবাহ পতি গ্রহণে অধিকারিনী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, “যদি” পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই ক্রী অধিকারিনী, কিন্তু পুরুষেরই কি ক্রী বিরোগান্তে

দ্বিতীয় বাব বিবাহ উচিত? উচিত, অসু- চিত, স্বতন্ত্রকথা; ইহাতে উচিত্যানৌ- চিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মহুযা মাজেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যেব অনিষ্ট নাষ্ট, এমত কার্যমাজই প্রযুক্তি অসুসাবে কবিত্তে পারে। স্তবং পত্নী- বিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপবিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিনী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচবাচব স্বীকৃত হয নাই। যাহাবা ইংবেতি শিক্ষাব ফলে, অথবা বিদ্যাসাগব মহাশযেব বা ব্রাহ্ম ধর্মেব অসুবোধে, ইতা স্বীকাব করেন, তাহাবা ইহাকে কার্যে পবিণত কবেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিনী বলিযা স্বীকাব কবেন, তাহাদেবই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস ক- বেন না। তাহাব কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ কবে নাষ্ট। অন্যান্য সামান্যক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কাবণ বুঝা যায়, বিধা- নেব কর্তা পুরুষ জাতি সে সকলেব প্রচ- লনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ কবেন, কিন্তু এই নীতি এসমাজে কেন প্রবেশ কবিত্তে পারে না, তাহা তত স- হজে বুঝা যায় না। ইহা আশাস সাধ্য নহে, কাহাবও অনিষ্টকর নহে এবং অনেকব সুখরজিকর। তথাপি ইহা

সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অগত্যান্বিতাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেক মনে করেন, যে চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্যা একরূপ দৃঢ়বন্ধ, যে তাহার অনাথা কামনা করা বিধের নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন, যে এই এক স্বামীব সঙ্গেই তাঁহার সকল সুখ ঘাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্য সুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা বাধ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্যা পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কব না কেন? তুমি মবিলে, তোমার স্ত্রীব আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মবিলে, তোমারও আব গতি হইবে না, যদি, এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সেন্নিহ কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার স্ত্রীর পোয়া বারো। তোমার বাহ বল আছে, স্ত্রীর তুমি এ দৌরাস্ত্র্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে

এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম বিরুদ্ধ বৈধব্য।

৩৮। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাস্ত্র্য আছে, স্ত্রীপুরুষের যত প্রকার বৈধব্য আছে, তন্মধ্যে আমাদের উল্লিখিত তৃতীয় প্রকার, অর্থাৎ, স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্দ্য পণ্ডব ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর ভাবনা, অধর্ম্যপ্রসূত, বৈধব্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গনর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্তিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কোতুক, ঘাছা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথাব ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্ট কারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার কবিয়াও তাহা লঙ্ঘন কবিত্তে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চক্ষুচক্ষ দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আব তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পণ্ডব ত্রায় পশ্চাৎ বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

স্বিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অমুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধি-

কার? তাহারা কি তোমারই মান রক্ষার জন্ত, তোমারই তৈজস পত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের অর্থ হুঃখ কিছু নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে একপ তৈজস কবিতা, যে তাহারা এখন আব এই শাস্তিকে হুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নভাবকে হুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হোক, অসম্মত হোক, তুমি তাহাদিগের স্বার্থ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আব কতকগুলি মূর্থ আছেন, তাহাদিগের গুণ এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন, যে জীগণ সমাজ মধ্যে যথেষ্ট বিচরণ করিলে চরিত্রতার হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিকে ধর্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাহাদিগকে বলা যায় যে দেহ ইউরোপাদি সভ্য সমাজে কুলকামিনীগণ নথেষ্ট সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন, যে সে সকল সমাজের জীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্মভ্রষ্ট এবং কলুষিত স্বভাব বটে।

ধর্ম বক্ষার্থে যে জীগণকে পিঞ্জর নিবদ্ধ

রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগণের একপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্মের ভাঙাগুলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু জীব ধর্ম একপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম একপ বস্ত্রাবৃত বাবিবৎ, সে ধর্ম থাকে না পাকা সমান—তাঁহা বাপিবার জন্য এত যত্নেব প্রয়োজন কি? তাহাব বন্ধন ভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা যে চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহু বিবাহ অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবাব প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন, যে এই অধিকার নীতি বিকল্প। সহজই বুঝা যাইবে যে এখানে জী গণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজ সংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য, কারণ মহাব্যজ্ঞাতি মধ্যে কাহাবই বহু বিবাহে অধিকার নীতি সম্মত হইতে পারে না। * কেহই বলিবে না

* কদাচিত্ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহাব ভাৰ্য্যা কুষ্ঠাদি বোগগ্রস্ত। বোধ হয়, বলিতেছি, কেননা তাঁহা স্বীকার করিলে রূপের পত্নীর পক্ষেও সেই রূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

যে জীপণও পুরুষের ন্যায় বহু বিবাহে অধিকারিনী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও জীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতি সঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত কবে, যেখানে কার্য্যাদিকারটি অনৈতিক, সেখানে উদ্ধাকে কর্তিত এবং সন্ধীর্ণ কবে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পাবে না। সাম্য এবং স্বানুবর্তিতা এই দুই তত্ত্ব মধ্যে সমুদায় নীতি শাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চাবিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত তাহাবই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে এমন ভবসা করা যায় না। আমবা আর দুই একটি কথা উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

জীপুকে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব সমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানকও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েই এক ঔবসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েই প্রতি পিতা মাতার একপ্রকার যত্ন, একপ্রকার কর্তব্য কর্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভ্রাস্য কল্লক, কন্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পাবে না।

এই নীতির যে কারণ হিন্দু শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, যে যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী, সেটি একপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ, যে তাহার অযৌক্তিকতা নির্দোষ কবাই নিশ্চয়োজন। দেখা যাউক, একপ নিয়মেব স্বভাব সঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কপিত হইতে পারে, যে জী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিনী, এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যের বর্জী, অতএব তাহার আব পৈতৃক ধনে অধিকারিনী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহা এই ব্যবস্থানীতির মূল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পাবে যে বিধবা কন্যা বিষবাধিকারিনী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিনী হয় না কেন? কিন্তু আমবা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। জীকে স্বামী বা পুত্র, বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যে ধনে নহিলে জীজাতি ধনাধিকারিনী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি ছুটহোক, কুভারী, কদাচার হোক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্ম্ম, ক্রতু, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে জীজাতিব কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্রে তাড়াইরা দিল ত সব ঘুচিল। স্বাভাব্য

অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য পতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পাবেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায় বিরুদ্ধ, এবং নীতি বিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে। বাটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রী গণের হস্তপদ বাধিয়া পুরুষ পদমূলে স্থাপিত কব—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নাবীগণ বাঙনিম্পত্তি করিতে না পাবে। জিজ্ঞাসা কবি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা এত বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে, স্ত্রীগণকে বাধিবাত্ত, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বতাবতঃ তুষ্ট বর? না বজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অর্থ না হয়, তবে অর্থ কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দু শাস্ত্রসারে কদাচিত্ত স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিবে। এটুকু হিন্দু শাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিবি ছুই একটা। থাকাতাই আমবা প্রাচীন আৰ্য্য ব্যবস্থা শাস্ত্রকে

কোর কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাপ্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মনের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বাটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদি অধিকারিণী নহেন। এ অধিকার কত টুকু? আপনাব ভবন পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবন কাল মধ্যে আর কাহাকেও কিছু খাইতে দিবেন না, এইপর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাণ্ডা পুত্র সর্বস্ব বিক্রয় কবিয়া ইন্দ্রিয়লুপ্ত ভোগ ককক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু গহাবাগী স্বর্ণমবীর ন্যায় ধর্ষিতা স্ত্রী কাহাবও প্রাণ বক্ষার্থেও এক বিধা হস্তান্তর কবিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তবেবও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থির মতি, বিষয় রমণে অশক্ত। হঠাৎ সর্বস্ব হস্তান্তর কবিলে, উত্তবাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এজন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমবা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, শৈথিল্য, চতুরতার, পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। বিষয় বক্ষার জন্য বে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিরুপ্ত বাটে, কিন্তু সে পুরুষেই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুষ্কমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয় কর্ত্ত্ব হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে লাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে

মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেট অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কোতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। সম্প্রতি হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য বিষয় এই অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশেহলস্থলে পড়িয়া গেল। যা! এত কালে হিন্দুস্তানের সতীত্ব ধর্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্ব ধর্ম রক্ষা কবিবেনা! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাঙ্গা নহিলে চাঁদার সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্মান্বহানে বাজিয়াছিল যে হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি কবিয়া, প্রিবিকৌন্সলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদ পত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া, “ওরে চাঁদা দে!” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না, কেন না দেশী সম্বাদপত্র পাঠ স্থখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু বাহাই হোক, বাহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আত্মাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড়

শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী তিল্ল অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম ভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃত্রিম, সে সকলই বিষয় পাইবে কেন না তাহার পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম শাস্ত, তবে অধর্মশাস্ত কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাংসলা, তবে মহাপাতক কেমন তর?

স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ বত বাধন বাধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কণা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? তুরিঃ নিষেধ আছে, সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম, লোকেও একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। “স্ত্রীলোকদিগের উপর বৈরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেক্ষেপ কিছুই নাই।

কপায় কিছু হয় না, ত্রুটি পুঙ্খাব কোম সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সচীৎ সম্বন্ধে কোন দোষ কবিলে সে আর মুখ দেখাইতে পাবে না, হস্ত আয়ীত্ব স্বলন তাঁহাকে বিষ প্রদান কবেন; আব একজন পুরুষ প্রকাশ্য সেটরূপ কার্য্য ক বয়া, য়েশনাট কবিয়া, জুড়ি ঠাঁকাইয়া বাত্রি শেষে পত্নীকে চবণবেণু স্পর্শ কবাটতে আসেন; পল্লী পুলাকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট কবিয়া অসাধুবাদ কবে না; লোক সমাজে তিনি যেকপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইবপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যব-চাবে সম্বন্ধিত হয় না, এবং তাঁহাব কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশেব চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পাবেন। এই আব একটি গুরু তর বৈষম্য।

আব একটি অসুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব নিয়ন্ত্রণীত্ব জীলোক ভিন্ন, এদেশীয় জীগণ উপার্জন করিতে পারেন না। সত্য বটে, উপার্জনকাবী পুরুষেবা আপনং পবিবাবস্থা জীগণকে প্রতিপালন কবিয়া থাকেন কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এদেশে আছে, যে তাহাদিগকে প্রতি-পালন কবে, এমত কেহই নাই। বাঙ্গা-লায় বিধবা জীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য কবিয়াই আমবা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গ বিধবাদিগেব অল্পকষ্ট লোক বিখ্যাত, তাহাব বিস্তাবে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে

না, ইহা সমাজেব নিত্যক নিষ্ঠুরতা। সত্যবটে, দাসীত্ব বা পাটিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীকনা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা যত্নাভে বস্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহাবা যে উপার্জন কবিত পাবে না, তাহাবা তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহাব দেশী সমা-জ্বেব বীত্যাশ্রুসাবে গৃহেব বাহিব হইতে পাবে না। গৃহেব বাহিব না হইলে উপা-র্জন করাব অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় জীগণ লেখাপড়া, বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জন কবিত পাবে না। তৃতীয়, বিদেশী উমে-দওয়াব এবং বিদেশী শিল্পীবা প্রতি যোগী, এদেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প, বা বাণিজ্যে অল্প করিয়া সম্ভূতান কবিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহাব উপব জীলোক প্রবেশ কবিয়া কি কবিবে?

এই তিনটি বিষয় নিবাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হ-ইলে, বিশেষতঃ জীগণ সুশিক্ষিত হইলে, তাহাবা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নাবী-গণেব ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী, বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অল্প কাড়িবা লইতে পারিবে না। শিক্ষাই

সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের দেশের জীবনের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাহাদিগের যশঃ অক্ষর হউক; কিন্তু এট কর জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছু হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য জাতীয় উন্নতির জন্য কেহ নাই।

পণ্ডিতগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক অধিবাসী, জীবজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। জীবলোকদিগের উপকারার্থ একটি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ হয় না কি? আমরা করদিনের তিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পুস্তকালয় জন্ম বিস্তার অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ সংসাররূপ পুস্তকালয় সংস্কারার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না, কেন না তাহাতে রক্ত-তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, টাব অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে, কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র।

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পেশিয়াল” আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে এক জন কোন বিলাতীয় সংবাদপত্রে নিয়ন্ত্রিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সংবাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদের পীড়াপীড়ি করেন তবে আমরা নাচাই হইব। সংবাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কো-

থায় দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে কিছু বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আশ্বাসিত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সংবাদ

পাইবেন এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এ দেশের নাম “বেঙ্গল” এনার কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশীলোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জ্ঞানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে পূর্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও “বঙ্গাল” বলে, একনা এদেশের নাম “বঙ্গাল”। কিন্তু এদেশের নাম বঙ্গাল নাহে—ইহার নাম “বেঙ্গল”—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব একপা কেবল প্রবন্ধনা মাত্র। আমার বোধ হয় বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল্ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম “কালকাটা” (Calcutta) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটি বঙ্গানামকে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম “কালকাটা”

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোবতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃষ্ণবর্ণ বঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কৃষ্ণত্ব বেশ; নরত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন,

কৃষ্ণত্ব বেশ হইলেই কাকি। আর যাহাবা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাদেকবের বংশসম্বৃত।

দেখিলাম অধিকাংশ বঙ্গালি মাক্কেটের তত্ত্বগ্রন্থত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব মাক্কেটই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে ভারতবর্ষ মাক্কেটের সংক্রমে আসিবার পূর্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত; এক্ষণে মাক্কেটের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ আমাদিগের মত শেণ্টলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পারজামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব, দেখ, ত্রিটিব রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। অতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্বারা ভারতবর্ষের যে কিপরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেরই জ্ঞানে। বঙ্গালিতে বৃদ্ধিতে পারে, এত দ্রুতি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে আমি করিনি

বাহাদুরিগের ভাষার অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই। তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেন্ডান্ এবং বোল্ডান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদী পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের মূল মর্ম এই যে, বুখিতির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মনোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মনোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। পরিশেষে, তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাই কোর্ট বলে, গবর্ণমেন্টকে গবর্ণমেন্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিভনিষকে ডিভনিষ, রেলকে রেল, ডোরকে দোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আবাদিগের ত্রীটের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক

তৎপ্রণীত ভগবৎগীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পরে, কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমুলর, মনোবোগ করিলে, এবিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে অশোকের পূর্বে আর্থোরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমুলর পর্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারনাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।*

যাহা হোক, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ, যে হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিয়ে লিখিতেছি:

* সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগান্ড ট্র্যাট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

- ১। জ্ঞান
- ২। কার্য
- ৩। শূন্য
- ৪। কুলাল
- ৫। বংশজ
- ৬। বৈষ্ণব
- ৭। শাক্ত
- ৮। রায়
- ৯। ঘোষাল
- ১০। টেগোর
- ১১। মোল্লা
- ১২। ফরাজি
- ১৩। রামায়ণ
- ১৪। মহাভারত
- ১৫। আসাম গোরালপাড়া
- ১৬। পাবিয়া ডগ্‌স

বঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কাব-
ণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি
বঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেক
গুলি বঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম
যে তিনি কোন জাতি? সকলেই বলিল
তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে
ঠকাইতে পারিল না, কেন না আমি
সেই পণ্ডিতবর মক্ষ মূলরের গ্রন্থে*
পড়িয়াছি, যে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
জ্ঞান। দেখা যাউতেছে, যে “Mitia”
শব্দ “mitre” শব্দের অপভ্রংশ, অতএব

মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই
বুঝায়।

বঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই
যে তাহারা অত্যন্ত রাজতক্ত। যেকোন
সাথে তাহারা সুববাজকে দেখিতে
আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে
ঈদৃশ রাজতক্ত জাতি আর পৃথিবীতে
কোথাও অস্তিত্ব করে নাই। ইহঁদের
আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে
তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

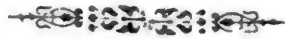
বঙ্গালিবা জীলোকদিগকে পরদা
নিশীন কবিতা রাখে শুনা আছে। ইহা
সত্য বটে, তবে সর্বত্র নয়। যখন
কোন লাভের কথা না থাকে, তখন
জীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের
সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে।
আমবা যেকোন ফৌলিংপিস লইয়া ব্যব-
হাব করি, বঙ্গালিরা পৌরাজনা লইয়াও
সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই,
তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার
দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বাক্স
পোরে। বন্দুকের সিমের গুলিতে ছার
পক্ষিভাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বঙ্গালির
মেয়ের নয়নবানে কাহার পক্ষচ্ছেদের
আশা করে বলিতে পারি না। আমি
বঙ্গালির কন্যার অজান্তরপের যেকোন গুণ
দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে,
আমারও ফৌলিংপিস্টিতে দুই একখানা
সোনার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী
ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি
না।

তুখু ময়নবানে কেন, শুনিয়াছি বাক্য
লির মেয়ে নাকি পুন্সবান প্রেরোগেও বড়
হুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুন্সবানে,
আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত
পুন্সবানে, কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা
আমি জানি না; যদি থাকে, তবে
বাক্যালির মেয়েকে ছুরাকাজিকিনী বলিতে
হইবে। শুনিয়াছি কোন বাক্যালি কবি
নাকি লিখিয়াছিলেন, “কিছার মিছাব
ধনু, ধরে ফুলবান;” এখন কথাটা একটু
কিরাইরা বলিতে হইবে “কিছার মিছাব
ফুল, মারে ফুলবান।” বাহা হউক,
ফুলবান সচরাচর প্রচলিত না হইয়া
উঠে। বাক্যালার ইংরেজ টেকা ভাব হইবে
—আমার সর্বদা ভয় করে, আমি এই
গরিব দোকানদারের ছেলে, ছটাকা
লোভে সমুদ্র পাব হইয়া আসিয়াছি—
কে জানে কখন, বঙ্গকুলকামিনী প্রেবিত
কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা
করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে,

আমি অমনি ধপাস্ কবিয়া চিতপাত
হইয়া পড়িয়া বাইব! হায়! তখন আমার
কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না, যে সকল বাক্যা-
লির মেয়ে একপ ফৌলিংপিস, অথবা
সকলই একপ পুন্সক্ষেপণী প্রেরণে সূচ-
ত্বা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি
জনববে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি,
তাহাবা নাকি ভর্তৃনিয়োগানুসাবেই একপ
কার্য্যে আবৃত। এই ভর্তৃগণ দেশীয়
শাস্ত্রানুসাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করি-
য়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটা বেদ
আছে—তাহাব মধ্যোচাণক্য শ্লোক নামক
বেদে (আমি এসকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎ-
পন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে
আত্মানং সততং বন্ধেৎ দাবৈববপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই হে পদ্মপলাশ লোচনে
শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতিব জন্য
তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি,
তুমি গলায় পর!



উড়িষ্যার পথে প্রভাত।*

(১)

উঠ উঠ রাতি পোহার;

গুরু—ত্রয়োদশীর সোনার চাঁদ

একলা কেলে ঐ পালার,

ভেবে—ঘুম্নে আছে বজ্রমতী

ধীরি ধীরি চোর পালার ॥

কিবা—বহুকণী নিশাপতি—

তাহুর বাক্যে অন্ত যার

* নীলগিরিমালা বালেশ্বর হইতে পুরীযাত্রী পন্থার কিয়দূর পশ্চিমে থাকিয়া
নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে—এই পথের উপর অধ-শকটে গুরু ত্রয়োদশীর তিমির-
শেষা রাত্রির প্রভাত বর্ণন।—ছন্দ:মাত্রাবৃত্ত।

ধরিয়ে—চল চল লাল শোভার
ভাষুর থাকে তত্ত্ব যার ॥
উঠ উঠ রাত পোহায় ॥
শশী—প্রণয় কিরণ আল গুটার,
ঝাটান—আঁধার রাশি ফের ছড়ায়,
ধরার মুখে কালি মাখায়,
চেয়ে—স্নানমুখী দেখে ধরায় ॥
উঠ উঠ রাত পোহায় ॥
অলস—অন্ধার যেমন তুলে শিখায়,
শেষে—নির্জাগমুখে শিষ গুটার,
তথাপি—লাল বমণে চোক জুড়ায়,
তেমনি—অর্জিহীন দেখে চাঁদার,
অর্জিহীন দেখে শোভার ॥
শশধর—অস্ত্রি চুড়ার ঐ দাঁড়ায়,
রক্তিম—অন্ধার যেন গিবি চুড়ায়,
শৈল—অগ্নি গিবি প্রায় বুঝায়,
এই ছিল যে—গেল কোথায় ॥
উঠ উঠ রাত পোহায় ॥

(২)

হলু দেয় শৃগাল গণে
হেরে—অন্ধকার প্রাণ সখায়,
গজায়—সহায় পেয়ে গিরি গুহাব
বুক—অকারণে কোপ জানায়, চোক বাঙাব
কর্কশ—আঁধার মানিক চোক আলায়,
নৃশংসের—অমতায় রাগ যোগায়,
হরিণীর প্রাণ শুকার,
অগ্রপদে চট চটায় ;
নিশাচর—শুশ্রুতো ফের আগায়,
বনস্থলী—অর মবার খস খসায় ;
গন্ধিনী—পাখীর কোলে মুখ লুকার,
চট নিদ্রায় ;

বাছার মা—কোলে ঢেকে রেয় কুলায়
নিদ্রাচোকে ধীন বাছায় ;
কীকটির—আপন প্রাণের তর কুলায়
মা হোলেই মার মারায় ;
বানরপাল—চকিত মনে রয় পাখার,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়
ময়না—পেটুক কথার শেষ নিশায়
আধ নিদ্রায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায় ।
উঠ উঠ রাত পোহায় ॥

(৩)

ভাহুপ্রিয়া উবা সভী
প্রাণীদ্বারে জল চিটার,
শীতল আলোক জল ছড়ায় ;
গ্রাম; বৌয়ে কাব শিখায় ॥
উঠ উঠ রাত পোহায় ॥
সাহস—আলোক সাথে এল ধরায় ;
ফুল ফুটার, বায়ু খেলার,
কোক মিলায় কুহ তুলায় ॥
সাহস—কোলাহলে দিক্ আগায়,
পাখিকুল—কোলাহলে বন মাতায় ॥
এবাব—জোলা আলোয় দিক্ ভাসায় ॥

৪

ঐ লাল রতন দিন ফুটার ॥
চেকেছে—দিনমণি কণ্ঠ বসনে
সাঁওতাল গিরির নীল আভায় ;
হাঁসি পায় ল্যাঙটা গিরির
চিকণ বাসের সন্ধ্যাতায় ॥
চলেছে—দলেবলে নীল গিরি
লক্ষ মাখায় উড়িষ্যার
যেন—তবন্ধিতা দেখে ধরায়

তুলেছে—দেখা দেখি বহুযতী

চেট মালার

শকটের উন্ট দিকে

যতবন্ধে দেশ ছুটায় ॥

(৫)

রৌদ্রে—তীক্ষ্ণ প্রভার

প্রভাত কুম্ভ দেখে শুকায় ॥

বসিয়ে—বারদেলে রোজ সাধে

দিনেব্ কায্ তোয় অপেক্ষায়

নীবে—দলে দলে দিনেব্ সাধে

দিনেব্ কায্ তোয় অপেক্ষায়

উঠউঠ দিন্ কুম্ভায় ॥

পলাশির যুদ্ধ।*

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত।

কেন না ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। স্মৃতবাং কাব্যকাবের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।* যাহা ইউক

* আমরা একপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে২ একপ ব্যঙ্গ কবিয়া, আমরা বড় অপ্ৰতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচবাচব, শিত্ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্থ, পাপিষ্ঠ, নবাবম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুদ্ধিতে পারেন যে একটা বহুস্যা হইল বটে, উদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুদ্ধিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, বাহা কিছু আর্ঘ্য সাহিত্যে আর্ঘ্য কর্শনে, আর্ঘ্য ভান্ধণ্যে, বা আর্ঘ্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউক

মেকলেব সঙ্গে আমাদের একপে কার্য নাই; নবীন বাবু গ্রন্থেব কথা বলি।

বোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহা-দিগকে ব্যঙ্গ কবিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুর মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবাব লিখিয়াছিলাম, যে শকুন্তলা মিরনার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেকপীরব হইতে কালিদাস চুরি কবিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত। কি সর্বনাশ! কালিদাস সেকপীরবেব পববর্তী! আর এক খানি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক বেসকল পচা পুবাঁতন চর্কিত চর্কিত পুনশ্চর্কিত তব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভি-নব বলিয়া পাঠককে উপচৌকন দিয়া-ছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, “আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব

* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীন চন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত বঙ্গ। ১২৮১।

প্রথমসর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান ব্যক্তির শেঠদিগের আগারে বহিরা সেরাজউদৌলাকে রাজ্যচ্যুত কবিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমনত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত কবিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হই-
রাছে, এবং নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। চুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্র-কৃত সিরাজউদৌলার রাজ্য বর্ণন—

“বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায়;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন;
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, ঘাহার প্রভাব
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে জিভুবন;
সুগোল মৃণালভূজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রমালাপ মন্ত্রণার চলে,
রমণীর স্নানতল রূপের কিরণ

আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিরাছে!” কি হুঃখ!

এইখানে ক্রাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথাযুসাবে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাহা-
দ্বিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কতকগুলি বাক্যলা সম্বাদপত্র বেক্রপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সহন;
সঙ্গীতে গাইছে অর্থা মনের বেদন।”

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং
ষড়্‌যন্ত্র কারীদিগের মধ্যে তাহারই বাক্য-
সকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু
যবনে যে সম্বন্ধ, তদ্বিবরক নিম্নোক্ত
উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি বুধা জাতি বন্দ ধর্মের কারণে—
অশ্বখ পাদপদ্মাত উপবৃক্ষমত
হইবাছে যবনেরা প্রার পরিণত ॥

ষড়্‌যন্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের
সাহায্যে অত্যাচারী সেরাজউদৌলাকে
দূর করিতে হইবে—সেরাজের সেনা-
পতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হই-
বেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের
বিরোধিনী। ইংরেজের সাহায্য বাহা
হইবে, তাহা দৈবী বাণীর ন্যায় কথা
পরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন পরে
নিজমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—

“আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিকোবিয়া অসি,
সাক্ষিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সমুখরণে; বেশ পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাস্যক উজলি বঙ্গ;—এই অভিশাপে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উকতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যাববেগে আমার ধমনী।”

“ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা আসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদবে;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ? সত্য সেঠবব!—
‘বঙ্গমাতা উদ্ধাবের পক্ষ সুবিত্তাব
রষেছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পবিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পক্ষে কব বিচরণ।
প্রগল্ভতা মহাবাজ! ক্ষম অবলাব,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবাব!!”

বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শ মত কার্য্য
হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আবস্ত।
এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা
যায়। দ্বিতীয় সর্গহইতে এই কাব্যে,
কবিত্বকুসুম একপ প্রভূতপরিমাণে বিকীর্ণ
হইয়াছে, যে কোন স্থান উদ্ধৃত কবিত্ব,
সমালোচক তাহার কিছুই স্থিতি পায়
না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত কবি।
এইরূপ অপরিণাম্য পরিমাণে যিনি এ
চূর্ণভ রত্নসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি
যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্তের নদী
পাব হওয়াব চিত্র, তপনচিত্রিত ফটো-
গ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত
বশি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপ-
রাহু হইয়াছে—

খচিত স্বর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,

চুধি মুহু কলকলে, মন্য সমীরণ,—
তবল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তবঙ্গিণী।
শোভিছে একটা রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র ববি জাহ্নবী-জীবনে।
অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস-কেতন,
উড়িছে গোববে উপহাসিয়া ভাস্তবে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আধাবি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীৰ্যা কাটোয়া-সমবে।
সশস্ত্র ব্রিটিস সৈন্য তবী আবোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপাব, অঙ্গ ঝলমলে;
দুবহতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে;
বক্তবস্ত্রে, বণ-অস্ত্রে, ববিব কিরণ
বিকশিছে প্রতিবিশ্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।
ব্রিটিসের বণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন ঝনন,
হেঁসিছে ভুবঙ্গ রঙ্গে, গজিছে বারণ।
থেকে থেকে বীবকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুবিছে ফিবিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মস্তবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু ঝঞ্জে; ধীবপদ; কভু দ্রুতগতি।
‘ডুমের’ ঝঝঝ বব ‘বিপুল’ ঝঞ্ঝার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীব অহঙ্কার।

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে,
আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে।
গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরু-
তলে বসিয়া, কর্তব্যাকর্তব্যচিন্তিত।
ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার
হুমাহনিকতা পর্যালোচনা করিয়া তিনি

শক্তি। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজ-
লক্ষী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে
আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ
কবির সৃষ্টি; রাজলক্ষীকে কবি এক
অপূর্ব মহিমাময় শোভায় পবিমণ্ডিত
করিয়াছেন।

কোটি কহিব কান্তি কবিতা প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-বস্ত্র, সেই ববাননে;
গৌববের রঙ্গভূমি, দয়াব নিবাস,
প্রভু ও প্রগল্ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিবণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব খচিত চাক কুমুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-স্বাসিত
বামার সুরতি খাস, কুমুম সৌভ,
প্রাণে মর অমবতা করে অমৃতব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্মাল্যখচিত
জ্যোতি রয়ে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
অলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিব-প্রজলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অখণ্ড শীতল যেন শারদ চঞ্জিমা,
যেমন প্রথরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাথা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে আগ্রত স্বপনে,
ভুবন ঈশ্বরী মুক্তি দেখিলা নয়নে।

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশপ্রস্থত মেঘ-
ধ্বনি-আত্মাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

“রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর;
জ্যোতার উপরে জ্যোতা জ্বিতের সহায়,

আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপকৃপাতী, মূর্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্বদেশে খেতে ও শায়নে
বববে তাঁহাব মেঘ, বাঁচার পবনে।
পার্শ্ব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! গগনর স্থল।”

কুজ ২ বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব
প্রকাশ। নিম্নোক্ত কুজ চিত্রটি দেখ—

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লক্ষ দিয়া যেই বীব তরী আবোহিল;
স্তির ভাগীরথী জল করি উচ্ছসিত,
অমনি ব্রিটিশ বাদ্য বাজিয়া উঠিল;
ছুটিল তবণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আবশি খানি ভাঙিল গড়িল;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় “জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—”

ঐতরণীর নাবিক দিগেব গীত অতি
মনোহর—বাইরণের যোগ্য। গীতটি
শুনিয়া বাইবণকৃত নাবিকদস্যর গীত
মনে পড়ে।

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।

নবআবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিহা আফ্রিকার যুগতৃপ্তিকার,
ঐশ্বর্যশালিনী পূর্ব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্তি না আছে কোথায় ?
পূর্ব পশ্চিম গার সমুদয়,
“জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়।”

সম্পদ সাহস; সঙ্গী তববাব;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডাবী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনাব;
শয্যা রণক্ষেত্র; জঁষা জ্ঞাপকারী।
বজ্রাঘি জিনিয়া আমাদেব গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অর্ধ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পাবাবাব?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
“জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়?”

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে ঝারে বীর ব্রিটিসতনয়?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
অরিয়া অন্তরে; চল রণে তবে;
হায়! কিবা স্মৃতি উপজিবে মনে,
তুনে রণবার্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
“জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়।”

অতএব সবে অভয় অন্তবে,
চীত হয়ে পড়ে দাঁড় দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান;

ব্রিটিশের নামে ফিবে সিদ্ধুগতি,
বিক্রান্ত অশনি অর্ধ্রপথে রয়;
কিছার দুর্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়;
গাবে বজ্রসিদ্ধ, গাবে হিমালয়,
“জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়।”

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদৌলার
শিবিরে নৃত্য গীতেব ধুম পড়িয়াগিয়াছে।
এমত সময়ে, সহসা, ইংরেজের বজ্র গর্জিয়া
উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণ কৃত, ওয়াটালুর
যুদ্ধেব পূর্বরাত্রি বর্ণনা অবশ্য পড়ে—

“There was a sound of revelry
by night” &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাই-
বনেব যোগ্য—

বাগী-বীণা বিনিমিত স্বব মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে বক্ত অধবযুগল;
বহিছেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পাবিধাত যেন, মাগি পবিমল;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা সলিলে, মবি, ভাসিছে কেবল।

তোপেব শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল
—সিঁদাউদৌলার ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন
হইলেম। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার
স্বার্থপর, অধাবসারবিহীন, দুর্বল, ভীত
চিত্ত, অকিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত
হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের
আশ্লেষণ শক্তির তাদৃশ পবিচয় দেন

† Synthesis.

নাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশেষণ শক্তির
বিলক্ষণ পবিচয় দিয়াছেন।

নবাব, আপনাব কর্মফল ও চরিত্র
দোষ চিন্তা কবিতা, ভয়বিমূঢ় হইয়া,
মীবজ্রাফবেব শবণ লইব বলিয়া দৌড়ি
লেন, কিন্তু ভয়ে মুচ্ছিত হইয়া পড়ি-
লেন। তখন তাঁহাব একজন স্নেহময়ী
মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া, অশ্রুবিমোচন
কবিত্তে লাগিলেন। এদিকে, এক ব্রিটিস
যুবক—

প্রিয়ে কেবোলাইনা আমাব।

ইত্যাদ্য এক স্তম্ভধুব গীতিধ্বনি বিকীর্ণ
কবিত্তে লাগিল—এইরূপে বঙ্গনী প্রভাতা
হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ,
কার্যের মন্দগতি। ইহাতে কার্য
অতি অল্প, যাত্রা আরু, শত্রুর গতি
অতি অল্প হইলোহে। অল্প ঘটনার
বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সঙ্গসবল পবিপূর্বিত
হইতেছে। প্রথম সর্গে বাঙ্গাল পবা
মশ কবিগেন, এই মাত্রে, দ্বিতীয় সর্গে
ইংবেঙ্গসেনা গঙ্গা পার হইবা পলাশীতে
আসিল এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই
হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবি
তাঁব মোহমন্ত্রে মগ্ন হইয়া, এসকল দোষ
লক্ষিত কবিবাব অবকাশ পাওয়া যায়
না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ বর্ণনা
অতি সুন্দর—

† Analysis.

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল।

গভীর গর্জন করি,

নাশিতে সমুখ অরি,

মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত চাবা মনে গবি,

ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,

চাহিল আকাশ পানে,

ঝবিল কামিনী কন্দ-কলসী অমনি।

পাণিগণ কলবব কবি বাস্তমনে,

শশিল কুলায়ে ডবে;

গাভীগণ ছুটে বড়ে,

বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে তাঁকাল সঘনে।

আবাব আবাব সেই কামান গর্জন।

উগবিল ধুমবাশি,

আঁধাবিল দশ দিশি,

গবজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাধন।

আবাব আবাব সেই কামান গর্জন।

কাঁপাইয়া ধরাতল,

বিদাবিয়া বণস্থল,

উঠিল যে ভীমবব ফাটিল গগন।

সেই ভীমববে মাতি ক্লাইবেব সেনা,

ধূমে আববিত দেহ,

কেহ অশে পদে কেহ,

গেল শত্রু মাঝে। অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝুনা।

খেলিছে বিজ্ঞাৎ এক ধাঁধিয়া নয়ন।

লাখে লাখে তববাব,

ঘুরিতেছে অনিবার,

বহিকবে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

ছুটিল একটা গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পাবে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ছুতলে হইল মিব্ মদন পতন !
“হুব্রো, হুব্রো” কবি গর্জিল ইংবাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল বণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ ।
“দাঁড়াবে দাঁড়াবে ফিবে, দাঁড়াবে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও বণ,”
গর্জিল মোহনলাল “নিকট শমন?”

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য
আছে, তাহা আবও সুন্দর। সত্য
ইতিহাসে ইহা কীর্তিত আছে, যে হিন্দু
সেনাপতি মোহনলাল পলাশির ক্ষেত্রে
ক্লাটবকে প্রায় বিমুখ কবিষাছিলেন,
এবং যদি মীবজাফব বিশ্বাসঘাতকতা
না কবিতেন, তবে ভাবত সাম্রাজ্য অদ্য
কে ভোগ কবিত তাহা বলা যায় না।
যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহন-
লাল তাহাদিগকে ফিবাইবাব অন্য যে
সকল কথা বলিষাছিলেন, তাহা আমবা
উদ্ধৃত কবিব কি? না, পাঠকের
ঠাছা হয়, বিবলে বসিয়া আপনি পাঠ
কবিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিবিল
আবার বণ চইতে লাগিল—কিন্তু এমত
সময়ে শঠ মিবজাফরের পবামর্শে নবাব
রণস্থগিত কবিবার আস্থা প্রচার কবি-

লেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে
নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ
দ্বিগুণ বল কবিল—

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংবাজ শঙ্গিন কবে,
ইঙ্গ যেন বজ্র ধবে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

কাবো, বুক কাবো পৃষ্ঠে, কাহাবও গলায়
লাগিল, শঙ্গিন আয়,
ববিষাব ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধবায়।

ঝম্ ঝম ঝম কবি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাটয়া রণস্থল,
কাঁপাটয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে কবিল বঙ্গ বিজয়ঘোষণা।

মুচ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপব,
শোণিতে আবক্তকাষ,
অস্ত গেল ববি, হায।
অস্ত গেল যবনের গোববভাস্কব।

ইংলণ্ডেব বণজয় হইল—স্বর্ঘ্যাস্ত হটল
—কবি স্বর্গ্যকে সাক্ষী কবিষা নিজমনেব
কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু একপ
উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য,
আমাদিগেব বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট
নহে। চাইলড হেবল্ডে বাইবণ সচবাচব
এইকপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া
লোকমুখে কবিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেবল্ড
বর্ণন কাব্য, আব পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান
কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে,

পলাশির যুদ্ধ তাহা সাজে না। এই কাব্যে কাব্যের গতিবোধ করা কর্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতুগণের উৎসব, সিবাজ-দৌলার কাবাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ, বা বৃত্তসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা কবিতে চেষ্টা পা ইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল, কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুবাহুব বাহুস, বা অমাহু যিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত, সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেষ্টা ক্রমে বিচরণ কবিয়া, আপনাব অভিলাষ মত সৃষ্টি কবিতে পাবেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান কবিতে পাবেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সোভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমাধ্য ঘটনাবৈচিত্র্য সৃষ্টিবৈচিত্র্য, সম্বলিত করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ করেন নাই। বৃত্তসংহারে একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই এক খানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে,

নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মস্তমিচ্ছ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপত্রালীর সঙ্গে বাইরের লিপিপত্রালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চবিত্তের আল্পেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশেষণে দুইজনেই কিছু শক্তি আছে। নাটকের বাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে “যাত প্রতি-যাত”—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহাব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরের কবিতা তীব্রভেজস্বিনী জালাময়ী অগ্নিতুল্যা, বাজালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রভেজস্বিনী, জালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আল্পেষ গিণিনিকর, অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহাব বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নারকের প্রণয়বেগ বর্ণনা-চ্ছলে নাযককে যাহা বলাইয়াছেন, তাহাব নিজের কবিতাব বেগ এবং নবীন-বাবুর কবিতাব বেগসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of
flame.

I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain :
If changing cheek and scorching
vein,
Lips taught to writhe but not
complain,
If bursting heart, and madd'ning
brain,
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign*.

নবীন বাবুবুও যখন স্বদেশবাৎসল্য
স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রা
খিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও
গৈরিক নিষ্পত্তির ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে
রোদন, যদি আন্তরিক মর্শ্বেভেদী কাত-
রোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময়, সত্য-
প্রিয়তা, যদি দুর্জাসাপ্রার্থিত ক্রোধ,
দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই
দেশবাৎসল্য নবীন বাবুবু, এবং তাহার
অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ
হইয়াছে।

বাইরনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায়
অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরনের ন্যায়,

* The Giaour.

তাঁহারও শক্তি আছে, যে দুই চারিটি
কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ
করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ
ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু অনেক সম-
য়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া,
বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

গাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন
বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন
দিতে পাবি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার
বাইবণ বলিয়া পবিত্রিত করিতে পারি।
এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।
পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য
ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তাহাব্যয়ে
সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা
একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের
আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি।
যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে
ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ
করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির
আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বা-
ঙ্গালি জন্ম বুঝা।



রাধারাণী ।

১

রাধারাণী নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগেব অবস্থা পূর্বে ভালছিল—বড় মাহুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন স্ত্রীতির একটি মোকদমা হয়; সর্ব্বশ লইয়া মোকদমা; মোকদমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার স্ত্রীতি ডিক্রী জারি করিয়া, ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিভিকোলিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আব আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটারে আশ্রয় লইয়া, কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না,

বসিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাদিতে কাদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা বথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পরয়া পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাদিতে কাদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুখলধারে প্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নভাব মনে করিয়া তদগেহাও রাধারাণীর চক্ষুঃবারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাদিতে উঠিতেছিল—আবার কাদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী

বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া আসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারানী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকাবে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারানীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারানী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সে বলিল, “কে গা তুমি কাদ?”

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারানীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারানীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারানীর ক্ষুদ্র বুকটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারানী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,

“আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।”

সে পুরুষ বলিল, “তুমি কোথা গিয়াছিলে?”

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। কিন্তু অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, “তোমার বাড়ী কোথা?”

রাধারানী বলিল, “শ্রীরামপুর।”

সে ব্যক্তি বলিল, “আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।”

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারানীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারানীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল, যে রাধারানী বড় বালিকা। এখন রাধারানী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে আনিল, রাধারানী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোমার বয়স কত?”

রাধা। দশ এগার বছর—

“তোমার নাম কি?”

রাধা। রাধারানী

“হাঁ রাধারানী! তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?”

তখন সে, কথার কথায়, মিষ্ট কথাসুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল, যে মাতার পথের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে লইয়া গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণে বালিকার হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া আছে। তখন সে বলিল, “আমি একছড়া মালা খুঁজিতে ছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।”

রাধারানীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে আমাকে যে এত বয়স করিয়া, হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি

একরে ? তা, নহিলে, আমার মা যেতে
পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারানী, মালা, সমস্তি
ব্যাহারীকে দিল। সমস্তিব্যাহারী বলিল,
“ইহ ব দাম চারি পরস।—এই লও।”
সমস্তিব্যাহারী এষ্ট বলিয়া মূল্য দিল।
রাধারানী বলিল, “এ কি পরস।? এ যে
বড় ঠেক্চে।”

“ডবল পরস।—দেখিত্বে না দুইটা
নৈ দিই নাই।”

বাধা। তা এ যে অন্ধকারে চক্ চক্
কব্চ। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

“না। নূতন কলেব পরস।, তাই
চক চক্ কব্চে।”

বাধা। তা, আচ্ছা ঘবে গিয়া, প্রদীপ
জ্বলে যদি দেখি, যে পরস। নব, তখন
কিবাষ্টবা দিব। তোমাকে সেখানে একটু
দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পবে, তাহা বাধাবাণীর মা
কুটীরে, আসিয়া উপস্থিত হইল।
সে খানে গিয়া, রাধারানী বলিল, “তুমি
ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমবা আলো
আলিয়া দেখি টাকা কি পরস।।”

সঙ্গী বলিল, “আমি বাহিবে দাঁড়াইয়া
আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—
তার পর প্রদীপ আলিও।”

রাধারানী বলিল, “আমাব আর কা-
পড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে
দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে
মর্দন। থাকি, আমার ব্যামো হয় না।

আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি
দাঁড়াও আমি আলো আলি।”

“আচ্ছা।”

ঘরে টেবল ছিল না, সুতরাং চালের
খড় পাড়িয়া, চক্ মকি ঠুকিয়া, আশুণ
আলিতে হইল। আশুণ আলিতে কালে
কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো
আলিয়া, রাধাবাণী দেখিল, টাকা বটে,
পরস। নহে।

তখন রাধাবাণী বাহিবে আসিয়া
আলো ধরিয়া তন্নাস করিয়া দেখিল, যে
টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধাবাণী তখন বিষমবদনে, সকল
কথা। তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে
চাহিয়া বহিল—সকাতবে বলিল—“মা।
এখন কি হবে।”

মা বলিল, “কি হবে বাছা। সে কি
আব না জেনে টাকা দিয়াছে। সে দাতা,
আমাদের হুখে শুনিয়া দান করিয়াছে—
আমবাও ভিখারী হইয়াছি—দানগ্রহণ
করিয়া খবচ কবি।”

তাহা এইরূপ কথাবার্তা কহিতে-
ছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া তাহাদের
কুটীরে আগত ঠেলিয়া বড় শোর গোল
উপস্থিত করিল। রাধাবাণী দ্বার খুলিয়া
দিল—মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই
বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন।
পোড়া কপাল। তিনি কেন? পোড়ার
মুখে কাপুড়ে মিন্সে!

রাধাবাণীর মার কুটীর, বাবারের
অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিক-

টেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—সেই পোড়ার মুখো কাপড়ে মিলে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপূবে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন বাব খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল “রাধারাণী এই কাপড়।”

রাধারাণী বলিল, “ওমা! আমার কিসের কাপড়!”

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ার মুখো কি না, তাহা আমবা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, “কেন, এই যে এক বাব এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল, যে এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এসো।”

রাধারাণী তখন বলিল, “ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁগা, পদ্মলোচন!”—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বাব আনা, আর দুই আনা মুনকা লইয়া ছিলেন—

“হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবটিকে চেন?” পদ্মলোচন বলিল, “তোমবা চেন না?”

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম। আমি চিনি না।

যাহা হোক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনকা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনার বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিবিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গা ইষামাব পথ্যেব উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া, প্রদীপ জালিল। মাব জন্য ব্যক্তিষ্কিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিদ্বার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে স্বর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—“এ কি মা!”

মা, দেখিয়া বলিল—একখানা নোট!

রাধারাণী বলিল, “তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।”

মা, বলিলেন, “হাঁ। তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে “রাধারাণীর জন্য।”

রাধারাণী বলিল, “হাঁ মা, এমন লোক কে মা!”

মা বলিলেন, “তাহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম কল্পীকুমার রায়।”

পরদিন, মাতার কন্যার, কল্পীকুমার ব্যয়েব অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু

ত্রিপুরাপুরে, বা নিকটবর্তী কোনখানে
কল্পিনীকুমার রায়, কেহ আছে, এমন
কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি
তাহারা ভাঙাইল না—ভুলিয়া রাখিল—
তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

২

রাধারাণীর মাতা পথ্য কবিলেন বটে,
কিন্তু সে বোগহইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁ-
হার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয়
ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়া
ছিলেম; এই শারীরিক এবং মানসিক
দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। বোগ
ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া, তাঁহাব শেষকাল
উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে, বিলাত হইতে সম্বাদ
আসিল যে প্রিবি কোমিলেব আপীলে
তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি
আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়া-
শিংহিলার টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং
তিনি আদালতের খবচা পাইবেন।
কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহাব পক্ষে হাই-
কোর্টে উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই
সম্বাদ লইয়া রাধারাণীর মাতাব কুটীরে
উপস্থিত হইলেন। সুসম্বাদ শুনিয়া,
কুণ্ডার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সম্বরণ কবিয়া কামাখ্যা
বাবুকে বলিলেন, “যে প্রদীপ নিবিয়াছে,
তাহাতে তৈল দিলে কি হইবে? আপ-
নার এ সুসম্বাদেও আমার আব প্রাণরক্ষা
হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

তবে আমার এই ছুখ, হে রাধারাণী
আর অমাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না।
তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার
এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল
আপনিই ভরসা। আপনি, আমার এই
অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন
—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব?”

কামাখ্যাবাবু অতি ভক্ত লোক। এবং
তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন।
রাধারাণীর মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইলে,
তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন,
যে যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়,
অন্ততঃ ততদিন তোমবা আনিয়া আমার
গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার
মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা
তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরি-
শেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক
সাহায্য করিতে চাহিলেন। “আমাব
এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক
হইলে চাহিয়া লইব।” এইরূপ মিথ্যা
কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য
গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। কল্পিনী
কুমারের দান গ্রহণ, তাঁহাদিগের প্রথম
ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বৃষ্টিতে পারেন
নাই, যে তাঁহাবা একরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া-
ছেন। দশা দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু
অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধা-
রাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে
ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও
কাতর হইলেন। বলিলেন,

“আপনি আশা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব।”

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, “আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার স্বত্ত্বের মধ্যার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কত্নার স্ত্রায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।”

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কত্নার অধিক যত্ন করিব। আমি কাষমনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।”

যিনি মুম্বু তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আশ্রদের হাসি হাসিলেন। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর ঝিটিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ কবিতা অগুরোধ করিলেন, যে এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্রজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুত-

রাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সমস্তে নিম্নালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন বক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপর্যুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাঁহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের অধীনে আনিবার জন্ত বহু পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা কবিলেন, আমি রাধারাণীর জন্ত গন্তদুব করিব, সরকারি কর্ত্তাচারিগণ ততদূর কবিলেন না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে, কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধাণা করিতে লাগিলেন।

যাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্য-বিবাহে তাঁহার ঘৃণ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে কবে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর

বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিতা করিলেন।

৩

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারানী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অস্থঃপুংসমূহে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারানীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবু ইচ্ছা, রাধারানীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তবু জানিবার জন্য আপনার কন্যা, বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে, রাধারানীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত, সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,

“রুশ্বিনীকুমার বার কেহ আছে?”

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “না। তা ত জানি না। কেন?”

বসন্ত বলিল, “রাধারানী রুশ্বিনীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।”

কামাখ্যা। সে কি? রাধারানীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কিপ্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাজের বিবরণ সবিস্তারে রাধারানীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা

বাবু রুশ্বিনীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

“রাধারানীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারানী একটি মহা স্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অহুসারে কর্তব্য নহে। রুশ্বিনীকুমারের নিকট রাধারানীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রতাপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুশ্বিনীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানি না। তাহার পরিবার সম্বানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুশ্বিনীকুমার বিবাহ করিবাবই বা সম্ভাবনা কি?”

বসন্ত বলিল, “সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারানী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সে সেই রাশিঅবধি, রুশ্বিনীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারানী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যাহ মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারানী আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারানী রুশ্বিনীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আব কেহ রাধারানীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।”

কামাখ্যাবাবু মনে মনে বলিলেন, “বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যিক। কিন্তু

প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, কল্পিনীকুমারের সন্ধান করা।”

কামাখ্যাবাবু, কল্পিনীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতার তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু বর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশেই আপনাব মোরাকেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সন্বাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

“বাবু কল্পিনীকুমার রাঘ, নিম্ন স্বাক্ষর কাব্যী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন— বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঠিকাত্তে কল্পিনী বাবু সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কাবণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রীহিত্যাদি—”

কিন্তু কিছুতেই কল্পিনীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসব গেল, তথাপি কই, কল্পিনীকুমার ত আসিল না।

ইহাব পর, রাধাবাণীর আব একটি ঘোবতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধাবাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাভূতা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলেন, মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর আত্মাদির পর, রাধাবাণী, আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু, রাধাবাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লটরাই, রাধাবাণী প্রথম মেই ছই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন, যে এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে, একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হোক—“কল্পিনীকুমারের প্রসাদ।”

গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তত্বাত্তে কে কণা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধাবাণীর মাতা দাখিরাবস্তার নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্রীবামপুরে কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দবিত্ত হইলে, সেগ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজগ্রাম শ্রীবামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমবা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধাবাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধাবাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

৪

ছই এক বৎসব পরে, একজন ভদ্র লোক, সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসব। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই “কল্পিনীকুমারের প্রসাদের”

বারে আসিরা দাড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একাহার বাড়ী?”

তাহারা বলিল, “একাহারও বাড়ী নহে। এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে “রুক্মণীকুমারের প্রসাদ বলে।”

অগস্ত্যক বলিলেন, “আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পাবি?”

রক্ষকগণ বলিল, “দীন দুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনার্যাসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?”

দর্শক ভিতবে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলিলেন,

“বন্দবস্ত দেখিয়া, আমার বড় আ-
হ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নচ্ছত্র
দিয়াছে? রুক্মণীকুমার কি, তাঁহার নাম?”

রক্ষকেরা বলিল, “শ্রীমতী রাধারানী
দাসী এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছেন।”

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে
ইহাকে রুক্মণীকুমারের প্রসাদ বলে
কেন?”

রক্ষকেবা বলিল, “তাহা আমবা কেহ
জানি না।”

“রুক্মণীকুমার কার নাম?”

“কাহারও নয়।”

“যে রাধারানী দাসীর নাম করিলে,
তাঁহার নিবাস কোথায়?”

রক্ষকেরা, সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টা-
লিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,
“তোমরা বলিতে পার, এই রাধারানী
সধবা না বিধবা?”

উত্তর “সধবাও নন—বিধবাও নন—
উনি বিবাহ করেন নাই। বড় মাহুষেব
মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ
দিবে?”

প্রশ্ন—“উনি পুরুষ মাহুষেব সাক্ষাতে
বাহিব হইরা থাকেন? রাগ করিও না
—এখন অনেক বড় মাহুষের মেয়ে মেন
লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে,
এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

বক্ষকেরা উত্তর কবিল—“ইনি সেরূপ
চরিত্রেব নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির
হন না।”

প্রশ্নকর্তা ধীবেৎ রাধারানীর অট্টালি-
কার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ
করিলেন।

ক্রমশঃ



রাধারাণী।

৫

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পবিচ্ছদ সচরাচর বাস্তালি ভল্ললোকের মত, বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটা হীরকাসুবীর ছিল, তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্মকাবকগণ অবাক হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া বহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্ত তাহারা জিজ্ঞাসা কবিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল বাবু সন্ন্যাস পবিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পবিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ান্জিব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানিপত্র দিলেন, বলিলেন,

“এই পত্র আপনাব মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।”

দেওয়ান্জি বলিলেন, “আমার মুনিব জীলোক, অবিবাহিতা, আবার অন্নবরদ্ধা। এজন্য তিনি নিরস কবিয়াছেন, যে কোন অপবিচিত্র লোকে পত্র আনিলে, আমবা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।”

আগন্তক বলিল, “আপনি পড়ুন।”

দেওয়ান্জি পত্র পড়িলেন—

“প্রিয় ভগিনি।

“এব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কবিও—ভয় কবিও না। যেমতং ঘটে আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।”

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আব কিছু বলিল না—পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্র-বাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক জুস-জ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ কবিল। দেখিয়া, একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তককে নিরীক্ষণ কবিতে লাগিল। দেখিল, যে তাঁহার বর্ণটুকু গোব—ক্ষুটিত মল্লিকাবাশির মত গোব; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, এবং স্নেহং সুল; কপাল দীর্ঘ; অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুবর্ণিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু, বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ক্রয়ুগ, সূক্ষ্ম, ঘন, দৃব্যত, এবং নিবিড়কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর বক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, এবং কোমল; গ্রীবা, দীর্ঘ, অধচ্চ মাংসল; অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি

ভক্ত, স্বগতিত, এবং একটি বৃহদাকাব হীৰকে রঞ্জিত। পবিত্রাঙ্গিকা মনেঃ বাসনা করিল যে যদি কোন পুরুষ জন আমাদেব যুনিব হন, তবে যেন ইনিই হয়েন।

বাধারানী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাবিদায় কবিতা দিলেন। বাধারানী আসিবামাত্র দর্শকেব বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপেব আলোকে তাঁহার মস্তকেব কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তকেব উচিত প্রথম কণা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বহিলেন। বাধাবানী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

“আপনি একপ গোপনে আমাব সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ কবিতাছেন কেন? আমি জীলোক, কেবল বসন্তের অমুবোধেই আমি ইহা স্বীকার কবিতাছি।”

আগন্তক বলিল, “আমি আপনাব সহিত একপ সাক্ষাতেব অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।”

রাধাবানী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য একপ অমুবোধ কবিতাছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয় আপনি জ্ঞানেন।”

আগন্তক, একখানি অতিপুৰাতন সন্ধানপত্র বাহিব কবিতা তাহা বাধাবানীকে দেখাইলেন। রাধাবানী পড়িলেন;

কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত কল্পিনীকুমারের সেই বিজ্ঞাপন! রাধাবানী, দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়াই নারিকেল পত্রের ভাষা কপিতে লাগিলেন। আগন্তকের দেবতুল্য পঠন দেখিয়া, যেন ভাবিলেন, ইনিই আমাব সেই কল্পিনীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা কবিতা বলিলেন, “আপনাব নাম কি কল্পিনীকুমার বাবু।”

আগন্তক বলিলেন, “না।” “না” শব্দ শুনিয়াই, বাধাবানী, ধীরেঃ আসন গ্রহণ কবিলেন। আব দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাবিয়াগেল। আগন্তক বলিলেন, “না। আমি যদি কল্পিনীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমাব পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।”

বাধাবানী বলিল, “যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনব কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?”

উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট মণ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাতরে আপনার নামটি গোপন কবিতা কাল্পনিক নাম ব্যবহার কবিতাম। কাল্পনিক নামটি

কল্পিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হই-
তেছেন কেন ?”

বাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগ-
তক বলিতে লাগিলেন—“যথার্থ কল্পিণী
কুন্ডাব নামধৰে, এমন কাহাকেও চিনি
না। যদি কেহ আমারই তল্লাস কবিতা
থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি
জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি
তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর
কাছে আসিতে সাহস হইল না।”

“পরে?”

“পবে কামাখ্যা বাবুর শ্রদ্ধে তাঁহার
পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্ৰণ করিল, কিন্তু
আমি কার্যগতিকে আসিতে পারি নাই।
সম্প্রতি সেই ক্রটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য
তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিয়াছিলাম।
কৌতুক বশতঃ বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনিয়া-
ছিলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে উহার কথা উত্থা-
পন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে
জিজ্ঞাসা কবিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন
দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র
বলিলেন, যে বাধারাণীর অনুবোধে।
আমিও এক বাধারাণীকে চিনি গাম—এক
বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে
আব ভুলিতে পারিলাম না। যে মাতার
পথের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া
বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার
বৃষ্টিতে—” বাক্য আব কথা কহিতে পারি
লেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল।
রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল।
চক্ষু মুছিয়া বাধারাণী বলিল,

“সে পোড়ারমুখীর কথার এখন
প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।”

আগতক উত্তর কবিলেন, “তাঁহাকে
গালি দিবেন না। যদি সংসারে কেহ
সোনারমুখী থাকে, তবে সেই বাধারাণী।
যদি কাহাকে পবিত্র সবলচিত্ত, এ সং-
সারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেট
বাধারাণী। যদি কাহারও কথায় অমৃত
থাকে, তবে সেই বাধারাণী—যথার্থ অ-
মৃত! বর্ণে অঙ্গবাব বিনা বাজে, যেন
কথা কহিতে বাধে কবে, অথচ সকল
কথা, পবিত্রাব স্মৃদ্যব,—অতি সবল!
আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন
কথা কখনও শুনি নাই।”

কল্পিণীকুমার—এক্ষণে ইহাকে কল্পি-
ণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে
বলিলেন, “আবাব আজবুই তেমনি
কথা শুনিতেছি।”

কল্পিণীকুমার মনে ভাবিতেছিলেন,
আজি এতদিন হইল, সেই বালিকার
বর্ণনাব শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজিও সে
কণ্ঠ আমার মনেব ভিতব জাগিতেছে।
যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই
বাধারাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেট
বাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই
কি সেই? আমি মূৰ্খ! কোথায় সেই দীন-
হৃৎখিনী কুটারবাসিনী ভিখারিণী, আর
কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ই-
ন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে
ভালকবিতা দেখিতে পাই নাই, স্মরণে
জানি না যে সে স্নানবী কি কুৎসিতা,

কিন্তু এই শটানিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অভূতপ্রবণে রুঞ্জিনীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন নন্দন-কানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় গ্রীত হইয়াছে? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া, হৃদয়েব ভিতবে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকাণ্ডে জানিলে?

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আব এমন আছে কি? এই সঙ্গাগরা নগনদীচিত্রিতা জীবসঙ্কলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্ত অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ত্রীড়াময়, এমন আব আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে অভিনব মধুবিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্তপরিচিত, চিরস্থিত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, কখন আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেন না চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, “তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।”

হাঁ গা এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বশ্ব! চিববাহিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে “হাঁ গা সেই রাধারাণী পোড়ার-মুখী তোমার কে হয় গা” বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচজন, রসিকা, প্রেমিকা, বাক্ চতুবা, বয়োধিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আচ্ছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ বাধারাণী কেমন করো এমন করো কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে একটু পরিতাপ করিল, কেন না কথাটা একটু ভৎসনার মত হইল। রুঞ্জিনীকুমার একটু অপ্ৰতিভ হইয়া বলিলেন,

“তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিলাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অঙ্গকার রাতে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা

হইল, যে যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!”

“তোমার রাধারাণী!” রাধারাণী ছল ধরিয়া হাসিল।

হাঁ গা, না হেসে কি থাকি যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নও মনে ছল ধরিল—
“তুমি হইয়াছি—আপনি নই।” প্রকাশ্যে বলিল, “আমাবই রাধারাণী। আমি একবারি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।”

রাধারাণী বলিল, “হোক, আপনারই রাধারাণী।”

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তাবে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ের কন্যা।’ যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়া-পীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্ধান করিয়াছিলেন শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয়, ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘কেন

রাধারাণী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পাবেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন, যে ‘এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন। স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।’ আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ কবিয়াছি কি?”

রাধারাণী বলিল, “করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি, যে আপনি মহাত্মনে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে তাহা আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিতে বলিতে পারি না। হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া বাইবে কি না?”

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন কেবল নিজদত্ত অর্ধ-বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন,

“এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখি-
যে যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া লান না।”

থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিও কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না আপনাকে দয়ার লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেক্ষেপে দয়াজ্ঞচিত হইতেন, তাহাহইলে, আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাকে অমন চক্ষুশাপরা দেখিবা অবস্থা তাহার কিছু আমুকুলা কবিতেন। কই, আমুকুলা কবাব কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?”

কঞ্জীকুমার বলিলেন, “আমুকুলা বিশেষ কিছুই কবিতো পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপথে বথ দেখিতে আসিবা ছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পাবে, এত জন্য ছদ্মবেশে কঞ্জীকুমার বাথ পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাধে রূড বৃষ্টি হওবার বোটের থাকিত সাহস না করিবা একা তটে উঠিবা আসিবাছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিবা উভাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিবাছিলাম, কিন্তু সেই বাক্স আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইবা তখনই আমাকে কাশী ঘাইতে হইল। পিতা অনেক দিন কয় হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসবাধিক বিলম্ব হইল। বৎসব পবে আমি কিবিয়া আসিবা আবার সেই কুটারেব সন্ধান করিলাম—

বা। আপনি রাধারাণীকে খেঁচপ ভাল বাসেন দেখিতেছি, তাহার কাবল জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। জীলোক অমন ব্যস্ত হইয়াই থাক। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয় সে বপেব দিন নিবাসবে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটারেই আশ্রয় লইতে হইয়া ছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?”

ক। অবিকল নহে। আমি যাহা রাধারাণী হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখি বাব ভায়া, বাবাব গী আলো আলিতে গল—আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিবা আসিলাম।

বাধা। আর কি দিবা আসিলেন?
ক। আর কি দিব? একখানা ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটারে রাখিবা আসি লান।

বাধা। আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে। আসিতেছি। একটু অপেক্ষা করুন।

সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি বস্ত্র রাখিবাছিল—তাহা বাহির করিবা আনিল। আসিবা বলিল,

“নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে কবিতো পাবে, আপনি নোটখানি হারাইরা গিয়া ছেন।”

ক। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, “রাধারানীর জন্য।” তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, “রুক্ষ্মীকুমার রায়।” যদি সেই রুক্ষ্মীকুমারকে সেই রাধারানী আশ্রয়ণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়া ছিলান।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যে আপনার ত্রীচরণ দর্শন জন্য এত কাতরা তাহাকে এত দিন দেণা দেন নাট কেন? সেই রাধারানী সেই রুক্ষ্মীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এটা দেখুন।

এই বলিয়া রাধারানী সেই নোটখানি রুক্ষ্মীকুমারের হাতে দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, “প্রভু, সে দিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে। এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।”

৬

রাধারানী যুক্তকরে বলিলেন, “আপনি বলিয়াছেন, আপনার যথার্থ নাম রুক্ষ্মীকুমার নহে। আমি বাঁহাকে আরাধ্য দেবতা মনে করি, তাহার নাম জানিতে বড় ইচ্ছা করে।”

রুক্ষ্মীকুমার বলিলেন, “আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।”

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনিয়াছি।

ক। লোকে অমন সকলকেই রাজা

বলে। কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেই আমার বখেটে সম্মান হয়।

রাধা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল; আপনি আমার সঙ্গতীষ জানিয়া, স্পষ্ট হইতেছে যে, আপনাকে আজি আমার অতিথ্য স্বীকার করিতে বলি।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “আমি না ভোজন করিয়া তোমার বাড়ী হইতে যাউব না।”

রাধারানীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাসময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারানী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারানী বলিলেন,

“বহুদিন হইতে আমার প্রত্যাশা ছিল যে একদিন না একদিন আপনার দর্শন লাভ করিয়া আপনার পূজা করিব। কিছু পুস্তক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই হারছড়াটি অতি সামান্য, কিন্তু আমি দিয়াছি বলিয়া রানীজি যদি ব্যবহার করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।” এই বলিয়া, রাধারানী এক মহামূল্য বহুশত বৃহদাকার হীরকখচিত, গ্রন্থিত নক্ষত্রমালা তুল্য প্রভাশালী, হার বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন

“রানীজি? রানীজি কেহ নাই। দশ-বৎসর হইল আমার পরিবার গীত হইয়াছেন। আর আমি বিবাহ করি নাই।”

রাধারানীর মাথা গুরিয়াগেল। বহুকষ্টে,

মন স্থির রাখিয়া—মন ঠিক স্থির বহিল,
কণা স্তনিধা এমনও বোপ হয় না—
রাধাবানী বলিল,

“যাচা আপনার জন্য গড়াইয়াছি,
তাচা আপনাকেই গ্রহণ কবিতে হইবে।
অনুমতি কবেন ত ও হাব আপনাকেই
পবাইয়া দিই।”

এই বলিয়া রাধাবানী হাসিতে সৈত
নক্সমালা তুল্য হাব দেবেজ্ঞনাবাণেব
গলার পবাইয়া দিল। দেবেজ্ঞনারাণ
আপনাকে এইরূপ সজ্জিত দেখিবা হা
সিতে লাগিলেন। বলিলেন,

“এহাব আমাবই হইল?”

রাধা। যদি গ্রহণ কবেন।

দে। গ্রহণ কবিলাম। এখন আমাব
বজ্ঞ আমি বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে
পারি?

বা। যাহা আপনার যোগ্য নহে, তাহা
অন্যকে দান কবাই বাজাদিগেব বীতি।

দে। এ হাব আমাব যোগ্য নহে—
অথবা আমি ইহাব যোগ্য নহি। তুমিই
ইহাব যোগ্য—তোমাকেই এ হাব দান
কবিলাম।

এই বলিয়া দেবেজ্ঞনাবাণ সৈত হাব,
রাধাবানীর গলার পবাইয়া দিলেন।

রাধাবানী অসন্তুষ্ট হইল না। মুখনত
করিয়া, মৃদু হাসিতে লাগিল, এক

বার মুখ তুলিয়া দেবেজ্ঞনাবাণেব মুখ-
পানে চাহিতে লাগিল। দেবেজ্ঞনাবা
বণ বুঝিলেন। বলিলেন,

“আমি ওহাঙ্গ লইব না, তাই তোমায
দিলাম। আমায অন্য একছড়া দাও?”

রাধা। কোনছড়া?

দেবেজ্ঞ বলিলেন, “তোমায গলায
যে ছড়া আগে হইতে আছে।”

রাধাবানী পবিচাবিকাকে ডাকিয়া বলি
লেন, “চিত্রে, ওখানে আছিস কি?”

চিত্রা, অন্তবাল হইতে দেখিতেছিল।
বলিল, “আছি।”

রাধাবানী বলিলেন, “তোব শাঁকটা
কোথা?”

চিত্রা বলিল, “এইখানে আছে।”

রাধা। তবে বাজা।

এই বলিয়া রাধাবানী, আপনার নি-
জের হাব, গলা হইতে খুলিবা, দেবেজ্ঞ-
নাবাণকে পবাইয়া দিলেন।

চিত্রা, উচ্চবেবে শাঁক বাজাইল।

তারপর বীভিষত বিবাহ হইল কি?
হইল বৈকি। বসন্ত আসিল, তাহার
ভাইয়েবা আসিল, রাজা দেবেজ্ঞের কত
লোক আসিল—কিন্তু অত কথা আর
তোমায গুনে কাজ নাই।

সমাপ্ত।



চৈতন্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যা বিলাস

এক্ষণে চৈতন্য নবযৌবনে* পদার্পণ কবিলেন। শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকসিত-প্রায় হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ কবিল। মনের বৃত্তি সমুদয় প্রস্ফুটিত হইয়া সতেজ হইল। নবীন উৎসাহ ও বলে মন বলশালী হইল। কল্পনা ভবিষ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র গঠন করিয়া নানাবর্ণে বিভূষিত করিল। আশা ভরসা ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে প্রধাবিত হইল। চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন ও একাগ্রতাসহ বিদ্যোপার্জন করিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে সার্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত হইলেন। হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর। রত্নদিন বিদ্যাভ্যাস নাহি অবসর ॥ উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদেশের নাথ। পড়িতে চলেন সর্বশিষ্য করি সাপ ॥ আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসেব সভায়। পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু কবেন সদায় ॥

প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন। আসিয়া খণ্ডক দেখি আমার স্থাপন ॥ অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্থ হয়। যেবা জানে তার ঠাই পুথি না চিন্তায় ॥

* শ্রীগৌরান্ধ সুন্দর বেশ মদন মোহন। বোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন ॥

চৈতন্য ভাগবত ৬২ পৃ।

মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি চতুষ্পাঠীর অন্মাত্ত শিষ্যগণ চৈতন্যের ব্যাকরণের শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল। এবং যদিও চৈতন্য সমপাঠী ছিলেন, তথাপি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাই। এমত সুবুদ্ধি সর্ব নবদ্বীপে নাই ॥

চৈতন্যভাগবতে মুরারি গুপ্তের উক্তি।

সমপাঠীদিগের প্রশংসাবাদে চৈতন্যের কণ বধির হইল এবং অহঙ্কারে মত্তিক ঘুবিয়া গেল। চৈতন্য ইহাদিগের কতিপয়কে লইয়া মুকুন্দ সঙ্ঘের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিলেন। এই নবীন চতুষ্পাঠীতে নবদ্বীপবাসী আরও অনেকে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

চৈতন্য কিরূপে সমপাঠীদিগের উপর এতাদৃশ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সূতরাং বোধ হয় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্ঞান প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। চৈতন্য ভাগবত † ও চৈতন্য চরিতা-

† চৈতন্যের প্রতি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের উপদেশ। “তোমার পিতা পিতামহ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন তুমিও বিদ্যোপার্জন কর।”

মৃতেরঃ কোনকোন স্থলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

মহুয়া যাহা সৰ্কুদা দেখে, প্রায় তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন অতৃতপূৰ্ব্ব ঘটনা দেখিলে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাবত্তা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা সেরূপ নহে। চৈতন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য ও মানসিক বৃত্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। চৈতন্য জন্ম হইতে মহাপুরুষ। আবার বাল্যকাল হইতে মনোবৃত্তির বিচালন হওয়ার তাঁচান স্বাভাবিক তেজস্বিতা আৰু বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং এষ্ট অলোকসামান্য প্রতিভার তেজে তাঁহাদের মন যে বিমোচিত ও ইতি-কৰ্ত্তব্য-সিদ্ধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আডাম স্মিথ* বলেন

‡ দিগ্বিজয়ী সহিত চৈতন্যের কণোপকথনে চৈতন্য স্বয়ং অনভিজ্ঞতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রাথমে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করেন।

† জন্মকালে মানসিক ক্ষমতার তাৎপর্য্য থাকে। কার্লাইল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ইবিষয় স্বীকার করেন। অস্বদেশীয় ভাগবত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরও এই মত। বস্তুতঃ সংসারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা মানসিক ক্ষমতার নৈসর্গিক তারতম্য দেখিতে পাই।

* *Theory of Moral Sentiments.*

অসাধারণ গুণ অথবা বিভবসম্পন্ন লোক দেখিলে আমরা হতজ্ঞান হইয়া, অনজ্ঞোদ্দেশ্যে তাহার নিকট নতশির হই। ইহা মহুয্যের নৈসর্গিক, ধর্ম এই জন্যই পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ একজীবনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে জন্য কার্লাইল মহম্মদের ভক্ত, মিস কব পার্কারের ভক্ত উনবিংশ শতাব্দীর দর্শনসমাজ কোমতের ভক্ত, সেই কারণে চৈতন্যের সমপাঠী-সম্প্রদায়ও তাঁহার ভক্ত ও তাঁহার অপূর্ণতাতে অন্ধ।

চতুর্পাঠী সংস্থাপন হইলে চৈতন্য একমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন, অনন্যমনা হইয়া একমাত্র বিদ্যাপ্রসারণ হইলেন। দিনে দিনে নবরূপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। এষ্ট সময়ে চৈতন্য জ্ঞানোপার্জনই জীবনের মুখ্য কার্য্য ভাবিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সভাজয়, দিগ্বিজয় প্রভৃতি, কল্পনার বা মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিতের জন্মপরিগ্রহ দেখিয়া ব্যর্থপন নাই হুঃখিত হইলেন।

দেখি বিশ্বস্তর রূপ সকল বৈকুণ্ঠ।

ইবিষ বিষাদমনে ভাবে নিরস্তর ॥

হেন দিব্য শরীরে না হয় কুরুল।

কি করিবে বিদ্যার করিলে কাল বশ ॥

চৈতন্যের মনে কি এপর্যন্ত ধর্ম্যভাব সঞ্চারিত হয় নাই? বৈষ্ণবগৃহকারেরা “হেন দিবা শরীরে না হয় কক্ষরস” এই চরণ বারা স্পষ্টতঃ হয় নাই বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে “পাষাণী দেখে যেন যমের সমান” এই চরণ বারা চৈতন্যের তাত্‌কালিক ধর্মের প্রতি আস্থা স্বীকার করিয়াছেন। আগল শেষমন্তেরই পক্ষপাতী, এবিষয় উত্তরোত্তর এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। তবে এই মাত্র বোধ হয় বালস্বভাব চৈতন্যের পরিণতবয়স্ক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ছিল না; বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার সমধিক সহানুভূতি ছিল এতাবৎ ধর্মের উপর একান্তস্বদনে যত্ন ও আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

একদা একজন দ্বিধিজয়ী বহু দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী জয় করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। চৈতন্য এতাবৎ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন এবাক্তি নিতান্ত সাংসারিক জ্ঞানশূন্য অন্যথা দ্বিধিজয় করিতে নবদ্বীপ আসিবে কেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্ব্বাপহরণ* করিবে। চৈতন্য এই চিন্তায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এবং একদা সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিধিজয়ী তথার উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার নাম ও বিদ্যাবস্তা পূর্বেই শ্রবণ করিয়া

* পূর্বেকালে দ্বিধিজয়িগণ প্রতিশ্রুত হইত পরাস্ত হইলে সর্ব্ব্বদিব।

ছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র সাধার সম্ভাষণে বসিতে অমুরোধ করিলেন। এক্ষণে পরে চৈতন্য দ্বিধিজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তম্ভ পাঠ করিতে অমুরোধ করিলেন। দ্বিধিজয়ী গঙ্গার স্তম্ভ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যার দোষা-রোপ করিলেন। দ্বিধিজয়ী চৈতন্যের আপত্তি বখাখায়াত্ব করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। এইরূপে যত প্রস্তাব উপস্থিত হইল দ্বিধিজয়ী চৈতন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ হাসিতে উদ্‌যত হইলে, চৈতন্য ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। কোমলহৃদয় চৈতন্য দ্বিধিজয়ীকে মনঃক্লান্ত দেখিয়া যারপর নাই অমৃতপ্ত হইলেন এবং নানারূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কণ্ঠে প্রফুল্লচিত্ত করিলেন। দ্বিধিজয়ীকে জয় করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইলেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে আসিয়া পরাস্ত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন চৈতন্য সকল পণ্ডিতকে জয় করিলেন। আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি না, যে হেতু তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অধিকার রঘুনাথ শিরোমণির তুল্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তুল্য থাকার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মবিষয়ে একাধিপত্য করিয়াছেন উপ-

† চৈতন্যচরিতামৃত ১ম খণ্ড।

চৈতন্য মঙ্গল।

রোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ও দর্শন ও স্বতিতে তরুণ করিয়াছিলেন ।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, দ্বিধিজরী পরাভূত হইয়া একদিন নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, বাগ্‌দেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন “তুমি যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ সে মথুরা নহে, অখিলনাথ । বিপ্রবর শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া চৈতন্যের নিকট আসিয়া গলবস্ত্রে নানারূপ স্তব-স্ততি করিতে লাগিলেন । একথা সত্য হউক বা নাহউক দ্বিধিজরী “গৌড়, তিরহত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, লাহোর, কাঞ্চিপুুরী হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড়ু প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া যে একজন বালকের নিকট পরাভূত হইলেন, তাহাকে অলোকসামান্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? চৈতন্য দ্বিধিজরীকে বলিলেন বুধা বিদ্যাবলে মোক্ষ হইবে না, তুমি যাবজ্জীবন কৃষ্ণের চরণ সেবা কর ।

বাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয় ।

তাবত সেবহ কৃষ্ণ কবিতা নিশ্চয় ॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ।

কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি মনোবৃত্তি রয় ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

ধর্ম্মভাবের অঙ্গুর

বালকের কোমল মন আর্জ মৃত্তিকাবৎ,
যে রূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে । যাহা

দেখে তাহারই অমুকরণ করে—তাব সংসর্গগুণে তাহারই হৃদয়ে বিদ্ধ হয় । বহুদর্শন নাই । জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প । পক্ষান্তরে মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না । বহুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সর্বদা আন্দোলিত হয় । বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জিত নহে । বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত না হইলে, প্রায় কার্য্য করিতে পারে না । সংসারে কে না দেখিয়াছেন মার্জিতবুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্য বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্তু কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে । এই জন্যই অপরিণতবয়স্ক বালক কল্পনা-পরায়ণ । তাব সংসর্গগুণে যাহা মনো-মধ্যে বিদ্ধ হয় কল্পনা তাহা লইয়া সর্বদা ক্রীড়া করে । নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নির্মাণ করে । কতবার নির্জ্ঞান প্রান্তরের হরিৎবর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্ত শরীরে মায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত সুখের চিত্র আঁকে । কতবার নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া নদীর মধুমাখা সঙ্গীত রব শ্রবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত দূরগত সুখবৎ গুনিতে পার । কত বার গভীর রজনীতে নিদ্রিত হইলে, কল্পনা কত মনোহর চিত্র দেখিতে পার । কালে যুবক এই বিষয়ে একেবারে তন্ময় প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন । নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না করিয়া দিলে, কদাপি ক্ষম্যক্ষম করিতে পারেন না। যখন সেই করুণা পারলৌকিক সুখ সহ যুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কদাপি তদনুসরণ জীবদ্দশাতে ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এজীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের জ্ঞান অল্প পথাবলম্বী তাদৃশ বন্ধপরিকর হয় না। কলম্বস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কারের ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথর জীবন থাকিতে পোপের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যের করুণা ধর্ম্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বঙ্ক + বলেন “আমার কার্যের জন্য আমি অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।” বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়গণ স্বাধীনতা-প্রিয়, বারাক্ষণাভ্যাস অলীক হাস্য কৌতুক প্রিয় সর্বদেশীয় কামিনীবৃন্দ বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজন্যই যেমন মিলের তনয় জন মিল দর্শনাসক্ত এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ পরম বিজ্ঞভক্ত ও সংসারে গতিরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের ধর্ম্মানুসরণ দেখিয়া চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সার, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর

† Buckle's History of Civilisation, Vol. I.

ভোগ সুখাপেক্ষা অশেষগুণে প্রার্থনীয়। ধর্ম্মজনিত সুখ নিত্য আর বিলাসসুখ অনিত্য। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন ধর্ম্মের জন্য জোষ্ঠ ইহলোকের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রণাপেক্ষা প্রিয় জনক জননী ত্যাগ করিয়া, সংসারের বিলাস-বাগনা ভোগ ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তিব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কবিরাজ হইলেন, তখন তাঁহার মন ধর্ম্ম চিন্তায় অবশ্যই বিচলিত হইয়াছিল। যদিও জনক জননী অপত্য বিবাহ জনিত অসহ যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাহাব কারণ ধর্ম্মের উপর কণ্ঠিক গতিরাগ হইয়াছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে অগ্রজের সন্ন্যাস তাঁহার মনে সংসারের ভোগবাসনা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল। তবে তাহা দীর্ঘ কালে অক্ষুণ্ণ হইয়া পুষ্ট হয়।

চৈতন্য পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন “আনি চিরদিন আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চরণ সেবা করিব।”

এই সকল ঘটনা বশতঃ চৈতন্য বাল্য কাল হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল প্রথম যৌবনে জ্ঞানচর্চায় মনোভিনিবেশ করিয়া তৎপ্রতি অযথা আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। এই সময়ে একদিন শিষ্য-বর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে বাইতেছেন এমন সময়ে পথে ত্রিবাঙ্গ পণ্ডি-

ভের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে বৈষ্ণববিবেচী বলিবা জানিতেন; তাঁহার মুগদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা অন্যদিকে গমন করিলেন। চৈতন্য শিষ্যদিগকে ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যাগণ বলিল “শ্রীবাস কার্য্যাক্ষরে ঐ পথে গিয়াছে।” চৈতন্য বলিলেন “তাহা নহে আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিবা শ্রীবাস আমাব মুগদর্শন করিবে না, এজন্য অন্য পথে গেল।”

এই ঘটনা চৈতন্যকে প্রথমতঃ ধর্ম্মবদিকে লটকা যার। বস্তুতঃ একটা ঘটনা বা একটা উপদেশ সময়ে মমুষ্যের মান যুগান্তর উপস্থিত কবে। সময়ে একটা সামান্য ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মনে বিদ্ধ হব সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিল তাহা হয় না। ঘোব অবিশ্বাসী নাস্তিকও হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয় জন হাবাইয়া ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকাব করিয়াছে। চৈতন্যেব জীবনেও শ্রীবাসেব এই আচরণ এইরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছিল। চৈতন্য তখনই হৃদয়েব সহিত বলিলেন।—

এমন বৈষ্ণব মুই হইছু সংসারে।

অজ ভব আসিবেক আমার ছুয়ারে ॥

জন ভাই সব এই আমার বচন।

বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব বিলক্ষণ ॥

আমারে দেখিয়া বে যে সকলে পলার।

তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায় ॥

এই সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুবে বৈষ্ণব-

গণ নাম সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাদিগকে যারপর নাই উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবগণ মহাছঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন শীঘ্রই আমাদিগের দল গুঠ হইয়া ছুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহার কিছুদিন পবে, ঈশ্ববপুত্রী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শাস্তিপুবে অদ্বৈতেব আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্ববপুত্রীকে দেখিয়া যাবপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্ববপুত্রী কিয়দিবস শান্তিপুবে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপ গমন করিলেন এবং তথায় গোপীনাথ আচার্য্যেব আলয়ে অবস্থান করিলেন। চৈতন্য দেব ঈশ্ববপুত্রীসহিত আলুগত্য করিবা প্রতিদিন ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঈশ্ববপুত্রী চৈতন্যেব অসাধাবণ রূপলাবণ্য, অসামান্য প্রতিভা ও আন্তরিক ঈশ্ববনিষ্ঠা দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন।

একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন “তত্ত্ব যাহা বলে তগবান্ তাহাতেই সন্তুষ্ট অতএব গ্রন্থেব দোষগুণ বলা নিবর্থক।”

মূর্খো বদতি বিষ্ণাব ধীবো বদতি বিষ্ণবে।

উভয়োস্ত সমং গুণ্যং ভাবগ্রাহী জনাৰ্কনঃ ॥

ভক্তি মাহাত্ম্য প্রতিপাদক চৈতন্যেব এই প্রথম বচন। প্রাচীন আৰ্য্যদিগের

শাস্ত্রাদি কর্ত্ত্ব ও জ্ঞান কণ্ডপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণব-দিগেব * বিশেষতঃ চৈতন্যের পূর্বে তাহা প্রাচীণ কেহ প্রকৃষ্ট রূপে জীবনে পবিত্র করেন নাই।

অদ্যাপি চৈতন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই ত্রিবিধ পণ্ডিতের কার্য্য পৰিহাৰ করেন নাই। মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ক্রমে চৈতন্যের পবিত্র ও বিচার হইল। সকলই তাঁহার অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধিত মোহিত হইলেন।

একদা প্রদোষকালে চৈতন্যদেব গঙ্গা তীরে উপবেশন কবিয়া শিষ্যাদিগকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েক জন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ কবিয়া বিমোহিত হইলেন এবং একপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি বিবচিত্র এজন্য নানাকপ মনোহর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন চৈতন্যের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন

—হেব স্তন নিমাঞি পণ্ডিত।

বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ তুঁবিত ॥

পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।

সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি কবে ॥

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন

* রামানুজ আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে ভক্তি সাধারণ্যে পবিত্র হইয়া নাই।

তোমরা শিখাও মোবে কৃষ্ণ ভজিবার
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নূতন বেশ ধারণ কবিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে সমুদয় ভাবত মোহিত হইয়াছিল তাহার অল্প দেখা দিয়াছে। একদা চৈতন্য ভক্তিরসে আর্জমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দশা † উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণ নৃত্য, হুকাব, তর্জ্জন, গর্জ্জন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধু বায়ুবোগ বিবেচনা কবিয়া মস্তিষ্কে নারায়ণ তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ বায়ুবোগ নহে প্রেম-বিকার। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। চৈতন্যের এই প্রথম দশা।

দশা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগবদ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপেব প্রত্যেক ঘবে ঘবে ভ্রমণ করিতে গেলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেবই আলয়ে ভ্রমণ কবিলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপলাবণ্যে ক্রমে চৈতন্য আবার বৃদ্ধবদিতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু মুসলমান জ্ঞী পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

নবধর্ম্মসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারক দিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। নানক মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই

† প্রেম ভক্তিতে বাহুজ্ঞান শূন্য হওয়া।

সাধারণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বাক্যো-
চ্চারণ করিয়া উৎপীড়িত হওয়াব পূর্বে
সর্ব সাধারণের যারপার নাট প্রিয়
ছিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্মের মূল এক।
সত্যকথন, ন্যায়ব্যবহার ও পবোপকার
সকল ধর্মের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত
বিরুদ্ধাচরণ (যথা ঈদানীন্তন হিন্দু পক্ষে
গো মাংস ভক্ষণ) না দেখিলে, কেন
তাঁদৃশ সদগুণশালী মহাপুরুষের প্রশংসা
করিবে না।

এই সময়ে চৈতন্য সংকীর্্তন কবিত্তে
আবস্ত কবিষাছিলেন কিন্তু তত বাহ্যল্যাব
সহিত নহে। অদ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যা-
পনই জীবনের প্রধান কার্য ছিল।
প্রধান পণ্ডিতদিগের ন্যায় চৈতন্য গৃহী
দিগের নিকট নানাকূপ ভেট ও বিদায়
পাইতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুব

অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে
তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। নানা
আয়ীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পবিপূর্ণ
হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং বন্ধন কসিয়া
সকলকে ভোজন কবাইতে লাগিলেন।
এটরূপ গার্হস্থ্যশ্রমই গৃহী বৈষ্ণবদিগের
আদর্শ। বৈষ্ণব মাতেই অতিথিপায়ণ,
আখড়াধাবিগণ ভিক্ষা কবিয়া অতিথি
সংকাব কবেন। চৈতন্য বলেন,
তৃণানি ভূমি কদকং বাকচতুর্থাচ স্নুতা।
এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে
কদাচন ॥

সত্যবাক্যে কবিবেক কবি পবিহাব।
তথাপি অতিথি শূন্য না হব তাহাব ॥
শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্র-
স্তাব লিখিবাব সময়ে অমবা অঙ্গীকার
কবিষাছিলাম যে আমবা পুনর্কব এই
বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।
অনেক দিন, আগবা তাহাতে হস্তক্ষেপণ
কবিত্তে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপবি
চিত্ত গ্রন্থখানি সাহায্যে প্রোক্ত বিষ-
য়ের পুনরালোচনা সাহসিক হইলাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি
প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচা-
বিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া
উঠিত; বঙ্গদেশেও প্রাচীন ইতিবৃত্ত স-
ম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্র-
শংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছু
কাল সকলের মুখে ইহাব প্রশংসা শুনা
যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের ছব-

* সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহেব সামাজিক বৃত্তান্ত।
শ্রীলাল মোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

দুই ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালাদেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দুবে থাকে—কিছু সূক্ষ্মতা গালি পালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পবিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ, বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পবি শ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ কবে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণেব উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয়, কেবল ব্রাহ্মণগণেব ইতি বৃত্তবিষয়ক নহে। কাষস্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণেব বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগেব বিবরণ বিশেষ পর্যালোচনীয়; অন্য জাতিব বিবরণ তাহাব আত্মজ্ঞিক মাত্র।

আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাব কল এই দাঁড়াইতেছে যে উক্তব ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণেব অধিকার এদেশে ততকাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুশত বৎসব পূর্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আদিরাছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবাব অনেক কারণ আছে।

যজুর্সংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদগণের বিচারে, ইহাই স্থির হইয়াছে যে আৰ্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ

প্রদেশ অধিকার ও অবস্থান করিয়া কাল সাহায্যে ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহাব সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহাব একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্যজাতিব দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমবা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংবেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংবেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত কবেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়া ছিলেন। ইংবেজসমূহ বংশেবাই এখন আমেরিকাব অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগেব দেশ।

পুনশ্চ, সাক্ষণ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহাবাও ইংলণ্ডেব অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যোবাও পশ্চিমাঞ্চল—আমবা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংবেজাধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষণাধিকৃত ইংলণ্ডেব সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতেব প্রভেদ এই যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডেব আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শূদ্রনাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংবেজেব ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের

অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারত বর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এদেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য কিন্তু ইংবেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের বাসভূমি ছিল, কিন্তু বোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্ত্ব কেন্দ্রীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেবই বাসস্থল রছিল; অনেক বোমক তত্ত্বদেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু বোমকেবা তথাকাব অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্ধ্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে টংবেজভূমি বলা যাইতে পারে না। মিশবাদিকে বোমক ভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে ভিজ্যাক্ত বঙ্গদেশকে আর্ধ্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্ধ্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্ধ্যজাতি চতুর্ধর্গ। যেখানে আর্ধ্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেই স্থানেই চতুর্ধর্গের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুইচারি ঘর, যাহা স্থানে২ দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে, অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটা রাজবংশ অতি

প্রাচীনকালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমবা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সহস্রোত্তর ঐরূপ। মুশিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকব বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছে—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্ দিগকে বৈশ্য বলিলেও—বৈশ্যবা সংখ্যার অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা তিন অন্য সিদ্ধান্ত কবিবার কারণ নাই।

যখন আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সম্ভতিগণকে সম্ভ্রংশী বলে। আদিশুর পঞ্চব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খৃঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে দশম শতাব্দীতে গোড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পরীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংবেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি

আর্য্যজাতি। তাঁহারই উপবীত ধারণ কবে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাল্যলার ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিত্ বাণিজ্যার্থ আসি য়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতিবিবল, তখন বলা যাইতে পারে যে এষ্ট বাল্যলা, নয়শত বৎসর পূর্বে আর্য্য ভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভাবতবর্ষের সঙ্গে ঈংবেজদিগেব যে সম্বন্ধ বাল্যলাব সহিত আর্য্যদিগেব সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল বাল্যলার প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জনা আদিশূব ও বল্লালসেনে যে কত বৎসবেব ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূব যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকূজ হইতে আনয়ন কবেন, তাঁহাদিগেব বংশ সন্তৃত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেনে কোঁ ল ন্য প্রদান কবেন। প্রবাদ আছে মে বল্লালসেন, আদিশূবেব অব্যবহিত পব-বর্তী বাজা। কিন্তু এ কিস্বদত্তী বে অমূলক, এবং সত্যেব বিবেচী, ইহা বাবু বা জেঙ্গলালমিত, পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত কবি-য়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালনোহনবিদ্যা-নিধি, তাহা পুনঃ প্রমাণিত কবিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণেব মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগেব আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কোঁ লীনা প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশূবেব পঞ্চ

* (১) শ্রীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবান, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিজয়, (৬) কাক, (৭)

ব্রাহ্মণেব মধ্যে দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগেব আদি পুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কোঁ লীনা প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষহইতে অষ্টম পুরুষ।† তট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণেব একজন। বল্লালসেন তৎ-শীঘ্র মহেশ্বকে কোঁলীনা প্রদান কবেন। মহেশ্ব তট্টনাবাণ হইতে দশম পুরুষ। ইত্যাদি।

আদিশূব বাহাদিগকে কাণ্যকূজ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পববর্তী বাজা হইলে কখন তাঁহাদিগেব অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাই-তেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বাবেজ দিগেব কুলশাক্তে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূবেব দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিত্রীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে ৯৯৯ অব্দে আদিশূব পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন কবেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, যে এই অঙ্ক শকাব্দ নহে, স-বৎ। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের হিসাব কবিত গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লে-খেন—

“আদিশূব খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষ-ভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, এবং খৃঃ

ধাঁধু (৮) জলাশয়, (৯) বাগেশ্বব (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

† (১) দক্ষ (২) ব্রহ্মসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রী-ধব, (৮) বহুরূপ

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রোষ্ঠি যাগ করেন।

প্রমাণ, এক্ষণে সঙ্খ্য—১২৩২
ঐ —খৃষ্টীয় শক—১৮৭৫

সম্বতের সহিত খৃঃ অন্তব—৫৭
এখন দেখা যাটতেছে যে ১২২৯সংবৎ অর্থাৎ ৫৭ বর্ষে পুত্রোষ্ঠি যাগ হয় সে বৎসর খৃঃ ১০৫৬।—১৬১ পৃষ্ঠা

বিদ্যানিধি মহাশয়েব ভুল এই যে সংবতে ৫৭বৎসব যোগ কবিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির কবিতো হয় না; কেননা খৃঃঅব্দ হইতে সংবৎ পূর্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃঃঅব্দ পাউতে হইবে। যোগ কবিলে, এখন ১২৩২ + ৫৭ = ১২৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১২৩২—৫৭ = ১৮৭৫ খৃঃঅব্দ পাওয়া যায়। সেটুকু ১২২৯সংবতে ১২২৯—৫৭ = ১১৭২ খৃষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্তানাস্তবে সংশোধিতও কবিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম কবিতো হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলী চবিতো “সামান্য কারে অব্দ শক লিখিত আছে। স্মৃতবাং ঐঅব্দ পদেব শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাটতে পাবে।” বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধবিতো হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় কবাব যে কাষণ নির্দেশ কবিয়াছেন, তাহা তত পবিষ্কার রূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি নায্য বোধ হয়। এস্থলে, আমাদিগকে অজ্ঞাস্ত পুৰাণতত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল

মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দোষ হইতে পাবে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বঙ্গাল সেন, দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯শকে রচনা সমাপ্ত কবেন। ১০১৯শক ১০৯৭ খৃঃঅব্দ। তাদৃশ বৃহৎগ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বঙ্গাল সেন তাহাব পূর্বে অনেক বৎসব হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা কবা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানাযার বঙ্গাল সেন ১০৬৬ খৃঃঅব্দে বাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা, ও বাজেন্দ্রলাল বাবুব কথাই এক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশেব পর্যায় হিসাব করিয়া নিরূপণ কবিয়াছেন। তাঁহাব গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ আদিশূরেব সময় নিরূপিত হইয়াছে। এগণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ১১৯সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসবেব প্রভেদ হইতেছে; কেননা ১১৯সংবতে ১৪২ খৃষ্টাব্দ। এপ্রভেদ অতি তল্প। এদিকে শকাব্দ ধবিলে ১১৯ শকাব্দে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই। তখন, বঙ্গাল সিংহাসনাকট ইহা উপবে দেখা গিয়াছে। স্মৃতবাং শক নহে সংবৎ।

অতএব আদিশূরেব পুত্রোষ্ঠি যাগার্থ পঞ্চব্রাহ্মণেব আগমন হইতে, বঙ্গালেব গ্রন্থ সমাপন পর্যন্ত ১৫৫বৎসর পাওয়া

মাইতেছে। উপরে বলা চইয়াছে যে বঙ্গাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূব হইতে বঙ্গাল নবম পুরুষ। আদিশূবের সমকালবর্তী দক্ষ হইতে তৎপুত্রজাত, এবং বঙ্গালের সমকালবর্তী বহুকপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূবের সমকালবর্তী বেদগর্ভ হইতে তৎপুত্রজাত, এবং বঙ্গালের সমকালবর্তী শিশু, ৮ম পুরুষ, তজপ ভট্টনাথ্য হইতে মহেশ্ব ১০ম পুরুষ; এবং ত্রীর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩ পুরুষ। কে বল ছান্ড হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূব হইতে বঙ্গাল পর্য্যন্ত নব পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত বীতি এই যে ভাবতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনার এক পুরুষে ১৮বৎসর পড়তা কবা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয়পুরুষে ১৬০ বৎসর পাওয়া যায়। অতএব অন্য হিসাবে বঙ্গাল ও আদিশূব ১৫৫বৎসরের প্রভেদ পাউয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে। অতএব একল গ্রাহ্য। বঙ্গাল আদিশূবের সার্বক শতাব্দী পবগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায়, যে যখন বঙ্গাল কোলীয়া সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূবানীত পঞ্চব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত বর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড়শত বৎসরে ঐদৃশ বংশবৃদ্ধি বিশ্বকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা কবা যায় যে তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে

ইহা বিশ্বকর বোধ হইবে না। বহু বিবাহ যে বিশেষ রূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুত্র মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে ভট্টনাথ্যগণের ১৬পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, ত্রীর্ষের ৪পুত্র, এবং ছান্ডের ৮ পুত্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে ব্রাহ্মণায় ৫৬পুত্র রাখিয়া পবলোক গমন কবিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস কবেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে বাটীদিগের ৫৬টি গাঁও। যখন দেখা যাইতোছে যে একপুরুষ মধ্যে, ৫৬র হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১৩৭ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয়পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, কেননা পঞ্চব্রাহ্মণ অধিক বয়সে ব্রাহ্মণায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা ব্রাহ্মণায় সূত্রাঙ্গ বৃদ্ধি কবিবাব তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃর স্বীকার কবিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

অবিখ্যাত কুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ ব্রাহ্মণায় কত বিস্তৃত, তাহা বাটীর কুলীনগণ জানেন। এক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়, কোন২ বড় গ্রামে, তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে

অন্যায় বলিবেনা। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে
এক বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীল-
কণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের, সঙ্গে বর্তমান
লেখকের পবিচয় নক্ষর এবং কুটুম্বিতা
আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ
সপ্তম কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ।
যদি সাত আট পুরুষে, একপ সংখ্যা-
বৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে,
তবে দেড় শত বৎসবে ৫জন হইতে এ-
কাদশ শত ঘব হওয়া নিতান্ত অপ্রত্যা-
কথা নহে।

একগে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বাস
যোগ্য বলিবা স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশুব পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনি
বাব পূর্বে এতদেশে সাড়ে সাত শত ঘর
ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ১৪২ খৃ অঙ্কে আদিশুব ঐ
পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পবে
বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্বৃত
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোলীন্য প্রচলিত
করেন।

৪র্থ। এ দেড়শত বৎসরে ঐ পাঁচ
ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড়শত বৎসবে পাঁচজন ব্রাহ্ম-
ণের বংশে একাদশ শত ঘব হইয়াছিল,
তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণ
গণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘব হইয়া-
ছিল।

যদি, সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষও
পাঁচজন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্য-

কুজীদিগের ন্যায় বহুবিবাহ পরায়ণ
ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায় তবে
বাঙ্গালার প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমন
কালহইতে শত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদের
বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের
জন্য অসম্ভব নহে।

সপ্ত শতীদিগের পূর্বপুরুষগণও বহু-
বিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমান
দোষ হয় না। কেন না বহুবিবাহ তৎ-
কালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাই-
তেছে। তবে এমন হইতে পারে যে
কাণ্যকুজীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া
শপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে
উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা
অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতী-
গণের পূর্বপুরুষের তত বিবাহ কবিবাব
কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে
পাঁচজন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ
ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে
একবাব আবস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে
একত্রে বা একে একে, রাজগণের প্রয়ো-
জনানুসারে, বা রাজপ্রসাদ লাভাকাজ্যের
অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব, কান্যকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ
আসিবার পূর্বে দুই এক শত বৎসরের
মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস,
বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়
অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ-
শূন্য অনাগ্যভূমি ছিল। পূর্বে কদাচিৎ
কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া, বাস
করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে

নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে আদি শুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছি, তাহাব কারণ এমত নহে, যে ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণ সংখ্যার অল্পতাব কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বয়স কখনও প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল স্বীকার কবিতে হইবে। কোনও আপত্তিকাবী তাহাও স্বীকার কবিতে পারেন। বলিতে পারেন, যে তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল—একগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্বে হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশুরের পূর্বকাল জাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বৎ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকাবই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? আমবা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশুরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকরের নাম তাঁহাব স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুভট্ট

† বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

অন্নদেব, গোবর্দ্ধনচাৰ্য্য, ইলাহুধ, উদয়নাচাৰ্য্য, প্রভৃতি যাহাব নাম কবিবেন সকলই আদিশুরের পূর্ববর্তী। ভট্টনাভা-য়ণ ও শ্রীহৰ্ষ তাঁহাব সমকালিক। প্রাচীন আৰ্য্যজাতি যেখানে বাস কবিয়াছেন, সেই খানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগেব পাণ্ডিত্যের চিহ্নরূপ গ্রন্থাদি বাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখন কার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমবা অবশ্য ইহা স্বীকাব করি যে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেও আৰ্য্য রাজকুল বাঙ্গালার ছিল, এবং তাঁহাদিগেব আধুনিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেক্ষেপে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগেব আলোচনাৰ বিষয় নহে। সেক্ষেপে সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিকৰ্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমবা যে কথা সপ্রমাণ কবিবাৰ জন্য যত্ন পাইবাছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে কবিবেন, যে বাঙ্গালাব ও বাঙ্গালিব বড় লাঘব হইল। আমবা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালিজাতিৰ অগৌৰব কবা হইল। আমবা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংবেজদিগেব সম্মুখে স্পৰ্দ্ধা কবি—তানা হইয়া আমবাও আধুনিক হইলাম।

আমবা দেখিতেছি না যে অগৌৰব কিছু হইল। আমবা সেই প্রাচীন আৰ্য্যজাতি সম্বন্ধেই রহিনাম—বাঙ্গালার যখন আসি না কেন, আমাদিগেব পূর্বপুরুষ-

গণ সেই গোরবাসিত আৰ্য্য। বয়ং গোর-
বের বুদ্ধিই হইল। আৰ্য্যগণ বাঙ্গালার
তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই
—আৰ্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।
এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে
কীর্ত্তি ও যশেবও উত্তরাধিকারী। সেই
কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদের পূৰ্ব্ব-
পুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেও-
য়াবীরমত আগবাও ভারতীয় আৰ্য্যগণের
প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কেব লাদব
হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে
সাত্বে সাতশত ঘব ব্রাহ্মণ ছিল। বঙ্গালের
সময় সেই সাত্বে সাতশত ঘবেব বংশ
এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণেব বংশ একাদশ শত ঘব
ছিল। অত্রীয় বৈশ্য এখনও যখন অতি
অল্প সংখ্যক, তবে তখন যে আবও অল্প
সংখ্যক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।
বঙ্গালের দেড় শত বৎসর পবে মুসল-
মানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয়
আৰ্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে,
ইহা অস্বমেয়। তখনও তাঁহাবা এদেশে
ঔপনিবেশিক মাত্র। স্মৃতরাং সপ্তদশ

অষ্টাবোহীকর্তৃক বঙ্গজয়ের বেলকলঙ্ক, তাহা
আৰ্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আৰ্য্যগণের অভ্যুদয়ের
সম্ভব হয় নাই। এখন সে সমস্ত বোধ
হয় উপস্থিত। বাহবলে না হউক, বুদ্ধি-
বলে যে বাঙ্গালি অচিবে পৃথিবীমধ্যে
যশস্বী হইবে, তাহার সমস্ত আশিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বাহা
বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বৰ্ত্তে।
বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন কায়স্থগণ সং-
শুদ্ধ, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদের
বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বি-
ষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা
হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছু বলিবার
প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ
আৰ্য্যবংশসম্বৃত বটে। আদিশূরেব সময়
পঞ্চ ব্রাহ্মণেব সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও
কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। তৎ-
পূর্বে যেমন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ছিল, সেই
রূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক।
এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কার
স্বরূপ।



রজনী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

(অমরনাথ বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ ভবের হাট হইতে, আমার এই মনিহারির দোকান খানি উঠাইতে হইল। লোক ঠকাইয়া—আপনি ঠকিয়া, কোন সুখ নাই। মনে কবিয়াছিলাম, নানা বর্ণের সুশোভন কাচে, এসাধের বিপণী সাজাইব—অমূল্য মণিমাণিক্য মনে ক-করিয়া, খরিদদার বহুমূল্যে আমার সেই কাচ কিনিবে। কিনিবে না কেন? কিনিয়া বিনিময় দেয় কি? অসাব কাচ লইয়া, অসার কাচ দেয়। অসার কথা—অসার স্তব,—অসার তোষামোদ, অ-সার বন্ধুত্ব, অসাব আশ্রয়,—খল হাসি, শঠ প্রবৃত্তি, নীচ আশয়, বিনিময়ে ইহাই দেয়। কাচের বিনিময়ে কাচ লইয়া, এককালে আমাব কি তৃপ্তি হইল? এদখ হৃদয়ের কোন্ আলা খামিল? এ অনন্ত, অনিবার্য পিপাসার কি শমতা হইল? এ হাট ভাঙ্গিব, এ ব্যবসা ছাড়িব—যিনি ছল জানেন না, কপট জানেন না, বাহার কাছে খল কপট চলে না, বাহার কাছে কাচ বিক্রয় হয়, যিনি বিনিময়ে খাটি সোনা ভিন্ন দেয় না, তাহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমার অনেক সন্মান করি-

য়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে, তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমের, এজন্য তো-মাব পক্ষে প্রমাণ নাই। এই ক্ষুটিতো-মুখ হৃদপদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি এমনিহা-সির দোকান ভাঙ্গিব—যিনি সকল খরিদ দারের বড় খরিদ দাব, বিনামূল্যে সক-লই তাঁহাকে বিক্রয় করিব।

তুমি নাই? না থাক, তোমাব নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অথও মণ্ড-লাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তষ্টম্ নমঃ বলিয়া, এ কলঙ্কলাঙ্কিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কেব ভাব আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবে-দন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্বত্রো খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায়

কাজ কি? বে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইল?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসজ্জন দিব। একবার ললিতলবঙ্গলতার মুখে হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব।

আমি পবদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র অধিকতর স্ত্রিব—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহাব সঙ্গে অনেককণ কণোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমাব উপর যে বিবক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পবদিন পুনরপি তাহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্জলতা ও ক্লিষ্টতার কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্বৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র আপনাব প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বজ্রনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি, যে যেদিন হইতে বজ্রনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাহাব পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল। এক কথা লবঙ্গ আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই, কি প্রকাবে বলিলে, কেন না বজ্রনী আমাব পক্ষী বলিয়া পরিচিতা—কিন্তু আমাব বেশ সন্দেহ হইল যে শচীন্দ্র বজ্রনীর প্রতি অস্বস্ত। এই অস্বস্তির বিরূ-

তিতে তাহাব বায়ুরোগ, অথবা বায়ুরোগের বিকায়েই এই অস্বস্তি।

একদিন, যখন আব কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীবেৎ বিনা আডম্বরে বজ্রনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহাব অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎ সংসারস্থখদর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয় জন দর্শনস্থখে সে যে আজন্ম যত্নপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাহাব সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাহাব চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুবাগ বটে।

তখন বলিলাম “আপনি বজ্রনীর মঙ্গলাকাজী। আমি সেইজন্যই একটি কথাব পবামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। বজ্রনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আমাব আমাকর্তৃক আবও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।”

শচীন্দ্র আমাব প্রতি বিকট কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, “আপনি যদি সমুদায় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “বলুন।”

আমি বলিলাম, “আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি আপনাব অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্ম, তাহাকে আপনাব দ্বী পবিচয়ে আপনাব গৃহে রাখিয়া ছিলাম। বজ্রনীর সম্মতিক্রমেই রাখিয়া

ছিলাম। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করার সহায়তা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।”

শ। তার পর বিবাহ হইল কি প্রকারে?

আমি বলিলাম, “বিবাহ হয় নাই। রজনী আমার স্ত্রী নহে।”

শচীন্দ্র প্রথমে ভ্রু কুঞ্চিত করিল, তাহার পর তাহার সর্কান্ন কাঁপিতে লাগিল।

আমি তখন শচীন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। যেপ্রকারে রজনীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচারীর হস্তহইতে রক্ষা করিয়া, তাহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্রও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন। বলিলেন,

“আপনি বলিলেন রজনী আপনাকর্তৃক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা নহে, বিশেষ উপকৃত্যই হইয়াছিল।”

আমি বলিলাম, “পরে শুনুন।” তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম। যেপ্রকারে রজনীর উত্তরাধিকারিণীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে রজনীর সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম,

যেপ্রকারে সে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আমার মতে সম্মত হইয়া, আমার স্ত্রী পরিচয়ে আমার গৃহবাসিনী হইয়া রহিল, তাহাও বলিলাম। তাহার পর যে প্রকারে রজনী আমাকে বিষয় দান করিয়া, আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিলাম।

শুনিয়া শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,

“মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?” আমি বলিলাম, “আমি যে ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষী তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আশ্রয়শূন্যা। তাহার কোন উপায় আমি করিতে পারিতেছি না।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না। যে অন্ধ অবালা স্ত্রী, বঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত, তাহাকে আশ্রয়দানে আমার পিতা অদ্যাপি অক্ষম হয়েন নাই, অথবা বিমুখ হইবেন না।”

আমি বলিলাম, “আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে। কিন্তু আমার দোষে তাহার বিবাহের পথ বদ্ধ হইয়াছে। যাহাকে লোকে আমার পত্নী বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার। যদি কেহ আপনার সন্ধান থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।”

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন,

“যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে রজনীর পাতের অভাব নাই। কিন্তু আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি-প্রকারে জানিব? রজনীত এসকল কথা এত দিন কিছু বলে নাই।”

আমি বুঝিলাম, রজনীর ববপাত্র কে। বলিলাম, “রজনীকে আজি জিজ্ঞাসা কবি বেন। আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি করিতেছি।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন, আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম, যে আমি কলিকাতা তাগ কবিয়া যাউব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যা-গমন কবিব না—তিনি আমার শিষ্য, আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা ইঙ্গিত বুঝিল। আমার সহিত, পূর্বাঙ্গীকার মতে, পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-লাম,

“আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?”

ল। শুনিয়াছি। তুমি অধিতীয় পাঠ্য।

আমি। সে কথা কে অস্বীকার করি-তেছে? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস হয় কি?

ল। কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস

করিতাম না। কিন্তু রজনীকে জিজ্ঞাসা কবায়, সে সমুদায় বলিয়াছে। তাহার কথায় বিশ্বাস করি।

আমি। তাই বা কেন কর? মনে কর তাহাকে আমি এ সকল কথা শিখাইয়া আনিয়াছি।

ল। কি অভিপ্রায়ে তুমি শিখাইবে?

আমি। মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ে উপর বিরক্ত। উভয়ে উভয়কে ছাড়িতে চাই। বিবাহ অস্বীকার ভিন্ন, ইহার আর উপায় কি?

লবঙ্গলতা ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, “যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া বলে না যে আমি চুবি কবিতুছি।”

আমি। চোরের অনেক কোশল।

ল। তুমি অনেক কোশল জান বটে, কিন্তু রজনী তত জানে না। রজনী যেপ্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল। সত্য কথা না হইলে, সে তত সবিস্তারে বলিতে পারিত না।

আমি। শিখাইলে, বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষি জোবানবন্দী দেয় কি প্রকারে? শিখিলে সকলেই মিথ্যা কা-হিনী সবিস্তাবে বলিতে পারে।

ল। রজনী তোমার শিক্ষামতে কখন পারে না। কেন না, তুমি শিখাইলে, কোন না কোন কথায় আমি বুঝিতে পারিতাম, যে চক্ষুদ্বান্ ব্যক্তি শিখা-ইয়াছে। রজনী যাহা বলিল, তাহাতে

বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞানমত সকল বলিতেছে।

আমি। তুমি দ্বিতীয় বেছাম বোধ হয়। সত্য সত্যই কি তুমি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছ?

ল। সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছি।

আমি। শচীন্দ্র?

ল। তার আরও বিশ্বাস।

আমি। ভালই হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আমার গৃহে যাইতে অসম্মত। তাহার বিবাহ স্তব্ধকঠিন। আমি কি তোমাদিগকে নিঃস্ব কবিত্তা, রজনীকেও তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি?

ল। তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশেষ আমাদিগের ধন সম্পত্তির উপর তোমার বড় মায়। কিন্তু রজনীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না।

আমি। তবে তাহাব কি উপায় করিবে? জিজ্ঞাসার রাগ করিও না। আমাব একটু প্রয়োজন আছে।

ল। আমবা তাহাব বিবাহ দিব।

আমি। সে বড় কঠিন। তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে করিয়া বিবাহ করিবে, এমন লোক কি আছে?

ল। আছে।

আমি। থাকিতে পারে। এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অন্য প্রকারে বিবাহের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু

সে প্রকারের লোককে কি রজনী বিবাহ করিবে?

ল। যে পাত্র স্থির হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে রজনী রাজি হইয়াছে।

আমি। বটে? কে সে?

ল। আমার পুত্র শচীন্দ্র।

আমি। কানাকে!

ল। কানাকে। যাহাতে অমরনাথ বাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে অন্যোও ইচ্ছুক হইতে পারে।

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন না শচীন্দ্র যে রজনীতে অমুরক্ত তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল,

“তুমি আমার সঙ্গে আর একবার সংস্কারের ইচ্ছা করিয়াছিলে কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?”

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। তোমার স্বামী পাহারাওয়ালার ভয়ে। বাজধানী অন্ধকার করিয়া চলিলাম কি?

ল। প্রায়। বোধ হয় এখন পুলিশ আপিস উঠিয়া যাইবে।

অ। বোধ হয়। আর কেহ স্থখী হউক না হউক, তুমি হইবে।

লবঙ্গ চুপ করিয়া রহিল।

আমি তখন, ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া, লবঙ্গকে বলিলাম, “আমি একটি কথা জি-

জ্ঞান করিবার জন্যই, তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি সরলাস্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরলাস্তঃকরণে উত্তর দিবে। আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই স্মৃতি হও?”

ল। সরলাস্তঃকরণেই উত্তর দিব—যথার্থই স্মৃতি হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই ভাল থাকি।

আ। তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?

লবঙ্গ, কয়েকটা কথার এক শ্রমিক চিত্র আঁকিল—জিতেদ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী,—আমি বলিলাম,

“আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?”

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া, বলিলাম,

“যদি লোকান্তর থাকে তবে?”

লবঙ্গলতা বলিল, “আমি দ্বীলোক—সহজে হুর্সনা। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলা-কাজী।”

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, “আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাজী তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এক লক্ষ লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।”

লবঙ্গ, অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল,

“তুমি কুলাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা বুদ্ধিতেই কুলাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে? এখন সে অমৃত্যুতে আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?”

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পরে শোন যে অমব-নাথ আর কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ কবিলে আমি ধর্ম্য পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাজী হইরাছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্ত আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুৰিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার “ইহলোকে।” এই কথা আর সেই কথা—আমি যেমন তোমায় চাই—তুমি তেমন নও। যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।

আমি বলিলাম, “আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহা বলিয়া যাই। বজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল। সে দানপত্র এই। আমি বজনীর বিষয় পবিত্যাগ করিতেছি। এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি।”

আমি সেই দানপত্র, বাহিব কবিতা, লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট কবিতাম।

লবঙ্গ বলিল, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস কবি নাই। কিন্তু এ দানপত্র বেজিষ্টরী হইয়াছিল কি?”

আমি। হইয়াছিল।

ল। শুনিয়াছি, বেজিষ্টরী হইলে আব একটা নকল সরকারিতে থাকে।

আমি। এ দানপত্রেবও তা আছে। এই জন্য আমি আর একখানা দানপত্রে

কাল দস্তখত কবিতা বেজিষ্টরী কবিতা আনিয়াছি। ইহাব দ্বারা আমার সমুদায় স্বাবরসম্পত্তি আমি দিতেছি।

ল। কাহাকে?

আমি। যে বজনীকে বিবাহ কবিতা তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্বাবর সম্পত্তি? “হু।”

ল। রজনী যাহা তোমাকে দিয়াছিল তাহা তোমার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। এক্ষণে তোমার মতি ফিরিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহার বিষয় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ। ইহা আমার পক্ষে বিশ্বাসকর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতে পারি। কিন্তু আমি জানি তত্ত্ব, তোমার নিজেবও অনেক জমীদারী আছে। তাহাও রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, “তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না বজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহাব কথা প্রকাশ কবিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও। যদি ইহাব অন্যথা কর, তবে তোমার স্বামীর শপথ সাগিবে।”

এই কথা বলিয়া, ললিত লবঙ্গলতাব উত্তরের অপেক্ষা না কবিতা, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে টেমেন

গিয়া বাম্পীর শকটারোহণে কান্দীর যাত্রা করিলাম ।

দোকানপাট উঠিল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম । শুনিলাম যে মিত্র বংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন । কোতূহল প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম । দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গন পূর্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন । অনেককণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল । তাঁহাব নিকট শুনিলাম, যে তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন । কিন্তু আমার সঙ্গে রজনীর যথার্থই বিবাহ হইয়াছিল, পাছে কলিকাতার লোক বেহ এইরূপ মনে করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানী নগরে বাস করিতেছেন । ভবানী নগরেও কতকগুলি লোক তাঁহাকে লইয়া আহ্বার করে না, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র হুঃখিত নহেন । তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন ।

আমার নিজসম্পত্তি, এবং রজনীর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রত্যাগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ

করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না । শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন । আমারও সে ইচ্ছা ছিল । শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন ।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্বক পদধূলি গ্রহণ করিল । আমি দেখিলাম, যে ধূলিগ্রহণ কালে, পদস্পর্শ জন্য, অঙ্গগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল । কিছু বিস্মিত হইলাম ।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইল । কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল । আমার বিস্ময় বাড়িল । অঙ্গদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে । চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না । একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক !

অন্যত্র রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায় ? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্ত রজনীকে আজ্ঞা করিলেন । রজনী একথানা কারপেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল সেখানে অঙ্গ একবিদ্যুৎ জল পড়িয়াছিল ; রজনী আসন রাখিয়া,

অগ্রে অঞ্চলেব দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়া ছিলাম, যে রজনী সেই জলস্পর্শনা কবি বাই আসন পাতা বন্ধ কবিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শেব দ্বাৰা কখনই সে জানিতে পাবে নাই, যে সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আব থাকিতে পাবিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,

“রজনী এখন তুমি কি দেখিতে পাও?”

রজনী মুখনত করিয়া, দীর্ঘ হাসিয়া বলিল, “হাঁ।”

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, “আশ্চর্য্য বাটে, কিন্তু জৈশ্বর কৃপায় না হইতে পাবে, এমন কি আছে? আমা দিগেব ভাবতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েবা বহুকাল পবিশ্রম কবিলেও আবিষ্কৃত কবিত পারিবেন না। চিকিৎসা বিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতিব কাছে, সে সকল লুপ্তবিদ্যাব কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি কবিতছে। আমাদিগেব বাতীতে একজন সন্ন্যাসী কখনং যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। তিনি যখন

শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ কবিব, তখন বলিলেন, ‘শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কহা যে অন্ধ।’ আমি বহু কবিয়া বলিলাম, ‘আপনি অন্ধত্বের আবেগা ককন।’ তিনি বলিলেন, ‘কবিব—এক মাসে।’ ঐশ্বর্য্য দিবা, তিনি একমাসে রজনীব চক্ষে দৃষ্টিব সৃজন কবিলেন।”

আমি আবও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম “না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস কবিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে, ইহা অসাধ্য।”

এই কথা হইতছিল, এমন সময়ে এক বৎসবেব একটি শিশু, টপিতে টপিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীব পায়েব কাছে দুই একটা আড়াড পইয়া, তাহাব বস্ত্রেব একংশ ধৃত কবিয়া টানটানি কবিয়া উঠিয়া, রজনীব আঁটু ধবিয়া তাহাব মুখ পানে চহিয়া, উচ্ছ্বাসি হাসিয়া উঠিল। তাহাব পবে, ক্ষণেক আমাব মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বালল, “দা।” (যা।)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে এটি?” শচীন্দ্র বলিলেন, “আমাব ছেলে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহাব নাম কি রাখিবাছেন?”

শচীন্দ্র বলিলেন, “অমর প্রসাদ।”

আমি আব সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ।

শৈশবসহচরী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উন্নয়ন।

পূর্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার দুই এক দিবস পাবে স্বর্ণপুর গ্রাম অন্ধকার-ময় হইল। বাজপথে জনমানব দেখা যায় না—কেবল কখনও পুলিশ কর্ম-চারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগের ভয়ে বাটীর দ্বার খুলিতে সাহস করেন না, কিছুদিনের জন্য চাট বাজার বন্ধ হইল। তন্নিবন্ধন গ্রামবাসী-দিগের ক্রমেই আহাবও বন্ধ হইতে লাগিল। স্বর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাসিনী জাহ্নবীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীন হইল। যে সকল যুবতী সর্বদা গ্রীবা-নির্মজ্জিত কবিতা তাহার মনে বাজ হংসীর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহা-দিগের আর সে জাহ্নবীকূলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে যেসকল কুলকামিনীগণ সূর্য্যদেবকে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান, এবং যাহারা তজ্জন্য ঘামিনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্নান করিয়া থাকেন কেবলমাত্র তাহারাই এক্ষণে জাহ্নবীর শোভাবর্ধন করিয়া থাকেন। এমনতর অবস্থায় একদা অতি প্রত্যুষে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একটি পরি-চারিকা সমভিব্যাহারে অতি ক্রতপাদ

বিক্ষেপে ভাগীরথী তীরভিমুখে কথোপ-কথন করিতে গমন করিতেছিল।

“বিনোদিনী এখনও বাত আছে?”

“হ্যাঁ এখনও ঢের বাত, আমার গা হুচ্ছুক কব্চে—ঐ দেখ এখন স্ব-তারাও উঠে নি। চল দিদি ফিরে যাই চ।”

“দূর হ। এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন—ভয় কি লো!”

বি। (চুপি চুপি) আজ বড় দিদির ঘবে গাংছা আন্তে গিয়ে এক ভয়ানক বিকটাকাব মাহুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় চেষ্টে—

চ। সে কি? কুমুদিনীর ঘরে—

বি। হ্যাঁ।

চ। কখন দেখিলি?

বি। এই মাত্র।

চ। এতক্ষণ বলিস্নি যে?

বি। বড় দিদি বলতে নিষেধ করে-ছিল।

চ। তবে বলি যে।

বি। বলতে কি চল দিদি যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল তত-ক্ষণ আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল—আমার মাতা খাস কাকেও বলিস্নে, আমার ভগিনীপতিকেও না—

চ। না তা বল না—তুই কাকে দেখলি—

বি। আমি তাকে চিনি না—কিন্তু মুখ দেখে বোধ হইল যেন তাকে কখন কোথায় দেখেছি।

চ। কেমনতর দেখতে।

বি। দেখতে সন্ন্যাসীর মত—বুক পর্যন্ত পাকা লাড়ি। খুব বড় চোখ, গেকুরা বসন পবা—গলায় কট্রাকের মালা।

চন্দ্র। কি কবিত্তেছিল?

বি। বড় দিদির শিঙার বসে মাথাব হাত বুলাইতে ছিল; আমি ঢুকবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া অনা দাব দিয়া পলাইল।

চন্দ্র। কুমুদিনী কি কবিত্তেছিল?

বি। তাঁর এখন একটু অবছেড়েচ। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম দিদি ওকে? তিনি বলিলেন এক সন্ন্যাসী আমাব চিকিৎসা কবিত্তেছেন, অব বিশ্রাম কালে আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তারপর আমি যখন গামছা লইয়া ফিবে আসি তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বিনোদ, যে সন্ন্যাসীকে এখানে দেখিলি, কাহাকেও বলিসনে কাকাও যেন না জানতে পাবেন।

চন্দ্রমুখী। “বাবাবের বলিতে নিষেধ কবি-
রাছে।” এই বলিয়া চন্দ্রমুখী অন্যমনস্ক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই যুবতীর গঙ্গা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর শোভা দেখিয়া দাঁড়াইল। বিশালজদবা জাহ্নবী নক্ষত্র করণে ঝিকঝিক করিতে২ দূরপ্রান্তে ধুমমবে মিশিয়াছে। নদীর অপর পারে রজনীর অম্পট আলোকে

অন্ধকাবময় দেখাইতেছিল। অদূরবর্তিনী ক্ষুদ্র২ তবণী হইতে নীপাংলাক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীসদয় আন্দোলিত কবিয়া, যুবতীর শব্দবিজড়িত অলকাগুচ্ছেব চাকলা বিধান কবিত্তেছিল। যুবতীর বিশেষ প্রীতিলাভ কবিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া দূবে একটি ক্ষুদ্র তরীহইতে কে গায়িত্তেছিল তাহাই শুনিতেছিল—তৎ-পরে অস্তে২ ঘাট নামিল। তাহাদিগের পূর্বে ছুট একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে স্নান কবিত্তেছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাচাল প্রাচীনা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা কবিল,

“কুমুদিনী কেমন আছে?”

চন্দ্র। কুমু এখন আছে ভাল। এই মাত্র অবছেড়েছে।

প্রাচী। আর সে বাবুটি কেমন আছে?

চন্দ্র। তা বিশেষ জানি না—শুনি-
রাছি বড জর- দিবারাত্রি বেহঁসে
আছে।

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর ও বাবুটির
একসময় জর হোল কেন?

চন্দ্র। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন তা কে
জানে—কুমুদিনীর অব হোল বর্ণের
শোক, বাবুটির জর হোল ডাকাতেরা
মাগায় ঘেরেছিল বল্যে।

প্রা। বাবুটি তোমাদের বাটতে কেন?

চন্দ্রমুখী উত্তর করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, “ও গো সে
বাবুটি আর কেহ নয়—আমাদের রমণ

পুরের খুড়ীর জামাই, তা আমাদের বাড়ী থাকবে না তো কোথা যাবে?”

প্রা। কার, প্রমদার স্বামী?—আহা প্রমদা মোরে গেছে—ছোঁড়া কি আবার বিয়ে করেছে?

চন্দ্রমুখী বলিল “বিয়ে হয় নি কিন্তু হবে—”

প্রা। কার সঙ্গে?

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে।

প্রা। (হাসিয়া) তা তোমরা এমন সব যুবতী শ্যালী থাকতে আমার সঙ্গে কেন। কুমুদিনী এমন সুন্দর কড়ে রাঁড়ি, তাতে আবার বাপ বিধবা বিধে না দিতে পেরে বিবাগী হয়েছে। কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক না, তা হলে বাপ ঘরে ফিরে আসবে।

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন না—বিনোদিনী “পোড়ার মুখ তোমার” বলিয়া জলে নামিলেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহা-দিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে বসিল, “তা আশ্চর্য নয়।”

প্রাচীনাও তজ্জপ মুহূর্ত্তেরে বলিলেন “কেন লো?”

পরিচারিকা উত্তর করিল “জামাই বাবু প্রলাপে দিবারাত্র বড়দিদির কথা বল্যে থাকেন এবং বড়দিদিও জর ত্যাগ হলো জ্ঞান হলেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে।”

“তাঁতে বিয়ে হবে কেমন করে জান্‌লি?”

পরিচারিকা বলিল,

“তা তুমি বুঝে নাও।”

প্রাচীনা বলিল “তাত বুঝলুম এখন চুপ কর।” তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিকাকে সঘোষন করিয়া বলিল,

“বিহু তুই কি রজনীবাবুর বাড়ীতে আর থাকিস্ না?”

বি। আর কার জন্যে থাকিব। যে স্বর্ণের জন্যে ছিলাম সে গলিয়া অঙ্গার হইয়াছে—এখন আবার সাবেক মুনিব বাড়িতে আছি। এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুচিল। বিনোদিনী ও চন্দ্রমুখী স্বর্ণকে মনে পড়াতে অবিশ্রান্ত নয়ন বারি জঙ্ঘবীর জলে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুচিতে ব-লিল “আহা স্বর্ণ কি সুন্দর মেয়েছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ—অমন মেয়ে কলিতে হয় না—আপনার প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচালে।”

বিধু বলিল, “আর তেমনি উপযুক্ত পায়ে পড়েছিল, রজনী বাবুর মতন বাবু দেখিনি।”

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, “চুপ কর হারামজাদি! রজনীর মতন বাবু দেখিস্‌নি? সে আবার বাবু? কে তাকে বাবু কল্ল, কে তাকে এত ধনের অধিপতি কল্ল? সেও আমি। পাবও! নেমকহারাম! এখন আমার চিন্তে পারে না, বলে আমি পাগল হ! হ হ! আমি পাগল! হি! হি! হি!”

রমণীগণ দেখিল তটোপরি দাঁড়াইয়া গলিতবসনা আলুলায়িত কুম্মকেশা, মধ্য-

বয়সী স্কন্ধী, একটি স্ত্রীলোক বোবভাবে হাসিতেছে। সেই অবিরত বায়ুতাড়িত তবঙ্গিনীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মূর্তি দেখিয়া বমণীগণ চমকিত হইল। বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ লুকাইল।

উন্মাদিনীর হাসি থামিল। কিছু কাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উন্মাদিনী সেই অন্ধকারময় জাহ্নবীর উপকূল আলোড়িত কবিয়া অতি মধুর স্ববে গায়িতে লাগিল—

ডুবিতে এসেছি আমি জাহ্নবী সনিলে।
কি কাজ জীবনে মম চিবদিন ভাবিলে ॥
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সূত
একে সবে আমি ডুবেগেছে জলে।

উন্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীতা হইল এবং তাহার ব্যস্ততা হেতু চন্দ্রমুখী তাহার সতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন বিনোদিনী উন্মাদিনীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন উন্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল “হু! তুমি বড় স্কন্ধী—সাবধান তোমার বড় বিপদ!” বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর পশ্চাৎ চলিল—পরে কূল হইতে উপরে গিয়া বলিল, “চন্দ্রদ্বিদি মাগি কিতয়ানক পাগল! কিন্তু কি স্কন্ধী ছিল, এখনও কত রূপ বয়েছে।”

বমণীগণ চলিয়া গেল, কেবল ঘাটে একাকিনী পূর্বোন্মিখিতা প্রাচীনা বহিল, আর উপকূলে উন্মাদিনী ছিল। প্রাচীনা

আন্তঃ আসিয়া তাহাকে বলিল, “হাগা বড়নীকে কেমন করে তুমি বড় মানুষ করলে? সে যে তার বাপের বিষয়ে বড়মানুষ হয়েছে।”

উন্মাদিনী উচ্চচাসি হাসিয়া বলিল, “তার বাপ! তার বাপকে? বমাকান্ত। হু! না! না! সে কেবল আমি জানি। হি! হি!” এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বয়ঃসী চমকিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বহিল।

মোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্ন্যাসীর পবিচয়।

ডাকাতি হান্সা কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল। তৎপরিবর্তে আর একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া স্বর্ণপুর্বে পাডায় পাডায় গুণ্ডগোল হইতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুমুদিনী অতি শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাঁহার পিতা হবিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগে সফল হইতে না পারিয়া উদ্যমীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ হবিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রচার করিলেন, যে তাঁহার কন্যা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ দিবেন। বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী যে

সন্ন্যাসীকে কুমুদিনীর শিররে বসিতে দেখিয়াছিলেন তিনি হবিনাথ মুখোপাধ্যায়। অপত্যস্নেহেব অমুবোধে সন্ন্যাসীশ্রমে থাকিয়াও আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ চিনিতে পারিয়া স্বর্ণেরশোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তাহার পিতাকে সন্ন্যাস অশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানা প্রকারে অমুবোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রতিদিন বাত্রে হবিনাথ মুখো কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিন রাত্রেই কুমুদিনী তাহাকে ঐকম অমুবোধ করিতেন। তৎপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আবোগ্যলাভ করিলে একদিন বাত্রে হবিনাথ, কুমুদিনী ও তাহার জননী সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার গৃহিণীকে বলিলেন, “দেখ সংসায়ে আমার দুই কন্যা ভিন্ন কিছুই ছিল না। যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্বদাই তাহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতাম না। সেজন্য যাহা কিছু ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম তাহা এ অঞ্চলে থাকিয়া করিতাম, কিন্তু যে দিবস হইতে শুনিলাম যে আমার সোনার প্রতিমা স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি—” বলিতে হবিনাথ মুখের কর্ণবোধ হইল—স্রীলোকগণও কাঁদিয়া উঠিলেন, তৎপরে সকলে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলে সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “যে দিবস শুনিলাম

স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি, সেই দিবস হইতে ঈশ্বরোপাসনার আর মন নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সর্বদা ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কুমুদিনীকে দেখি, এবং কুমুদিনীর গীডার সংবাদ শুনিয়া সে ইচ্ছা বলবতী হইল। কুমুকে গোপনে দেখিতে আসিলাম, প্রতি বাত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, আমি অপত্যস্নেহেব স্নোতে যে বাধ বোধিতা-বাগিয়াছিলাম তাহা ভাসিয়া গেল—আমাব এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছা হয়—” এই কথা বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং তাহার জননী উভয় সন্ন্যাসীব পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিল, “বাবা আমাদের আবধেই নাই—”

সন্ন্যাসীব দ্ববগিলিত নখনাশ্র কুমুদিনীব মস্তকে পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণেব পব বলিল, “আমি আব তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাউব না। যদি তোমরা আমাব একটা অমুবোধ রাখ।” কুমুদিনী বলিলেন, “বাবা কি অমুবোধ—তোমার অমুবোধ রাখব না। বাবা তুমি যে আমাদের সব।” হবিনাথ তাহার পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, “আমি কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, কেমনবা কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না।” কুমুদিনীব মাতা বলিলেন, তোমাব মেয়ে, তুমি বিবাহ দিবে, কেহ আপত্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমার হাবাইয়াছিলাম—আর

একত্রে তোমার মতে অমত করিব না।”
 হরিনাথ বলিলেন “আমি আমার কন্যার
 এবিষয়ে মত জানতে চাই।” কুমুদিনী
 লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। মুখ
 রক্তিমাবর্ণ হইল—মস্তকে দ্বিগুণ অঞ্চল টা
 নিলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন
 না। কিন্তু সন্ন্যাসী পুনঃপুনঃ উত্তর চাও
 য়াতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন “বাবা যদি
 প্রাণ দিলেও তুমি ঘরে ফিরে এস, তবে
 তাও আমি দিব।” হরিনাথের আফ্লা-
 দেয় সীমা রহিল না; কাঁদিতেন কুমুদি-
 নীকে আশীর্বাদ করিলেন—সে বাজেই
 যন্ত্রাশ্রমী হইলেন। কোন গোপনীর
 কারণেই হউক আর পিতৃদেহ বশতঃই
 হউক কুমুদিনী অগত্যা বিবাহ কবিত্তে
 স্বীকৃতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তুষিতচাতক—করকাভিঘাতী মেঘ।

হরিনাথ বাবুব গৃহে প্রত্যাগমন ও কুমু-
 দিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস অপ-
 রাহে গ্রামপ্রান্তে একটি উদ্যানে বসিয়া—
 রজনীকান্ত শুনিলেন। এই সংবাদ শুনি-
 বামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে ভয়মিশ্রিত
 আশার সঞ্চার হইল। অনেককণ চিন্তা
 করিতে লাগিলেন—কি চিন্তা? তাঁহার
 কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল?
 এই নূতন সংবাদে আজ সেই চিন্তা
 অতি গাঢ়তর হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল
 তথাপি রজনী সেইখানে বসিয়া ভাবি-
 তেছেন—উদ্যানের পশ্চাতে একটি অতি

বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড; তন্মধ্যে
 দশ বাবটি গাভি বিচরণ করিতেছে। এ-
 কটা রাখাল বিচিত্র স্ববে গাভিদিগের গৃহে
 প্রত্যাগমনের সঙ্কেত করিতেছে। রজনী-
 কান্ত সেই বাঁঠপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া
 আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি
 হইল—চন্দ্রোদয় হইল—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া
 বামিনী মধুর হাসি হাসিয়া অন্ধকারের
 কালো গাড়ী—ধাসা ফুলদার সেই কেরে-
 পের মাড়ী অপমৃত্ত কবিয়া, ঘোমটা
 খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল—সে কাণ্ড
 দেখিয়া, রজনীর বাগানের ফুল, গাছের
 পাতা, মাঠের ঘাস, সবোবরের জল,
 সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচাফি করিয়া
 হাসিয়া উঠিল। তৎসহিত রজনীর হৃদ-
 যও হাসিল, কিন্তু চিন্তা আরও গাঢ়তর
 হইল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল,
 তথাচ তাঁহার সংজ্ঞা নাই, একজন পরি-
 চাবক কি বলিতে আসিয়া পশ্চাতে
 দাড়াইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া
 আশ্বেত পলাইল। রজনী যে কি চিন্তা
 করিতেছিলেন তাহা আমাদের পর্য্যায়-
 ক্রমে অনুসরণ করিয়া প্রয়োজন নাই।
 কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি শেষ
 সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার শ্বশুর হরি-
 নাথ বাবুব সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সেই
 উপলক্ষে যদি কুমুদিনীর সহিত একবার
 সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাহা
 কর্তব্য। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
 কেমন করিয়া কথা কহিবেন এবং কি
 কথা কহিবেন আর কি প্রকারেই বা

তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়া ছিলেন। মনের ব্যস্ততাহেতু সেই রাজ্যেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। রজনী ক্ষতপাদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অল্প ক্ষণেই হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড়বাবু কোথায়?” সে বলিল “বড়বাবু ও শরৎ বাবু খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছেন।” রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন “শরৎ বাবু কে?” দ্বারবান উত্তর করিল “শরৎ বাবু, বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা—আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।” এই কথা শুনিয়া রজনী খিড়কির উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুষ্করিণীর প্রান্তবর্নির্মিত সোপানাবলীর একটা সোপানে তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়া চন্দ্রালোকে কথোপকথন করিতেছিল। পুষ্করিণীর চারিদিকে বৃহৎ কামিনীবৃক্ষবকেয়ারি ছিল। রজনী পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন ছুইজনের একজন কুমুদিনী আর অন্যজন এক যুবা পুরুষ। যে যুবা, সেই রাজ্যে ডাকাত দিগের হস্ত হইতে তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল সেই যুবা। রজনী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক কামিনী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেইখানে বাহা

শুনিলেন তাহাতে তিনি প্রস্তুতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন যে যুবক অতি ব্যগ্রভাসহকারে কুমুদিনীকে কি বলিতেছে; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন না—শরৎকুমার কুমুদিনীকে বলিল “তবে কেন—কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত অবস্থায় আমার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে—কেন তুমি আমার প্রতিদেবস দেখা দিতে—তুমি কি জানিতে না তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র লোকে মোহিত হয়—তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এতদৃশ্য করিলে? কেন আমার চির অভাগা করিলে? ইহার দায়ী তুমি—কুমুদিনী বল—বল,—বল, আগায় বিবাহ করিবে কি না—”

উত্তর নাই; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপান প্রান্তে বসিয়া আছেন। শরৎকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন “কুমুদিনী আমার অল্প বয়স—২২ বৎসর মাত্র—আমার আরও বহুকাল বাঁচিবার আশা আছে কিন্তু তোমার এক কথায় বহুকাল বাঁচিবার আশা একেবারে ঘুচিবে—একবার তুমি বল আমি সংসারে থাকিব কি না।” কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না—অক্ষুটস্বরে মুখাবরণ করিয়া বলিলেন “থাক” এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জায় বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন। শরৎকুমারের হৃদয় স্থখে উছলিয়া উঠিল। শরৎকুমার কুমুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করা অকর্তব্য বিবেচনা

করিয়া, গহাভিমুখে চলিল। হাসিতে২ চলিল—আর কামিনী বৃক্ষেব তলার রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া কি কবিল? হাসিতে লাগিল?

তিনি বজ্রাঘাতবাহিত ব্যক্তিব ন্যায় মুমূর্ষু হইয়া, কামিনী বৃক্ষেব একটি ডাল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহ্য হইল, ভয়ঙ্কর হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কবিত্তে লাগিলেন। আসিতে আসিতে উদ্যানেব মধ্যে তাঁহাব সেই মনোহাবিণীৰ দেখা পাইলেন; পুনরায় প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী গজেন্দ্র গমনে চক্সালোকে হাসিতে২ আসিতে ছিল। বজ্রনী দেখিলেন কুমুদিনী কোন অসীমসুখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্ত তাঁহার লাবণ্য বিগুণ বর্জিত হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া বজ্রনী চক্ষু মুদিলেন। ইচ্ছা হইল কুমুদিনীৰ সন্মুখে সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কুমুদিনী হাসিতে২ তাহাব নিকট আসিল। বজ্রনী মুখ নত করিয়া বহিলেন—সে লাবণ্য তাঁহার অসহ্য হইল। কুমুদিনী অতি মধুব স্ববে বলিল ভগিনীপতি, এস গৃহে চল; এষ্ট বলিয়া হস্ত ধবিল। বজ্রনীৰ শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিজ্ঞাসা কবিল ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? রজ্রনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? কুমুদিনী উত্তর না পাষ্টয়া তাঁহাব মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন দেখিলেন, মুখ অতি স্নান, দৃষ্টি মুক্তিকার প্রতী। কুমুদিনী অতি কোমল স্বরে

আদব কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন “কেন, ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? শরীরে কি কোন অসুখ হযেছে?” বজ্রনী সে আদবের স্ববে উদ্ভত হইয়া উঠিলেন—এবং বিকৃতস্ববে বলিলেন “শারীরিক অসুখে, না তা নয়।”

কুমু। তবে কেন কাঁপিতেছ?

বজ্র। কেন কাঁপিতেছি তোমায় কি বলিব কুমুদিনী?

কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠস্বরে আদব কবিয়া বলিল “ভগিনীপতি, আমার বলিবে না ত কাকে বলিবে—আমাব মাথা খাও আমার বল।”

রজ্র। তুমি কি বুঝিবে কুমুদিনী! তুমি ত কখন নাবী রূপেব মহিমা দেখিয়া ভুল নাই—যদি কখন জন্মজন্মান্তরে পুরুষ জন্ম ধাবণ কবিয়া কোন যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হও তবে তখন বুঝিতে পাবিবে আমি কাঁপিতেছি কেন।”

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল “ভগিনীপতি যাহাবা স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, তাহাদিগেব কি দিবাবাত্র এই প্রকাব হাত কাঁপে। তোমার কি দিবাবাত্র এই প্রকাব হাত কাঁপে?”

রজ্রনী। কুমুদিনী, আজ এক বৎসব যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—যাহার রূপ দিবাবাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান কবিয়া থাকি, সেই আদব করিয়া আজ আমাব হাত ধবিয়াছে। ঐক্ণে বুঝিলে কুমুদিনী কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? হাত কি কুমুদিনী—আমাব

হৃদয় কাশিতেছে।” কুমুদিনী রজনীর হস্ত ত্যাগ করিলেন, লজ্জার মুখ বক্তিমাবর্ণ হইল, গৃহে বাইতে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। রজনী পথ অববোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন, কিন্তু কুমুদিনী বলিতে দিল না—অতি মধুব, অতি স্থিৰ, কাতব, অথচ গম্ভীর স্ববে বলিল “তুমি আমার ভগিনীপতি ছিলে—আজ—চিব কাল থাকিবে—কেন না আমাব স্বৰ্ণ আজ্ঞা আমার পক্ষে মরে নাই—কখন মবিবে না—এ হৃদয়ে চিবকাল জাগিবে। আমি কি স্বৰ্ণেব স্বামী কাড়িয়া লইব? ছি। যদি আর এ কথা বলিবে, তবে এই কুমুদিত কামিনীর ডালে, এই আঁচল গলায় বাধিয়া, তোমাবই সন্মুখে মবিয়া স্বৰ্ণের কাছে গিয়া আশ্রয় লইব।”

বজনী কাঁচা ছেলে। যদি আগাদের মত, বিজ্ঞ লোকের কাছে পবামর্শের জন্য আসিত, তবে আমবা পবামর্শ দিতাম যে বাপু, যা হলো তা হলো, এখন আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই—এখন চখেব জল মুছিয়া, ঘবে গিয়া সকাল২ আহাৰ করিয়া, শয়ন কব। কাল সকালে আব কোন একটা সুন্দরী কন্যাব সন্ধান কবা যাইবে। কিন্তু বজনী কাঁচা ছেলে, অত বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল, “আমি এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম।”

কু। যদি তোমার প্রতি আমার কি প্রকার স্নেহ বৃত্তিতে পারিয়া এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তবে—কেন আপ-

নার মনে ও রূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়া ছিলে—

বজ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই কিন্তু এখন করিয়া ছিলাম।

কু। কেন—এখন কিসে?

বজ। আমি আগে বৃত্তিতে পারি নাই যে আমা হইতে শরৎ কুমার তোমাব অমুগ্রহেব পাত্র—

কু। (অতি কঠিন স্বরে) আমি জানিতাম বজনী বাবু ভদ্র লোক, কিন্তু তিনি যে ইতবেব জার আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শুনেন তাহা জানিতাম না—বেস কবেছেন—কিন্তু আমাব সঙ্গে আব কখন যেন সাক্ষাৎ না হয়।”

এই বলিয়া কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন; রজনী বিস্মিত হইয়া সেই ধানে বহিলেন। তৎপরে আত্মস্তুতি লাভ করিয়া দৌড়িয়া কুমুদিনীৰ সন্মুখে গিয়া বলিলেন “আমার একটা শেষ কথা শুন—এ কথা তোমার শুনিবার কোন আপত্তি নাই। আমার যে কটুক্তি করিলে তাহার আমি যোগ্য নহি; আমি ইচ্ছাপূর্বক তোমাদিগেব গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমার দ্বারবানেরা বলিল যে তোমার পিতা এই উদ্যানে আসছেন; আমি তদনুসাবে এখানে আসিলাম। কামিনী বৃক্ষ পর্যন্ত আসিয়া তোমাদিগেব কথা বার্তা শুনিলাম। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলাম—কেন তাহা আর বলিতে

চাহি না। সুতরাং তোমার শেষ কথাও
তুনিতে পাইলাম—আমি ইচ্ছাপূর্বক
তোমাদের কথা শুনি নাই—আমি
অভক্ত নহি; আমি ইতর নহি—তুমি
আমায় এপ্রকার স্বভাবান্বিত মনে কবিলে
আমাব মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমাব সহিত
আর তোমাব সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি
আমার সব। তোমাব সম্মুখে শপথ করি-

তেছি আব দেখা দিয়া তোমার যত্নণা
দিব না।”

এই বলিয়া বঙ্গনীকান্ত বেগে সে স্থান
হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী দেখি-
লেন যে রজনী এই কথা যখন বলিত-
ছিলেন, তখন তাঁহাব চক্ষে ছুই এক
ফোটা বারিবিन्दু পড়িয়াছিল—কুমুদিনী
বাথিতা হইয়া সেইখানে ঠাঁড়াইয়া বহি-
লেন।

সুহৃৎ—সঙ্গম।

[কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে।*]

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(১)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গ,
বাজ দেখি বীণা আনন্দেব সাজ,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তবজ
ভাসা দেখি তায় আশাব ফুল।

(২)

শুনিয়া প্রাচীন “অর্কিউস” গান
পাইল চেতন অচল পাষণ,
শ্যামেব বাশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসাৰে কুল ॥

(৩)

তুই কি নারিবি চেতন পবাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উখলিয়া শ্রেত জীবৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-ভরুর মূল?

(৪)

“কোথা বালা-সখা—” বলি একবার
ডাক দেখি সুখে মিলে সব তার,
“আর রে শৈশব সুহৃৎ আবার
আশাব কাননে খেলাতে যাই।”

(৫)

বল্, বীণা, বল্ “নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, মিলিলে স্বপনে,—
আজ্জ্ কি তাঁদের স্মরণে নাই।”

(৬)

“স্বপ্নে কি নাই সে সৌভভময়
শৈশবেব প্রিয় পাদপ নিচয়,
তডাগ, প্রাকণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জডালে যাহাতে শিশুব ধায়।”

* লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা
রি-উইনিয়নে লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়া ছিল।

(৭)

“ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসিয়ে বাহাতে জীবনের তবী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া ॥

(৮)

“পড়ে নাকি মনে কত দিন হায়,
‘মা’—‘মা’ বলি প্রবেশি আলম
কত স্নেহে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা ।

(৯)

“সেইরূপে পুনঃ কবিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে স্নেহ ছরত
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা ॥

(১০)

“নবীন প্রবীণ এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
কবেছি প্রাণের কপাট খুলে ।

(১১)

“লবু আশা, হায়, লবু তৃষা লম্ব
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, ঘেঁষ সকলি ভুলে ।

(১২)

“তবে কি এখন নাবিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
ভুলেছে তবঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

(১৩)

“কবিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
কত কি সে সব শিবির জরনা
ছিন্ন ভূগ সম বিফল হবে?

(১৪)

“চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি স্মৃতিম স্মৃতিম মুরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায় ।

(১৫)

“আমবাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম স্নেহে আগে সে যেমন
অইখানে যবে কবেছি ভ্রমণ
ভান্ন, বুড়ি-ধাবা ধবি মাথায় ॥

(১৬)

“অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখে কত বাব,
ভেবেছ কি কত কত বস্ত্র তার
কবাল কৃতান্ত কবেছে চুবি?

(১৭)

কোথা সে আজি বে কণজন্মা ধীর
“হারিক” স্নেহ বন্ধের মিহিব ।
কোথা “অনুকূল” মলয় সমীব !
“দিনবন্ধু” বঙ্গ-সাহিত্য-চুবি?

(১৮)

“ক্রীষদুগ্ধদন” কোথা সে এখন!
তাব তরে আব কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বন্দেব প্রদীপ্ত প্রভাত তারা?

(১৯)

“হে বন্ধিম, সখে তোমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না ববে—
কালেতে হইবে সকলি হাবা।

(২০)

“তাই বলি ভাই এসো একবার
সম্মুখসরে স্মৃথে মিলি হে আবাব,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের ছাব
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

(২১)

“আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালিব ক্ষুদ্র জীবন সম্বল
কবে সে ফুঁবাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকবন্দে!

(২২)

“এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয় দর্পণ,
স্বথপূর্ণ মহী, স্বথপূর্ণ মন—
সকলি স্মরণ মাধুবীময়।

(২৩)

“সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচাব
ধনাচ্য, কান্দাল, বাঁজপুঞ্জ আব,
একি সে আসন, পঠন সবাব—
আনন্দে হৃদয় মগন রয় ॥

(২৪)

“সেই স্বথময় স্মৃতেব মেলা,
পেয়েছ আবাব কব সবে খেলা,
স্বথের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

(২৫)

বাজ বীণা এবে মিলি সব তাব,
মৃদুলা মৃদুলা করিষা ঝংকার,
প্রণয় কুসুম ফুটাবে সবার,
সবস মধুব জলদ তালে ॥

[কোবস]

বসন্ত পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গ,
বাজ বীণা, বেগে আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে স্বথের তবঙ্গে,
ভাসাবে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষণ,
শ্যামেব বাঁশীতে যমুনা উদ্ভান
বহিল উল্লাসে রসায় কুল ॥

তুই কি নারিবি চেতন-পবাণে,
স্মৃতি সঙ্গমে এ স্বথের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিঙ্গাতে প্রণয়-তরুর মূল ॥



বর্ষ সমালোচন।

সম্বাদ পত্রের প্রথা আজ, নববর্ষ
প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল
সমালোচনা কবিত্তে হয়। বঙ্গদর্শন

সম্বাদ পত্র নহে, স্মৃতিবাহ বঙ্গদর্শন বর্ষ-
সমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমা-
দেব কি সাধ কবে না? যেমন অনেকে

রাজা না হইয়াও রাজকারদার চলেন, যেমন অনেকে কানা বান্ধালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাথে কোর্ট পেটেলুন আটেন, আমবাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোদুড়িও প্রচণ্ড প্রতাপ শালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ কবির ইচ্ছা কবিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতিব এমনই ছবদৃষ্ট, যে যে যখন যে সাধ কবে, তাহাব সেই সাথে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমবা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে বামায়ণ! সৌভাগ্যেব বিষয় এষ্ট যে বঙ্গদর্শন বচনাসম্বন্ধ কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছা চারী। অতএব আমবা, মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাথে বিষাদ ইত্যাদি অল্প প্রেমের লোভ সম্বরণ কবিয়া, অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ শালের সমালোচন কবিব। অতএব হে গতবর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন কবিব।

গতবৎসবে রাজকার্য্য কিকপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যে অনেক অমু-সন্ধান কবিয়া জানিয়াছি। যে এই বৎসবে তিনশত পয়ষটি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি কবিয়া মিনিট ৬০ ছিল। কোনটির আমবা এক টিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন

নাই। ইহাতে তাহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে এ বৎসবে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমবা এ কথাব অমুমোদন করি না, দিন কমাইলে কেবল চাকুবিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রম-লাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমবা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে। আমবা কর্তৃপক্ষগণকে অমুরোধ কবিতৈছি, বাব মাসই শীতকাল থাকে এমন একটি আইন প্রচাবের চেষ্টা দেখুন।

আমবা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসব সকলেবই এক এক বৎসব পবমাযু চুবি গিয়াছে। কথাটার আমবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবি না। আমবা প্রত্যক্ষ দেখিতৈছি, আমাদেব ৭১ বৎসব বয়স ছিল, এ বৎসব ৭২ হইয়াছে। যদি পরমাযু চুরি গেল, তবে একবৎসব বাড়িল কি প্রকারে? নিকক সম্প্রদায়ই এমন অযথার্থ প্রবাদ বটাইয়াছে।

এ বৎসর যে স্তবৎসব ছিল, তাহাব বিশেষ প্রমাণ এষ্ট, যে এ বৎসব অনেকেবই সন্তান জন্মিয়াছে। টিষ্টিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের স্তন্যক কন্মচাবিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহাবও ২ পুত্র হইয়াছে, কাহাবও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহাব গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। হুঃখের

বিষয় এই যে এবৎসর কতক গুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিরাজে। গুলিয়াছি যে এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেণ্টে আবেদন করিবেন, যে এই পুণ্যভূমি ভাবতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহা বা এই রূপ প্রস্তাব করেন, যে যদি কাহারও নিতান্ত মৰা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিশে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসবে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্ট-মেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। তাঁহা বিশ্ব-কর হউক বা না হউক, বিশ্বকব ব্যাপ্তাব এই যে তাঁহাতে গবর্ণমেন্টের টাকা, হয় কিছু উন্নত হইয়াছে, নব কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমরা একথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এ বাব বিচালয় সকলের কার্যের আমরা বিশেষ সূখ্যাতি করিতে পারি-লাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ কবি-রাজে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা না-লিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না; যে থানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে, নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রোজ চাহক, বা

না চাহক স্বর্গদেব সর্বত্র বোজ করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহক বা না চাহক, মেঘ ক্ষেত্রে বৃষ্টি কবিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহক বা না চাহক, বিচারকেব উচিত গৃহে চুকিয়া বিচার কবিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন, যে বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জনী সকল অকস্মৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য, যে গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সম্মার্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিম দিগেব বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্প-প্রিয় ইহা বাও তেমনি সম্মার্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আশা এমনও গুলিয়াছি যে গবর্ণমেন্টের কোন অধস্তন কর্মচারী প্রস্তাব কবিয়া-ছেন, যে যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারি-গণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া” সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণের জন্য “অর্ডার অব দি ক্রমস্টিক্” সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষতঃ গণবান্ ডিপুটি এবং সবজজপ্রভৃতিকে বাছিয়া লাকলা-ইনের দড়িতে এই মহাবস্ত্রটিকে বাধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকানি চেন চাদর বিভূষিত সদা কম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ণ শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদ

স্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদবে গ
হীত হইবে, তাহা আমবা শপথ করিয়া
বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা
এই যে এত উমেদওয়ার যুটিয়ে যে কীটার
সম্ভলান করা তার হইবে।

গতবৎসর স্মৃষ্টি চইয়াছিল। কিন্তু
সর্বত্র সমান হয় নাই। ইচ্ছা মেঘদি-
গেব পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশ
বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশেব লোকে
গবর্ণমেন্ট এই মর্শ্ব আবেদন করিয়া
ছেন, যে ভবিষ্যতে যাহাত সর্বত্র স
মান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত
হউক। আমাদের বিবেচনায় ইহাব
সহুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি
সংস্থাপিত কবা উচিত। কোন২ মান্য
সহযোগী বলেন, যে যদি সবকাব হইতে
মেঘদিগেব বাবববদাবি ববাদ হয়, তাহা
হইলে তাহাদিগেব কোন দেশেই যাই
বার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু
আমাদিগেব বিবেচনায় ইহাতেও স্মৃবিধা
হইবেনা—কেননা বঙ্গদেশেব মেঘ স
কলঅত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনী
গণকে ছাড়িয়া টাকাব লোভেও দেশ-
দেশান্তরে যাইতে স্বীকাব কবিবে না।
আমবা প্রস্তাব কবি যে মেঘ সকল এবা
লিশ কবিয়া দিয়া, ভিত্তীব বন্দোবস্ত
কবা হউক। ক্ষেত্রে এক একজন
চাপবাশী বা স্মৃগোগ্য ডিপুটি এক এক
জন ভিত্তীকে দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাধিয়া
উর্দ্ধে উথিত কবিয়া তুলিয়া ধবিবেক,
ভিত্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া
পাবে ত নাগিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশেব কামিনীগণ বে দেশ
হিতৈক্ষী নন—নহিলে ভিত্তীব প্রয়ো-
জন হইত না। তাহাবা যদি প্রাত্যহিক
সাংসাবিক কাগাটা মাঠেগিয়া কাঁদিয়া
আসেন, তাহা হইলে অনাবাসেই কৃষি

কার্যেব স্মৃবিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেন্ট
এবালিষ করা যাইতে পাবে। তবে
আমবা লোকেব শাবীরিক ও মানসিক
মঙ্গলার্থ বলি, যে আকাশবৃষ্টিব পবিবর্তে
নাবীনয়নাশ্রব আদেশ কবিত্তে গেলে,
একটু পাকা রকম পুলিষেব বন্দবস্ত
কবা চাই। মেঘেব বিছাতে অধিক
প্রাণী নাশ হয় না, কিন্তু বমগীনয়ন-
মেঘেব কটাক্ষ বিছাতে মাঠেব মাঝখানে,
চাষা ভূষোব ছেলোদব কি হয় বলা যায়
না—পুলিষ থাকা ভাল।

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোল
যোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি
অনেক বিদ্যালয়েব ছাত্রেবা এক একটা
কাণনাপা কাটি প্রস্থত কবিয়াছে। তাহা
দেব মনে ঘোব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে
—তাহাবা বলে, অধ্যাপকদিগেব শ্রব
নেজ্জিগুণি মাপিয়া দেখিব—নহিলে
তাহাদিগেব নিকট পড়িব না। আমরা
ভবসা কবি মাপা কাটি ছোট পড়িবে,
এমত সম্ভাবনা কোপাও নাই।

যাহা হউক, দুর্বৎসব হউক, সুবৎসব
হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমবা স্তিব
জানিতে পারিতছি—তদ্বিষয়ে কোন
সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসবটি চলিষা গিষাছে।
এ বিষয়ে মতাস্তব নাই।

দ্বিতীয়, বৎসব গিষাছে, আব ফিবিবে
না। ফিবাঈষাব জন্য কেহ কোন
উদ্যোগ পাঠিবেন না। নিশ্চল হইবে।

তৃতীয়, কিবে আব না কিবে, পাঠক।
আপনাব ও আমার পক্ষে সমান কথা,
কেন না, আপনাব ও আমাব, পাঁচাত্তবেও
ঘাস জল, ছিষাত্তবেও ঘাস জল। আপ-
নাব মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলেব
প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

—০০০—

চীন, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডীয়া, মিসর এবং গ্রীস দেশে খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্বে হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয়। চীনেবা এই শাস্ত্র বাঙ্গলানীতি এবং হিন্দু কাল্‌ডীয়া ও মিসর জ্যোতিষা ধর্ম্মনীতির ন্যায় অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করিতেন। কিন্তু গ্রীসে বাঙ্গলানীতি, ধর্ম্মনীতি অথবা কলিত জ্যোতিষের সহিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কোনরূপ সংশ্লিষ্ট না থাকায় উক্ত দেশে জ্যোতির্বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। হিপার্কাস্ এবং টলেমি কর্তৃক যে জ্যোতির্বিদ্যাবিশেষ অশীলন আরম্ভ হয়, নিউটন এবং লাপ্লাসের দ্বারা তাহারই পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কোন সময়ে চীন, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার আবিস্কার হয় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন; এবং আধুনিক কৃতবিদ্যা মহোদয়গণ জ্যোতিষবিশেষের গৌরব রক্ষার্থ যত্নবান হওয়াতে এই বিষয়ের মীমাংসা অতীব দুঃসহ হইয়াছে। যাহা হউক, কাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিলে প্রতীতি হইবে যে তত্বেদেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বহুকালব্যাপী অশীলন হয় নাই।

চীন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিবরণ হইতেই চীন দেশীয় জ্যোতির্বিদগণের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাট্ ফোহির রাজত্ব সময়ে চীন দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ফোহি এবং নোয়া ব্যক্তিবিশেষের নামান্তর মাত্র। ফোহি জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং গগনবিহাবীদিগের আকৃতি নিকপণেও বহুবিধ যত্ন করিয়াছিলেন। হোয়াংটাব রাজত্ব সময়ে (খ্রীষ্টাব্দঃ পূঃ ২৬৯৭ অব্দে) যুসি উপমেক্স নক্ষত্র, এবং ইহার চতুর্পার্শ্বস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি অচল এবং সচল বৃত্ত সম্বলিত একটি গোলক নির্মাণ করেন, এবং চাবিটী প্রধান দিগ্‌নিরূপণোপযোগী যন্ত্রের (যাহা কেহ দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গব্রিল সাহেব লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনেরা অপমণ্ডলের তির্য্যাক্তা এবং গ্রহণের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিয়াছিলেন; এবং ইহার বহুকাল পূর্বে সৌর বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং শঙ্কু-

জারা দ্বারা সৌর মাধ্যমিক উন্নতি অব-
ধারিত করিয়া সূর্যের ক্রান্তি নির্ণয়, এবং
যেক্ষণ উন্নতি প্রভৃতি নিরূপণের উপায়
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গব্রিল আরও
নিখিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে প্রণীত
চীন দেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক গ্রন্থ
পাঠে অসংগত হওয়া যায়, যে চীনেরা
সূর্যের এবং চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি, এবং
গ্রহগণের পরিভ্রমণকাল নিরূপণ করিয়া-
ছিলেন। ডিউহোও বলিয়াছেন যে চিউন
কং নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ প্রায়
১০০০ বৎসর খৃঃ পূঃ নভোমণ্ডল পর্য্য-
বেক্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুণ্ড্র নক্ষত্রগণকে
শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয়।

হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ নাক্ষত্রিক বর্ষের
দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট,
৩০ সেকেন্ড; এবং সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য
৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫০ ১/২ মিনিট নিরূ-
পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গণ-
নামুসারে বিষুবদ্বয় প্রতিবৎসর ৫৪" পুরো-
গমন করে। তাঁহারা অপমণ্ডল নিরক্ষ-
বৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপন্ন করেন
তাহা ২৪° পরিমিত; চন্দ্রকক্ষও নিরক্ষ-
বৃত্ত পরস্পর তির্য্যগ্ভাবে ছিন্ন করিয়া
যে কোণ উৎপাদন করেন তাহা ৪° ৩০'
পরিমিত; বৃহ, শুক্র এবং শনির কক্ষাব-
নতি ২° ১০' মঙ্গলের কক্ষাবনতি ১° ৩০'
এবং বৃহস্পতির কক্ষাবনতি ১° পরিমিত
বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা কক্ষ-পরিধি

বোজন দ্বারা পরিমাপ করিতেন। কোল-
ফ্রক্ক বলিয়াছেন যে আর্থাভট্ট পৃথিবীর
পরিধি ৩৩০০ বোজন নিরূপণ করিয়া-
ছিলেন। ৩৩০০ বোজনে ২৫,০৮০ মাইল;
অথবা এক অংশে ৬৯.৭ মাইল গণিত
হয়। কোলফ্রক্ক আরও বলিয়াছেন যে
গ্রহগণের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু, ও দূর
বিন্দুর গতি বিষয়ক হিন্দু সিদ্ধান্ত, চন্দ্রের
পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দুর সা-
দৃশ্য হইতে অনুমিত হইয়াছে। টলেমি
প্রচারিত মতের যে অংশ হিপার্কসকর্তৃক
উদ্ভাবিত হয়, তাহাও হিন্দুদিগের অবি-
দিত ছিল না। ইহারা লকার বায়োমাত্র
বৃত্ত হইতে দ্রাঘিমা গণনা করিতেন।
সৌরবৎসর, চান্দ্রমাস এবং বিষুবন্তের
পূর্বাগমন এই তিন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতি-
ষিক গণনা যে হিপার্কস অথবা টলেমির
গণনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন
হিন্দুবা আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফল
মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য
দশটি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের
উল্লেখ করিয়াছেন; তদ্যথা (১) গোল,
(২) নাড়ীবলয়, (৩) ঘটি, (৪) শঙ্কু, (৫)
ঘটা, (৬) চক্র, (৭) চাপ, (৮) বৃত্তপাদ,
(৯) ফলক, (১০] ধীষত্ব। * ইহা ব্যতীত
সূর্য্যসিদ্ধান্তে নবযন্ত্র † এবং সমুদ্র রেণু-
গর্তাখ্য ‡ যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১১অ ২।

† হু সি ১৩ অ ১৪

‡ হু সি ১৩ অ ২২।

হিন্দুরা ৪৩২,০০০ বৎসরে একযুগ এবং লশযুগে অথবা ৪,৩২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, এবং এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প অথবা ব্রহ্মাব একদিবস গণনা করিতেন। এই সুদীর্ঘ কালের সহিত জ্যোতিষিক কালচক্রের সম্বন্ধ নিরূপণার্থ পণ্ডিতেরা নানাবিধ যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।*

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে ববাহ মিহিব এবং ব্রহ্মগুপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরীতে জ্যোতির্বিদগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্মগুপ্ত খৃঃ ৬২৮খৃঃ অব্দে, এবং কোলব্রুক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে তিনি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী শেষে বর্তমান ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত “ব্রহ্মসুট সিন্ধাস্ত” অথবা “ব্রহ্ম সিন্ধাস্ত” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। কোলব্রুক বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থে গ্রহগণের সমগতি ও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ বিষয়ক গণনা, সাময়িক সম্পাদ্য, ভূপৃষ্ঠ স্থান নিরূপণের উপায়, সৌর এবং চান্দ্র গ্রহণ

গণনা, গ্রহগণের উদয়াস্ত কাল নির্ণয়, শঙ্কুবাণা উন্নতি পর্যবেক্ষণ, গ্রহগণের পরস্পর এবং নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ, চান্দ্র এবং সৌর গ্রহগণের কাব্য, এবং গোল প্রভৃতি নির্মাণের উপায়, বর্ণিত আছে।

এই সকল স্বীকৃত বিষয় হইতে কোলব্রুক এবং উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদগণ অনুমান করিয়াছেন যে—বরাহমিহির খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহির কলিত-জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ সংকলন এবং “বৃহৎ সংহিতা” প্রণয়ন করেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদগণ খৃঃ ২০০ অব্দে অপর এক বরাহমিহিবের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণে জনশ্রুতি আছে যে বরাহমিহিব রাঢ়া বিক্রমাদিত্যের সভাব একটা রত্ন ছিলেন। তাহা হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে জীবিত ছিলেন তাহাব কোন সন্দেহ নাই।†

আর্য্যভট্ট, (আরবেবা যাহাকে আর্য্য বাহাব বলে,) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আর্য্যভট্ট জ্যোতিষ এবং বীজগণিত বিষয়ক যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন।

পুলিষ এবং পরাসর প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ আর্য্যভট্টের সময়ে অথবা তৎপূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহাদিগের

† বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি ছিলেন।

বং সং

* এ বিষয়ে একটি কথা আম দিগেব মনে হয়। বিষ্ণুবর্ষ প্রতিবৎসর ৫৪ পুরোগমন করে তাহা হইলে ৩৬০° [সম্পূর্ণ মণ্ডল] ২৪০০০ বৎসবে পুরোগমন করিতে পারে। ইহাবই অষ্টাদশ গুণ ৪৩২০০০। কিন্তু আমবা স্বীকার করি ইহাকে বলে, “গৌড়া মিলন।” প্রাচীন আর্য্যঠাকুরেরা এইরূপ গৌড়া মিলন দিয়াছিলেন কি না কে জানে?—বং সং

বিরচিত কোন গ্রন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভাস্করাচার্য্য “লীলাবতী,” “বীজ-গণিত,” “সিদ্ধান্ত শিবোমণি” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক গ্রন্থ “সূর্য্য-সিদ্ধান্ত” কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় নাই। অতি প্রাচীন গন্থ সকলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এক্ষণে যে গ্রন্থ “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” নামে প্রসিদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই গ্রন্থেবই নাম “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” ছিল কি না তাহা নিক পণ কবা সুকঠিন। হিন্দুবা সনদের সময়ে আপনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থেব ভ্রম সং-শোধন করিতেন, কিন্তু গ্রন্থের নাম পবি-বর্ত্তন কবিতেন না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেকাংশ পবিবর্ত্তিত হ-ইয়া আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বেংটলী সাহেবের মতে ববাহমিহিব “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” প্রণেতা; কিন্তু কোলক্ক এই মতের অপলাপ করিয়াছেন।

হিন্দু এবং ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রা-নুসারে রাহ নামক গ্রহদ্বাবা সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রন্থ হওয়াতে গ্রহণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি, অবস্থান, বক্রগমন প্র-ভৃতি পাতবিন্দু এবং সংযোগবিন্দু অধি-ষ্ঠিত দেবতাদিগের প্রভাবেই হইয়া থাকে। সূর্য্যভট্ট গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবীর আক্ষিক গতিও নির্ণয় করিয়াছিলেন;

এবং এই আক্ষিকগতির কারণ “প্রবাহ” নামক প্রবল বায়ু নির্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই মতের অপলাপ করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ হইলে উপরিস্থিত সকল পদার্থই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের টীকা-কার পৃথুদক স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃঃ অব্দে নৌবেরী শ্যামরাজ্যে রাজদৌত্যে প্রেরিত হন। স্বদেশ প্রত্যা-গমনকালে তিনি শ্যামদেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা লইয়া যান। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ডিউবাম্প নামক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচাবক কর্ণাট দেশস্থ কৃষ্ণ বোরাম বা কৃষ্ণ বা রাম নামক নগর হইতে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা প্রেরণ কবেন। এই সময়ে পাটোই-লেট নামক অপব একজন প্রচারক ও মসলিপত্তনেব নিকটবর্ত্তী নর্শপুৰ নামক স্থান হইতে অন্যান্য জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ কবিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ল্য-জেন্টিস্ যিনি গুজ্র গ্রহের সূর্য্যতিক্রম পর্য্যবেক্ষণ মানসে ভাবতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ত্রী-বেলোর হইতে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডি-তেরা অহুমান কবিয়াছেন যে শ্যাম দেশীয় তালিকা খৃঃ ৬৭৮ অব্দে, কৃষ্ণ বোরামের তালিকা খৃষ্টীয় ১৪৯১ অব্দে, নর্শপুরের তালিকা খৃঃ ১৫৫৯ অব্দে, স্ট্রীভ্যালোবের তালিকা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১০২

অন্ধে, অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভে, প্রস্তুত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, খ্রিস্ট-যুগের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেসলী এই মতের অপলাপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোলব্রুক লেসলি'র মত প্রামাণ্যপূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন খ্রীষ্টীয় ২০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দু'বা জ্যোতির্বিদ্যার সমাগালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিলামত্ৰী গ্রীকদিগের জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রীকজাতিই সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রণেতা।

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ দেবদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত পুরাতন ঋষিদিগের দ্বারা প্রণীত; তৃতীয়তঃ যেসকল গ্রন্থ কোন অনির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক রচিত, চতুর্থতঃ যেসকল গ্রন্থের প্রণয়ন কাল এবং রচয়িতার নাম আমরা অবগত হইয়াছি।

ব্রহ্ম, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি এবং নারদ সিদ্ধান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ইহা “বিষ্ণুধর্মোত্তর” পুরাণের অন্তর্গত।

২। সূর্য্যসিদ্ধান্ত—কথিত আছে যে

সূর্য্যদেব মর নামক দানবকে* কৃত + যুগাবসানে এই শাস্ত্রে উপদেশ দেন।† সুতরাং হিন্দু গণনামুসারে এই গ্রন্থ ২১৬৪৯৭৬ বৎসর* পূর্বে রচিত হইয়াছে। বেটলী সাহেব গণনা দ্বাৰা সিদ্ধ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত খ্রী ১০৯১ অব্দে রচিত হয়; কিন্তু এই মত প্রামাণ্যপূর্ণ, সুতরাং গ্রহণীয় নহে।

৩। সোমসিদ্ধান্ত—সোম (চন্দ্র) এই গ্রন্থ প্রণেতা। বেটলী সাহেব বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতই এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে।

৪। বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ কবেন নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয় ছিল।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত—১ অধ্যায়—৪।৫।

+ কৃত—কৃ-করা+ত।

† আবুব বেগান, যিনি গজনিপতি মামুদেব সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১০৩১ খ অব্দে ভারতবর্ষের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি “লাত” নামক ব্যক্তি বিশেষকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ওয়েবাব সাহেব ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বর্ণিত “লাধ” এবং “লাত” এক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র নাম মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

* জ্যেতার (জ-রক্ষা-ইত-আ) বৎসর সংখ্যা—১২৯৬০০০ দ্বাপরের (দ্বি-পর)—বৎসর সংখ্যা—৮৬৪০০০ কলির (কল-গণনা-১) অতীত বৎসর সংখ্যা—৪৯৭৬

৫। নারদসিদ্ধান্ত—ইহা দেবর্ষি নারদ প্রণীত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। গর্গসিদ্ধান্ত—এই গ্রন্থ একপে অপোপ্য হইয়াছে; কেবল হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে কখন কখন গর্গসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত অংশমাত্র দৃষ্ট হয়।

২। ব্যাস সিদ্ধান্ত।

৩। পবানব সিদ্ধান্ত—বেটলী সাহেব বলেন যে আর্ঘ্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায় পরাশর প্রণীত সিদ্ধান্ত লিখিত গ্রন্থগণের সমগতি বিষয়ক প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। পৌলিষ সিদ্ধান্ত—কোলক্রক এবং বেটলী এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এবং আর্ঘ্যসিদ্ধান্তের মত পবানব বিরোধী।

৫। পুলস্ত সিদ্ধান্ত।

৬। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত—বেটলী এবং কোলক্রক সাহেব বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ অদ্যাপি বর্তমান আছে। বেটলী আরও বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত—আর্য্যভট্ট “আর্ঘ্য-ভূশতক” এবং “দশগীতক” নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বেটলী সাহেব “আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত” এবং “লঘু-আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত” নামক যে দুইখানি গ্রন্থের

উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় উক্ত দুইখানি গ্রন্থেরই নামস্তর হইবেক।

২। বরাহসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির ব্রহ্ম, সূর্য্য, পৌলিষ, বশিষ্ঠ এবং রোমক সিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ করিয়া “পঞ্চ-সিদ্ধান্ত” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ব্রহ্মগুপ্ত রচিত। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম “ব্রহ্ম-সুট-সিদ্ধান্ত।” ভাস্করাচার্য্য এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “সিদ্ধান্ত শিবোমনি” রচনা করেন।

৪। রোমকসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণ বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বরাহমিহির প্রণীত সিদ্ধান্তে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৫। ভোজসিদ্ধান্ত—খ্রীষ্টীয় দশ বা একাদশ শতাব্দী খাকবাজ ভোজদেবের রাজত্ব সময়ে এই জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঁচ খানি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী ভাস্করাচার্য্য “সিদ্ধান্ত শিবোমনি” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শান্তিল্য গোত্রোক্ত ব ভাস্কব ১০৬৬ শকে* মহেশ্বরের ঔবসে জন্মগ্রহণ

* “The years of the era of Sālivāhana are, accordingly to Warren, Solar years, their reckoning commences after the lapses of 2179 complete years of the Iron age, or early in April A. D. 78

* * The years of this era are generally cited as Saka or Saka

করিয়া ৩৬ বৎসব বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত গ্রহ প্রণয়ন করেন। সহ পূর্বত নিকট বর্তী কোন নগর ইহার ঠৈতৃক বাসভূমি ছিল।†

২। পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ “সিদ্ধান্তসুন্দর;” ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃ অক্কে) গণেশ “গ্রহলাঘব” এবং ১৬২ খৃ অক্কে কমলাকর “তত্ত্ব-বিবেক” বা “সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-বিবেক” রচনা করেন। স্বর্গাসিদ্ধান্তের সুবিখ্যাত টীকাব বঙ্গ নাথের পুত্র মুনীন্দ্র “সিদ্ধান্তসারভোম” নামক জ্যোতিষিক গ্রহ প্রণয়ন করেন, এবং সিদ্ধান্ত শিবোমণি একটি টীকাও প্রস্তুত কবিয়াছিলেন।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে “স্বর্গাসিদ্ধান্ত” “সিদ্ধান্ত শিবোমণি” এবং “গ্রহলাঘব” মুদ্রিত হইয়াছে।

কালডীয়।

মাসিননাধিপতি বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার খৃ পূঃ ৩৩২ অক্কে বাবিলন আক্রমণ করেন। কথিত আছে ইহার ১৯০৩ বৎসব পূর্বে বাবিলোনীয়দিগের কতকগুলি জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ফল ক্যালিস থেনিস কর্তৃক প্রসিদ্ধ নামা আবিষ্ট টুলের নিকট প্রেরিত হয়, সূত্রবাং খ্রীষ্টীয় শকের ২২৩৪ বৎসব পূর্বে কালডীয় দেশে জ্যোতির্বিদ্যার অমূল্যলন আবস্থ

হইয়াছিল। কিন্তু টলেমী খৃ ৭২০ বৎসব পূর্বে কালডীয় পর্য্যবেক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। যদিও কালডীয়দিগের গ্রহণ গণনা করিবার প্রথা, যাহা টলেমী প্রণীত আলমাজেস্ট নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে, তাৎপশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ এষ্ট প্রথা অবলম্বন কবিয়াই পাশ্চাত্য জাতির। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বর্তমান উন্নতি করি-
য়াছেন অবশ্যই স্বীকার কবিত্তে হইবে।

কালডীয় জাতি বাশিচক্র দ্বাদশ সমান অংশে, প্রত্যেক অংশ ৩০° এবং প্রত্যেক (°) ৬০ বিভক্ত কবিয়াছিল; এবং বাশিচক্রের বহিঃস্থ চতুর্ভুজ প্রতি নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানও নিরূপণ করিয়াছিল। হেবোডোটাস্ নামক জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে কালডীয় জাতি শকু এবং পোলস্ নামক যাদুঘর সৃষ্টিকর্তা। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শকু ব্যবহৃত হয়। পোলস্ যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় কালডীয়েরা অননবিন্দু নিকটবর্তী স্বর্গের মাধ্যাত্মিক উন্নতির পবিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ করিত। খ্রীষ্ট ইহাদিগের কালমাণ-যন্ত্রস্বরূপ ছিল।

আপলোনিয়স্ মিন্ডিয়স্ নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্যালডীয় আচার্য হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অ্যাপলোনিয়স্ বলিয়াষ্টেন যে ক্যালডীয় জাতি গ্রহগণ এবং ধূমকেতু-গণ এক জাতীয় বলিয়া নির্দেশ করিত এবং

years.” Burgess's *Surya Siddhanta*, add. notes. 12

† সিদ্ধান্ত শিবোমণি—১৩ অ-৫৮৬১।

এই গগনবিহারীদিগেব গতিব নিয়মও নিৰূপণ কৰিয়াছিল। আপলেনিয়সেব বিবৰণ যদি সত্য হয়, তাহা হ'লে কাল্-ডীয় জাতি যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষেব সম-ধিক অনুশীলন কৰিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণু-মাত্র সন্দেহ থাকিবাব নহে।

জেমিনস্ লিখিয়াছেন, কাল্ডীয় জাতি যে জ্যোতিৰ্বিদ্যাব সমাগালোচনা কৰিয়াছিল তাহাব উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তাহাদিগেব গণনানুসাবে চন্দ্র ৬৫৮৫ ১/২ দিবসে সূৰ্য্য সম্বন্ধে ২২৩ বার, আপন কক্ষেব নিকট বিন্দু ও দূৰবিন্দু সম্বন্ধে ২৩৯ বাব, এবং আপন পাতাবিন্দু সম্বন্ধে ২৪১ বাব আবর্তন কৰে। তিনি আবও বলিয়াছেন, যে কাল্ডীয় জাতি অতি-শয় যত্ন সহকাৰে গ্রহগণ, বিশেষতঃ শনৈ-শচব গ্রহ, পর্য্যবেক্ষণ কৰিয়াছিল।

মিসবীয়।

পূৰ্বকালে মিসবদেশ বাসীবা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰেব অনুশীলন দ্বাৰা সমধিক প্রতি-পত্তি লাভ কৰিয়াছিলেন। ডীওডোবস্ সিকুলস্ বলিয়াছেন যে মিসবীয়েৰা গ্রহণ গণনা কৰিতে পাবিত; এবং ডীওজে নিস লেয়াৰ্চিস্ উস মিসর দেশে পর্য্যবে ক্ষিত ৩৭৩ সৌব এবং ৮৩২ চান্দ্র গ্রহণেব উল্লেখ কৰিয়াছেন। কথিত আছে যে কোনন (খৃঃ পূঃ চতুৰ্থ শতাব্দ) মিসবীয় সমস্ত সূৰ্য্যগ্রহণেব বিবৰণ সংগ্রহ কৰিয়া ছিলেন; এবং আরিসটটল্ লিখিয়াছেন যে কালডীয় এবং মিসরীয় জ্যোতিৰ্বিদ-

গণ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বাৰা যে সকল জ্যোতিষিক গণনা কৰিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রম মাত্র নাই।

মিসবীয়েৰা ৩৬৫ দিবসে বৎসব গণনা কৰিত বটে, কিন্তু ৩৬৫ ১/২ দিবসে বৎ-সব গণনা যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, তাহাও অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবগত ছিল। ডাও ক্যাসিয়স্ বলিয়াছেন যে মিসরী-য়েৰা সপ্তাহ গণনা কৰিবাব প্রথা প্রচ-লিত কৰে; এবং গ্রহগণেব নামানুসাবে সপ্তাহান্তৰ্গত দিবস সংখ্যাব নাম নির্দেশ কৰে। হিন্দু পুৰাণেও এ প্রসঙ্গেব উল্লেখ আছে, সূতরাং এই মত অত্যন্ত প্রাচীন বলিতে হইবেক।

মিসব জাতি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান কৰিত। তাহাদিগেব ধাবণা ছিল যে শুক্র এবং বুধ গ্রহ সূৰ্য্য পবিত্রমণ কৰে, এবং সূৰ্য্য উক্ত পবিত্রমণকাবী গ্রহদ্বয়েব সহিত পৃথিবী পবিত্রমণ কৰে। সূতবাং শুক্র এবং বুধ কখন বা সূৰ্য্যাপেক্ষা পৃথি-বীর নিকটবর্তী, কখন বা তদপেক্ষা দূৰ-বর্তী, হয়। ম্যাক্রোবিয়স এই মত বিস্তৃত মিসবীয় বলিয়া উল্লেখ কৰিয়াছেন।

কথিত আছে যে ২৫০০ খৃঃ পূঃ মিস-বীয়েৰা বাশিচক্র এবং স্বাদশ রাশিৰ নাম ও অবস্থান নির্দেশ কৰিয়াছিল। লাপ-লাস্ প্রভৃতি কতিপয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডি-ত্বেৰা এই মতেব পোষকতা কৰিয়াছেন।

ক্রমশঃ

তিনী:

সাং ভবানীপুর।

বাস্তব কবি কেন?

ইউরোপীয়েরা কবিত্বের উপর অনেকটা হতাশার হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং যত্ন বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত। কাব্যের এইরূপ অথবা অনাদর দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সে দিবস একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিতেছিলেন,—বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, তাহা বাস্তবীয়; কিন্তু তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসংক্ষেপ করিয়া তুলিতেছ কেন? মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধিবৃত্তির, তেমনি হৃদয়েরও অনুশীলন হওয়া কর্তব্য। ইউরোপে তাহা হইতেছে না।

আমাদের দেশেও তাহা হইতেছে না। ইউরোপ একদিকে ছুটিতেছে; আমরা তাহাব বিপবীত দিকে যাইতেছি। প্রাচীন গ্রীসে যে কয়েকটি বস কাব্যের আধাব বলিয়া পরিগণিত ছিল, আধুনিক ইউরোপেও তাহাই আছে; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের পাঁচটি ভূতের স্থানে এক্ষণে পয়ষট্টিটি দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপবীত। প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভূত ছিল, এখনও সেই ক্ষিত্যপতেজোমক্‌ষ্যম আছে, কিন্তু রসের যারপর নাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই

বটে, কেননা যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর বাস্তবায় করা হিন্দুসভ্যানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নয়টি রস ছিল। শাস্তিরস তাহার মধ্যে একটি। সেই শাস্তিরসের একটি শাখা, ভক্তিরস। আমাদের দেশে এখন একা ভক্তিরসই চৌষট্টিবিধ।* ইউরোপীয়েরা প্রাচীন রসেই সন্তুষ্ট; যত কারিগরি, তাহা ভূতের উপর। আমরা প্রাচীন ভূতেই সন্তুষ্ট; কারিগরি কেবল রস লইয়া। ইউরোপে কেবল বিজ্ঞান—কেবল অল্পজন, জনজন, আর যবকাবজন; আমাদের দেশে কেবল রস, কেবল কল্পনা। কেবল কবিত্ব—কেবল নিখিল চন্দ্রিকা আর প্রফুল্ল মল্লিকা, কোকিলের কুজন আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কববীভূষণ আর কাঁচলিক্ষণ, বিবহিণী বালা আর গৌবনের জালা।

কল্পনার এইরূপ অথবা অনুশীলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ অথবা অনাদর দেখিয়া অনেকে ভীত। বিজ্ঞান করিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙ্গিয়া মরিতেছেন, তবু বিজ্ঞান হয় না। আবার ‘কল্পনার আর প্রয়োজন নাই, অমূল্য করিয়া ইতি কর’ বলিয়া গলা ভাঙিতে

* হরিতকিরসামৃত সিদ্ধ দেখ।

ছেন, তবু কল্পনা ফুরায় না—কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহাব উপর নবন্যাস—কল্পনার ছড়াছড়ি। যে কেহ ছুই একখানা পুস্তকেব ছুই এক পাতা উন্টাইযাচ্ছেন কি না উন্টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসাব নামিয়া ‘সখিরে সখি’ করিতে বসেন।

কেহ না মনে করেন, যে আমরা কাব্যের নিম্না করিতেছি। নিম্না করা দূরে থাক, কাব্যের আমবা বিশেষ পক্ষ পাতী এবং কবিত্বগকে আমরা যাব পর নাই ভক্তি কবিত্তা থাকি। ইহা আনা দেয় বিশ্বাস আছে, যে হোমব এবং বর্জিল মত লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগ। ইয়া থাকেন, এত আর কেহ না। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে, পশুতাবের সংযমনে, কবির ন্যায় কৃতকার্য হইতে আর কেহই পারেন না। ধার্মিকের ধর্মোপদেশ গ্রাহ্য ভাসিয়া যাব—গ্রাহ্য এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু কবির কথা হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর। ধার্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন, যে ‘বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, মরকভোগ করিতে হইবে,’ তাহা হয় ত ঠনিয়াও শুনি না, কেন না ধর্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা নাকি—নরকের ভাব মনোমধ্যে

স্পষ্টীকৃত করা ধর্মোপদেশকের সাধ্যা-
তীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেক্ষপ
নহে। বিশ্বাসঘাতকতা কবিলে নরকে
যাইতে হইবে, এরূপ অকার্যকর অর্থ-
বিহীন বাক্য কবি প্রয়োগ করিলেন না;
সেই নরকব এক অপূর্ণ দৃশ্য দেখা-
ইলেন। আমরা বিশ্ববিশ্ফারিত নেত্রে,
ভীতিসংকুচিতচিত্রে দেখিলাম,—গভীর
নিশার, পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু
ফটফটের রাজার চক্ষে ঘুম থাকিয়াও
নাই; তেমন নিদ্রার অপেক্ষা আগরণ
ভাল। গভীর নিশার লেডি ম্যাকবেথ
দীপ হস্তে করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আঁচে
অথচ চলিয়া বেড়াইতেছেন, নিদ্রার
তাহাব শাস্তি নাই, কেন না তিনি বিশ্ব
স্তব উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন,
নিদ্রিতকে জোব করিয়া চিবনিদ্রিত
করিয়াছেন। কবির সঙ্গে, পার্শ্ব দাঁড়া-
ইয়া, সেই হতভাগিনীর পাপ-আশীর্ষ
দর্শিত মনেব উদ্ভাস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ
শুনিলাম—ভীত হইলাম। পার্শ্ব চিকিৎ-
সক ছিলেন, তিনি ছুঃখিত হইয়া বলি-
লেন, হায়! হায়! যাহা তুমি জঃনিয়াজ
তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না—
রোমাঞ্চ হইল। সামান্য পরিচারিকা,
সে উঠিয়া বলিল, “সমস্ত শরীরের গৌর-
বের জন্যও আমি এমন হৃদয় বন্ধের
ভিত্তর চাহি না”—দাসীর মুখের কথা
শুনিয়া হৃদয়েব ভিত্তর হৃদয় ডুবিয়া
গেল।* কবির নিকট বিদায় লইলাম,

* Macbeth. Act. v. scene I.

কিন্তু এ অপূর্ণ নরকচিৎ হাড়ে হাড়ে
বিধিরা রহিল। এমন জীবন্ত উপদেশ
শ্রুতি থাকিতে ভুলা যায় না। তাই
বলিতেছিলাম, পাপের কল্যাণতা দেখা-
ইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ
করিতে, কবি অধিতীর। কাব্য ভাল।

কাব্য ভাল, কিন্তু কণা কি জান, কোন
বিষয়েরই বেকায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে।
সর্বসত্যসুগৃহিতং। কাব্য ভাল, কাব্য
ধাক, কিন্তু তাই বলিয়া আর কিছু না
থাকিবে কেন? সকলই কিছু কিছু চাই,
নতুবা সংসার চলে না। কেবল কোম
লতা ভাল নহে—জীলোকের সংসারে
ষাভাসের ভর সহ্য না; কেবল কাঠি-
নাও ভাল নহে—পুরুষের সংসারে বিলি
ব্যবস্থা থাকে না। জীলোকে পুরুষে যে
সংসার গঠিত তাহাই ভাল, তাহাই চলে।
সমাজেও তাই। জগতের একই নিয়ম :
যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূগুষ্ঠে
পতিত হয়, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু,
অখিল সংসার সেই নিয়ম জোরে বাঁধা!
যে নিয়ম ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম
বৃহৎ সমাজেও। স্পার্টা কেবল পুরু-
ষের সমাজ, কেন না স্পার্টার জীলোকে-
রাও পুরুষ—স্পার্টান সমাজ চলিল না,
বিহ্যাতের ন্যায়, কণেকের জন্য অনিয়া
অমনি মিথিয়া গেল। বঙ্গদেশে কেবল
জীলোকের সমাজ, কেন না বঙ্গদেশের
পুরুষেরাও জীলোক, সুতরাং বাঙ্গালার
অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে
পেটের ভাত চাল হইয়া যায়। জী

লোকে পুরুষে মিলিয়া যে সমাজ গঠিত
হয়, সেই সমাজই চলে। কোমলে
কঠিনে মিলন হইলেই সর্বোৎকৃষ্ট হইল।
সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামঞ্জস্যই প্রকৃ-
তির চরম উন্নতি। যৌননির্বাচনের
সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন, প্রকৃতিকে
সেইদিকে লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক
নির্বাচনে সংসার বলীয়ান হইতেছে;
যৌননির্বাচন সংসারকে সুন্দর করি-
তেছে। বাহা সুন্দর এবং বলীয়ান,
তাহাই চলে, কেবল সুন্দর চলে না,
কেবল বলীয়ানও চলে না। কেবল
সৌন্দর্য্য লইয়া উতালি মারা গিয়াছে—
কবির হৃৎ এই যে, ইতালি তুমি এত
সুন্দর হইয়াছিলে কেন? কেবল সৌন্দর্য্য
লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে—ভারতীয়
কবিও এই হৃৎ করিতে পাবেন। কেবল
সৌন্দর্য্য লইয়া ওয়াশিংটনের কাব্য
সকল মারা গিয়াছে—তাহাতে প্রচুর
সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বল নাই, সুতরাং
সে সকলের বড় একটা আদর নাই।
আবার কেবল বল লইয়া স্পার্টা মারা
গিয়াছে, কেবল বল লইয়া ক্রিডেরা
মারা গিয়াছেন। কেবল বল লইয়া
কবিকঙ্কণ মারা গিয়াছেন। ছুই চাই।
ইহাই প্রকৃতির উপদেশ; এবং প্রকৃতির
উপদেশ সকলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য;
নতুবা মঙ্গল নাই। আমরা প্রকৃতির
উপদেশ গ্রহণ করিতেছি না; বাহাতে
বল হইবে তাহার কোন অনুষ্ঠানই নাই,
সুতরাং আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু

গ্রহণ যে কবিত্তেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাই ? জগতে কিছুই নিষ্কারণ নাই ; আমাদের কবিত্বপ্রবণতায় কি কোন কারণ নাই ? অবশ্য আছে ; এবং সে কারণ কি, তাহা বলিতে চেষ্টা করি তেছি। কিন্তু তৎপূর্বে আব একটা কথাই মীমাংসা করা উচিত। কবি কাহাকে বলা যায় ?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অমৃত্যব-কতা এবং করুণা। অমৃত্যবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তবঙ্গ হৃদয় মধ্যে অন্তত্ব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন হুঃখ ভাবিয়া মনে বসিয়াছেন ‘আজিকার বঙ্গনী বেন আর পোহার না,’ যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন মনে মনে বসিয়াছেন, ‘স্ব্যাদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র পাটে গিয়ে বসো বাপু,’ তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন তিনিই কবি, এবং এ সুখদুঃখের সংসারকে কে চাসে নাই—কে কাদে নাই ? অতি পরিকার আকাশেও কালো মেঘ দেখা যায়, আবাব নিবিড় অলদের কোলেও সৌদাগিনী হাসে, তেমনি সহস্র সুখের মধ্যেও একটু হুঃখ থাকে, আবাব সহস্র দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই। তা ঠিক ; তবে কি না যার হৃদয় কঠিন তাহা হৃদয়ে তবঙ্গ উঠে

না—সে ব্যক্তি তাঁর অমৃত্যব কলে বটে কিন্তু তার হৃদয়ে তবঙ্গ নাই, কেন না তবঙ্গ কাঠিন্যের ধর্ম নহে। আর যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তবঙ্গ উঠে, কেন না তবঙ্গ তরলতারই ধর্ম—তরলতার ভঙ্গী বিশেষের নামই তবঙ্গ। এই তবঙ্গ যার উঠে এবং ইহার বৃত্তি ভাবের বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। সেই জন্য সকলে কবি নহে। বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালি হৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবাব অশিক্ষিতের উপর করুণার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারাঙ্ক, সুতরাং বাঙ্গালির করুণাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি। কিন্তু এ করুণা, এ অমৃত্যবকতা কোথা হইতে আসিবে ?

প্রাচীন আর্ষগণ ধর্মের বন্ধনে হিন্দু-সমাজকে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে বাঁধিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য থাকনা, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বাঁধিতে হইল। ধর্মশাস্ত্রের বিধি পক্ষ-ইহাং বৃহৎ এক বঙ্ক নির্মাণ করিলেন। তাহাতে ভাবতবর্ষকে বাঁধিয়া, বঙ্কুর দুই মুখ দ্বন্দ্বিত্তে ধবিয়া বসিলেন। যদি কেহ কখন বন্ধন বৃদ্ধ হইবার উপক্রম করিল, অমনি রজু টানিয়া তাহাকে ব্যথিত করা হইল—তাহার মান গেল, কুল গেল,

সন্তম গেল, জাতি গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল। অগত্যা সকলকে বন্ধন স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রের উপর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যের উপর বাক্যব্যব করা পঞ্চমহাপাতক তুল্য গণ্য হইল। যাহা কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে তাহাই সত্য; তাহাতে শতসহস্র জাজ্ঞ্যামান ভ্রম পাকিলেও তাহা অত্রান্ত। দুইটি কথা, যাহা সরল বাঙ্গালা ভাষায় বলিলে মূর্খেরও পরস্পর বিবোধী বলিয়া বুঝিতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই দুইটিই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সত্য কলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ মিররে পচিতে হইবে। যে সকল স্থল বুঝিতে পার না, তাহাও বিশ্বাস কর। বুঝিতে যে পার না, সে তোমার বুদ্ধির দোষ; তন্নিবন্ধন শাস্ত্রের অগৌরব কেন করিবে? সব মিটিয়া গেল। বোল কলা সম্পূর্ণ হইল।

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্ত্রে আছে, এবং যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য। যাহা শাস্ত্রে নাই তাহাই মিথ্যা। একপ বিস্থাসে স্ফুল ফলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুঁড়িয়া ছিল।* আবিস্তৃতলের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া স্কলমেন কিছু করিয়া উঠিতে পাবেন নাই। ভাবত-

* উক্ত পুস্তকাগার দাহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস এতলে প্রকটিত হইবে।

বর্ষে ব্রাহ্মণের ভাতিরা। বিদ্যাসাজ্ঞাত্য হইতে নির্বাসিত। কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যামুশীলন ছিল। কিন্তু নূতন সত্যের পথ বন্ধ, জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রাধিক্য কেবল কথার আবরণে পরিণত হইল। বুদ্ধির প্রাধিক্য যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাতে কার্য্য হইল না। তন্মাস আকুইনাস, দন কোতস্ প্রভৃতি প্রথমে বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। হৃদির তীক্ষ্ণজ্ঞতাগে করজ্ঞান এতল নাচিতে পারে?—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এতলেরা মধ্যবর্তী বিস্তৃতি পার না হইয়া যাইতে পারে কি না?—ঈশা যখন মেরির গর্ভে ছিলেন, তখন বসিয়াছিলেন, কি শুইয়া ছিলেন না দাঁড়াইয়াছিলেন? এইরূপ বৃত্তান্তকে তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেন না আবিস্তৃতলের উপর বাক্যব্যব করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন। পবের মন্ড করিতে গেলে অ পনাব মন্ড আগে হয়। যে শৃঙ্খল পবেব জন্য নির্মাণ করিয়া ছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাধা পড়িলেন। বুদ্ধির পথে কাঁটা পড়িল; করনাব পথ মুক্ত—সুতরাং মনের চাকল্য সেই পথে নিযুক্ত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কবির চক্ষে কিছুই নির্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থায় (Mythological stage or volitional stage,) মিলবলেন

লোকে প্রাকৃতিক কার্যমাত্রকেই ইচ্ছা। বিশিষ্ট জীবের কার্য বলিয়া বোধ করে। এইজন্য সে সনয়ে সকলেই কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাঁহার সজীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা যেন মনে করি, সূর্য্য উদয়ান্ত হইতে বাধা—আগাদেব নীরস, শুষ্ক চিত্তায় যেমন সকলেই নিরস, সকলেই নিরতি, তাঁহাদেব তেমন ছিল না, সুতরাং যখন পশ্চিম গগন সারাক্ষর সৌগীন শোভার শোভিত হইত, তখন বৈদিক আৰ্য্য অন্তঃগমনো-মুখ দিনমণিকে করছোড়ে বলিতেন, —আবার এসো হে; আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, আবার কখন দেখা পাব হে। ঐক্লপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহারা সকলেই কবি। যাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহাই কবিত্ব পরিপূর্ণ; যাহা কবিত্ব পরিপূর্ণ তাহাই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। এই কারণে বালক মাত্রেই কবি, কেননা বালক সকলকেই সজীব বলিয়া বিশ্বাস কাব। আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ, বিছাৎ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপ্, বৃক্ষ, লতা সকলকেই সজীব মনে কবিত্তে আমরা বাধা, কেন না সকলেই আমাদের দেবতা। জননীভক্ত্যের সঙ্গে এই বিশ্বাসপান কবিত্তি, বাল্যকাল এট বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, পবিত্র বুদ্ধিব লঙ্গে ইহা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, মানসিক

বুদ্ধিনিচয়ের ক্ষুষ্টির সঙ্গে ইহা ক্ষুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সাহায্য পাই না;—মেঘকে দেবতা বলিয়াই বোধ থাকিল, বায়ুপ্রাণি মনে করিতে পারিলাম না; অগ্নিকে ব্রহ্মা বলিয়াই পূজা করিলাম, রাসায়নিকক্রিয়া মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; কণ-প্রভাকে চিরকাল দেবেন্দ্রাহুত পলার-মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িৎতা মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং চিবকাল কল্পনার কার্য্য হইল। যে স্থলে কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিবোধ উপস্থিত হইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য পাইল, ধর্ম্মের সাহায্য পাইল, বিশ্বাসের সাহায্য পাইল, আর দশম জন লোকের সাহায্য পাইল, সুতরাং কল্পনার ৬৭ চিরকাল হইল। প্রত্যেক কলহে জয়লাভ কবিত্তা কল্পনা বলশালিনী হইল; হারিয়া হাবিবা বুদ্ধিনিভেজ, ক্ষুষ্টিবিহীন, অবসন্ন, বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। কবিত্তের প্রধান উপকরণ কল্পনা, সুতরাং কবিত্ত বাড়িল অথবা বুদ্ধিপ্রবণতা পুষ্ট হইল।

সুপের শবৎ কালে শরৎসুন্দরী পূজা বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান উৎসব। কেবল শান্ত, কেবল ভক্ত, বাংলা নহে, বঙ্গদেশে এ উৎসব সর্বজনীন; এবং এ উৎসব কবিত্ত পরিপূর্ণ। এক প্রতিমাতেই কবিত্তের সীমা নাই। দশভুজা দশহস্তে দশ গ্রহবর্গ ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপ আলো কবিত্তেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাগ্-দেবী স্কুমার পঙ্কজের উপর তদধিক

সুখুমার চরণসরোজ বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের পার্শ্বে কার্তিকেশ্বর এবং গজানন সুন্দরেব—চরম এবং কুৎসিতের চরম। নিম্নে মহাদৈত্য মহিষাসুর বীরদর্পে বিকট দশনে অধর দংশিয়া আসি উখিত কবিতোছে—তুর্কসিংহ তাহাকে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিতেছে। মন্তকোপরি দেবাসুরের অপূর্ণ যুদ্ধের অপূর্ণ চিত্র। অঙ্গনে ছাগ শোণিতের ধারা; সেই শোণিতে বিভূষিত হইয়া ভক্তিভাবপরিপ্লুত ভক্ত নাচিতেছে। এ অপূর্ণ দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মধ্যে মহান্ ভাবের তরঙ্গ বহেনা, এমন নীরস, শুক হৃদয় কার আছে? এ উৎসবে যে এক বাব মাতিরাছে—কোন বাঙ্গালিসন্তান মাতে নাই?—মিণ্টন পড়ার কাজ তাহাব হইয়া গিয়াছে। ইহাব উপর আবার আনুসঙ্গিক কবিত্ব আছে। বালকেরা স্নানাহার ভুলিয়া গিয়াছে, যুবকেরা আনন্দে মাতিয়াছেন, নববিকসিতা কুমুমরূপিনী বঙ্গকুলবধু স্তম্ভর অলঙ্কারে স্তম্ভব দেহ স্তম্ভর করিয়া সাজাইয়া, বহু দিনের পর প্রিয়সম্মিলন হইবে এই আনন্দে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন, প্রবাসী, এক বৎসরের দাসত্বযন্ত্রণা ভুলিবার আশার উজ্জ্বলসে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। যুদ্ধেরা পর্য্যন্ত বার্ককোর উপর উৎসাহ চাপা দিয়া আবার যুবা হইয়া উঠিয়াছেন। বজ্রের আনন্দের সীমা নাই; বিচিত্র অট্টালিকার এবং পর্ণকূটারে রাজপথে এবং অন্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি

উঠিতেছে, কেবল হৃদয়ানুভূত উৎসাহ তবঙ্গ খেলিতেছে। শিতার কাছে পুত্র আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আসিতেছেন, প্রাণস্নিহীত কাছে প্রাণী আসিতেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সমবেত হইতেছে—আনন্দের সীমা কি? এক মাস পূর্ণ হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল, সেই দিন আসিয়াছে—এক মাস পূর্ণ হইতে যে ভাবের বহিঃস্থিকি স্থিকি অলিতেছিল, আজ তাহা একেবারে অলিয়া উঠিয়াছে। কেবল ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ তবঙ্গ উঠিতেছে। পূর্ণেরই বলা হইয়াছে, যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই কবি। জুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির নাবমাসে তেব পূর্ণ আছে, জুর্গোৎসব সর্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ কবিতাম। বুদ্ধিনান্ পাঠককে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এক্ষণে ঐক্যবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

ঐক্যবধর্ম্ম বাঙ্গালিকে বতটা কোমল করিয়াছে এত বোধ হব আর কিছুতেই নহে। ঐক্যবধর্ম্ম কোমলতাপূর্ণ, প্রাণপূর্ণ, মধুপূর্ণ—যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার উগ্র অনুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ব্রজরাখানদিগের স্নাত্ত্যব, গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস চেষ্টা, ঐক্যবধর্ম্মের যে অংশ দেখ

তাহাতেই মধু আছে। আর বৈষ্ণবধর্মের
যেসকল ভাষ আছে, সে সকলই জীবন্ত
—তাহাতে তরঙ্গ আছে, বেগ আছে,
চাক্ষু্য আছে। বংশোদ্ভূত বাংসল্য জীবন্ত
বাংসল্য, কেন না হাজার হইলেও কৃষ্ণ
নিজের পুত্র নহে। সুতরাং এ বাৎ-
সল্যের সঙ্গে আশঙ্কা আছে। যশোদা
পুত্রহীনা, কৃষ্ণ তাঁহার বহু আরাধনার
ধন—বহু আরাধনার বাহা লাভ হয়
তাঁহার জন্য আশঙ্কাও অধিক। অম্মাক
কিন্তু চক্ষু পায়, তাহারি পক্ষে চক্ষু বড়
আদরের ধন। অন্ধকারের মধ্যে যে আ-
লোক পাইরাছে, তাহার আলোক বড় অ-
মূল্য। গোপীন্দ্রসানিগের অমুরাগ জীবন্ত,
কেন না এ রস পরকীর,* সুতরাং উগ্র,
তীব্র এবং বেগবান্। রাধিকার ভাল-
বাসাও জীবন্ত, কেন না এ প্রণয়ের ভিতর
স্তব আছে, লজ্জা আছে, বিপদ আছে,
কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে। বৈষ্ণব-
ধর্মের অন্তর্গত সকল ভাবই জীবন্ত।
বৈষ্ণবধর্ম প্রেমের ধর্ম, আগা গোড়া
সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই কোমল।
বঙ্গীয় কথিকুলভিত্তিকগণ এই রসে মজি-
লেন; এই তরল ধর্মের উপর কবি-
ত্বের তরলতা ঢালিলেন—লাহা মধুর,
সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও

• পূর্বতন আলফারিকেরা স্বকীয়
নারিকাকেই প্রধান্য দিয়াছেন, কিন্তু
বৈকব আলফারিকদিগের মতে পরকী-
য়াই প্রধান স্থানান্তিবিধি ।

‘অলঙ্কারকৌরুড’ দেখ।

বাহুধা, আরও মৌল্যধা, আরও কোমলতা
চাপাইলেন; চাপাটরা, ককরাধিকার
প্রণয়ে এক অপূর্ণ মোহিনীশক্তি দিলেন।
রাধিকার ত কথাই নাই, ককও এক
অপূর্ণ জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন
যোগী লজিয়া রাধিকার কুঞ্জে প্রেমভিক্ষা
করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাধিবার
জনা শায়া লাজিলেন, এবং স্বয়ং যোগী
হইয়া স্বয়ংই বৈদ্যা হইলেন; আবার
কখন মনের বেগে পারে ধরিয়া কাঁদি-
লেন,—

શ્રમજિ મમ ઈવનઃ શ્રમજિ મમ ભૂવનઃ

ସ୍ବୟମ୍ଭି ମମ ଶତବଜ୍ରନାଧିରାଜଃ ।

রাধিকা কখন গুরুমামে মাতিয়া কৃষ্ণকে
ভৎসনা করিলেন,

हरि हरि ! याति माधव याहि केशव मा

যদৈক্যববানঃ

ভাষ্যস্বর সর্বসীক্লেশলোচন যা তব হরতি

विवादः ।

কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া
আদর করিলেন,

ତୁମି ଆମାମ୍

পরাম: অধিক, হিম্মার পুস্তনী,

এ দুটি আঁখির তারা ।

একজন কবি, অল্পপম মধুকর-নিকর-
করষিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জকূটার সাল-
ইলেন, তাহার চতুর্দিক সরস বস-
কের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার তিত্তর
শলিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মঙ্গল
সমীরকে বৃহৎ মণ্ডাপিত করিলেন—
করি এইখানে বসন্তোৎসব করিবেন।

হরি বসন্তোৎসব করিলেন না, প্রণয়োগ-
সবে ভঙ্গ দিয়া দূরে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেম
পাগলিনী সেই কোমল মল্ল সমীরের
অধিক নৈরাশ্যকাতর স্বরে কাঁদিলেন—
কহত কহত সখি, বোলত বোলত বে,
হামাবি পিয়া কোন দেশবে
নাগরী পাইয়া, নাগব স্ত্রী ভেল,
হামাবি বুক দিয়া শেল রে ॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবি
ন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি
কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসা-
ইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপ ভাল-
বাসাইয়া বৈষ্ণব ধর্মকে এক অপূর্ণ বস
করিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেব-
দেবী লইয়া, তবু তাহা সাধারণ লোকের
সম্বন্ধকক্ষাভীত নহে, কেন না অমন
জুখ, অমন ছুঃখ, অমন হাসি, অমন
কান্না সকলেবই আছে। দেব দেবীর
নাম মাত্র, নতুবা বৈষ্ণব কবিরা মানব-
হৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন।
যে বেগ বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে, সে
বেগ তোমার আমাব হৃদয়েও আছে, তবে
কি না আমবা তেমন কবিয়া বলিতে
জানি না। সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া,
সকলেই সে বস বুঝে, সকলের সঙ্গেই
ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া
সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই
তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন।
নগরে, গ্রামে, পল্লীতে, পাড়ায়,
গৃহে, সেই রসের বিস্তার হইল। পৌত্ত-
লিকতা হাজি কবির ধর্ম। যে দেশে

পৌত্তলিকতা আছে সেই দেশেবই লোক
কিৎপরিমাণে কবি। যে দেশে পৌত্ত-
লিকতার অল্পতা অথবা অভাব লক্ষিত
হয়, সেই দেশেই পরিমাণাজুগারী কবি
দের অল্পতা অথবা অভাব দেখা যায়।
কোন মনুষ্যই একেবারে কবিতে বঞ্চিত
হইতে পারে না: আজি পর্যন্ত সংসারে
এমন কোন ধর্মও প্রচলিত হয় নাই,
যাহাব ভিতর পৌত্তলিকতা নাই অথবা
কালে গোত্তলিকতার পরিণত হয় নাই।
বলিয়াছি ত, পৌত্তলিকতা কবির ধর্ম;
তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় কবিত্ব পরি-
পূর্ণ ধর্ম যে দেশে প্রচলিত, সে দেশেব
লোক যে কিৎপরিমাণে কবি হইবে
তাহাব বৈচিত্র্য কি?

আবার বৈষ্ণব ধর্ম অমুতাবকতামু
লক, কেন না উহা ভক্তিপ্রধান। বঙ্গ-
দেশেব অন্যান্য সকল ধর্মই প্রায় জ্ঞান-
প্রধান অথবা কাম্যপ্রধান। চৈতন্য-
দেবকে ভক্তিমাহাত্ম্যেব উদ্ভাবন কর্তা
বলিতেছি না; বোপদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগ-
বতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে
এবং দাক্ষিণাত্যে বামামুজস্বামী এই
বসেব বিস্তার করিয়াছিলেন, তবে কি না
চৈতন্যদেব ভক্তিবসকে যবে ঘরে ঢালা-
ইলেন। চৈতন্যেব বাহাদুরি এই পর্য্যন্ত।
জ্ঞানকাণ্ড অথবা কাম্যকাণ্ডেব সঙ্গে অমু-
তাবকতার সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু ভক্তির স-
হিত উহাব অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না
ভক্তি অমুতাবকতারই মুর্ত্তিবিশেষ।
অমুতাবকতার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ অতি

নিকট; হুতরাং অমুভাবকতার অমুশী
জন দ্বাৰাতে হয়, তাহাতেই কবিত্বের
লাভ আছে। অতএব কাঞ্চালি সে কবি।

তাহার অনেকটা নিদ্রাগ্রাসস্বরূপ বৈষ্ণব
ধর্মের দাবি আছে।

ক্রমশঃ

চৈতন্য ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বঙ্গদেশের দর্শন ।

১৪২৬ অথবা ২৭ শকে* উনবিংশ
বৎসর বঙ্গক্রম কালে চৈতন্য বঙ্গদেশ

* বৎসর গণনা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ ও
যুক্তি উভয়ানুসরণ কবিয়া নির্ণীত হইল।
চৈতন্য ২৩ বৎসর ১১ মাস বঙ্গক্রম
কালে গুপ্তভাগ করেন।

চক্ৰবর্তী বর্ষের শেষে যেই মাঘ মাস
তবে শুক্ল পক্ষে প্রভু কৈলা সন্ন্যাস।

তাহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে
হয় ১ম অঃ দেখ।

আবার চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য
চরিতামৃতে স্পষ্টাক্রমে লিখিত আছে,
চৈতন্য বঙ্গভূমিতে প্রত্যাগত হওবার
অব্যবহিত পরেই গয়াধামে যাত্রা করেন
এবং গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া চাবি
বৎসরকাল গৃহে অবস্থান করেন। বঙ্গ
দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আর
একটা কার্য্য করেন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার
পানিগ্রহণ। তীর্থযাত্রা ও বিবাহ ন্যূনা-
ধিক ১ বৎসর ও গৃহে অবস্থান চাবি
বৎসর ২৩ বৎসর ১১ মাস হইতে বাদ
দিলে ১৮ বৎসর ও কয়েক মাস হয় এবং
তাহার জন্ম ১৪০৭ শকেব ফাল্গুন মাস।
এই জন্য উক্তকাল ১৪২৬ অথবা ২৭।

গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। গ্রীষ্মে
তাহার পূর্বপুরুষদিগের বাড়ী, (গ্রীষ্ম
বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী) হুতরাং পৈতৃক
বাগদান দেখিতে কোতুলক জন্মিলে তা-
হাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এযাত্রায়
গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত যাইতে পারিবার ছিলেন না
তথাপি, বোধ হয়, পৈতৃক বাগদান
সম্বন্ধেই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্য বঙ্গদেশাতিমুখে পদক্ষেপে যাত্রা
করিয়া পদ্মাবতীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।
কিঞ্চিদবস অবস্থান করিলেন। পদ্মাবতী
জঙ্গীপুর্ব্বের ৬৭ ক্রোশ উত্তর ছাপচাটী
হইতে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ২২
কোদালী মোকামে ব্রহ্মপুত্রসহ মিলিত
হইয়াছে। ছাপচাটী মুর্শিদাবাদ জিলার
অন্তর্গত, ২২ কোদালী ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ
পদ্মানদীর উপকূলের কোন স্থানে তিনি
অবস্থিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত,
চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি
গ্রন্থে অথবা কোন নাটকাদিতে তাহার
নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অন্যদিক প্রমাণাবলম্বন করিলে জানা যায়, অধুনা পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে তন্মধ্যে শাদিখাঁরদিয়াড়* ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম ও তাহার অপবপাবস্থিত মিরগঞ্জ† ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম সমধিক বৈষ্ণব প্রধান এবং হয় ত শাদিখাঁরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমতলী এবং খেতবী সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু অধুনা পদ্মাব নিকটবর্তী হইলেও তৎকালে নিকটে ছিল না। যে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্বেই প্রেমতলী হইতে পদ্মা ও ক্রোশেব অধিক ব্যবধান ছিল, এবং প্রেমতলী পাব হইয়া অপবপাবে ক্রমাগত ৮।১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চব্বি বোধ হয়। সুতরাং বোধ হয়, এককালে পদ্মা প্রেমতলী হইতে অনেক দূরে ছিল। বিশেষ প্রেমতলীর ২০০।৩০০ হস্ত পবেই, খেতবী গ্রাম ক্রোশার্দ্ধ অগ্র হইতে ভূবীজ। পদ্মা ভূবীজের তাদৃশ নিকটস্থ থাকিতে পাবে না। যেহেতু পদ্মাব তীব্র দিয়াড় এবং ভড়ু অতিক্রম করিলে ভূবীজ পাওয়া যায়। অপব প্রেমতলী নিকটে কুমারপুবে অদ্যাপি মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় জুপালদিগের যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তদ্ব্যতীত নিশ্চয় অস্বত্ব হইবে যে সে সকল পদ্মাব তীরে গঠিত হয় নাই এবং তৎকালে পদ্মা কুমারপুবে,

* জেলা মুরশিদাবাদে স্থিত

† জেলা রাজশাহীস্থিত।

প্রেমতলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল। তবে যে এসকল গ্রাম বৈষ্ণবপ্রধান তাহার কারণ, অধুনা ১০০ বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণার রাজা বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম অবস্থান করিতেন, এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজ (কবি গোবিন্দ দাস) রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণবগণ (যাঁহারা পূর্ববর্তীদিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। নরোত্তম দাসের পূর্বে প্রেমতলী প্রভৃতি ঘোষ শাক্তপ্রধান ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থান যুক্তি সঙ্গত বোধ হইবে না, শাদিখাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে অদ্যাপি চৈতন্যমাসে গজানানের দিবসে “দধি চিডাব ফলাব” করা বৈষ্ণবদিগের ও তৎপ্রদেশীয় সাধারণ লোকদিগের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে। সাধারণ্যে বিশ্বাস চৈতন্য ঐ দিবসে তথায় “দধি চিডাব ফলাব” করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পথিক লোকই “দধি চিডাব ফলাব” করিয়া থাকে, এজন্য মিরগঞ্জে চৈতন্য পথিক ও শাদিখাঁরদিয়াড়ে অবস্থিত হইয়াছিলেন ইহাই অস্বত্ব হয়। তবে যদি কেহ কেহ এ আপত্তি করেন শাদিখাঁরদিয়াড় পদ্মাতী হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান। ইহার উত্তর স্থলে এই প্রস্তাব লেখক বলিতে পারেন, যে ১৮।১৯ বৎসর অতীত হইল তিনি

শানিখারদিয়াড হইতে পদ্মা ২ ক্রোশ
ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮।১৯
বৎসর এপার ভাঙ্গিয়া অপর পারে ২
ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে। স্ততবাং
এককালে যে তাহা পদ্মাতীবস্থ ছিল
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ দিয়াড
নামই তাহার অমোঘ প্রমাণ।

চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া
মহানন্দে পদ্মাব জলে ক্রীড়া কবিত্তে
লাগিলেন। পদ্মাব শোভা গস্তীৰ ও
ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাব মন
আবণ্ড প্রশস্ত হইল, বল্লনা উদীপ্ত হইল,
ক্ষুৰ্ত্তি দ্বিগুণিত হইল।

এদিকে, নবদীপ হইতে একজন প
ণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তদ্বেশীয়
বিদ্যা ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ও বিদ্যা
ব্যবসায়ী বালকগণ, যাহা বিদ্যোপার্জন
জন্য নবদীপ যাইতে উদ্যত ছিল, তথায়
চৈতন্যের সহিত মিলিত হইল। বৈষ্ণব
গ্রন্থকানগণের মতে নিম্নাঞ্চিত পণ্ডিতের
নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু
আনাদিগের বিবেচনায় নিম্নাঞ্চিত পণ্ডি
তের নামে হউক বা না হউক নবদীপের
পণ্ডিতের নামে বটে।

চৈতন্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম বুগপং প্রচাব
কবিত্তে লাগিলেন। তাঁহাব বিদ্যা
বুদ্ধি ও সবল ধর্ম্মের ভাবে সকলেই মো-
হিত হইলেন। তাঁহাব ছাত্র সংখ্যা
পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল।

একদা একজন ব্রাহ্মণ পবমার্থ তত্ত্ব

জিজ্ঞাসু হইয়া তথায় আগমন করি-
লেন। চৈতন্য বলিলেন,

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রোতারাং যমতে
মঠধঃ।

সাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-
কীৰ্ত্তনাং ॥

তথাহি— হবের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব
কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
যতিরস্তথা ॥

অগমহামন্ত্র—

হবেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে।
হবে রাম হরে বাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে
প্রেমের অঙ্গুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক
হইলে পবম তত্ত্ব লাভ হইল। এইরূপে
কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া চৈ-
তন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিবহুজানিত
ক্লেশে নিতান্ত কাতব হইয়া চৈতন্যের
বঙ্গে অবস্থান কালে প্রাণত্যাগ করি
লেন। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বঙ্ক
বালকগণ তাঁহায়ে দেখিতে আসিলেন।
চৈতন্য মাতার চরণবন্দনা করিতে শা-
ইয়া দেখেন, তিনি যারপর নাই বিষা-
দিতা ও তাঁহাব মুখে বাক্যব্যয় নাই।
সুতরাং বুঝিলেন, নিশ্চিত বিশেষ অম-
ঙ্গল হইয়াছে। পরে শচী বলিলেন,
বধুমাতা পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করি-
য়াছেন। চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন
করিয়া জননীকে বলিলেন

কস্য কে পতি * * মোহ এবহি
কেবলং ।

* * * *
“ ভবিতব্য যে আছে তাহা ঋণ্ডেবে
কেমনে ।”

অতীত যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায় ।
সে হইল আর কি কার্য্য হুঃখে তায় ॥

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতন্যের
এই প্রথম উক্তি। চৈতন্য ভবিতব্যবাদী
ছিলেন, স্মৃতবাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস
কবিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঈশ্বর
ইচ্ছায় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শন-
কাবেব জ্ঞান উদাসীন বলিতেন না।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস ।

নীতিকুমারজলি ।

(এই শিবোদ্যোগযুক্ত প্রবন্ধে পুৰাতন
নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ
অমুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ
পর্যায়ানুক্রমে অমুবাদিত হইবে না—
শ্রুতি, স্মৃতি পুৰাণেতিহাস কাব্য প্রভৃ
তিতে যখন যেমনোজ্ঞ-হিতকথা নথন
পথে পতিত হইবে, তখন তাহাবই মর্ম্ম।
মুবাদ সঙ্কলন কবা অভিপ্রায় মাত্র)

প্রথম অঞ্জলি ।

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিবময় ।
কিন্তু তাহে আছে সুখাসম ফলবৎ ॥
তার এক কাব্যামৃত-বস আশ্বাদন ।
অন্যতর সদাল প সহিত সজ্জন ॥

২

ক্রমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল ।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বস্ত্রল ॥

বনে ব্যাঘ্র গজ-সেবা বরং মঙ্গল ।
এ ভাবে বিভবহীন জীবন বিফল ॥

৩

মাগিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায় ।
মাগিক মাগিক ববে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায় ॥

৪

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ শিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত ।
হইলে বসন্তোদয়, আনা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভূত ॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিরোজন ॥
কিন্তু অরসিকে যেন করিতে ভজনা ।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনাশলিখনা ॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কৃষ্ণবর,
ভেদকারী কথা সূনিশ্চর ।

বাহু চেয়ে বেগপতি, গিরিগৃহা গৃহপতি,
তবু সিংহ পশুবই নয় ॥

৭

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি স্বর্ণময়,
মানিকে মণ্ডিত পদপর ।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥

৮

কোকিল গর্জিত নহে চূতরস গিরে ।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দম খাইয়ে ॥

৯

রোহিত রহিত দর্শ গভীর পুরুষে ।
একাস্রল জলে পুঠী ছট্ কট করে ॥

১০

মেঘাগমে শুদ্ধ যত পরভূতগণ ।
ভেক ভায়া ধখা বক্তা, যোনই শোভন ॥

১১

শিববেতে থাকে শিখী, গগনে নীবদ ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয় ।
যে বাহার বজ্র হয় কভু দূষ নব ॥

১২

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদব না কবে সম্ভাষণ ।
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অজুগত,
কাস্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বজ্রগণ,
কিছুগাত্র কথা নাহি কর ।
ভয়ে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বর্ষ হয় ॥

১৩

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার ।
ধনেতেই পার লোক অপদে নিত্যব ॥
ধন চেয়ে এলংসারে বন্ধু কেহ নয় ।
ভাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥

১৪

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পুণ্যপান হয় লোকে
যদি তার প্রচুবর্ধ থাকে ।
শশিকলা স্বকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ করে তাকে ॥

১৫

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন ।
সকলই চলাচল, যার আছে কীর্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥

১৬

সেই জন সজীবন, সেই জন বশোদন,
সজীব যে জন কীর্তিমান ।
অবশ অকীর্তি যার, জীবন কোথার তার,
বেঁচে থাকা মৃত্যুতব সমান ॥

১৭

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে ।
হেন সন্তুষ্ট, হলো ও প্রসন্ন
ভয়ঙ্কর মানি মনে ॥

১৮

গ্রন্থগত বিদ্যা, পবনগত ধন ।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলো প্রয়োজন ॥

১৯

উদ্যোগী পুরুষসিংহে সন্ন্যাস আশ্রয় ।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হয় ॥

দৈব দূর করে, আত্ম-শক্তি কর সার ।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥

২০

সম্পদে কর্কশ, খেলের মানস,
আপদেই সুকোমল ।
অসীতল পদ্ম,* অকঠিন হয়,
কিন্তু মুক্ত তপ্ত জল ॥

২১

শুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর ।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন ।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন ॥

২২

ফোভের যাতনা সহ্যে সাধুশীল নর ।
সহিতে না পারে কভু ঈতর পামর ॥
মহা শাপ বর্ষণেতে হীরাই সক্ষম ।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম ॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয় ।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণি মুক্তা চয় ॥

২৪

অতিশয় ক্ষুত্র নরে, যে হিত সাধনা করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে ।
পান করি কুপপয়, প্রায় তুষা শাস্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে ?

২৫

এক ভূমি জাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে ।
কেবা শালি, কেবা শ্যাগা, পরিচয় ফলে ॥

২৬

মুখভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন ।
মুদকে মধুর স্বাদি অর্পিলে কীরণ ॥

* কর্কর প্রভৃতি ।

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয় ।
তাহে বা কি বিক্ষাচলে আছে করিচয় ॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন ।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন ॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জম ।
তুষাতেও না করিত চরণ চারণ ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী ।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী ॥

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিদ্ধু সন্নিধান ।
শুদ্ধ এক গুণ করিছ মল পান ॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই ।
আমারি কণ্ঠের ফল ফলিয়াছে ভাই ॥

৩০

কি ফল নির্ঝাঁপ দীপে তৈল দান করা ।
চোর গতে সাবধান কিসে যার ধরা ॥
কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জরা ।
কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা ॥

৩১

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস ।
বরং তিক্ষাকরা ভাল, কিম্বা উপবাস ॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন ।
তথাপি লয়েনা গর্বী জাতির শরণ ॥

৩২

কুজনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস ।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভাৰ্য্যা সহবাস ॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন স্ত্রুত ।
অনল নিরহে তহু করে ভয়ীভূত ॥

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর ।
 লিখরাগ্রে হুটে যদি কমল নিকর ॥
 অচল সচল হয় অনল শীতল ।
 তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ॥

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চারে জল,
 সেকপ লক্ষীর আগমন ।
 গজভুক্ত কথুবেল, সেকপ লক্ষীর খেল,
 পলায়ন করেন যখন ॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্যে পিত্তন বেজন ।
 সবিশেষ যত্নে করে দোষ অব্বেষণ ॥
 যথা অতি রমণীয় চাকু কলেবরে ।
 ব্রণ অব্বেষণ করে মক্ষিকা নিকরে ॥

৩৬

সদাগুণীর বত স্রণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
 যিনি হন সাধু সদাশয় ।
 নব চূতাছুররস, পান করি হয়ে বশ,
 কোকিল ললিত কুহরয় ॥

৩৭

সতের সদগুণ, দুর্জন পিত্তন,
 ক্ষণেকে দূষিত করে ।
 যথা ধূম রাশি, বিমলতা নাশি,
 মলিন করে অধরে ॥

৩৮

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
 • বিভাত না হয় গুণ ।
 চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট বান্ন দেখা,
 প্রসন্নতা তাহে নান ॥

৩৯

কাম ক্রোধজাত দোষ বিবেকে বিলয় ।
 ভাষুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয় ॥

৪০

উপদেশ উপহৃত পাত্র বুদ্ধিমান ।
 বিফল নির্দোষ জড়ে উপদেশ দান ।
 কুসুম সুরভি তিল করে আকর্ষণ ॥
 যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন ॥

৪১

মরণেই সদগুণীর গুণের প্রচার ।
 পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার ॥

৪২

হুঠের দোঁর্জন্য চর, কখন কি গত হয়,
 কি করে বা উত্তম আকরে ।
 জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ প্রাণ হরে,
 কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে ।

৪৩

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন ।
 ক্ষীরোদ মণিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ ॥

৪৪

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুব ।
 পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কপূর ॥

৪৫

আপৎ সময়ে সাধু আরো শোভাকর ।
 রাহগ্রস্ত সুধাকর বিগুণ সুন্দর ॥

৪৬

যদি এজগৎ কভু পদাশূন্য হয় ।
 আবর্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
 তবে কি মৃণাল ভোজী রাজহংস গণ ।
 কুক্কুটের প্রায় করে মল অব্বেষণ ॥

৪৭

মদ যুক্ত মাতঙ্গের মস্তক উপরে।
সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা ঘোর স্বরে ॥
প্রকৃতিতে জ্ঞাত এই স্বপ্ন মহাধন।
বরসের ধর্ম ইহা নহে ত কখন ॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।
দশবাত্র, সন্তসিংহ, তিন হস্তী সনে।
অবহেলে পবাভূত করিয়াছি রণে ॥

তোমাতে আমাতে ঈদ্র্য হইবে সমর।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।
যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন।
সিংহজরী বলি বুধা কর আশালন ॥
সিংহ শূকরের বলে তেদ কত দূর।
ভালমতে জ্ঞাত বত পণ্ডিত ঠাকুর ॥

ক্রমশঃ

কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হবিজাগ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় ছই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমনত সন্দেহ কল্পনাকালে জন্মে নাই—যে তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একমুদ্রিত ছিলেন। রামকান্ত-রায়ের একটা পুত্র জন্মিয়াছিল—তাঁহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে২ সন্দেহ হইল যে উভয়ের উপার্জিত বিষয়, একের নামে

আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাঁহার লেখাপড়া করা কর্তব্য। কেন না যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে কৃষ্ণকান্ত কখন প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করাব সম্ভাবনা নাই তথাচ কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে তাঁহার নিশ্চরতা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজন বশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমনত অভিলাষ করিতেন, যে ভ্রাতৃপুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদ-ভিসি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে

আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ প্রায়মত রামকান্ত বারের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বারের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল; কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে তাঁহার পরলোকাভ্যে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা, সম্পত্তিতে অধিকাবিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্ভিক্ষ। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ভিক্ষ। বাঙ্গালির উইল কখন গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া অনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল,

“এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল আর আমরা তিন আনা?”

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, “ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।”

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য টা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার ক্ষে? আর মা বহিন কে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল

গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া দিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব।”

হর। আপনার বুদ্ধি ও ক্রি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে বাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন,

“হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আমি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।”

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের দাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রাগ আর বিরক্তি করিলেন না। স্বহস্তে লিপিকৃত উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নূতন এক খানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কন্যা এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনামাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই।

“কলিকাতার পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে বিধবারিবার শাস্তসম্মত।

আমি মানস করিয়াছি যে একটি বিধবা বিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পবিত্তন করিয়া আমাকে ১০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র বেঞ্জিন্টের কবেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।”

হবলাল মনে কবিতাছিলেন যে কৃষ্ণকান্ত ভবে ভীত হইয়া উইল পবিত্তন করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সে ভবসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

“তুমি আমার ত্যাক্ত পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট বাতীত ইষ্ট হইবে না।”

ইহাব কিছু পবেই হবলাল সম্বাদ পাঠাইলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ করি যাছেন। কৃষ্ণকান্ত বার আবার উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল কবিলেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ খোষ নামে একজন নিবীহ ভাল মানুষ লোক বাস কবিতেন। কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এমন্য ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণকান্তকে জ্যেষ্ঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্তৃক অমুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাকব উক্তম। এসকল

লেখা পড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, যে “আহারাদিব পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।”

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন “আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?”

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, “এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।”

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাহার একটা পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে।

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরার কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আর দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপব হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চমিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন কিন্তু বর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ আনাহার কবিয়া নিজের উদ্যোগে ছিলেন, এমন সময়ে বিশ্বনাথ পন্ন হইয়া দেখিলেন, যে হরলাল রায়।

হরলাল আসিয়া তাঁহাব শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হব। বাড়ী এখন যাই নাই।

ব্র। একেবারে এই খানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। দুই দিন কোনখানে লুকাইয়াছিলাম। আবাব নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই বকম ত শুনুতেছি।

হব। আমার ভাগে এবাব শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন বাগ করো তাই বলছেন কিন্তু সেটা থাকবেনা।

হব। আজ বিকালে লেখা পড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি কবব ভাই? কর্ত্তা বলিলে ত না বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাত তোমার দোষ কি? এখন কিছু বোজগাব কবিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই মার না কেন?

হর। তা নয়, হাজ্জাব টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করো নাকি?

হব। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটা কাজ বলি। এখনই আবঙ্গ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।*

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হবলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাটয়া উলটিয়া পাল টিয়া দেখিল। বলিল, “ইহা লইয়া আমি কি করিব?”

হর। খুঁজি কবিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

হর। গোয়ালী কোয়ালাব কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমার কবিত্তে হইবে কি?

হব। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষদ্র মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান কবিত্তা কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে দুইটিবই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়।

তখন হবলাল বলিলেন ইহাব একটি কলম বাস্তুতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা শেখা পড়া কবিত্তে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?

ব্রহ্মানন্দ মমীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হবলাল বলিতে লাগিল,

“ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।”

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে আমি ঘাডে কবিত্তা নিয়া যাব?

হব। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে

—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ত্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছি ভাইবে।

হব। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পাবে আজি এটা কেন? তুমি সরকাবিকালি কলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই শোধবাইবে।

ত্র। তা সবকাবি কালি কলমকে শুধু কেন? সরকাবকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হব। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসন কর্ম আবস্ত কব।

তখন হরলাল দুইখানি স্নেনেবাল লেটব কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,

“এষে সবকাবি কাগজ দেখিতে পাই।”

“সবকাবি নহে—কিন্তু উকীলের বা ডীব লেখা পড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কৰ্ত্তাও এইরূপ কাগজে উইল লেখাইবা থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ কবিয়াছি। বাহা বলি তাহা এই কালি কলমে লেখ।”

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ কবিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহাব মম্বার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রাঘ উইল করিতেছেন। তাহার নামে যত সম্পত্তি আছে তাহাব বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পর-লোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদ

লাল তিন আনা, গোবিন্দলাল একপাই, গৃহিণী এক পাই; শৈলবতী এক পাই, হবলালেব পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বাব আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?”

“আমি।” বলিয়া হরলাল ঐ উইল কৃষ্ণকান্ত বায়েব এবং চাবিজন সাক্ষিব দস্তখত কবিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “ভাল, এত জাল হইল।”

হব। এই সীচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে সেই জাল।

ত্র। কি সে?

হব। তুমি যখন উইল লিখিতে যা-ইবে তখন এই উইল খানি আপনার পিবানেব পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাহা দেব ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, নেথক একট; সূত্রাং দুই খানি উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িবা শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর কবিবাব জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিবিয়া দস্তখত কবিবে। সেই অবকাশে উইল খানি বদলাইয়া লইবে। এই খানি কৰ্ত্তাকে দিয়া কৰ্ত্তার উইল খানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভ্রাবিতে লাগিল।

বলিল, “বলিলে কি হয়—বুড়ির খেলটা খেলোহ ভাল।”

হয়। ভাবিতেছ কি?

ত্র। ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিছু জ্বালের মধ্যে থাকিব না।

“টাকা দাও।” বলিয়া হবলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হবলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতে ছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

“বলি তোরা কি গেলে?”

“না” বলিয়া হবলাল ফিরিল।

ত্র। তুমি এখন পাঁচশত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হয়। তুমি সে উইল খানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ত্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হয়। তবে তুমি রাজি হইলে?

ত্র। রাজি না হইয়াই বা কি কবি। কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হব। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লই তেছি তুমি দেখ দেখি টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্ত কৌশল বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইল খানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম

করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কিপ্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, “এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।” এই বলিয়া হরলাল, সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

ছই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দেব সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হবলাল কহিল যে আমি এখানে চলিলাম। সন্ধ্যার পব বাকি টাকা লইয়া আসিব। বলিয়া সে বিদায় হটল।

হবলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দেব বিষম ভয়সঙ্কট হইল। তিনি দেখিলেন যে তিনি যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা বাস্তবাবে মহাদুর্ভাগ্য অপবাধ—কি জানি ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে ব্যবজীবন কাণাকড় হইতে হয়? আবাব বদলের সময়ে যদি কেহ খবরা ফেলে? তবে তিনি একাধি কেন কবেন? না কবিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ কবিতে হব। তাহাও হব না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহাব! কত দ্বিভ্রতাক্রমকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিবাছ! এদিকে সংক্রামক জ্বর প্রীণায় উদ্ভব পরিপূর্ণ, তাহাব উপর ফলাহাব উপস্থিত! তখন, কাংস্তপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত, লুচি-সন্দেশ, মিহিমানা, সীতাভোগ, প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন ক-

রিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহা করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পাবি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পায়ে নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক কবেন, তথাপি তিনি এ কুট প্রস্তাব মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে—পরদ্রব্য গুলি উদ্বাস্য করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়েব ঠিক তাই হইল। হবলালেব এটাকা হজম কবা ভার—জেলপানাব ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ কবাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদ্‌ হৃদয়ের ভয়ও বড়! ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণেব মত উদ্বাস্য করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাব পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে হবলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হবলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি হইল?”

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,
“মনে করি টাকা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আতুল গেলছিঁড়ে।”
হর। পার নাই নাকি?

হর। তাই কেমন বাধে? ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

হর। না তাই—এই তাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাধ হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহিব করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিবস্ত্রিতে হবলালেব চক্ষু আদ্র এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন,

“মুর্থ, অকর্ম্ম! জীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না। আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও যদি তোমাহইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায় তবে তোমাব জীবন সংশয়।”

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “সে ভাবনা কবিও না; কথা আনার নিকট প্রকাশ পাইবে না।”

এই কথাব পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটা জীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হবলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কে ও?”

জীলোকটা হুই হুতে অকল ধরিয়া বলিলেন, “দাসী।”

হর। কে ও রোহিণী?

জীলোকটা বলিল, “আজ্ঞে।”

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা। তাঁহাকে বুঝতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়া-

ছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র দেখাইত। রোহিণী পরমাসুন্দরী; সুন্দরী বলিয়া পরীতে তাহার গ্যাতি ছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অল্পপযোগী অনেক গুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জল একাদশী কবিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে মাচও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুকুম উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাটলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রোণদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অন্ন, চড়চড়ি, মড়মড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের থেলনা, সূচের কাজে, তুলনা রহিত। চুল বাধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পরীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিণী সেখানে আখড়া ধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীৰ্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনাগিয়াছে, রোহিণী “ছিটা ফোটা তত্ত্ব মত্ত” অনেক জানিত। সুতরাং যেরমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাড়িতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য; রোহিণী তাহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটা মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল,

“কাকার কাছে যে জন্য আসিয়া ছিলেন, তাহার কি হইল?”

হরলাল বিন্ময়্যাপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন “কিজন্য আসিয়াছিলাম?”

রোহিণী হাসিয়া মুহূর্ত্ত শ্লোক বলিল,

যাও২ আর কেলেসোনা, কাজ কি
সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায়
লাড়িয়ে ॥

হরলাল দ্বিগুণ হাসিয়া বলিলেন,

“বটে! তোমার অসাধ্য কৰ্ম্ম নাই।
এখন কি একটা নূতন রোজগারের পছা
হইল?”

বো। হইল বই কি।

হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ
কথা যাবে না কি?

বো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই
হবে।

হর। কি রূপে?

বো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা
দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া
দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন
“সে কি রোহিণী?” পরে কহিলেন,
“আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য
কৰ্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল
বদলাইবে?”

বো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে

নাই বা বলিলেন। না পারি আপনার
টাকা আপনি কোরং লইবেন।

হর। কোরং? তবে কি টাকা আগামী
দিতে হবে নাকি?

হো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

হো। আপনিই বা আমার অবিশ্বাস
কবেন কেন?

হর। তবে এটা পারবে?

হো। আজকেই। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে
এটোপনে আমার সঙ্গে যাক'ও করিবেন।

হরনারা বলিলেন, “ভাল,” এই ব
লিয়া তিনি রোহিণী হাতে হাজার
টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐ দিবস বাত্র চট'র সময়ে কৃষ্ণকান্ত
বায় আপন শয্যন মন্দির পর্যাঙ্কে বসিয়া
উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া শটকায়
তানাক টানিতে ছিলেন, এবং সংসারের
একমাত্র ঔদয়!—মাদক মদ্যো শেষ্ঠ!
অহিংস ও অফিওয়ে নেশাও মিঠে
রকম ঝিগাইতেছিলেন। ঝিগাইতে
ঝিগাইতে থেয় ল দেখিতেছিলেন মেন
উইল পানি হঠাৎ বিক্রম কো'বাল্য ইটরা
গিয়াছে। যেন হরনারা তিনটাকা তের
আনা দুকড়া হুক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমু
দায় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার
যেন কে বলিয়া দিল, যে না এ দানপত্র
নাই, এ তমসুক। তখনই যেন দেখি-

লেন যেন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া
বৃষভাসুর মহাদেবের কাছে এক কোটা
আফিম কর্জ লইয়া এট দলিল লিখিয়া
দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্দক রাখিয়াছেন
—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে কোরকোজ
করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে,
রোহিণী ধীরেই সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ
করিয়া বলিল, “ঠাকুরদাদা কি ঘুমাই-
য়াছ?”

কৃষ্ণকান্ত রায় ঝিগাইতে ঝিগাইতে
কহিলেন, “কে নন্দী? ঠাকুরকে এই-
বেলা কোরকোজ করিতে বল।”

রোহিণী বুঝিলেন কৃষ্ণকান্তের আফি-
মেব আমল আসিয়াছে। হাসিয়া বলিল,
“ঠাকুরদাদা, নন্দী কো?”

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন,
“চ'ম'সিক বলেছ। বন্দাবনে পোয়ালা
বাড়ী নাপম পেয়েছে—আজও তার কড়ি
দেয় নাই।”

রোহিণী নিল্ পিল্ করিয়া হাসিয়া
টটিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল,
নাগা ভুলিয়া দেপিয়া বলিলেন, “কে ও,
অশ্বিনী ভবনী কৃত্তিকা রোহিণী?”

রোহিণী উত্তর করিল, “মৃগশিরা
অর্জা পুনর্কস্তু পুষা।”

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ষকল্গুনী।

হো। ঠাকুরদাদা আমি কি তোমার
কাছে জ্যোতিষ শিখিতে এয়েছি!

কৃষ্ণ। তাইত! তবে কি মনে করিয়া?
আফিম চাই না ত?

হো। যে সাংঘ্রী প্রাণধরো দিতে

পাশ্বে না, তাব জন্য কি আমি এসেছি !
আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই
এসেছি।

ক। এই এই। তবে আফিসেই
জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা না। তোমার
দ্বিবা আফিস চাই না। কাকা বললেন
যে যে উইল আদ শেখা পড়া করতে,
তাতে তোমার দস্তখত হয় না।

কৃষ্ণ। সে কি, আমার বেস মনে
পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করি না।

রো। না, কাকা কছিলেন যে তাঁহার
বেস অরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত কর
না, ভাল, সন্দেহ বাখার দরকার কি ?
তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ
না।

কৃষ্ণ। বটে—হবে আলোটা ধর দেখি,
বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের
নিম্ন হঠাতে একটা চাবি লইলেন। বোহিনী
মিকটু দীপ তুলে লইল। কৃষ্ণকান্ত
প্রথম একটা কুঁজ হাত বাজা বুঁদিয়া
খিচিল একটা চাবি লইয়া পরে একটা
চেঁটে ডুরায়ের একটা হেরাজ খুলিলেন
এবং অমুসন্ধার করিয়া ঐ উইল বাহিন
করিলেন। পরে বাজ হঠাতে চসমা বা-
হিন করিয়া, মাসিকার উপর সংস্থাপনের
উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিছু চসমা
লাগাইতেই ছুইচারিখান আফিসের ক্লিক-
কিমি আসিল—ভক্তরাং তাহাতে কিছু
কাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চসমা
লুইয়া হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্র-

পাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহি-
লেন, “বোহিনী, আমি কি এতই বুড়
হইয়াছি ? এই দেখ আমার দস্তখত।”

বোহিনী বলিল, “বালাই বুড়ো হবে
কেন ? আমাদের কেবল ভোব করিয়া
নাভিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি
এখন যাঁই, কাকাক বলি গিয়া।”

রোহিনীর সে অভিপায় তাতা সিদ্ধ
হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায়
আছে, তাহা জানিয়া গেল। বোহিনী
তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন রন্ধিষ হইতে
নিকট হইল।

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতে-
ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাতঙ্গ হ
ইল। নিদ্রাতঙ্গ হইলে দেখিলেন, যে
তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জলিতেছে না।
সচরাচর সমস্তরাত্র দীপ জলিত কিন্তু সে
রাত্র দীপ নির্ঝল হইয়াছে দেখিলেন।
নিদ্রাতঙ্গকালে এমনতর শব্দ তাঁহার কর্ণে
প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি
কলে ফিরাইল। এমনতর বোধ হইল
যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে।
মানুষ তাহার পর্য্যকের শিবোদেশ পর্ব্বত
আসিল—তাঁহার বাগিনে হাত দিল।
কৃষ্ণকান্ত আফিসের নেশার বিভোব, না
নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু কদম্ভ
করিতে পারিলেন না। যবে যে আলোক
মাই—তাঁহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন
অর্দ্ধ নিদ্রিত—কখন অর্দ্ধ সচেতন—
সচেতনের চকু খুলে না। একবার

দৈবাৎ চক্ষু পুলিবার, কতকটা অন্ধকার
বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন
মনে করিতেছিলেন, যে তিনি হরিষোষের
মোকদ্দমার আল দলিল দাখিল করার,
জেলখানার গিৰাছেন। জেলখানা ঘোরা-
ন্ধকার! কিছু পরে হঠাৎ যেন চাৰি
খোলের শব্দ অঙ্গ কানে গেল—একি
জেলের চাৰি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক
হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্কা হাতড়াইলেন,
পাইলেন না—অভ্যাস বশতঃ ডাকিলেন,
“হবি।”

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপূবে শয়ন কবিতেন
না—বহির্জগতেও শয়ন কবিতেন না।
উত্তরেব মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই
ঘরে শয়ন কবিতেন। সেখানে হবি
নামক একজন খানসানা তাহাব প্রতী
স্বরূপ শয়ন কবিত। আব কেহ না।
কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, “হবি।”

হবি তখন গতি গোয়ালিনীর গৃহে সেট
বহুবিলাসিনী স্ত্রীকে কেবল হবিমাত্র
পৰাবণা মনে করিয়া তাহাব সতীত্বের
প্রশংসা কবিতেছিলেন। সেও রোহি-
ণীর কৌশল। নহিলে ছাব খোলা থাকে
না। এদিকে কৃষ্ণকান্ত বাবেক মাত্র
হবিকে ডাকিয়া, আবার আকিমে ভোর
হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল
উইল, তাহার গৃহ হইতে সেই অবসরে
অন্তর্হিত হইল। আসল উইল তৎপরি-
কর্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুপ্তা স্ত্রীর প্রথম নিদ্রাতলে নয়
নোম্মীলনবৎ, পৃথিবী মণ্ডলে প্রভাতো-
দয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘো-
ষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত
হবলাল কথোপকথন কবিতেছিল—যেন
পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে সর্প-
দম্পতী গরল উপগীর্ণ কবিতেছিল। কৃষ্ণ-
কান্তের যথার্থ উইল বোহিণীর হস্তে।

হবলাল বলিল, “তারপৰ, আমাকে
উইল খানি দাও না।”

বোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি,
উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হবলাল তর্জন গর্জন কবিতা বলিলেন,
“তোমাব পুরস্কাৰ তোমাকে দিয়াছি।
এখন ও উইল আমার।”

বো। আপনাবই বহিল, কিন্তু আমার
কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চির-
দিন আপনাবই আজ্ঞাবাবী। ঠহা আর
ক'হ রও হস্তে যাইব না বা তার কেহ
দেখিতে পাউবে না।

হব। তুমি স্বীলোক—কোথার বাধিবে
কাহার হাতে পড়িবে, উত্তরেই মারা
যাউব।

বো। আমি উইল এমত স্থানে রা-
খিব, যে অন্যার কথা দুবে থাকুক, আমি
না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হব। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার
দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি
গোবিন্দবালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

গো। গোবিন্দলালের মুখে অ. ভন।
আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হব। আর যদি কোন প্রকারে আমি
কর্তৃকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে
চুরি করিয়াছে।

গো। আমি তাহা হইলে কর্তৃর
নিকট এই উইল খানি ফিরাইয়া দিব।
আর বলিব যে আমি এই উইল বাতীত
কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবু
কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর
উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপ-
নিই বিবেচনা করুন। অরণ করিয়া
মেথুন আসল উইলে আপনার শূন্য
ভাগ; আনাকে খানার ঘাইতে হয়
আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া

রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন। এবং
বলে উইল খানি বাড়িয়া লইবার
উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন
উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া
বসিলেন,

“ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া
যাউন। আমি কর্তৃর নিকট সম্বাদ
দিই যে তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—
তিনি নূতন উইল করুন।”

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে
উইল দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,

“তবে অধঃপাতে যাও।”

এই বলিয়া হরলাল সেতান হইতে
প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া
নিজালায়ে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

শৈশবসহচরী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরস্বয়।

এবদা রাজি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এক
ব্যক্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে সূর্যগুর গ্রামের
যে পল্লীতে হরিনাথ মুণ্ডো বাস করেন,
সেই পল্লীতে ঘাইতে চলে। নাথ নাথ,
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাজ অন্ধকার, কো-
নের কাহ্ন দেখা যায় না—অতি প্রবল
উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া
মধ্যে২ গাত্র বসনদ্বারা মুখের কিয়দংশ

আবরণ করিতেছিলেন। পথিক কিঞ্চিৎ
দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটি
অতি অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চলিলেন।
পথ এমত অপ্রশস্ত যে পথিকের গাত্র-
বসন ছুইপার্শ্বস্থিত দৃষ্টি স্পর্শ করিতে
লাগিল। মধ্যে২ পথিপার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ
থাকাত সেট পথে হজ্জকার আরও গাঢ়-
তর বোধ হইতে লাগিল। অতি প্রবল
নৈশবায়ু মধ্যে২ পথিককে কাঁপাইতে
লাগিল, তজ্জনা পথিক আরও দ্রুত চলি-

লেন, এক স্থানে একটি বাদ মৃদুফুলে
গাঢ় অন্ধকারে অতি বেগে পথিকের
মস্তকে এসে টিকিবে পদার্থ লাগিয়া। পদ-
বহুলায় উঃ কবিতা উচ্চারণে তিব্বত পদ
সঙ্গে সঙ্গে উঃ কবিতা উচ্চারণ। পদিক
পদ পদে মৃদুয়া বৈশিষ্ট্য কবিতা পদ
স্বিত হইয়া উচ্চারণ কবিতা 'কে ও?'
পদার্থও ত্রুটিপথে উত্তর করিল 'তুমি
কে?' পথিক স্বব চিনিতে পারিয়া
বলিলেন 'কে দেবনাথ মুখা মহাশয়!
আপনি, তা আমি জানিতে পারি নাট
—ক'সম্বাদ?'—দেবনাথ আঘাত মস্ত
পদ গাল ধরিয়া কবিতা বলিয়া 'অবে
বেগে দেও হোমার সম্বাদ—আগেই
সম্বাদ—আগে প্রাণ না আগে সম্বাদ—
ন'হ'ব ভনা আনি এত রাত্রি এটীতে
অন্ধকারে দাঁড়াইয়া—সেই আগার সর্ক
নাশ করিয়া।' রতিকান্ত বল্যোপাধায়
(পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে পথিক
রতিকান্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিল,
“মুখোপাধায় মহাশয়, আপনার আমি
কি সর্কনাশ কবিতা?” দেবনাথ অতি
ক্রুদ্ধেরে বলিল “মুখোপাধায় ইহা অপেক্ষা
আর কি সর্কনাশ হইতে পারে, তুমি
আগার সম্বাদের এই দাঁড়াই ভাঙ্গিয়াছ।’
এই বলিয়া দেবনাথ মুখা বেদনোন্মুদ
হইলেন।

রতিকান্ত হাদ্যের বেগ সঞ্জন করিতে
না পারিয়া মুহূর্তে হাসিতে লাগিলেন।
তাহাতে দেবনাথ আবও রাগান্বিত হইয়া
বলিল, “রতিকান্ত বাবু তুমি আজ

অমার যে অন্টি করিলে এ অন্টি
সামি মবে ও ভুলিয়া না।” মুখোপা
ধায়ের সেই সময়ে মনে পড়িতেছিল,
যে ত হাব খুনা নারিকেল দিয়া চাল
ভাজা প ওয়ার স ধইছ মব মত খুচিল
—ইক্ষু, কেতব প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর তাঁ-
হাব কাছে এখন হইতে গে মংস দ্বারা
হইল—হায়! এখন কি হইবে? তাম্বল
চর্কণের জন্য কি এখন ত্র্যক্ষণিকে অমু-
বোধ কবিতা হইবে? তা ত প্রাণ
থাকিতে হইবে না—নথ নাড়া, নথব
ভিতর হইতে বাকা হাসি, প্রাণ থাকিতে
সহিব না। নথের কথা মনে হইবা-
মায় মুখোপাধায় অশ্রুপূর্ণ লেচনে
বলিতে লাগিলেন, “আজ হইতে তুমি
আগার চিবাক্র হইলে, আমি হো-
মার জন্য যেরজনীর সর্কনাশ করিতে
ব'মরা ছিলাম সে আগার কখন কোন
অন্টি করে নাই; কিন্তু তুমি আজ আগার
সর্কনাশ করিলে! হায় খুনা নারিকেল
বে!—আমি হোমার সহিত মিজতা ক-
বিতা যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ
করিয়াছিলাম, সে শপথ তাকে ফরা-
ইয়াছিলাম—হে মা কালি কোন অপ-
বাদ লইও না—হায় বিনতি কুন বাতরাজ
অলু, শমা পিয়াবা বাদাম পোস্তা দে!”
এই বলিয়া দেবনাথ চক্ষু মুদিত করিয়া
একবার ধ্যান করিল। গঙ বহিয়া অশ্রু-
জল ভাসিয়া পড়িতে লাগিল! ইহাতে
রতিকান্তের হাস্য দৃষ্টবর্জিত হইল কিন্তু
অতি কষ্টে উহা সঞ্জন করিয়া অতি

কিনীতস্বরে বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ হইয়াও কেন এরূপ অন্যায় রাগ করিতেছেন। আপনি আমার পরম হৃদয়, আপনাব সাহায্যে আমি কার্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার দীত ভাঙ্গিতে পারি? আর বিশেষতঃ আপনি কি জানেননা যে গো হাড়ের ক্যার জুইটা দীতের পবিত্রতায় কালই জুইটা সোণার দীত বসান যাইতে পারে? তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—এবং সূনা নারিকেল কি চাউ, চকমকির পাঁতরও ভাঙে চিকানো বায়।”

মুখো। যার?

রতি। কলিকাতার মনেহর বাবু সোণার দীতে এক জোড়া লোহার হাতা বেড়ি চিবাইয়া খাটাইয়াছিলেন। কলাই আপনার সোণার দীত বসাইব—

দেব। কি বল্লে ভাই—হাতা বেড়ি? আমার সোণার দীত বসিয়ে দিবে?—তাকি হয়?

রতি। দিব। দুই দিনের মধ্যেই দিব। আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

দেব। তোমারই জন্য, সেই উদ্ঘা-
দিনীর সন্ধানে বেড়াইতেছি।

রতি। উদ্ঘাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধ-
কারে বাদাম তলার দাঁড়াইয়া কেন?

দেবনাথ ঝুঁজিয়া উত্তর পাইল না।
রতিকান্তও উত্তরের অপেক্ষায় নীরব
হইয়া রহিলেন কিন্তু কণকাল উত্তরেই
নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পাশ্চাতে

একটি ক্ষুদ্রজঙ্গল হইতে হঠাৎ মলের চুন
ঠন শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল।
তিনি দিশ্বরাদিত হইয়া উহ'র অমু-
সন্ধান করিতে উদ্ধাত হইলেন কিন্তু দেব-
নাথ মুখো অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিলেন
এবং বলিলেন “ভাই, জঙ্গলে কতরকম
জন্তু আছে—কানড়াইতে পারে। ওখানে
যাওয়া উচিত নহে।” রতিকান্ত দেবনাথ
মুখোর অভিজ্ঞতার বুদ্ধিতে পারিয়া বলি-
লেন, “কানড়াইতে পারে বটে। ওনকল
ঘোড়ার কামড়—মেঘ না ডাকিলে ছাড়ি-
না—কার মাথায় হাত বুলাইলে?”

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন, “ভাই
কথায় কাজ কি? সকলেরই শরীরে
একটা না একটা দোষ আছে। দেখ
ঐ দীতপড়ার কথাটা বলিতেছিলাম—ওটা
তামাসা—দীত আমার যেমন তেমনিই
আছে।” এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় তত্ত্ব
দস্তট জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন। রতিকান্ত
হাসিয়া বলিলেন, “তার লুক'চুরিতেই
বা কাজ কি? তোমার সোণার দীত
হলে তুমি ও চুনচুনে মল দুই গাছও চিবা-
ইতে পারিবে।” এই বলিয়া, রতি-
কান্ত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন—
কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া মুক্তিকানির্মিত প্রাচীর
বেষ্টিত একটি গৃহ ঘারে মুহূর্ত্ত আঘাত ক-
রিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না
পাওয়াতে গৃহপশ্চাতে একটি গবাক্ষে
সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন।
ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল
“কেও, রতি বাবু?” উত্তর “হাঁ আমি।

ছাব খোল বড শীত।" বতিকান্ত পুনরায় ছাবদেশে আসিলেন। একটা প্রাচীনা আসিয়া ছাবে দণ্ড টন করিল। প্রাচীনা পাঠক দিগেব নিকট অপরিচিতা নহেন, ইনি সে দিবস প্রভু যে গঙ্গাভীবে উদ্ভা দ্বীপের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনা বতিকান্তকে শীতান্ত দেখিয়া গৃহভাঙবে আসিতে কহিল। বতিকান্ত গৃহমধ্যে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছাব ক্রুদ্ধ করিয়া কহিলেন "কোন নন্দান পাইলেকি?" প্রাচীনা উত্তর কবিল "তাঁহার সন্ধান পাইরাছি, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই।"

রতি। কেন?

প্রাচীনা। সন্যোগ হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাঁহার পাগলামি দেখিতে ছিল।

রতি। কোথায় দেখিয়াছিলে?

প্রা। এই পাড়ার সন্ধ্যাকালে বেড়া ইতেছিল।

রতি। তবে বোধহয় এখানে এই গ্রামেই আছে?

প্রা। আচ্ছ বই কি।

রতি। বোধ হয় গ্রাম অসুসন্ধান করিলে তাঁহার দেখা পাইতে পারি?

প্রা। পাবেন।

উহার পর বতিকান্ত প্রাচীনার হস্ত পাঁচটি বোপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন। প্রাচীনা বিস্ময় কবিল "কোথা যাও?"

ব। তাঁহার অসুসন্ধান।

প্রা। সে কি। এত রাত্রে তাহাবে কোথায় পাইবে?

ব। যদি এই গ্রামে থাকে তবে পাব বই কি।

প্রা। কাহার বাটাতে অসুসন্ধান করিবে?

ব। পাগলী কাহারো বাটাতে আশ্রয় নয় না—

এই বলিয়া বতিকান্ত অতিক্রান্ত প্রাচীনার বাটা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রবণ হইল যে উদ্ভাদিনীকে মধ্যে গ্রামপ্রান্তে মাঠে এবং বাগানে ভ্রমণ কবিতো দেখিয়া ছিলেন। স্মৃতবাং তাঁহার এক প্রকাব প্রতীতি হইল যে পাগলীকে উহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিতে পাইবেন।—এমত বিবেচনা করিয়া বতিকান্ত চলিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরীধর।

রাতি প্রায় তৃতীয় প্রহর। হঃ হঃ কবিয়া শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে। বতিকান্ত অন্ধকাবে কাপিতে একাকী চলিলেন। কিয়দূর যাইয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ অন্ধকাবনর আশ্রয়কাননে আসিলেন। প্রবাদ ছিল যে এই কাননে ভূতলোনি বিরাজ করিত। কিন্তু বতিকান্ত যে হুঃসাহসিক পথ কবিয়া রজনীকান্তের সর্বস্বাপহরণে কৃতসঙ্কর হইরা-

ছিলেন, তদুপেক্ষা নৃশংসের কথা আর
কি ছিল? রতিকান্ত অকুতোভয়ে আশ্রম
কাননে প্রবেশ করিলেন। কাননব
মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক নির্মিত ঘাট বিশিষ্ট
সরোবর ছিল। বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রা
লোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ স্থান
কিঞ্চিৎ আলোকময়। রতিকান্ত দেখি
লেন যে ঐ ঘাটের একটি সোপানে কে
এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। তাহাকে দী
লোক বলিয়া বোধ হইল। একবার
রতিকান্তের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, চট্‌চট্‌
দাঁড়াইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার
চলিলেন। তাঁহার পদশব্দজনিত শুষ্ক
পত্রের সরমংশকে সে ব্যক্তি উঠিয়া
দাঁড়াইল। ক্রমে দুই এক পদ অগ্র-
সর হইলে রতিকান্তও সম্মুখে আসিলেন,
কিন্তু তাহার দ্বন্দ্বকল্প হইল। ঐহাকে
বহুকাল মৃত বিবেচনা করির ছিলেন,
এবং ঐহাকে এক্ষণে কখন দেখিবার
সম্ভব ছিল না, রতিকান্ত সেই অক-
কারময় বিজন আশ্রমকাননে তাঁহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া! স্তব্ধ তাহার মুখ।
হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অশ্র-
কাননবিশারিণী জীলোক আর এক পদ
অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া
বলিল “রতিকান্ত ভয় নাই—আমি
প্রতিনী নহি। তোমরা শুনিয়াছিলে
আমি মরিয়াছিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা
জনরবলম্বিত।” রতিকান্তের একপা
বাক্যকৃষ্টি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন “আপনি এখানে কেন?”

উত্তরে জীলোক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি
এত ব্যস্ত এখানে কেন?”

র। কোথায় ঘাইব?

জী। কেন, তোমার কি যত্ন দার
নাই?

ব। আপনি কি জানেন না যে
রজনীকান্ত আমার সর্কসাপহরণ করি-
য়াছে।

জী। তোমার মিথ্যা কথা—যদি
কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া
থাকে, তবে সে তাহার পিতা রানকান্ত।
অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার
চেষ্টার বেড়াইতেছ।

র। আপনি কিরূপে আমার অভি-
প্রায় জানিলেন?

জী। তোমার অভিপ্রায় গোপন
নাই—সকলেই এখন উহা জানিতে
পারিয়াছে। বলিতে বলিতে জীলোকটি
মাতঙ্গ হাত দিয়া বসিরা পড়িল—রতি-
কান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার
কি কিছু পীড়া আছে?” জীলোকটি
বলিল “আমি উৎকট বোগে পীড়িত—
আমার শেষদশা বলিয়া, তোমাদের
দেখিতে আনিয়াছি।”

র। এখানে কোন গ্রামের দিকের
চলুন। সেখানে কোন গৃহস্থের বাড়িতে
আশ্রয় লইবেন চলুন—এ পীড়িত অব-
স্থায় এখানে থাকা উচিত নহে—

জী। গ্রামে কোন গ্রহস্থের বাড়ী
আমি তিন দিবস চিলাম। কিন্তু গৃহস্থের
প্রতিবাদী একজন চিনিতে পারিমা আ-

মায় প্রেতিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। আমি সেই জন্য সেস্থান ত্যাগ করিয়া এই বাধা ঘাটেশ্বরন করিয়া আছি।

র। একাকী এই রূপ অবস্থায় কেমন কবিতা লেখা করিতেছেন—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে—

জী। আমি একাকী নহি; আমার একজন সমভিব্যাহারী আছে—আমি সে জন্য তোমার ব্যস্ত করিব না।

র। আমাদের ব্যস্ত করিবেন না ত কাহাকে ব্যস্ত করিবেন; আমরা কি আপনাব পর—

জী। তুমি আমার পর নহ কিন্তু তোমার যত্নে আমার তৃপ্তি হইবে না—এই কপোপকণন হঠাতে হঠাতে সেই গভীর তমিস্র নৈশগগন ভেদ করিয়া আত্মকানন কাঁপাউয়া সঙ্গীতধ্বনি হইল। রতিকান্তের শরীর কণ্টকিত হইল। পীড়িতা রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন “তুমি এস্থান হইতে যাও, আমার সঙ্গিনী আসিতেছে; তাহার চিত্ত স্থির নহে—তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাকলা আরও বৃদ্ধি হইতে পারে।” রতিকান্ত কোন উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে অপস্থত হইলেন, কিন্তু দূরে যাওয়া একটা তিস্তিভী বৃক্ষের অন্তরালে লুকুটয়া দেখিলেন যে দূর হইতে একটা মধ্যবয়সী রমণী চঞ্চলগমনে আসিতেছে—তাহার নিকটবর্তী হইলে চিনিলেন যে পীড়িতা রমণীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে; সেই উন্মাদিনী—বাহার

অনুসন্ধানে তিনি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতেছেন। রতিকান্তের সেই জনাই অনুধাবন হইল যে তাঁহার জ্ঞাতি রজনীকান্তের সম্বন্ধে যে অতি গূঢ় গোপনীয় কথা উন্মাদিনী গল্পাতীরে ব্যক্ত করিয়াছিল—তাহার সহিত এ পীড়িতা রমণীর কোন সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদেব কথাবার্তা শ্রবণাভিলাষে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরবশতঃ, কিছুই শুনিতে পাঠিলেন না—ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ব-দিক্ দ্রিষ্য আলোকময় হইল, বিহঙ্গম-কুল কলকল রব করিয়া উঠিল। পীড়িতা রমণী উন্মাদিনীর স্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অতি মুহূর্ণদবিক্ষেপে আত্মকানন হইতে নির্গত হইলেন। রতিকান্তও অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রমণীদ্বয় গ্রামান্তরে প্রবেশ করিয়া, চরিনাথ মুখের বাটীর সন্নিকটে একটা মুক্তিকানিষ্ঠিত কুটারে প্রবেশ করিলেন। রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাজ্যে যাহা দেখিল।

রজনীকান্ত যেমন কুমুদিনীররূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও মোহিত হই নাই, তথাচ তাঁহাকে মধ্যো দেখিতে ভাল বাসি। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিণীরা রাগ না করেন তবে আজ এক-বার তাঁহাকে গিয়া দেখি। প্রস্তুতি

পদ্ম কুম্ভবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শৈশব হইতে তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ সেই অকৃত্রিম স্নেহের তিনি অধিকারিণী—সেই মধুব আদরে আদরিণী। আবার সংসারী হইবেন—শৈশবে এখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সেই অর্থ না বুঝিতেও বিধবা হইয়াছিলেন; এখন তিনি সেই অর্থবৃত্তিতে পারিয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হইবে,—আবার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ—তাঁহার কি আর স্তরের সীমা আছে? এই অসীম সুখ গ্রহিবে অব্যক্ত, অথচ তাঁহার পিতা মাতা বৃত্তিতে পারিলেন—পারিয়া, তাঁহার জনক জননী জগদীশ্বরের নিকট মনে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগের এই একমাত্র কন্যাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন—কুমুদিনীও মনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহার ভাবী পতি শরৎকুমারকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। কুমুদিনী স্নেহের সময়ে তাঁহার দুঃখে দুঃখী তাঁহার স্নেহে সুখী, রজনীকান্তকে ভুলিলেন না, তাঁহাকে যে অকারণে রুচাবা দ্বারা মনস্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্মরণমধ্যে আঘাত করিত, এবং সর্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে আর একবার রজনীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট আলাপ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। এই চিন্তা

মেঘবৎ মধ্যে কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকার করিত—এবস্থি চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যাকালে কুমুদিনী তাঁহাদের খিড়কির উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটের একটি শোণানে বসিয়া আছেন, এমনত সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিগের পূর্বপরিচিত উম্মাদিনী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন “কি?” পাগলিনী কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, তোমার ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন?” পাগলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল “উহু” কুমুদিনী চমকিত হইয়া পাগলিনীর হস্তধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে?” পাগলিনী উত্তর না দিয়া কেবল অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কুমুদিনী পাগলিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন। খিড়কির দ্বারদিয়া নির্গত হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্নকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের এক কোণে একটি মৃত্তিকানির্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জলিতেছিল। তাহার সন্নিহিতে এক জীর্ণ ও গলিত শস্যায় একটি প্রাচীনা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা রমণী শয়ন করিয়া আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা নহেন, পূর্ব পরিচ্ছেদে রতিকাণ্ডের

সহিত বামিনীযোগে আত্মকাননে ইহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং বতিকাস্ত ইহারই পশ্চাৎ এই কুটীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পীড়িতা রমণী মুমূর্ষুপ্রায়ঃ মধ্যোঃ মুখে বারিনিকনের দ্বারা ও অনেক যন্ত্রে তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। পীড়িতা রমণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া ক্ষণিক হর্ষান্বিত হইলেন। নয়নে হই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “না এসেছিস, — কুমুদিনী তুমি পূর্নজন্মে আমার কে ছিলে—নতুবা এজন্মে চরমকালে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় কাজ করিতেছ কেন?” কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে বলিলেন “হির হউন, নতুবা বোগ বৃদ্ধি পাইবে।”

পীড়িতা রমণী উত্তর করিল, “রোগের আর কি বৃদ্ধি পাইবে—মা—আজ রাত্রি আমার কাটিবে না। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে; আমি সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।”

কুমু। কি, বলুন।

পীড়িতা। আমার ভিক্ষা এই যে বহুদূর হইতে মরিতে যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি একবার তাহাকে দেখাও—মা আমার আর কেহ নাই নাই যে এ উপকার করে—

কুমু। কে, কাকে দেখিতে চাও?

পীড়িতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলি-

লেন, “তোমাকে আমার পূর্বপরচয় দিব, তা নহিলে তুমি বৃষ্টিতে পারিবে না, আমার একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা—” বলিতে পীড়িতা অচেতন হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাজে যাহা শুনিল।

কুমুদিনী একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া তাহার মুখে সিঞ্চন করিলেন, এবং তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন। পীড়িতা রমণী কিঞ্চিৎ শলাধান হইলে বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের প্রতিবাদী রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীব মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোণামণিকে বিবাহ করেন। পিতা দাতা দরিদ্র বিধায়ে আমি তাহার সমভিন্যা হারে আসিয়া রমাকান্ত বাবুর বাটতে বাস করিতে লাগিলাম। কখন স্বামী বর করি নাই, স্বামী একজন মতঃ পুণীন—বিবাহ তাহার উপজীবিকা—আমাকে দরিদ্রের কণ্ঠা বিবেচনা করিয়া কখন তিনি আমাদের বাটা আসিতেন না। কিন্তু যখন জনিতে পারিলেন যে আমি বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যোঃ আসিতে লাগিলেন। আমি ভগিনীর সংসারে স্থখে থাকিলাম। প্রথমতঃ—মধ্যোঃ স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ—এই সংসারে কণ্ঠা স্বরূপা হইয়া রহিলাম। ভগিনী ব্রজে বিংশতি বৎসব বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথমা স্ত্রী

তিন কল্যাস্তান মাত্র ছিল, কিন্তু রমাকান্ত বাবু একটি পুত্রসন্তান না হওয়াতে সর্বদাই দুঃখিত। আমার ভগিনী সোণামনি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অনেক যোগ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অবশেষে ভগিনী অন্তঃস্বস্তা হইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমিও ঐ সময়ে অন্তঃস্বস্তা হইলাম। নবম মাসে এক দিবস প্রাতে ভগিনী একটি স্নান প্রসব করিলেন। বিধাতার নির্বন্ধ! আমিও সেই দিবসে সন্ধ্যাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম। আমরা দুই ভগিনী এক সময়ে পুত্র প্রসবিনী হওয়াতে আত্মাদের আর সীমা রহিল না—রমাকান্ত বাবুর বিপুল বৈভবের অধিকারী জন্মিল। স্বর্ণপুত্র আত্মাদে কাঁপিয়া উঠিল। আমাদের সন্তান দুইটির তাহাদিগের মাতুলের শ্রায় মুখাবয়ব হইল। উভয়ে হঠ পুট এবং একই প্রকার দেখিতে হইল, দুই জনকে একত্রে রাখিলে সর্বদাই ভ্রম হইত। ভগিনী সন্তানটির নিতান্ত অমুরক্তা হইলেন, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিতেন না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একদিবস তাহার বাল্‌সা হওয়াতে সোণামনি মনের চাকলা হেতু মুচ্ছিতা হইলেন এবং সেই অবধি ক্রমেঃ রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। রমাকান্ত বাবু সোণামনিকে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাঁহার পীড়া দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত চিকিৎসক

আনাহিলেন। তাঁহার একমাস ধরিয়া চিকিৎসা করিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল দর্শিল না—অবশেষে তাঁহার স্তান পরিবর্তন করিতে পরামর্শ দিল। নিলার পুরে আমাদের পিতালয়। নিলারপুরের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অতএব শেব স্থির হইল কিছু দিনের জন্য ভগিনীকে পিতালয়ে গিয়া বাস করি। এক শুভ দিনে নিলারপুরে যাত্রা করিলাম—রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোণামনির অতিশয় বাধ্য হওয়াতে আমাদের সমভিব্যাহারে চলিলেন,—উঃ বড় তৃষ্ণা জল—

বলিতেঃ রমণী আর বলিতে পারিলেন না, বাকশক্তি বহিত হইল, কুমুদিনী দ্রুত জল অনিয়া দিল। রমণী উহা পান করিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আবস্ত করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ কবিলেন, বলিলেন, “আজ স্থির হইয়া থাকুন কাল বলিবেন।” রমণী বলিলেন, “আমি কাল পর্যন্ত বাঁচিব না; আজ না বলিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।” এই বলিয়া পুনরায় আবস্ত করিলেন—

“পিতালয়ে কিছু দিন বাস করিয়া সোণামনি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। রমাকান্তের ইচ্ছা যে মাস ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোণামনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে। এষ্টরূপে কিছুদিন পরে যখন আমাদের শিশুদিগের আড়াই মাস বয়ঃক্রম হইল তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে পূর্বাঞ্চল হইতে

একদল ছেলেধবা স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহারা ছুই চারি মাসের শিশুদিগেব চুবি কবিয়া লালন পালন করিয়া চার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ব্যবসাদার-দিগের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহারা অন্য দেশে বালকদিগের গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে—এই সংবাদে প্রসূতিদিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আমার ভগিনী সোণামণি উন্মত্তের স্থায় হইলেন, পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তাঁহার শিশুকে কাহারও নিকট বিশ্বাস কবিয়া দিতেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে আমিই সে বিশ্বাসভাজন হইতাম। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সোণামণি আমার নিকট তাঁহার সন্তানকে দিয়া গল্পায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন। আমার পিতার বাটার গম্বাতেই একটা ক্ষুদ্র প্রান্তব ছিল, আমি বিষম গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় প্রান্তরের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়েতে চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে গিয়া দেখিলাম, শিশু নাই—চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া পড়িলাম, তখন বেস অরুকার হইয়াছে—আমার চীৎকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি চতুর্দিকে ভ্রাত্যবর্গকে পাঠাইয়া আমাব নিকট আসিয়া আমার ছুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন ‘দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইরাছি এফণেই তাহার শিশু কি

রাইয়া আনিবে; কিন্তু ইতি মধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটা আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পান তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। অতএব তাঁহাকে বাঁচাইবাব জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক। তোমার পুত্র ও আমাব পুত্র যমজের স্থায়, কোন প্রভেদ নাই। সোণামণি সহজেই ভুলিবেন—তাহার পর আমার শিশুপুত্র প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবেক—’ আমি এই পরামর্শে সন্মত হইলাম—কেন না সোণামণি বাটা আসিয়া তাঁহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহা জানিতাম। বিশেষতঃ যতদিন না সোণামণির শিশু পাওয়া যায় ততদিন আমার শিশু আমাবি নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা করিয়া পরিচারিকা কমলমণির (এফণে এই উন্মাদিনী) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ববৎ সেইস্থানে শয়ন করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উন্মাদিনীর স্থায় দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছানা হইতে ক্রোড়ে লইয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রকাবে সকলে জানিল যে আমার শিশু হারাইয়াছে এবং তাহা আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

“কিছুদিন পরে সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকান্ত বাবু

তাঁহাকে লইয়া স্তব্ধপুরে গাউবান উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমিও যাইতে উদ্ভাত হইলাম—কিন্তু তিনি নিমেষ করিলেন, বলিলেন, ‘তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক পাকা আবশ্যিক। তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে? আমি সকল খরচপত্র দিব।’ আমি যাইতে অস্বীকৃত হইলাম, বলিলাম, আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও, আমি যাইব। কিন্তু পাষণ্ড বলিল তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে আমি কোথায় পাইব—আমি বলিলাম তুমি চুরি করিয়াছ—সে উত্তর করিল, ‘কে এখন বিশ্বাস করিবে যে তোমার সন্তান তোমার জ্ঞাত মারে আমি চুরি করিয়া তোমাব ভগিনীকে দিয়াছি। একথা শুনিলে তোমাকে বাতুল মনে কবিবে একথা আর মুখে আনিও না—’ আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। পাষণ্ড গাছা বলিল তাহা সঙ্গত বিবেচনা হইল, কিন্তু আমি অনেক কাঁদিয়া বলিলাম আমি তাহাব বাটীতে বাস করি—কেন না তাহা হইলে আমার পুত্রকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু পাষণ্ড কোন মতেই রাজি হইল না—এখন আমি কোথায় যাই স্তব্ধপুর পিতামাতার সহিত কাশী যাওয়া স্থির করিলাম—রমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া সোণামণি সমভিব্যাহারে স্তব্ধপুর গেল। আমার শিশু সন্তানের পরিচয়ার্থে কমল-

মণিকে সঙ্গে লইয়া গেল। কাশী যাইবার কিছুদিন পূর্বে একদিবস এক জন পুলিশ কর্মচারী আমার পিতাব নিকট আসিয়া বলিল, একদল স্ত্রীলোককে ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিশে ধৃত করিয়াছে, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দুইটা শিশু-সন্তান পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে একটি হাকিমের নিকট তাহাদিগের একেহারে প্রকাশ হইল যে তোমার দৌহিত্র, তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়া আনিতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা আহ্নেদে তাহার সমভিব্যাহারে গিয়া সোণামণির শিশু ফিরিয়া আনিলেন। আমি আহ্নাদে গলিয়া গেলাম। আপনাব শিশুর জায় তাহাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই সংবাদ রমাকান্তকে লিখিলাম, আরও লিখিলাম আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়া দিবেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশী যাত্রা করিব। রমাকান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে ‘তোমার শিশু ফিরিয়া পাইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, তোমাব পুত্র দীর্ঘায়ু হউক—কিন্তু পুত্র ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি কি পাগল হইয়াছ?’ আমি পত্রখানি অঞ্চলে বাধিলাম। চক্ষের জল চক্ষে নাঁবিলাম ছুঃখের কথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম। সোণামণির শিশুসন্তান লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম—সেখানে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কমলমণি সোণামণিকে ত্যাগ করিয়া আমার নিকট

আসিল। তাহার বুদ্ধির কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলাম। রমাকান্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, নোপ হয় গেল রমাকান্ত তাহার সর্জনশ করিয়াছে। সে যাহা হউক কমলমণি শেষে উন্মত্ত হইল। সোণামণির পুত্র আমার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্যা হইল। রমণপুত্রের স্ত্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন, তাহার পরমাম্বন্দরী কন্যা প্রমদার সহিত সোণামণির পুত্র শরৎ কুমারের বিবাহ দিলাম—”

এইসময়ে কুমুদিনী চমকিয়া উঠিলেন—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “কি! আপনার প্রতিপালিত সোণামণির পুত্রের নাম শরৎকুমার?” পীড়িতা রমণী উত্তর করিল “হাঁ” কুমুদিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর?” “তাব পর বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শরৎকুমার কৃতবিদ্যা হইয়া, কলিকাতার চাকরীর চেষ্টা করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল। এই সময়ে তাহার শ্বশুর স্ত্রীনাথ বাবু বাটী আসিতে ছিলেন। শরৎকুমার তাহার সহিত আসিল। রমাকান্তের সহিত তাহার অথবা আমার যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা শরৎকুমারকে কখন বলি নাই। কেন না রমাকান্তের নাম মুখে আনিতে আমার ঘৃণা হইত—শব্দ এদেশে আসিলে পর আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগগস্ত হইলাম, এসংবাদ রমাকান্ত জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ

করিল যে আমাবও মৃত্যু হইয়াছে। আমি দিনে অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্চয় বিবেচনা হইল আর অধিক দিন বাঁচিব না। মনে আপনাব পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল। মরিতে ঐ উন্মাদিনী সমভিব্যাহারে এ দেশে আসিলাম। শুনিলাম আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রজনীকান্ত তাহাদের বিষয়াধিকারী হইয়াছে। এক দিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল তাহা জানি না। রজনী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। রজনী তাহাকে চিনিত না—কিন্তু তাহার শত্রু রতিকান্ত চিনিত। তাহার সহিত কাশীতে এক দিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমুদিনী আমার পূর্বরক্তান্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার রজনীকান্তকে এইখানে আনাও, আমি দেখে প্রাণত্যাগ করি।”

কুমুদিনী এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে পীড়িতা পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি ধীরে উঠিলেন এবং প্রতিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন “তুমি রজনী বাবুকে একবার এইখানে শীঘ্র আসিতে বল।” তৎপরে পুনরায় কূটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রমণী অচেতন। চেতন করিতে বহু মজ্ঞ করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—কুমুদিনী তাহার শিরে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত

কাঁদিতে লাগিল। রজনী তাঁহার কে ছিল? কেহ না—কিন্তু জনাখিনী বলিয়া পীড়িতা অবস্থায় তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গিয়া জন্মিয়াছিল। ইতিমধ্যে রজনীকান্ত সেই কুটারে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী আশ্চর্যগ্ধ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এ যুবাক্তি কে?” কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “তোমার রজনী।” বলিয়া মনে অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন, লজ্জায় অঞ্চল দিয়া মুখাবরণ করিলেন।

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; “সে আবার কি? তুমি কি আগায় চেন না? আমি রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।”

কুমু। অত্ৰ্যাক্তি তাঁহার পুত্র।

রজ্জ। কে?

কুমু। শরৎকুমার।

রজ্জ। যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে?

এই কঠিন তিরস্কারে কুমুদিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে, পুরুষ-মামুষের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর প্রতি চাহিলেন। আবার তখনই স্ত্রীলোকের মত চক্ষু ছটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া, একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “আমি তা বলি নাই। তবে কপাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি একথা কেন বলিতেছিলে?”

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল। রজনী বলিল, “কবে তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাই।

কুমুদিনী আবার লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পরে বলিলেন, “বিশ্বাস কর না কর, আমার যা কর্তব্য তা আমি করি। তুমি মনোযোগ দিয়া শোন।”

তখন সেই অন্ধকার নিশীতে, সেই বিজন কুটার মধ্যে, সেই সদ্যঃবিমুক্তপ্রাণ মমুষ্যা দেহপার্শ্বে বসিয়া, সেই যুবতী, রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ সর্বস্বাস্তকর কথা, কুমুদিনী যেমন যুতার নিকট শুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিতে লাগিলেন; ক্ষুদ্র, নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক, কুটার মধ্যে কাপিতে-ছিল,—মধ্যে কুটার ভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবৎ নাচিতেছিল—শবদেহের উপর ভৌতিক রঙ্গে খেলিতেছিল—কুমুদিনীর অশ্রুসমুজ্জল চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলসাইতেছিল;—নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় কদাচিৎ কোন অতি মৃদু, কি ভীষণ মৃদু! রব হইতেছিল—দূরে কদাচিৎ কোন বিকট পশু রব করিতেছিল। সেই সময়ে, সেই আলোকে, কুমুদিনী, ধীরে ধীরে, অক্ষুটস্বরে, গম্ভীরভাবে সেই সর্বস্বাস্তকারিণী কাহিনী রজনীকে শুনাইলেন। মেঘ বলিল, চাতক শুনিল—যা শুনিল, তা—বজ্রাঘাত!

পালি ভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী মনেও পালিভাষাকরণ কর্তা কচ্ছুরণ* কহেন “এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কলারম্বে ব্রাহ্মণ ও অন্ত্র বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষার কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

সমাগধী মূল ভাষা

নরেন্দ্র আদি কপ্লিক

ব্রাহ্মণ সমুদ্ররূপ

সম বুদ্ধ চাপি ভাষয়ে।।

পুনশ্চ “পতি সখিধ অসুয়” নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে “এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্ব হলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পবিত্রত্বশীল কিন্তু নাপথী অর্গ্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজন্ত অপবিত্রত্বশীল—টিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক নিচয় এই ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের বোধ মোকর্ধ্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।”

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ প্রকার ভাষা চির কালই প্রসিদ্ধ। “নয়ে-

দিত বে নামা ভংশিতটে” এই শ্রুতিবাক্য আর “যএব শকা লোকে তএব বেদে,” “লোকবেদয়োঃ সাধাবণ্যং” ইত্যাদি আর্য বাক্য এবং “যদাশজীযং বাচং বদেং” এই বেদ বাক্য এবং “যাত যামক যন্তবেং” ইত্যাদি স্থিতি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্রক্ষপুর্বাণে লিখিত আছে, “তসৌ ভাষাচ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্চ সংখ্যয়া। তজ্জ্ঞানায়ত বালানাং তত্ত্বদ্বাকবান্দিচ।” বিধাতা ৫৬টা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তত্ত্বদ্বা-বার ব্যাকরণও করিয়াছেন “এ কথা যত দূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিম্ন-য়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৮টা শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন বাবহারিক ভাষা নানা প্রকর আছে। ফল শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষা গ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন “প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা” স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, এতাবতঃ শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে এবং তাহাব্যভেদ অষ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত, এই প্রাকৃতির ভেদ উদাতী (৩) মহাবাহী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রধ্ব মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) শ্রবস্তী (৮) দ্রাবিড়ী (৯) ওড়ীয়া (১০) পাণ্ড্যতা (১১) প্রাচ্যা

* কাতায়ন।

(১২) বাহ্লিকা (১৩) রত্তিকা (১৪) দাক্ষি-
ণাত্যা (১৫) টৈপশাচী (১৬) আবস্তী (১৭)
শৌবসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টদশ স্থানে
শ্রবস্তী-ভাষা আছে, উঠাই পাল ভাষা
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে
সময় শ্রবস্তীতে জেত বনে বাস করিয়া
ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন,
সেই সময়টাই বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার
হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত ভাষা পালি-
নামে প্রখ্যাত হয়। কল্লন পণ্ডিতলিখি-
য়াছেন, “বৌদ্ধ ভাষা মজ্জানানো মাহে-
শ্বব তমা নৃপঃ,” এতদ্ভাষা তাহার বৌদ্ধ
ভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য।
হরীবীচীকায় উক্ত হইয়াছে “সংস্কৃত শিষ্ট
ভাষা চ শ্রবস্তী বাক্ বিনায়কাঃ” অর্থাৎ
শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত আর বিনায়কদি-
গের ভাষা শ্রবস্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ
বুঝায়। এই ১৮ প্রকার ভাষার উদাহরণ
“প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে” আছে, ঐ
সকল উদাহরণ পর্যালোচনা করিলে
পালি ভাষার সহিত শ্রবস্তী-ভাষার সাম্য
দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেণী যথা
মহাবংশ (মূল পালি) অস্য পালি ব্যাধ-
নম ভদা অসি নিবেসিত’ অর্থাৎ সেই
সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী
বাটী নির্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত
সূত্র ও তন্ত্রের দ্বায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণী
বদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিচয় পালি নামে প্রখ্যাত
হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী
ভাষায় রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষামুসারে

পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে।
অধ্যাপক চাইল্ডার্স অনুমান করেন যে
বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থনিচয় গ্রীষ্ট অব্দগ্রন্থের ১০০
বা ২০০ বর্ষ পবে পালি গ্রন্থ নামে প্রচ-
লিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক
কতিপয় পালি গ্রন্থে পালি যে কেবল
বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায়
তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
যথা “সামান্যকালস্বত্রমথ কণা” নেবা
পালিয়ম্ ন অথ কণায়ম্ দীপতি”
অর্থাৎ ইহা মূল বা অর্থ কণায় অর্থাৎ
টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
না, যথা লঘু পদ্ম পুণ্ডরীক “পালিয়ম
পান বুদ্ধতি কেন অথেন” অর্থাৎ তাহাকে
মূলগ্রন্থে কিজন্ম বুদ্ধ বলি যায়? পুনশ্চ
যথা মহাবংশ “পিটকতায় পালিন স
তস অথকথান” অর্থাৎ মূল ত্রিপিটক
এবং তাহার অর্থ কণা ইত্যাদি আধুনিক
পালিগ্রন্থের ভূমি উদাহরণ দ্বারা পালি-
মূল বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের একটা বিখ্যাত নাম
তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালি ভাষায়
মূল ধর্ম গ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ
মূল গ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা
অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরে লি-
খিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।
সাধারণতঃ পালি মগধ দেশীয় ভাষা, এই
প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা
দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ
ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে
“পালি ভাষা” এই নামের পবিত্র
মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝা-

উক্ত। পালি ভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা কবিরাছিলেন এবং খ্রীষ্ট জন্মের ৬০০শত বৎসর পূর্বে ইহা মগধ দেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পবে সিংহল দ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালি ভাষা কণোপকণের এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে। এজন্য ইহাকে মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কহেন পালির সহিত সৌরসেনী ও মহাবাহীর সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাউতে পাবে না, এজন্য আমরা তাঁহার কথা অগ্রামাণ্য বোধ করিলাম। বরকচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালি ভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধ গণের ৩টি প্রাকৃত ভাষা যথা প্ৰথম গাথা, দ্বিতীয় প্রান্তবের পোদিত কীর্তিস্তম্ভের ভাষা, ও ৩য় পালি ভাষা। আমরাদিগের মতে অশোকের নাটক ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্প মাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। লম্বিত বিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্য সিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংকৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া ইহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালি

ভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পবিত্রাক্রম হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নাক্য স্নানধূন কবির ভাষা এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহাবাস্তবতা ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক বলা—

সংস্কৃত	পালি
অভিধর্ম্য	অভিধম্ম
অমৃত	অমহ
অর্হত	অবহ
অর্থকথা	অথকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্গেগা
যেচ্ছ	মিলান্ধা
নির্বাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বরো
যবন	যোন
পঞ্চত	পঞ্চত
অশ্ব	অসো
বক্র	বত্ত
বৃক্ষ	বক্ক
শিষ্য	শিমণ
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধবাসী মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খৃঃ পূঃ সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫০০শতাব্দীতে বুদ্ধ যোষ মগধ দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালি

ভাষার বিশুদ্ধতা উন্নয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্ছয়বৃত্ত পালি ব্যাকরণ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। আনাদিগেত পালিনি ব্যাকরণেব ন্যায় বোদ্ধবন এত প্রস্তাব দান করিয়া থাকেন। সিংহল দ্বীপেব সকল বোদ্ধমঠে উহা সাধারণে বাক্ত হইয়া থাকে এবং উহা বোদ্ধ প্রবিরগণ একল পর্যন্ত বহু পরিশ্রমেব সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্ছয়বৃত্ত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগুলি কহেন কচ্ছয়বেব পালিব্যাকরণের নিয়মামুসারে কাত্তর রচিত হইয়াছে।

এই পালি ব্যাকরণ ৮ ভাগে বিভক্ত। এই ৮ ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন যথা।

সিথান তিলোকমহিতম্ অভিবাদি জগান
বুদ্ধন চ ধম্মমমলান্ গণমুণ্ডমক্ক
সখুম তস বচনাথ ববান্ সুবোধন
ব্যাত্যামি সুহিত মেগা সসন্ধিকপান্
সোয়ান ভিগিরিত নেয়েন বুদ্ধলভন্ত
তঞ্চপি তসবচনাথ সুবোধনেন

অথান চ অক্ষব পদেষু অনোহভাব
সিয়থিক পদ মতো বিবিধন শূত্রেয়

অর্থাৎ “আমি ত্রিলোক আরাধ্য বুদ্ধ দেব, তথা নির্মল ধর্ম, ও স্ববিশ মণ্ড-

লীকে বন্দনা করিয়া সন্ধি কল্পনগতীরূপে
সুত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত
হইবেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবেব উপ-
দেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চির সুখসম্ভোগ
করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাহাবা এতা
দৃশ বার্থার্থ সুখের আশা করেন, তাহাবা
এই গ্রন্থের নানা প্রকাব বাক্য সংযোগ
শ্রবণ করুন।”

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা।

- ১। অথ অক্ষব সম্ভাতো।
- ২। অক্ষব পাদোয় একচত্বারিংশন্।
- ৩। তথো উদাস্ত স্বব অথ।
- ৪। লহ মত্ত তয় রস্ব।
- ৫। অত্র দীঘ্ ঘ।
- ৬। শেষ বাজ্ঞন।
- ৭। বগ পক্ষা পক্ষাণ মত্ত।

এইরূপে কচ্ছয়ব ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বর্জিকদ্বারা গ্রন্থ ব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপে স্থানে পালিনি সূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে যথা পালিনি “অপাদানে পক্ষমী” তথা কচ্ছয়ব “অপাদানে পক্ষমী।” এই গ্রন্থে অনেক বোদ্ধ তীর্থ স্থানেব উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা শ্রবন্তী, গাটলী, বাবানশী ইত্যাদি—

রূপসিক্তি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকা কার।

বাল্যবতাব—এখানি সচবাচর প্রচলিত পালি ব্যাকরণ। ইহা কচ্ছয়বের

“এই স্থলে মর্য্যামুবাদ মাত্র করা হইয়াছে।

বাকরণের সংদি, প্রসাব, এবং অপবাণ্ড
সিংহলে এতদেশীয় লঘু কৌমুদীর আয়
আদরণীয়। বাল্যবতাব কচ্ছরণের বা-
করণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সং-
কলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি,
দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে
সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম
অধ্যায়ে অখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কীটক,
ও উপাদি হ্রস্ব, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক
ও বিভক্তি ভেদ। গ্রন্থারম্ভে গাথা বধা
বুদ্ধনামঃ দত্তিবন্দিত বুদ্ধম্ ভূজবিলোচনন্
বাল্যবতারণ ভাষিষন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিব

অর্থাৎ প্রস্তুতিত পদ্যেব ন্যায় আনন্দ
বর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটি প্রণাম করিয়া
সুকুমারমতি বালকেব জ্ঞানোন্নতি নিমিত্ত
বাল্যবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরচিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ
পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি। এখানিও কচ্ছরণের পালি
বাকরণের সারসংগ্রহ কিন্তু বাল্যব-
তাবের ন্যায় প্রঞ্জল ও শিকোপযোগী
নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধ
ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই
বাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্ছ-
রণের একজন প্রাচীন সংকলন কর্তা,
তিনি মূলগ্রন্থের বানানাদি হইতে নিস্তর
উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

* পালি ও গাথা সমূহ এই প্রস্তাবে
অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল
মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

কচ্ছরণন্ চ চব্বিয়ন ন নহ
নিশেষ কচ্ছরণ বানানাদিন্
বাল্যবোধাথ মুহুরন কবিশন
ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি।

অর্থাৎ “আচাৰ্য কচ্ছরণকে প্রণাম
করিয়া তাঁহার কৃত বানানাদি পর্যালো-
চনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির
নিমিত্ত, কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া
এই পদ রূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।

গ্রন্থকার আপনাব এইরূপ পরিচয়
দিয়াছেন যথা—

বিখ্যাত আনন্দ থেরাত্তর বর গুরু নাম
তন্ম পালি ধজানন
শিষ্যে দীপাকবঃখ্য দমিল বহুমতি
দীপালধ্যাপ্য কাশ
বাল্যদিচ্ছদি বাসদিত্য মধিবসান
নসনান যোতি ও
সোয়ম বুদ্ধ পিয়ভো যতি ইমামুজ্জান
রূপ সিদ্ধিন অকাণী।

অর্থাৎ এই নির্দেশ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত
আনন্দ শিষ্য তান্মপনি (সিংহল) প্রদেশ-
শেব ধ্বজ স্বরূপ ও দামিল দেশের
(চোল) দ্বীপ স্বরূপ এবং “বুদ্ধপিয়”
(বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপাকর রচনা করেন।
তিনি বাল্যদিচ্ছ ও চূড়ামণিকা নামক
নটন্যের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার
দ্বারা বৌদ্ধধর্ম উজ্জল ভ্রাতা ধারণ কবি-
য়াছিল।

সিংহল দেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থ
কার সিংহল দ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে নটবাজ পদ্য ক্রমবাহু চোল দেশীয় (বাংলা) একজন স্তম্ভবিবেক নিকট হঠাতে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, ইহাতে বোধ হয় ইচ্ছা নুপতিত সময় হঠাতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানা শাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহল দ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকাবের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগল্যায়ণ ব্যাকরণ। এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌগল্যায়ণ প্রণীত। “বিনয়ানুসমুচ্চয়,” পক্ষীকাপদীপ, গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেঘাস্তকের গ্রন্থে এই গ্রন্থকাবের বিশেষ গুণকোত্তিত হইয়াছে। মৌগল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহন রাজ্যকালে অল্পবয়স পূর্বের ধূপানাম ন চৈব পুরোচিত ছিলেন। এখানি কচ্ছ-রূপকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হঠাতে বিভিন্ন প্রকার বীতিতে বচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত নথ্য—প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ তাদি। গ্রন্থের প্রাবস্ত ব্যাক্য নথ্য—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিদ্ধ তথাগতম
সমস্ত সজ্জম ভাষিষন্ মগধনশক লক্ষণম।

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সমস্তে একনা কদিয়া, আমি মাগধী ভাষাব ব্যাকরণ বাখ্য্য করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক নথ্য—

তস্য ভূতি সমাসেন বিপুলার্থ পকাশিনী
বচিত পুন তেনৈব সমান্ন মোত কারিন।

এই কথেকথানি সচবাচন প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিতাষাব দীপানি, কচ্ছ-রূপ ভেদ টীকা মহাশব্দনীতি, প্যাংগ সিদ্ধি, গবল দেনাসন্য, পদিকা পদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচন্দ্র-গ্রন্থ। ইহা গদ্য ও পদ্যে বচিত। এবং পিজল, বৃত্তসজ্জাকব প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত চন্দ্র গ্রন্থের আদর্শে লিপিত। গ্রন্থকাব প্রাবস্ত শ্লোকে লিখিয়াছেন।

নমাপু দ্বন শাস্তন তদশাস্তন ভেদিনো
ধক্ষুজালস্ত কচিন মুনিন্দোদাত্তবচিনো
পিঙ্গলাচার্য্য দিহিস্তন্মানম দিতমপুবা
সুজ মাগধী কানন তন ন বংধতি

যথিচ্ছিতম।

ততো মগধ ভাবেব সতাবস্ত ভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সমুদয় পশানথ পদাকমম
ঐদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয় চন্দ্র

নিশ্যিতন্

অব ভিশ্যমহন দানিতেশম সুখ বিবুদ্ধির।

অর্থাৎ “মুনীজ্ঞকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিবণে ধর্মের উজ্জলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনেব তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব পণ্ডিতগণের বচিত চন্দ্র গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞ মাগধী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায় না, একন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় বচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।” ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ

দেখাইয়া, প্রচলিত ছন্দ সমূহের রচনার
বীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল।
এই গ্রন্থ ৬ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের
নাম সঙ্গ রক্ষিত।

ধাতু মঞ্জুষা—এখানি শিলাবংশ নামক
বৌদ্ধ স্তবির কৃত। পালি ভাষার ধাতু-
পাঠ। ইহা কচ্ছুরণের ব্যাকরণ সম্মত
গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপরা নাম কচ্ছুরণ
ধাতু মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রাবস্ত্রলোক যথা—
নিরুক্তি নিকর পার পারাবারস্তগান্ মনিন্
বন্দিত ধাতু মঞ্জুবান্ ক্রমি পথচনান্ যথান
সুগত গম মগম তন তন ব্যাকরণানিচ
ইত্যাদি

অর্থাৎ শব্দ সমুদ্র পার হইয়াছেন,
এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সঙ্ক-
র্মের মার্গ স্বরূপ এই ধাতু মঞ্জুষা রচনা
করিলাম, বৌদ্ধধর্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তম
রূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ
সম্বলন করিলাম।

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয়
দিয়াছেন যথা।

“রচিত ধাতুমঞ্জুষা শিলা বংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেকহ রাজহংস
অনিথ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
বঙ্গাদিলে নামা নিবাস বাসী
যতীশ্বরে সো জমিদান্ আকাশী—”

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থ-
গণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ
রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্ষাদি
গণেন মন্দিরের পুরোহিত ও তপস্য অব-
স্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধ ধর্ম

বহুকাল প্রচলিত থাকিষা রাজহংসেব
আর ধর্ম গ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ কংক।

ধাতুমঞ্জুষা ডন এনডিশ সিল ভিরা
বাহু বাহু দেবনামক পৃষ্ঠধর্ম্মাবলম্বী প-
ণ্ডিত ইহা সিংহন ও ইংরাজী ভাষার অমু-
বাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধান পদীপি—একখানি সংস্কৃত
অমর কোষের আয় প্রসিদ্ধ পালি অভি-
ধান। ইহা অনরকোষের প্রণালীতে
আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা।

তপাগতো করুণাকরো করো

প্যাগতো যোসঙ্গ সুখাপ পদান্ পদান্

অক পন্যথান কলিগম ভাব ভাব

নমামি তান্ কেবল ভুংখ করণ্ করণ্

অর্থাৎ আমি দয়ার সিদ্ধ তপাগতকে
বন্দনা করি, যিনি নির্কারণ আপনার আয়-
তাদীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখ-
বর্দ্ধন কবত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের
অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ
রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা।

সগ্গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো

তথা সামান্য কাণ্ডকান্

কাণ্ডাট্টভান বিত এস

অভিধান পদীপিকা

তিদীব মাহিয়ান ভূজগ বশাথি

সকলাথ সমাভায় দিপা নিয়ান

ইহও কুশল মতীম সনারো

পাতু হোতি মহা মুনিন বচক

অর্থাৎ এই অভিধান পদী পিকা ত্রি-
কাণ্ড বিভক্ত যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য

কাণ্ড। ইহাতে স্বর্ণ, পুণিবা এবং নাগ-
দেশের সকল বিবরণ উল্লখ আছে।
বুদ্ধিমান্ বাক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে
মহামুনিব সকল বাক্য অবগত হইবেন।
এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পনাক্রমবাহুর রাজ্য
কালে মোগল্লায়ণ কর্তৃক রচিত। পশা-
ক্রমবাহ ১১৫৩ খৃঃ অঃ বাজ্যাবস্থ করেন।
উপরেব লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষা সম্ব-
ন্ধীয় বাকবণ, ধাতুপাঠ, চন্দোগ্রন্থ, এবং
অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হ-
ইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য
গ্রন্থের বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে সাবোদ্ধৃত
হইল। আমরা পালি ভাষায় সুপণ্ডিত নহি
এতন্মাত্র সুবিস্তৃত পাঠক মহোদয়গণ এই
প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণাস্ত্যগত বা
অমুবাদ ঘটিত দোষ গার্জনা করিবেন

মহাবংশ—ইতিপূর্বে সংস্কৃত ভাষায়
নৃপতি বা কোন মহাত্ম্যাব জীবনী কিম্বা
কোন দেশের ইতিহাস সকলনের পদ্ধতি
ভিন্ন না, কেবল পুৰাণ ও বৃত্ত কণার
নাম্য অলৌকিক গল্প পৰিপূর্ণ গ্রন্থে আমা-
দিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হই-
য়াছে তাহাতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার
করা দুৰ্বপবাহত। আমরাদিগের সংস্কৃতে
প্রকৃত পুরাবৃত্ত মধ্যে কেবল একমাত্র
রাজতরঙ্গিনী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও
আধুনিক। রাজতরঙ্গিনী ১১৪০ খৃঃ অঃ
সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায়
রচিত সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ-
নিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট
হইয়া থাকে। সিংহল দেশীয় পালি

বৌদ্ধ ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের
প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা
সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত
প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি।
পালি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে
মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন।
মহাবংশ নামে পালিভাষায় দুইখানি
পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের
বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার
মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অমুসাধাপুরেব
উত্তর বিহায়েব কোন স্থানান্তরিত
কিন্তু কোন সময়ে কাহার দ্বারা ইহা
সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ
অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহ-
লেশ্বর ষাটুসেন এই গ্রন্থের পাঠ প্রবণ
করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খৃঃ অব্দের
মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে
স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে যে প্রাচীন
মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্বের রচিত।
এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২
খৃঃ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ
খানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং
সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু
পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই
গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খৃঃ
পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতি-
বৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক
প্রকার বৌদ্ধদিগের পুৰাণ বলিলেও হয়,
এতন্মাত্র তাহাতে আমরাদিগের পুরাণের
স্তায় অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে।
কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক

বিবরণ সমূহ স্মরণানী সহকারে বিনিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ ইহাতে সং-
লিভ হইয়াছে। আনানিগের সংকৃত
পুৰাণের নাম এ গ্রন্থখানি কেবল “কা-
হিনী” নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক স-
ত্যের অপলপ করা হয় নাই। মহানাম
কৃত মহাবংশ ৪৫৯ ইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের
নথ্যে সংকলিত। ইহা একশত অধ্যায়ে
বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায়
গ্রন্থিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা
করিয়ছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে,
তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরা-
ক্রম বাহর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন
পর্গন্ত কীর্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্তি
শ্রীমহাবংশের অনুজ্ঞামুসারে ও তিব্বতের
দ্বারা রচিত।

জর্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ
অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচা-
রিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ—মহাবংশের নাম এখানিও

সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি ইতিবৃত্ত।
যেং টরনার সাহেব অনুমান করেন এই
গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ হবিগণের
মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ স্মরণানী অনু-
সারে রচিত নহে, এজন্য কেহ অনুমান
কবেন এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির
দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ
ধর্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে
লিখিত হইয়াছে।

পালি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ
আছে, তাহার মধ্যে অভাঙ্গলু বংশ, দাতা
বংশ, ব্রহ্মজালসূত্র, জাতক (পঞ্চ) কুন্দক
পাঠ, সূত্র নিপাত, মহা পরিনির্বাণ সূত্র,
ধর্মপদ, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ এবং সিং-
হল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও
ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষায়
অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্স, কস্‌বুল, ক্রফ,
ও কুমার স্বামীস্বর বদ্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

নীতিকুসুমাজ্জলি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪৯

বিশেষ যত্নের সহ, নিম্নডিলে অহরহ,
বালুকায় টেল পেতে পার।

পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কতু হইবে সংহার ॥

কদাচিৎ পর্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশূন্য পাইতেও পারে।

কিন্তু ভাই নিরস্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥

৫০

মকরের ভয়যুক্ত, দন্ত থেকে বরি মুক্ত,
সদা মনি উদ্ধারিয়া লও।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
সন্তবিয়া পার হবে হও ॥
যোমযুক্ত বিমধব, ফণা দোর ভয়ঙ্কর,
ধব গিয়া কুশুম আকারে।
কিন্তু তাই নিবস্তব, মূর্খে আবাদিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে ॥

৫১

যদবধি তব, ছিলহে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যতকাল,
তরুণীতে অমুরক্ত ॥
এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাম্রাল,
সতত রহিলে মগ্ন।
পরম স্নেহে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন ॥

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়ত্ত ॥
কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা বায়ু ॥

৫৩

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্থলিত ॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায়।
তথাপিও তও আশা না ছাড়ে আমায় ॥

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥

৫৫

অষ্ট কুলাচল আর সাতটা সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর ॥
আমি তুমি, তারা কেহই না হবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
কেবল সক্ষম কর আত্মা আপনার ॥
আত্মজ্ঞান হীন যেই, সেইজন মুঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ় ॥

৫৭

দেবতামন্দির কিম্বা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা, আর মৃগচন্দ্র বাস ॥
সকল প্রকার কৰ্ম্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য স্তব্ধ বল না হয় কাহার ॥

৫৮

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে থিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে স্তব্ধলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ পরারণ,
নীতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বলনা।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে।
তুমি কার ছেলো, কোথা থেকে এলো,
মনে ভাব ভাই আরে ॥

৬০

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
কর্য না কর্য না অহঙ্কার।
এসব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমেষেতে করয়ে সংহার ॥
মায়ায় এসংসার, তরে মন অনিবার,
ভাবনা কবিতা এই সার।
ব্রহ্মপদে আস্তমজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর ॥

৬১

কমলের দলে জল, সদা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যত্ননর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল ॥

৬২

তব্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিন্তে।
পরিহার কব চিন্তা বিনশ্বর বিস্তে ॥
ক্ষণেক সজ্জন সঙ্গ কর বন্ধ করি।
সেইমাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী ॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারিগণ্ড শোভা হত, ভুঙ্গিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল বনে চরে।

৬৪

মৃগাল কমল দল যাহার আহাব।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমে যেই কন্দর নিকরে।
যাহার পানীর পয় পর্কিত নির্ঝরে ॥
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে।
তৃণরাশি চিবাঁইয়া দেহ বক্ষা কবে ॥

৬৫

গ্রহ পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবকদ্ধ বিষধর আর করিবর ॥
মতি মানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিলু এখন ॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকণে,
তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগবেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয়।
কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কৰ্ম্ম অশুষ্ঠানে
বিধি-বিধি কে করে নজ্বন।
বিপদ প্রসর করে, বসি কাল ছবাস্তবে,
সকলেরে করে আকর্ষণ ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুস্ত বিগলিত,
রুধিরাক্ত চাকু মুক্তা ফলে ॥
বনে ভিলী দেপি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে।
দেপি তার শুভ্রতব, স্কন্ধকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মহুযাবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ॥

৬৮

হে অশোক তপসব, কিবা কার্য্য নম্রতর
শাখা আর উন্নত মন্তক।
কিকাজ কোমল দল, নীলাবসে ঢলঢল,
কমনীয় কুসুম স্তবক ॥ • •
যেহেতু তোমাব তলে, নিষদ্ধ পণিকদলে,
খিন্ন হবে করি কত শুব।

মৃদু মধুবৃক্ষ ফল, না পাটয়ে স্মৃতিফল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥

৬৯

সারহীন হে শিমূল, অতি দূরে তব মূল,
কণ্টকে আবৃত পুন কায়।
ছায়াশূন্য তব দণ্ডে আছে তোমার ফল
বানবেও নাহি খায় ভয় ॥
কুসুমোতে নাহি গন্ধ, নাহি যাত্র নকরন্দ,
কোন গুণ নাটিক তোমার।
ধাক, থাক, আমি বাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাস্রয়ে থাকতে আমার ॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল ॥
স্নান ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল ॥
দূরে থেকে দেখি সমুদ্রত পুষ্পচর।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সূনিশ্চয় ॥
ওরে রে শিমূল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন ॥

৭১

কুপক্ষীর উক্তি।

কাঞ্চন পিঞ্জরে, থাকি নিবস্তরে,
নৃপতির কবে, সন্নিহিত কোমল কায়।
খাটে সুরমাগ, দাড়িষ পসাগ,
পান করি ভাল, পায়ঃসুখা গিণীসায় ॥
সমাজেতে হাস, পাড়ি অবিশ্রাম,
কুমারাম নাম, তবু কেন হারি হাস।
কানুন ভিতবে, কোন তরবারে,
জনমকোটলে, সদা মন মন ধায় ॥

৭২

মিত্র কর বশীভূত বিগল ব্যাভারে।
রিপুদ্রয় কর যুক্তি বল সহকারে ॥
লোভিজন ধনদানে, কার্যোতে জৈবরে।
যুবতীবে প্রেমে, দ্বিভগণে সনামরে ॥
সমভানে বশকর কুটুম্বনিকরে।
রাগীপ্রতি স্তুতি আব তক্তি গুরুবরে ॥
মুখে নানা কথা কয়ে, রসিকেবে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির হির রতি ॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা।
তরুব লাবণ্য, মতি স্মৃতি সনন্বিতা ॥
রিচের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধানক জনে।
মতের সূহতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু টাটে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পূর্ণ হয় শব্দাঙ্কের কায় ॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিষম বিপদে তন্তু কদাচ না হন ॥

৭৫

কমল আকবে, কমলনিকরে,
দিনকর তুলন করে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদনী জাল,
বিকাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
কবয়ে মলিল দান।
বিনা আবাহন, পরার্থ সূজন,
করেন হিত বিধান ॥

৭৬

ফলভরে নত হয় বিটপী নিকর।
ননভলে ভূনে নামি পড়ে জলধব ॥
অমুক্ত স্বজনের বনি হয় ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোজন ॥

৭৭

কুপণতা ভরে যশ, ক্রোধে শুণচয়।
কুধায় মর্যাদা, দস্তে সত্যনাশ হয় ॥
বিপদে সৈবর্ঘ্যের নাশ, বাসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ ॥

৭৮

জুরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয়।
অসাধা চেষ্টায় হয় পুরাচার্য ক্ষয় ॥
দরিদ্র দশায় সমানর পরিগত।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত ॥

৭৯

বল বল করে বল, নাবীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঙ্গ সামান্য ধনীর ॥
ঠকেদের বাক্‌চল, পণ্ডিতের বিদ্যা বল,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যতি-বল।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিত্ত ফল,
শাস্ত্র-বল বিবেক কেবল ॥

৮০

মলাদলী প্রিয়, হয়ে বিদ্যাবান্‌ জ্ঞানী।
ধনহীন গহী, আর পরাধীন মানী ॥
পরবশ স্থখী, তথা সধন কুপণ।
বৃদ্ধ হ'ল নাহি করে তীর্থ পর্যটন ॥
নৃপতি কুনরীবশ, নৃপ জকুগীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন ॥

সংক্রিয়া বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে ॥
কিবা আর হাস্যাম্পদ ইচ্ছাদের চেয়ে ॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন করেন রোপণ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন ॥
সুতরুণ তরুগণে পোষেন যতনে।
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে ॥
ভাড়াট্টয়া দেন যথা জড়াজড়ী হয়।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী নিচয় ॥
যেখানে দেখেন তরু হঠতেছে স্নান।
সেইখানে জলসেচ করেন প্রদান ॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান।
সর্বদা থাকুন সুখে রাজা কীর্তিমান ॥

৮২

কুসম স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান্‌ মনুষ্য নিকরে।
সর্বলোক শিরোপরে, অপক্লপ শোভারে,
অথবা বিশীর্ণ হন কানন ভিতরে ॥

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল সম্পাতে।
ছত্রে ভাঙ্কর, করী অকুশ আঘাতে ॥
গো গর্দভ বশীভূত লাঠীর প্রহারে।
ভেষজ্ঞেতে ব্যাধি, মস্ত্রে গরল নিবারে ॥
সর্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ বার্থ মূর্খদের কাছে ॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাহ্য, পরগুণে প্রীতি।
পত্নী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি ॥
গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিদ্যায় বাসন ॥

ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সাব ।
সেই মুক্তি কপট সংসর্গ পবিহাব ॥
যাহাদের আছে হেন চাকু গুণগ্রাম ।
তাঁহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম ॥

৮৫

রাজা ধর্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ ।
সত্যহীন দারা, জ্ঞানহীন যোগিগণ ॥
গতি হীন অশ্ব, জ্যোতি বিহীন ভূষণ ।
ব্রতহীন তপ, বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, স্নেহ হীন সহোদর ।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধিবর ॥

৮৬

ক্লোণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর ।
সারস ত্যজিয়া যায় শুষ্ক সরোবর ॥
পর্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর ।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ বনাস্তর ॥
বারবধু ত্যজে নর হইলে নির্ধন ।
ত্রিভট ভূপালে পরিহরে মস্ত্রিগণ ॥
কলত সংসায়ে কেহ কারু বশ নয় ।
কার্যবশে সকলেই রমণীয় হয় ॥

৮৭

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন ।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে ।
বল্লভা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর মিত্য অরোগিতা ।
প্রিয়তম প্রিয়তমা সদা পরিণীতা ॥
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থকরী হয় ।
এই ছয় গুহস্থের সুখের নিলয় ॥

৮৯

সুত বলি তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় সূচরিতে ।
সেই ত কামিনী, যে দিবা যামিনী,
চিন্তায় পতির হিতে ॥
মিত্র সেই হয়, সম ভাবে রয়,
সুসময় অসময় ।
বহু পুণাকলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয় ॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয়, কূলে ভয় ক্ষয় ।
মানে দৈন্য ভয়, আর বলে রিপু ভয় ॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে ।
নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥
শাস্ত্রে বাদীভয়, গুণে খলদানে ভয় ।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয় ॥
এসংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয় ।—
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয়।—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক মুণালে ।
যুবতী যৌবন ক্ষয়, সিতি কেশজালে ॥
জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নির্ধন ।
হা নির্বোধে বিধি ধনলোভী বৃদ্ধ গণ ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা ।
কমলকুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পয় নিন্দার কলনা ॥
প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্বক্ষণ,
প্রাপ্তহন যতক সুজন ।

নৃপতির সন্নিধান, হুরন্ত খলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন, শতে আকুঞ্জন,
শতীব হাজারে মন।

চাকারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ,
লক্ষেশের রাজ্য পণ ॥

রাজ্য যেই হয়, তুষা কুষা নয়,
সম্রাট্ হইতে চায়।

সম্রাট্ যোজন, চিন্তে অহুঙ্কণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥

সহস্র লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মদ্ব মিলে আমারে।

বিধি গোঁরীশ্বর, হরি পদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥

১. ৯৪

পাপ কর্মে রত দেখি করে নিবারণ।

হিতকর কার্যে সদা করে নিয়োজন ॥

অতিশয় গুণগুণ করয়ে প্রচার।

আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥

সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান।

সুমিত্র লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ॥

৯৫

ভ্রান্তভূত কর্ম ফল কালেতে উদয়।

শরদেই আগু ধান্য, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দূর।

তহু দহে লগুনাক্ত মাখিলে কপূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ম সুত্বকর।

জল দিয়ে কর্ণজল বহিকৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদেবভোগেচ্ছা নাযায়।

সত দুগ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯

স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।

মুক্তারে না বুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০

ভুবন রঞ্জনকারী শীলতা বাহাব।

অন্ধেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥

বহ্নি হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।

মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ॥

ভূজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।

বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ॥

১০১

বিদ্যা বিভূষিত থলে পরিহার কর।

মণিমস্ত ভূজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ॥

১০২

খল ক্রুর বটে, আর ক্রুর বিষধব।

কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রুরতর ॥

মস্ত্র আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।

কোনরূপে ক্রুর খল নিবারিত নয় ॥

১০৩

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল।

তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥

প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল।

কে কাহার ব্যাথায় ব্যাধিত ভবেবল ॥

ইতি প্রথম অঞ্জলি।



জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

আরবীরা ।

আসিয়া খণ্ডে আবব সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত জাতি বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্বেষণ করিয়া ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী শেষে খালিফা আল্ মানসুর এবং খালিফা হারুনআল রাশিদের রাজত্ব সময়ে আবব দেশে জ্যোতির্বিদ্যালোচনার স্থাপত্য হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যে আল্ মানসুরের অধিকার কালে আরবে বা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইবু জেনিস লিখিয়াছেন যে আল মানসুরের রাজত্ব কালে আরব জ্যোতির্বিদগণ অপমণ্ডল ত্রিভুজ ভাবে নিরক্ষবৃত্ত চিত্র করিয়া যে স্থান কোণ উৎপন্ন করে তাহা $২০^{\circ} ৩০'$, অথবা $২০^{\circ} ৩৩' ৫২''$ পরিমিত এবং যাম্যোত্তর বৃত্তের একাংশ পরিমিত গোলাভূজ ৫৬ বা $৫৬\frac{১}{২}$ মাইল [৫ অথবা ৬ যবে এক ইঞ্চি, ২৭ ইঞ্চি = ১ হাত, ৪০০০ হস্ত = ১ মাইল] নিরূপণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতাব্দী আরব দেশে জ্যোতির্বিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

আরব জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে আল বাটেগ্নিস অথবা আল বাটনী [খৃষ্টীয়

নবম শতাব্দী] সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আল বাটনী পূর্বের দূর-বিস্তৃত গতি আবিষ্কার করেন, সৌর বেগ-বিভিন্নতার ভ্রম সংশোধন করেন, অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত চিত্র করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা $২০^{\circ} ৩৫'$ পরিমিত এবং বিষুব ৬৬ বৎসরে একাংশ মাত্র পূর্বোদগমন করে, নিরূপণ করেন। আল-ফেগেন্স বা আলকাংগানী (খৃঃ দশম শতাব্দী) একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচনা করেন। খাবেট বিন্ কোরা [খৃঃ দশম শতাব্দী] অপমণ্ডলের স্থান পরিবর্তন বিষয়ক মতের পুনরুদ্ভাবন করেন।

ইবন্ জেনিস (খৃঃ দশম শতাব্দী) একখানি জ্যোতির্বিদ্যার রচনা করেন, এবং কোন স্থির জ্যোতিষ্কের উন্নতি পর্যাবেক্ষণ দ্বারা গ্রহণারম্ভ ও মোক্ষকালের নির্ণয় করেন।

স্পেনীয় মুর আর সেটেল খ্রীষ্টীয় ১০৮০ অব্দে টলেমী প্রণীত তালিকা অবলম্বন করিয়া এক জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন।

আর সেটেলের সমসাময়িক আল-হাজেন কিবরশির বক্রীভবন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন।

আবুল হাসেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী

কারন্তে সিজর জ্যোতিষিকগণের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

গ্রীকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, যথা, শঙ্খ, বৃত্তপাদ, গোল, ইত্যাদি আরবেরাও সেট সমস্ত ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু আরবেরা (বোধ হয় ইবন ফুনিস) কোন নক্ষত্র অথবা গ্রহের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সময় নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

পারসিক।

আরব খালিকাদিগের ভ্রাম্য তাতার সম্রাটেরাও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সমাগালোচনা করিয়াছিলেন। জেন্সিস খাঁর পৌত্র হলাকু খাঁ পারস্য দেশে একটা পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার রাজসিংহাসন আরোহণ কালাবধি যাবতীর জ্যোতিষিক যন্ত্র নির্মিত ও গ্রহ রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করেন। হলাকুর রাজত্ব সময়ে প্রায় ১২৭১ খৃঃ অব্দে,—নাসীর উদ্দীন জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দে জর্জ ক্রীসোকাস নামক গ্রীক টিকিৎসক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রণীত কতকগুলি পারস্ত জ্যোতিষিক তালিকা অনুবাদ করেন। চিওনিয়াডেস এই সকল তালিকা পারস্ত রাজ্য হইতে ইউরোপখণ্ডে আনয়ন করেন।

তৈমুরলঙ্গ বংশীরেরাও জ্যোতিষবিদ্যার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তৈমুর সাহের পৌত্র উলুগবেগ আপন

রাজধানী সমবকল নগরে পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন; এবং গণিতবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৪৪৭ খৃঃ অব্দে (চিহ্নরি ৮৪১ শকে) স্থির জ্যোতিষিক দিগের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গ্রীক।

ইউরোপীয় জ্যোতিষদিগের মধ্যে গ্রীকেরাই প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করেন। গ্রীকভাষায় প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণেতা অটোলাইক্স সচল-গোলক এবং জ্যোতিষিকগণের উদয়ান্ত সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অটোলাইক্স খ্রীষ্টাব্দেব চারিশত বৎসর পূর্বে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আরিস্তারক্স শেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ২৮০ বৎসর খৃঃ পূঃ সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি সূর্য্য এবং চন্দ্রের আয়তন এবং দূরত্ব পরিমাণ করিবার প্রথম উদ্যম করিয়াছিলেন। আরিস্তারক্স খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৭৬ অব্দে সাইরিণী নগরে ইরটস্টেনিসের জন্ম হয়। ইরটস্টেনিস আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর আয়তন নিরূপণে উদ্যুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে তিনি অপমণ্ডল নিরূপণে ভেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৫২' পরিমিত নির্ণয় করিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১৯৪ অব্দে টাটহেনিসের মৃত্যু হয়।

সিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিস অল্পবয়স্ক হইয়া পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সূর্যের ব্যাস পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১১০ খৃঃ পূঃ রোমান সেনাপতি মার্সেলসের জনৈক সৈনিক কর্তৃক আর্কিমিডিস নিহত হন।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর পর হিপার্কাস খৃঃ পূঃ ২০০-১১৫ জ্যোতির্বিদ্যার সমীক্ষিত আলোচনা করেন। হিপার্কাস বিগিনিয়ার অন্তর্গত নাইসি নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিপার্কাস বিষুববিন্দুদ্বয়ের পুরোগমন আবিষ্কার করেন, এবং স্থান-সম্মিলনশীল নিক্রপণার্থ প্রথমতঃ সরল উত্থান এবং ক্রান্তি এবং তৎপরে অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ব্যবহার করেন। তিনি সূর্য্য এবং উজ্জ্বল দূরবিন্দুর গড়-গতি নিক্রপণ করিয়াছিলেন। হিপার্কাস গ্রহগণনা করিতে পারিতেন এবং সূর্য্য বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। হিপার্কাস কর্তৃক সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তারকা দর্শন করিয়া তিনি নক্ষত্র-গণের সংখ্যানির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তদভিপ্রায়ে ১০৮১ নক্ষত্রের অক্ষ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন।

মিশরীয় জ্যোতির্বেত্তা সোসিজেনিস্

খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে রোমাধিপতি জুলিয়স্ সিজরকে পল্লিকা-গত লম্ব সংশোধনে সাহায্য করেন।

লুসিয়স্ নানলিয়স্ সিনেকা স্পেন দেশে কর্দোবা নগরে খৃঃ পূঃ ৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিনেকা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বচনা করেন; এবং ধূমকেতুগণের নৈসর্গিকতাব পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার গ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬৫ অব্দে সিনেকার মৃত্যু হয়।

ক্লডিয়স্ টলেমি খৃঃ প্রথম শতাব্দী মিসর দেশে পিলুসিয়স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলিফা হারুন আল-রাসিদের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবেরা ইহাকে “আল মেজেষ্ট” কহে। এই গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদায় যে টলেমি কর্তৃক উদ্ভাবিত এমত নহে। টলেমি যে মতেব পোষকতা করেন তাহার মর্ম্ম এই। পৃথিবী অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রীভূত, এবং গ্রহগণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মত প্রমাদপূর্ণ হইলেও কোপার্নিকসের সময় পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

টলেমি চন্দ্রোদয় এবং আলোকরশ্মির বক্রীভবন আবিষ্কার করেন, ও আকাশ-

কক্ষার নিকটবর্তী সূর্য্য অথবা চন্দ্র মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বৃহদাকারের কারণ নির্দেশ করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে গ্রহগণ এক এক অতি বৃহৎ স্বচ্ছ গোলাকাকার বস্তু, এবং তন্মধ্যে এক এক তারকা সন্নিবেশিত আছে। এই মতের সমর্থন জন্যই নিচোচ্চ-বৃত্ত * প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। টলেমি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ব্যাপীত ভূগোল, সঙ্গীত এবং কলিত জ্যোতিষেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

টলেমি প্রণীত “আলমাজেস্ট” নামক

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫ম অধ্যায় ৪১ নোক।

জ্যোতিষিক গ্রন্থ খৃঃ ১২৩০ অব্দে দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকেব রাজত্ব সময়ে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরব জাতিদ্বারা আলিক জাতিয়া নগরী ধ্বংস হওয়াতে গ্রীক জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার শেষ হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ আধুনিক ইউরোপে সংগৃহীত। লেখক এতদংশ সুপাঠ্য করিতে পারেন নাই—এজন্য তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। বং সং

কৃষ্ণকান্তের উইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভূমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমাব কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুবোধ, যে সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ আমি, বহু সন্ধ্যানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পব মনেব সাক্ষাৎ পাইয়া, “কৃষ্ণকান্তের উইল” যাদিয়া নিখিতে বসিতেছিলাম—এমত সময়ে ভূমি আকাশ হইতে

ডাকিলে “কুহ! কুহ! কুহ!” ভূমি মুকুট, আমি স্বীকার করি, কিন্তু মুকুট বসিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এসব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নবাবাবু টাকার জালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাগরচ হইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন ভূমি হয় ত আপিসেব ভগ্নপ্রাচীরেব কাছে হইতে ডাকিলে, “কুহঃ”—বাবু আব জমাগরচ মিলিল না। যখন বিরহ সন্তপ্তা

সুন্দরী, আয় সমস্তদিনেব পর অর্থাৎ
বেলা নয়টার সময় ছুটি ভাত মুখে দিতে
বসিয়াছেন, কেবল কীরকের বাটাট
কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি
তুমি ডাকিলে—কুহুঃ—সুন্দরীর কীরকের
বাটা অমনি রহিল—হয় ত, তাহাতে অল্প
মনে লগ মাখিয়া থাইলেন। যাই হউক,
তোমার কুহুরবে কিছু যাহ আছে—
নহিলে, বখন তুমি বকুলগাছে বসিয়া
ডাকিতেছিলে—আর বিধবা! রোহিণী
কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল
—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে
যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ
হুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার
ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা তা
বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা
হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার
ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সয়াদ, কোন্দল,
এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই।
চাকরাণী নামে দেবতা, এই চারিটির
সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেক গুলি
চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণ বধ। কোন
চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্বদাই সম্মা-
জ্ঞনী গদা হস্তে গৃহ রণক্ষেত্রে ফিরি-
তেছেন—কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা
দুর্যোধন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্তৃক ভৎসনা
করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণ রূপিণী, ছয়
মাস করিয়া নিদ্রা বাইতেছেন, নিদ্রান্তে
সর্বস্ব থাইতেছেন—কেহ সুগ্ৰীব, গ্রীবা

হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ
করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ বালাই
ছিল না—সুতবাং জন আনা বাসন
মাজা টা, বোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়া ছিল।
বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে,
রোহিণী জল আনিতে যাইত। যেদিনের
ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন
নিয়মিত সময়ে, রোহিণী কলসী কক্ষে
জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা
বড় পুকুর আছে—নাম বাকুণী—জল
তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল
আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল।
রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল
বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা
হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে
হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর
অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি,
চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী
বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম
নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা,
ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের
উপর চাক্রবিনিস্ত্রিতা কাল ভুজঙ্গিনী
তুল্যা কুণ্ডলীকৃত লোণায়মানা মনো-
মোহিনী কবরী। গিতলের কলসী কক্ষে,
চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী
নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী
নাচে, সেইরূপ, ধীরে ধীরে গা দোলা-
ইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখনি
আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত,
মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে

রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া ছলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, বোহিণী সুরুরী, সরোবর পথ আলো করিয়া জল নইতে আসিতেছিল—এমত সময়ে, নিষের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহঃ কুহঃ কুহঃ! রোহিণী চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই উজ্জ্বলকিশোরী বিলোলকটাক ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শব্দে বিহ্বল হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী পরস্পরায় এটি প্রতিবন্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূৰ্ণজগজ্জিত স্মৃতি ছিল না। মূৰ্খ পাখী আবার ডাকিল—“কুহ! কুহ! কুহ!”

“দূর হ! কালামুখো!” বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসৰ্ব্ব

অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাষ্ট, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রক্ত হাবাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুপের মাত্রা যেন পুরিল না—যেন এসংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহঃ, কুহঃ, কুহঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুশীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাধা। দেখিল—নবপ্রসুটিত আশ্রমকুল—কাঞ্চনগৌর, তরুরত্নের তরুর শাখালপত্রে বিমিশ্রিত, শীতলসুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণ গুণে, শব্দিত, অথচ সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাধা। দেখিল, সরোবরতীরে, গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে, কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাধা। বাতাসের সঙ্গে তাহাব গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাহার অতি নিবিড় ক্রম ক্রমিত কৈশ দাম, চক্রে ধরিয়া তাহার চম্পক রাজি নির্মিত স্বকোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষা-

ধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া তুলিতেছে—কি স্বর মিলিল! এও সেই বৃত-রবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল “কু উঃ” তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয় ঐ ছুট কোকিল রোহিণীকে কাদাইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাকনী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণী টি অতি বৃহৎ—নীল কাঁচের আয়না মত ঘাসের ফেঁমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফেঁমের পরে আর একখানা ফেঁম—বাগানের ফেঁম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফেঁম খানা বড় জাঁকাল—লাল, কাল, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে স্নিবে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলো একত খানা বড় বড় হীরার

মত অন্তর্গামী সূর্য্যাব কিরণে জ্বলিতে ছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফেঁমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফেঁম, আর ঘাসের ফেঁম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিল টা ডাকিতেছিল। এসকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে বোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে এই বাকনী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন, যে রোহিণী আসিয়া ঘাটের রণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনেই সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে

আমি এ পৃথিবীর কোন সুপভোগ ক
রিতে পাউলাম না? কোন দোষে আমাকে
এরূপ, যৌনন থাকিতে কেবল শুষ্ক কা-
ষ্ঠের মত উচ্ছ্রীবন কাটাতে হইল?
বাহাবা এ জীবনের সকল স্তখে স্তখী—
মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—
তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণ
বতী—কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে
এ স্তখ—আমার কপালে শূন্য? দূরহৌক
—পরের স্তখ দেখিয়া আমি কাতর নই—
কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার
এ অস্ত্রথের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা আমার ত বলিয়াছি, বোহিনী লোক
ভাল নয়। দেখ, এটুকুতে কত হিংসা!
বোহিনী লোভী, বোহিনী চোর, তা বলি-
য়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল
চুরি করিল। বোহিনী ব্যাপিকা, তাও
বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের
ন্যায় কথা বার্তা কহিয়াছিল। বোহি-
ণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে
কাঁদিতে উচ্ছ্রা করে কি? করে না। কিন্তু
অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না
দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতাব মেঘ,
কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা বোহিনীর জন্য একবার
আহা বল। দেখ, এখনও বোহিনী, ঘাটে
বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—
শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচি-
তেছে।

শেষে স্তখ্য অন্ত গেলেন; ক্রমে সরে-
বরের নীল জলে কালো চায়া পড়িল—

শোনে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী
সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল।
গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন
চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মধু আলো
কুটিল। তখনও বোহিনী ঘাটে বসিয়া
কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে
ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান
হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—ষাইবার
সময়ে দেখিতে পাউলেন যে তখনও
বোহিনী ঘাটে বসিয়া আছে।

এখন, বোহিনী বড় ব্যাপিকা বলিয়া বি-
খ্যাত। খ্যাতিটা অযোগ্য নহে, তাহা পা-
ঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর
এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক,
সঙ্গে আসিয়া যোটে। বোহিনীর সে গুরু-
তর অখ্যাতিও ছিল। স্তত্রাং কোন ভদ্র-
লোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না।
গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিতেন। কিন্তু এতকণ অবলা
একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাহার
একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তা-
হার মনে হইল, যে এ স্ত্রীলোক সচ্চবিত্রা
হউক জুচ্চবিত্রা হউক, এও সেই জগৎ-
পিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—আমিও
সেই তাহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—
অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার
দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন
করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে সোপানাবলি অব-
তরণ করিয়া বোহিনীর কাছে গিয়া, তা-
হার পার্শ্বে চম্পক নির্মিত মূর্তিবৎ সেই

চম্পকালোক চম্ভকিরণে দাঁড়াইলেন।

রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন,

“রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেন কেন?”

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন,

“তোমার কিসের দুঃখ, আমার কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।”

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে অতি স্নেহাযোগ্য বাপিকারন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জবন্য-শ্লোক আবৃত্ত করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুস্তকের মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বজ্রিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবর জলে সেই ভাস্করকীর্তি কর মূর্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করণাময়ী—মহুয্য অকরণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন,

“তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে

পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জানাইও।”

রোহিণী এমার কথা কহিল, বলিল,

“একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।”

কি কথা রোহিণি? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন বক্-বক্-গল্-গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী কি মনুষ্য কলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃ শূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে, রোহিণী ঘাটে উঠিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে দেহ স্ফটাকরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে বাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিক্ ঠিন্! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কান্দটা!

জল বলিল—ছলৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল ঠিন্ ঠিনা—না! তাত না—

রোহিণী'র মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ চনক্ ঢণ্—উপায়
আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বোহিণী সকাল৩ পাককাগী সমাধা
করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া,
আপনি অনাচারে শয়নগৃহে দ্বাব রুদ্ধ
করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার
জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদগণের
মতামত কলকাল পরিত্যাগ করিয়া,
আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন।
সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি
নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্বদা মনু-
ষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং
সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।
যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া
পরস্পর যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত
নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত
মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি,
এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া
সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপ-
স্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল,—“এমন লোকে-
রও সর্বনাশ করিতে আছে?”

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে?
টাকার কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও
টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হা-

জার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া
দাও না?

(N. B—এই কথাটা সুমতি বলিয়া-
ছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক
ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আব গোবিন্দ
লাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পা-
রিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে
বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই
তাহার কার্যোদ্ধার চইবে। তখনই সে
কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল
বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে
টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম-
পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত
দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা
কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কত-
দিন সাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে
ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল
কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে
জিজ্ঞাসা করিবে “এ উইল তুমি কোথায়
পাইলে, আর আমার দেৱাজে আর এক
খানা জাল উইলই বা কোথা হইতে
আসিল,” তখন আমি কি বলিব? কি
মজার কথা! কাকাতে, আমাতে দুজনে
পানায় সেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দ-
লালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার
পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু অবশ্য
তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সট কথা, কিন্তু গোবিন্দলালকে
অবশ্য এ সকল কথা কহাওঁতে কান
জানাতে হইবে, নইলে উইলের বদল
ভাজিবে না। কহিতে যদি থামায় দেয়।
—বে গোবিন্দলাল নাহিবে কি প্রকারে?
কহে জাব এক কথামাত্র তাড়। এখন
চুপ করিয়া থাক—আগে কহিবে সত
হাবদব সোনার পদার্থ নহে গোবিন্দ-
লালকে কহে গিয়া তাহার পায়ে জড়া-
ইয়া পড়িল। তখন কহে উইল।

ত। এখন বুঝ হইবে—যে উইল
কহাওঁতে কান প ভায়া হইবে, তাহাট
নাত্য বিন্দা গাহ হইবে। গোবিন্দলাল

সে উইল বাহিব করিলে, জ্বালেন অপবাদ-
গ্রস্ত হইতে পাবে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হই-
য়াছে তা হইবে।

সুতরাং স্মৃতি চুপ করিল—সাহস
পরাণ হইল। তাবদব হুই তনে সন্ধি
কবিয়া দণ্ডভাব, আর এক কথায় প্র-
বৃত্ত হইল। সেই বাণীতীব্যসক্তি,
চক্রান্নেব প্রতিদানিত, চম্পকদামবিনি-
শ্চিত দেব মূর্তি অনিরা, বোহিনী নানস-
চন্দ্রব কণ্ঠে ধরিল। বোহিনী দেগিতে
বাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে,
কঁকি। বোহিনী সে রাখে ঘুমাইল না।

চৈতন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দিবাহ।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বকপা পূত্রবধু-বিরোগ-
বিমুরা জননীকে নানাকপ সাজনা করিব।
চৈতন্য যথাবিহিত পত্নীবশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া
নির্দ্ধারিত করিলেন। ব্রহ্মাবন দান ঠাকুর
প্রভৃতি চৈতন্যের জীবনচরিত ঘোষণা
কেহ একথা উল্লেখ করেন না। কারণ
কুণ্ড তন্তে কবা অথবা পিণ্ডদান কবা
বৈষ্ণব দেগেব ব্যবসব নই নতবিস্তর।
‘সদাৰ্থি’ অস্বদেশীয় অনেক বৈষ্ণব
নিঃসৃত সমাজেব অনুরোধে আদ্যশ্রদ্ধ
করিয়াও পাপপক্ষে অংশ ছুর মিন-

জবাদি রক্ষা করিতে যান না।) তথাপি
চৈতন্য ধনিত্য যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি
করিয়াছিলেন ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া
বোধ হয়। কারণ;

(১) ব্রহ্মকান পর্যন্ত চৈতন্য কর্মকাণ্ড
তাগ ব্যবসব নাই। এবং সাক্ষাবন্দ-
নাদি যাজ্ঞিক ক্রিয়ায় + ব্যবসব নাই পক্ষ-

এই সকল প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত
ও চৈতন্য ভাগবত হইতে সংগৃহীত।

চাক্রগুর মধো যদি কেহ কোন
দিন সাক্ষাদি না করিয়া চতুষ্পাঠ্যে গমন

পাতী ছিলেন। বোধ হ'ল বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগের ভবিষ্যৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধচরণ এতাবৎ ভ্রমেও মনে করেন নাই। একাদশ ভাগবতের মতে † বৈষ্ণব তিন ভাগে বিভক্ত—উত্তম মধ্যম ও অধম। উত্তম অর্থাৎ নিরাশ্রম সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, মধ্যম অর্থাৎ গৃহী নাবু বৈষ্ণব, অধম অর্থাৎ প্রকৃত সংসারী, কপটচাণী—বিষ্ণুভক্ত। রামানুজ স্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নিরাশ্রম বৈষ্ণব ও গৃহী এই দুই সম্প্রদায়ের বিভক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এতাবৎ গৃহী বৈষ্ণবই ছিলেন।

(২) চৈতন্যের মাতা তাঁতার দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে যষ্টি পূজাদি সমুদায় করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যও যথাবিহিত বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৩) চৈতন্য পত্নীর শ্রদ্ধা না করিলে, অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন না।

পত্নীর শ্রদ্ধাদি সমাপ্ত হইলে, চৈতন্য প্রতিদিন যুক্লন্দ সঞ্জয়ের মন্ডপে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এদিকে শচী পুত্রের বিবাহের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া কন্যা অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন; একদা গঙ্গান্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীনানন্দন রাজ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশধর ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর রূপ লাগণা ও বালিকোচিত অবলম্বন দেখিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইলেন, এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাশীনাথ নিম্ন নামক জাতিকে আহ্বান করিয়া সনাতন রাজের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চৈতন্যের ১ন পত্নীবিবোগ হওয়া অবধি, সনাতন চৈতন্যকেই তদীয় কন্যা সমর্পণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিনা যজ্ঞে রহ লাভ হইবে জানিতে পারিয়া যাবপর নাই আক্লান্দিত হইলেন। মহা সনারোহে চৈতন্য ও সনাতনরাজের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ দিয়া নির্ঝাঁহ হইল। এই ক্রিয়া যথা শাস্ত্র নির্ঝাঁহ হইয়াছিল।*

চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই একী। চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে উভয় গ্রন্থেই ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। তথাপি লোকে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম কিজন্য বিষ্ণু-প্রিয়া† বলিয়া থাকে। অন্যাদিগের বিবেচনার ইহার বিবিধ উত্তর হইতে পাবেন।

* চৈতন্য ভাগবত দেখ।

† যুবতী ভার্গ্যা, রাগিয়া পূজ পরলোকগত হইলে জনক জননী “বিষ্ণুপ্রিয়া রহিল যেরে” এই বলিয়া পৈদ উক্তি করেন। এক্ষণ উক্তি বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত।

করিত, তাহাকে চৈতন্য যাবপর নাই তিরস্কার করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাটী বাইয়া নিত্য কর্ম করিতে আদেশ করিতেন।

‡ উক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ (বাগতব)

(১) ১ম হইতে দ্বিতীয় পঙ্কজ পার্থক্য রাখার জন্য বৈষ্ণবগণ প্রথম পঙ্ককে আখ্যা বিবেচনা করিয়া তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া দ্বিতীয়ার নাম পরিবর্তন করিয়াছেন। চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার সূতরাং বৈষ্ণবগণ কর্তৃক তাঁহার পঙ্কজ নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রাখা অসম্ভব নয় বোধ হয়।

(২) কথিত আছে সনাতন রাজ “বিষ্ণু-প্রীতি কামে” কল্যাণ দান করিয়াছিলেন। ইহাকেই বৈষ্ণবগণ নিকাম দান বলিয়া থাকেন। চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশ সমধিক কক্ষকাণ্ড প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল সূতরাং, হয়ত, তাৎকালিক কোন লোকই স্বর্গ কামনা প্রভৃতি কামনাবিহিত হইয়া কল্যাণ দান করিতেন না। পঙ্কজের সনাতনরাজ স্বীয় কল্যাণলক্ষীকে বিষ্ণুপ্রীতি কামে দান করিলেন, এইজন্য লক্ষ্মীর নামান্তর বিষ্ণুপ্রিয়া † হইল।

সে যাহা হউক চৈতন্যের দ্বিতীয় ভাষ্যের প্রকৃত নাম লক্ষ্মী, কিন্তু বঙ্গদেশের সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়াই বলিব।

চৈতন্য একাধং সংসার ত্যাগের অণু-মাত্র চিন্তা করিয়াছিলেন না। হায়! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য কি অন্ধ। চৈতন্য যদি একদিন ভ্রমেও মনে করিতেন যে চারিবৎসর পরেই সংসারাত্মক ত্যাগ

† বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রীতি কামনাতে দত্তা হইয়াছে যে।

করবেন তাহা হইলে কি তিনি একজন অবলাকে অনাথা করিতেন।

চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কয়েক দিবস মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন এবং মাত্র অল্পমতি গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের ঋণ শোধনার্থ শশিষ্যে গয়াধামে † যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গয়াধামে অবস্থান করিয়া যথাশাস্ত্র গয়াতীর্থের সমুদয় কার্যাদি সমাপ্ত করিলেন।

একদা চৈতন্য গদাধরের মন্দিরে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে পূর্ব-পরিচিত বৈষ্ণবচূড়ামণি ঈশ্বর পুরীকে দেখিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে দেখিয়া যারপর নাট প্রীত হইলেন। উভয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। অধুনা চৈতন্যের ধর্মবহুি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ছিল। ঈশ্বরপুরীর নায় ভাগবত শ্রেষ্ঠ সন্দর্শনে তাহাতে যেন নবীন আভিতি পড়িল। চৈতন্য পুরীরের সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধর্মবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ধর্মো দীক্ষিত হইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন—

হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

† অদ্যাবধি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। গয়াতে পিতৃ দান না করিলে কোন হিন্দুসন্তানই আপনাকে পিতৃঋণ মুক্ত বিবেচনা করেন না।

চৈতন্য কৃষ্ণমুখে দীক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ
রূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইলেন এবং
কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শন
করিতে লালসিত হইলেন। চৈতন্যের
পারিষদগণ অনেকরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে

এ যাত্রা বৃন্দাবনবাণী হইতে নিবৃত্ত
করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। পারিষদ-
গণ ভাবিয়াছিলেন, তখন ত, চৈতন্য বৃন্দা-
বন গমন করিলে আর প্রত্যাগমন
করিবেন না।



ধাত্মশিক্ষা।*

এই জন্ম সূত্রে কি হুঃখের বলিতে
পারি না, ধর্মোপদেশক এবং নীতি-
বেত্তাগণ তাহা নিরূপণ করিবেন, কিন্তু
জন্মগ্রহণ করা অতি সুকঠিন। বিধাতার
সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ, এবং লোকে যেমন
কুশলময় বলে, তেমন কুশলময় নছে,
এই কথার উদাহরণপ্রয়োগস্থানে মিল,
জীবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় হুঃখের বিশেষ
করিয়া উল্লেখ উত্থাপন করিয়াছেন।
প্রথমতঃ, জঠরযন্ত্রণা। যে জঠরস্থিত
তাহার কত যন্ত্রণা তাহা সবিশেষ বলিতে
পারি না, কিন্তু গর্ভিণীর যন্ত্রণার শেষ
নাই। যত দিন না সন্তান প্রসূত হয়,
তত দিন নিত্য পীড়া, নিত্য বিপদ।
যদি কোন ক্রমে নিয়মিত কাল অতীত
হইল, তবে প্রসবের দিন উপস্থিত।
যদি প্রসব ঘটিল, তবে হয় ত পী-
ড়ার ভরানক দৌবাখ্যা আরম্ভ হইল।
নিত্য পীড়া, নিত্য প্রাণ সংশয়। যাহারা
সামাজিক জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখেন

তাঁহারা জানেন, যে যত মনুষ্য, মাতৃগর্ভ
হইতে প্রসূত হওয়াব অল্পকাল মধ্যে
প্রাণত্যাগ করে, এত আর অন্য কোন
বয়সে করে না।

এই সকল অমঙ্গলের কোন প্রতীকার
হইতে পারে না? পারে। এমন কিছুই
নৈসর্গিক অমঙ্গল নাই, যে নৈসর্গিক
নিয়ম সকলের আলোচনা করিলে নি-
তান্তপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে তাহার প্রতী-
কার হয় না। এ বিষয়েও নৈসর্গিক
নিয়ম সকল অবগত হইলে পীড়া ও
মৃত্যুর লাঘব কবা যায়। এবং ইউরোপে
এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম উত্তমরূপে
অধীত হওয়ায় প্রসূতী এবং সূতের একটি
উত্তম সূচিকিৎসা প্রণালী উদ্ভূত হই
য়াছে। তৎসাহায্যে বহুতর প্রাণীর
জীবন রক্ষা এবং পীড়ার নিবারণ অথবা
উপশম ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু যে জ্ঞান মনুষ্যগাজেরই প্রয়ো-
জনীয়, তাহা কেবল চিকিৎসকের অধি-
ভাক্তার শ্রীযত্ননাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

* ধাত্মশিক্ষা এবং প্রসূতি-শিক্ষা।

চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫।

কারে শুহানিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিলে সংসারের নঙ্গল সুনির্ভীহ পার না। প্রায় সমস্ত মাত্রকেই গুণ ধারণ করিতে হয়; প্রায় গৃহ মাত্রকেই প্রসূতী এবং সূত। গৃহমাত্রকে চিকিৎসকের অধিকৃত নহে। বিশেষ, যে চিকিৎসা একদিনের জন্য নহে, যাঁহা গর্ভাধান কাল হইতে শিশুর শৈশবাতিক্রম পর্যন্ত অবলম্বিত তত্ত্ব কৰ্ত্তব্য। তাহা দুর্বল, অবসর বিহীন, এবং যেতনভোগী চিকিৎসকের উপর নির্ভর কবিলে চলে না। বিশেষ অনেক সময়ে, অকস্মাৎ এসত সঙ্কট উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক ডাকিবার সময় পাকে না। আর এতদেখে চিকিৎসক পুঙ্খম জ্ঞাতি, চিকিৎসানীয়া, লজ্জাশীনা স্ত্রীজাতি: চিকিৎসার প্রয়োজন ও লজ্জাবিবংসকর। অতএব প্রতি গৃহে গৃহে, গৃহী ও গৃহীণীগণ এ চিকিৎসা অবগত না থাকিলে মনুষ্যাগণের মঙ্গল নাই। যিনি গৃহে গৃহে গৃহগণের এই চিকিৎসা শিখিবার উপায় বিধান করিবেন, তিনি পরন লোকহিতকারী বলিয়া খ্যাত হইবেন সন্দেহ নাই।

এতদেখে ডাক্তার যত্নাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত “ধাত্মশিক্ষা ও প্রসূতী শিক্ষা” গ্রন্থে, গর্ভাধান ও শৈশব হইতে এ চিকিৎসার সমুদায় তত্ত্ব, অতি পরিকাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যত্নবাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, শিক্ষিতা হটক অশিক্ষিতা

হটক স্ত্রীলোক মাত্রকেই বিনামূল্যে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকল শিখিতে পারেন। যে ভাষার স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, সেই ভাষাতেই ছইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথনক্ষেত্রে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারে না। তরুণ চিকিৎসা তত্ত্ব এইরূপ পরিষ্কার করিয়া যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি চিকিৎসাবিদ্যার অসামান্য দক্ষতা সম্পন্ন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ডাক্তার যত্নাথ মুখোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত সূচিকিৎসক। তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা নির্ভাবদে গ্রাহ্য।

গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করা কৰ্ত্তব্য তদ্রূপক্রমে অনেক শিশুর শরীর দুর্বল এবং অস্বাস্থ্যপ্রবল হইয়া থাকে। ধাত্মশিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে এই একটি মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। এমন কি একজন ভদ্র লোকের সন্তান হইয়া অল্প কাল মধ্যেই বিনষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি যত্নবাবু ধাত্মশিক্ষা পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহার নিয়মগুলি প্রসূতী ও সন্তানগণের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন। সেই অবধি তাঁহার সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল। ইহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যে গ্রন্থের একরূপ

অপরিমেয় শুভ ফল, তাহা যে কেন
বাক্যলির গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে
আমরা বিশ্বিত হই। যদি শুভদিন
দেখিবার জন্য, পঞ্জিকা গৃহে গৃহে রাখি-
বার প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের
শুভবিষয়ক এই গ্রন্থও গৃহে রাখিবার
আবশ্যকতা আছে।

এই দূলে আমরা সুবিখ্যাত ডাক্তার
চার্লস যদুবাবুকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পত্র
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া
ক্ষান্ত হইব।

“It gives me much pleasure to
be able to inform you that after
having had the work critically

examined, and selected passages
either read to me, or translated
for me, I have formed a high
opinion of its merits. I consider
that the subjects you have taken
up are very judicious and your
treatment of them most careful.
I am convinced that an extensive
circulation of the book through
the Bengalee districts in the
Lower Provinces would do that
amount of good which is possible
as long as the management of
women in labor is entrusted to
untrained women who can neither
read nor write.”



কালিদাসের উপমা ।

“উপমা কালিদাসম্যা”—পৃথিবী বি-
খ্যাত। যেমন হোমরের যুদ্ধ, যেমন
ক্লোদ লোরানের দৃশ্যচিত্র, যেমন পিত্রা-
কার চতুর্দশপদী,—তেমনি—ততোধিক
—বিখ্যাত, কালিদাসের উপমা। যেমন
বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দের
বজ্র, এবং মন্থথের কুসুমশর—তেমনি
কালিদাসের উপমা—অব্যর্থসন্ধান। পৃথি-
বীতে এমন উপমা-পটু কবি, আর কখন
অন্যগ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ
পাঠককে, সেই উপমাকুসুমের একছড়া
কুদ্র হার গাঁথিয়া অদ্য উপহার প্রদান
করিব।

প্রথমে উপমার প্রকৃতি বিচার করিয়া
দেখিলে ক্ষতি নাই। আনাদিগের বিবে-
চনায় উপমা দ্বিবিধ।

প্রথম, সামান্য উপমা। কতকগুলি
উপমাতে, কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত
আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য নির্দিষ্ট হয়,
যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য
উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে হঠাৎ
বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের
সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার
নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ
যেমন বারি ব্যয় করে, রাজা দশরথ

সেইরূপ ধনব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট—দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে, মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ, এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধন এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতঃই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে, সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আনুষঙ্গিক মাত্র।

এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য। কালিদাস এরূপ উপমাপটু, যে অনেক স্থানে প্রায় প্রতি শ্লোকেই এক একটি উৎকৃষ্ট যুক্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এবিসময়ে রঘুবংশের প্রথম সর্গ বিখ্যাত। আমরা কিরূপে দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

বাগর্থাবিবসংপ্তকৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে ।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্শ্বতী পরমেশ্বরৌ ॥
ক হৃগ্যপ্রভবো বংশঃ ক চারবিষয়া

মতিঃ ।

তিতীষু হৃস্তরং মোহাহুদুপেনান্মি
সাগরং ॥

মনঃ কবিশঃ প্রাপী গমিষ্যাম্যপ-
হাস্যতাম্ ।

প্রাংস্তলভ্যে ফলে লোভাহুদ্বাহ রিব
বামনঃ ॥

অথবা কৃতবাগ্ধারে বংশেশ্বিন্ পূর্ক
শ্রুতিঃ ।

মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে হৃদ্যসোবাস্তি মে
গতিঃ ॥

ভেলার সাগর পাব, এবং “বামন হইয়া চাঁদে হাত” এরূপে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, কালিদাসের সময়ে তাহার উপমা অভিনব ছিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় ছিল, কেন না কালিদাসের ন্যায় উপমা-পটু কবি রাধু মাধুর্য্যায় চর্কিতচর্কণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ কালিদাসের অনেকগুলি উপমা এরূপে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নোক্ত উৎকৃষ্ট উপমা একটি ইহার দৃষ্টান্তস্বল—

ভীমকাস্তৈর্গৃপ্তগণৈঃ সবভূবোপজীবিনাম্ ।
অধ্যাশ্চাভিগম্যাশ্চ যাদোরৈরিবার্ণবঃ ॥

সেই রাজা ভরানক অথচ কমণীয় রাজগুণসমূহ দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নক্রচক্রসঙ্কুল অথচ রত্নরাজি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অনভিভবনীয় এবং আশ্রয়ণীয় ছিলেন।

আর একটি,
প্রজানামেব ভূতার্থঃ স তাত্যো বলিম-
গ্রহীৎ ।

সহস্র গুণমুৎস্রষ্টু মাদন্তে হি রসং রবিঃ ॥

আর একটি,
দ্বৈষ্যোপি সম্মতঃ শিষ্ট স্ত্রান্তাৰ্ত্তস্ত যথোষধম্ ।
ত্যাঙ্গ্যো হৃষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদমূলীবোরগ-
ক্ষতঃ ॥

তিনি প্রজাদিগের উন্নতি নিমিত্তে তাহাদিগের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিতেন।

স্বর্ঘ্য সহস্রগুণ দান করিবার নিমিত্তেই পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করিয়া থাকেন।

রোগীর ঔষধের ন্যায়, শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাঁহার গ্রহণীয়; কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গ-লির ন্যায় তাঁহার ত্যাজ্য ছিল।

বশিষ্ঠাশ্রম গমন সময়ে এক রথ কচ্ছ রাজদম্পতী—

স্বিষ্ট গম্ভীর নির্ঘোষ মেঘং স্যানন্দ-

মাস্তিষ্ঠৌ

প্রাবৃষ্যৎ পরোবাহং বিছাদৈরা বতাবিব।

ঋতি সুখাবহ অথচ গম্ভীর শব্দশালী এক রথাক্রুত সেই দম্পতী, বর্ষাকালীন বারিধরাশ্রিত বিছাওও ঐরাবতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে

রাজ্যোক্তি শ্রবণে বশিষ্ঠের সচিস্তাবস্থা—

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিনিত-

লোচনঃ।

ক্ষণমাত্র মুষিত্ত্বৌ স্পৃগুমীন ইব হ্রদঃ ॥

ঋষি, রাজা কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, ধ্যানে স্থিরনেত্র হইয়া কিছুকাল মীনহতিরহিত হ্রদের ন্যায় অবস্থিত হইলেন।

কুমার সমুদ্রের দ্বিতীয় সর্গে অম্বর গীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

তেষান্যবিরত্যা পবিত্রানমুপশিয়াং।
সরসাং স্পৃগুপদ্মানাং প্রাতর্দীপ্তিমানিব ॥

তারকাসুরোৎপীড়নে স্নানমুখকান্তি সেই দেবতাদিগের সম্মুখে, মুদিতপদ্ম-সরোবর সম্বন্ধে বাল স্বর্ঘ্যের ন্যায় বিধাতা আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা দেবগণের তেজোহানি দেখিয়া, বরুণকে বলিতেছেন।

কিঙ্কায় মরিচুর্কারঃ পানৌ পাশঃ প্রচেতসঃ
মস্ত্রেণ হতবীৰ্য্যন্য কবিনো দৈনা-

মাস্তিতঃ ॥

শত্রুচর্য্যার বরণের হস্তস্থিত এই পাশাস্ত্র মস্তকবীৰ্য্য সর্পের ন্যায় শোচনীয়াবস্থ কি জন্য?

আমরা অন্যস্থান হইতে অধিক উপমা সঙ্কলন না করিয়া, কুমারের তৃতীয় সর্গ হইতে কিছু গ্রহণ করিব। কাব্যান্ত্রে কুমারের তৃতীয় সর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট রচনা, সাহিত্যসংসারে বড় দুর্লভ। এই সর্গে মদন কর্তৃক শিবের ধ্যানভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের উত্তেজনায় অশ্বখ, রতিসহায় হইয়া, বসন্ত সমেত সেই মহাসংবমী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। উমাও তথায় গেলেন। তৎপরাশ্রয় মহাদেবের বর্ণনা কবিত্বের এক শেষ। তাহা হইতে একটি উপমা চয়ন করিব।

স্বপ্তিসংরম্ভ মিবাষুবাহং . . .

অগাধিবাধার মনুভবঙ্গং।

অস্ত্রচরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিকম্পমিব প্রদীপাৎ ॥

অস্ত্রপত বায়ু (প্রাণাদিব) নিরোধ হেত
দর্শনহীন মেঘেব ন ন, তবক্ষতীন সমুদ্রেব
নাট, বাতান্তাং নিশ্চল প্রদীপেব ত্যায়
শিবভাবাপন্ন ।

উমার বর্ণনা কালে—

আবর্জিতা কিঞ্চিৎবিব স্নানভ্যাম্
বাসো নসান তকণাক্ষবাংগং ।
পর্ণাপ্প পুষ্পস্তবকাবনয়া
সঞ্চাবিণী পল্লবিনী লভেব ॥

স্তনভবে শবীর যেন ঈষৎ নত হই-
য়াছে । বালস্বর্ণ্যেব ত্যায় অকণনর্ণ বস্ত্র
পরিধান কবিয়াছেন । যেন পর্ণাপ্প পুষ্প-
স্তবকে নভ ও নবপল্লবশালিনী লতা
বায়ুভবে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে ।

বসন্ত এবং সন্দের কাণ্ডো, তপস্বী
কিঞ্চিং বিচলিত হইলেন,

হবস্ত কিঞ্চিং পল্লিপুধৈর্যা
শ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবাসুরাশিঃ ।

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির ত্যায় মহাদেবও
কিঞ্চিং পৈর্য্যচ্যুত হইলেন ।

পরে রতিবিলাপ —

অ হু মাং তদধীনজীবিতাং বিনিকীর্ণা
ফণতিস্মসৌহৃদঃ ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জল সংঘাত
ঔবাসি বিজ্ঞতঃ ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ ফণবাশি যেমন জলাধীন
জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্র-
স্থান করে, তদ্রূপ তদধীনজীবিতা আমা-
কে পরিত্যাগ করিয়া ফণমাত্রে প্রণয়
ভগ্নপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে ।

কামসখ বসন্ত দর্শনে—

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপইবাগ্নিলাহতঃ ।
অহমসাদশেব পশ্য মা
মবিসহা বাসনেন ধুমিতাং ॥

তোমার সেই সখা বায়ুতড়িত দীপের
ন্যায় পরলোকে গমন কবিয়াছেন, আব-
ফিরিবেন না । আমি নিরুপাতিত দীপের
দশাবৎ অসমুদ্রস্থে ধূমিত হইতেছি দেখ ।

পবে অমুকুল আকাশবাণী হইল ।

ইতি দেহ বিমুক্তয়ে স্তিতাং
রতিমাকাশভবা সবস্বতী ।
শফরীং হৃদশোষবিক্রবাং
প্রমথ্য বৃষ্টি রিবাসকম্পয়ং ॥

সবোবর শুষ্ক হইলে বিপন্ন শফরীকে
প্রথম বৃষ্টি যেমন অমুকম্পা প্রদর্শন করে,
সেইরূপ দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় আকাশ-
বাণী রতিকে অমুগ্রহ প্রকাশ কবিল ।

পরে কুণ্ঠমনে উমা গৃহে প্রত্যাগমন
করিয়া তপশ্চারণে অভিলাষিণী হইলেন ।
তখন জননী মেনকা তাঁহাকে বিরত
করিতেছেন ।

মনীষিতাঃ সস্তি গৃহেষু দেবতা
স্তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ ।
পদং সহিত ভ্রমবস্যা পেলবং
শিরীষপুষ্পং নপুনঃ পতত্রিণঃ ॥

হে বৎসে! মনোহতীষ্ট দেবতা গৃহে-
তেই আছেন । তুমি তাঁহাদিগের আরা-
ধনে প্রবৃত্ত হও । কষ্টসাধ্য তপসা
কোথায় আব তোমার সুকোমল শরীরই
বা কোথায় । কোমল শিরীষ কুসুম
ভ্রমরের পদভর সহ কবিতে পারে কিন্তু
অন্য পক্ষীর নহে ।

এখন মেঘদূত হইতে কয়েকটি উপমা
সঙ্কলন করিব।

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে
দ্বিতীয়ঃ
দূরীভূতে ময়ি সচচরে চক্রবাকী মিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং শুক্লযু দিবসেধেযু গচ্ছংসু
বাল্যং
জাতাং মন্ত্রে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং
বান-রূপাং ॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম।
কিন্তু দৈবনিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্তী। স্মৃ-
তাং সহচর চক্রবাকী বিরহিত একাকিনী
চক্রবাকী তুল্যা সেই মিতভাষিনীকে
আমার দ্বিতীয় জীবিত তুল্য জানিবে।
আমি অমুগমন করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠা-
বিতা সেই সুকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এত
সকল দিবস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই
হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর তায় পূর্বাকারের
বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।
নুনং তন্তাঃ প্রবল বদিতোচ্চননেত্রঃ প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া তিলবর্ণাধারীষ্ঠং।
হস্ততন্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বাসকন্তা
দিলোদৈর্ঘ্যং তদমুসরণক্লিষ্টকাজে বিভর্তি ॥

হে মেঘ! প্রবল বোরন হেতু উচ্ছ-
সিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাসবশতঃ বিবর্ণ
অধরৌষ্ঠ, সংস্কারভাবে লম্বমান কুন্তল
হেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতল
বিজ্ঞত প্রিয়ার বদনটা তোমারই অব-
বোধে স্নানকাস্তি চক্রে ন্যায় হইয়াছে।
আশিঙ্কামাং বিবহশয়নে সগ্নিষ নৈকপার্শ্বাঃ
প্রাটীম্বে তনুনিব কলামাত্র শেবাং

হিমাংশোঃ

হে মেঘ! গানগিক যন্তনায় কুশাঙ্গী,
বিরহশয্যায় একপার্শ্ব শায়িনী, সেই প্রি-
য়াকে পূর্বদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চক্রে
মূর্তির ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীর চতুর্দশীর
চক্রে ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমুত শিশিরান্ জলমার্গ এবি
ষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সগ্নিগুতং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাং সনিলশুকতিঃ পদ্মভিষ্টা-

দয়স্বীং

সান্ত্রেহুহিব স্তলকমলিনীঃ নপ্রবৃদ্ধাঃ

ননুপাং ॥

পূর্ববৎ প্রীতি প্রদ হইলে বলিয়া গবাক
পথে প্রবিষ্ট, শীতল চক্রে শির প্রতি
নিয়মিত কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ
প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরশুক পদ্মদ্বারা
আচ্ছাদন করতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অবিক-
সিত অমুদিত স্তলনলিনীব অবস্থা প্রাপ্ত
জানকে দেখিবে।

রূপাপাঙ্গপ্রসবমলকরগুনমেহশ্চত্রং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্তুত জ্বলাংশং।
স্বধ্যাসম্মেনয়ন মুপরিষ্পন্নি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
নীনকোভ্যাকুলকুবলয় শ্রীতুলা মেঘাতীত ॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালক বশতঃ অপাঙ্গ প্রস-
রবিহীন, স্নিগ্ধাজন রহিত, মধুপানভাবে
জ্বলাসবর্জিত মৃগনয়নীয় বামনবটী
তুমি নিকটবর্তী হইলে উপরিভাগে
স্পন্দিত হইবা মীনচলন বশতঃ শকল-
কমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

ক্রমশঃ

ভারতমহিলা ।*

প্রথম অধ্যায় ।

[প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চা ছিল। আর্য্য গণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথমে উন্নতি লাভ করে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশেই নূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন তাহার অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও গণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন, ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিপ্রণের প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[ঐহাদিগের কল্পনাশক্তি ।]

আর্য্য গণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ঐহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। ঐহাদিগের সাহিত্য, রত্নাকর বিশেষ। উহাতে যেরূপ চাপ তাহাই মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী, নদ, নদী, পশুপক্ষ, কন্দর, কি শিল্প সামগ্রী,

প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়াশৈল; কি আন্তরিক গভীরতাব হৃদয় বিদারকশোক-প্রবাহ, কি আনন্দনিস্যন্দিনী প্রণয় বর্ণনা, সকল বিষয়েই আর্য্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

[কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব ।]

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তাঁহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশান বর্ণনা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা লোকে ভাল বাসে এমন কোন বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটি অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারীচরিত্র বর্ণনা

* এই প্রবন্ধ মহাবাজ ত্রিযুক্ত হুগার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ ঠাকুরাণ্য বি, এ, প্রণীত।

করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

[আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্র।]

আমাদিগের আর্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্মিত রমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্ত হয়, কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্ভূত-রমণীগণের মধ্যে কোন্গুলি সর্বোৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে হইবে।

[কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দী কারণ।]

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন ভিন্নটি কারণ বশতঃ তাঁহাদের কল্পনা শক্তির সর্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের লোকের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেত থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সম্যক প্রকাশিত হইতে দেয় না। কবিদিগের নিজ স্বভাবও

সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দী হয়। এই তিনটির মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দী। জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব সময়েই প্রতিদ্বন্দী না হইতেও পাবে। মিন্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিন্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

[সর্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা হুজুহ।]

কবিকল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্বোক্ত তিনটি কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয় সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও হুজুহ।

[সর্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়।]

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রতিদ্বন্দী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তি বলে কোন অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্ন কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে নূন হইবে। কোন

কবিট, এপার্যাস্ত তাদৃশ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পাবেন নাই। কোন কবিট এপার্যাস্ত সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে সমাক্রমে মুক্ত করিতে পাবেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণীসৃষ্টি কবা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিত্তাশীল ব্যক্তিগাজেই তাদৃশ রমণীর কোনও গুণ পাকা আবশ্যক অনুভব কবিত্তে পাবেন। তাঁহাব কোন কোন মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন কোন বৃত্তি নিতেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

[মহুযোর মনোবৃত্তি বিভাগ।]

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মহুযোর মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় স্নেহ প্রবৃত্তি ৩য় কৰ্ম্মনিষ্ঠতা।^{*} যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম নির্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহাদ্বারা রাজসম্রাজী রাজকার্য্য পর্যা-লোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যবাহ রচনা করেন, দার্শনিকেরা কুটার্থ নিয়ে প্রবৃত্ত হইয়ন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত সন্মতাব করিয়া চলিতে পারি, যাহাদ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে,

পুত্রাদিকে স্নেহ করিতে, দূরবস্ত্রকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল বাসিতে শিখি তাহার নাম স্নেহ প্রবৃত্তি। স্নেহ প্রবৃত্তি স্বথ ও দুঃখের কারণ। মহুযোর যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কৰ্ম্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। উক্ত মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পৰ্ব্বত অতিক্রম করিয়া, জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, দ্বিপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ কৰ্ম্মক্ষমতা।

এই তিনিটি প্রবৃত্তিই মহুযাস্বভাবের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মূর্থ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হটেণ্টট দিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আভা-মান বাসী দিগেরও স্নেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রাণ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কাফি দিগেরও কৰ্ম্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইহব বিশেষ নাই। আমরা ইখর ভিন্ন আর কুত্রাপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (Perfection) কল্পনা কবিত্তে পারি না। কিন্তু এরূপ মহুযাকল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টাই সতেজ এবং একটা, মহুযোব পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[কাব্যলিখিত পুরুষচরিত্রের প্রকর্ষপার্য্যাস্ত।]

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমরা তাঁহাকে

* Intellectual Emotional and Active powers.

বতদূর পাবি কর্মক্ষম কবি তাঁহার বুদ্ধি
বৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি। তাঁহার
স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি।
কিন্তু তিনি যদি কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের
জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহপ্রবৃত্তিকে
বিসর্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার
ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে
তাগ করিলেন পরশুরাম মাতৃহত্যা
করিলেন দাতা কর্তৃপুত্রকেও বধ করিলেন
তিনজই স্নেহপ্রবৃত্তিকে কর্তব্য কর্মের
দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই
জগদ্বিখ্যাত ও চিবস্ববণীয় হইলেন।

[তাদৃশ নারী চরিত্র।]

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র
চিত্রিত করিতে বসি তখন আমরা তাঁহা-
কে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত
করি। পুরুষের যেমন, কর্মক্ষমতা
সর্বস্ব হইবে নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেই
রূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব-
তোভাবে সমুন্নতি লাভ করিবে। প্রণয়
তাঁহার জীবন স্বরূপ হইবে। পিতৃ-
ভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্য স্নেহ, সর্বভূতে
দয়া, ঈশ্বর পরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয়
কোমল হৃদয় এবং মানস প্রকৃষ্টকারী
বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধি
বৃত্তি ও কর্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা
আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে;
কর্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা নূন হইলেও
ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা
অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন,

অগুনতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন
স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বাধি-
কাবী, সুতরাং সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্ম
ক্ষমতা তাঁহাদের মতে অধিক প্রয়োজ-
নীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন
হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার
জন্য, পরের উপকারে জন্য তাঁহাকে
নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ
করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই
তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

[নারীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তি প্রাধান্য হইবে
বলিবার কারণ।]

অনেকে বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল
হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে
এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর
এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তু-
দিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল;
মহুবাদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা
স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন
কবিই নারীচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন তিনি তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধি-
কতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন।
সন্তান লালনপালনের ভার সর্বত্রই স্ত্রী
লোকের প্রতি অর্পিত হয় এই জন্য
স্ত্রীলোকের অপত্য স্নেহ বলবান হইয়া
উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপে-
ক্ষা দুর্বল এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের
আশ্রয়ে বাস করিতে হয় সুতরাং যে
সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সম্ভা-
বের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সে
গুলির আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্ত্রীর হঠল যে দেশগত কাল গত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহার পূর্বক নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পদ্যান্ত বা Highest Ideal স্ত্রীর করিতে হইলে তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে যতদূর পাবা যায় তেজস্বিনী কবা আবশ্যিক। তাঁহার কর্ণপাতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ পাকা উচিত। কর্তব্য কর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অমু-বোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্তব্যকর্মের জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপরনাই শারীরিক যত্ননা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবের অবতারণা ।

পৃথিবীস্থ তাবদেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অমুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাবের অমুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্বোত্তম সুন্দরচরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন নাই। আমরাদিগের প্রাচীন কবিগণও পূর্বোক্ত কারণত্রয়ের অমুরোধে এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ঐতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা নায়িকা কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দুদিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন পতিপরায়াণী কার্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আব কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে

তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাউক আযাকবিগণ নারীচরিত্র বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন এবং কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রী লোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি করিয়াছেন পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাব পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। যে হেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, ততই নূতন পদার্থ নির্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই নিজশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়। অতি নৈসর্গিক ঘটনা বর্ণন-কুশল কবীজ্ঞ মিণ্টেনের আলৌকিক কাব্যেও তাঁহার সমকালবর্তী কেবালিয়ার ও পিউরিটান দিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে কালিদাস বায়ীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

[সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়।]

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুৰাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এষ্ট সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই জীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণনা নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুৰাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্বৃত। সুতরাং উহাকে প্রকৃত সমাজ চিত্র কোন রূপেই বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনা প্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ, কিন্তু স্মৃতিসংহিতা সকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ প্রতিক্ষুতি পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিগ্রন্থের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

[১ জীলোকের আদি।]

আমাদিগের দেশীয় বুদ্ধেরা কোন প্রস্তাব উৎপত্তি হইলেই জিজ্ঞাসা করেন ইহার আদি কি? অর্থাৎ পুরাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে। সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি জীলোকের আদি কি? বাইবেলাদি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে আদামের পঞ্জর হইতে, ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের স্রবের জন্যই জীলোকের উৎপত্তি। ইহাতে জীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা অনেক নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে জীলোকের

মর্যাদা অনেক অধিক। আমাদিগের সৃষ্টি প্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ১ন। আদ্যাশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে স্রীলোকই ব্রহ্মা-ওঁব মূল। দ্বিতীয় নারায়ণ বা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং আপন দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারীর উৎপত্তি হয়।

দ্বিধা কৃত্যায়নোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোত্তমং অর্দ্ধেন নারী” মতঃ।

[ও প্রয়োজন।]

আমাদের শাস্ত্রে স্রীলোক ভোগের জন্য নহে, মতঃ স্রীলোকের তিনটি প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন যথা

উৎপাদন যথাতন্ত্র জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যাহং লোকযাহ্মায়াঃ প্রত্যাহং স্রী
নিবন্ধনং ॥

[জীলোকের স্বাধীনতা ছিল না।]

যদিও স্রীলোক পুরুষের পঞ্জর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ স্রীলোককে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন করিয়া গিয়াছেন। জীলোকের স্বাধীনতা নাই, “ন স্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি” ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নহু বলেন, “জীলোকের অতি-তাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্রীলোকদিগকে তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তব্য নিদেশনত কার্য্য করিতে হইবে।” যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, “পিতা মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধা-

বহুয় পুত্রেরা জীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ঠাহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। জীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।” বৃহস্পতি বলেন, “শত্রু অথবা অন্য কোন প্রাচীনা জীলোকে তরুণবয়স্ক জীলোকদিগকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিবে।” নারদ বলেন, “যদি স্বামীর বংশ নির্মূল হয়, অথবা ক্রান্তিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্মূল হইলে, রাজা জীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ জীলোক ধর্মবিরুদ্ধ পণ্যগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।” পৈতৃনিসী বলেন, “জীলোকদিগকে সর্বদা সাবধানে রাখিবে দেখিও যেন সন্দরবর্ণ উৎপন্ন হয় না।”(১) এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, জীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই প্রাচীন ঋষিদিগের সম্মত নহে। কিন্তু মহাভারতে আমরা এক সময়ের কথা শুনিতে পাঠি, তখন জীলোকে পুরুষের ন্যায় সর্বপ্রকারে স্বাধীন ছিল।(২)

[জীলোক অবরোধবর্তিনী ছিল না।]

যদিও জীলোকে স্বাধীনতা বিষয়ে ঋষিরা সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া জীলোক যে অবরোধবর্তিনী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(১) D. N. Mitra's decision in the great Unchastily case.

(২) শ্বৈতকেতুপাখ্যান।

প্রতীতি দেখা যাইতেছে, সীতা বামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চ পাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা সন্দরঙ্গম হইবে। কাব্য গ্রন্থ সকলে যে “শুদ্ধান্ত,” “অন্তঃপুর,” “অবরোধ,” ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ স্তত্রাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্ধ্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন, এবং নির্মূল গার্হস্থ্য স্ত্রের অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের স্ত্রায় তাহারা জীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। জীলোকদিগের প্রতি তাহারা সর্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মহু বলিয়াছেন, “যে গৃহে জীলোকেরা অসম্ভট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রহুতা নাই।” জীলোকেরা যে অবরোধবর্তিনী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে অরুদ্ধতী সর্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমতিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনারূঢ়ভাগিনী হইতেন। আর “সদ্বীকো ধর্ম্মমাচরেৎ” এই এক নিয়ম। প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মই জীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সমভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

ক্রীড়াঃ শরীরসংস্কারং সমাজোৎসব-

দর্শনং।

হাস্যং পরগৃহে বানং ত্যজ্যেৎ প্রোষিত-

ভর্তৃক। ॥

অর্থাৎ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাড়ী বাইবে না কোন সমাজ বা উৎসব স্থলে উপস্থিত হইবে না। তাহাই হইলে স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অমুমতি লইয়া স্ত্রী সর্বত্র গত্যাত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শঙ্কশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐশ্বরিনী বলিলেই ব্যভিচারিণী বুঝায়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিত সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু কুলটা বলিলে পূর্বকালে দুই স্ত্রীলোক বুঝাইত না যে হেতু “কুলটার অপত্য” এই অর্থে “কৌলটিনেয়” পদ হইয়া থাকে। যদি দুই বুঝাইত কৌলটের বা কৌলটার পদ হইত। “কুদ্রাগোধাত্যো বৈবর্যো” এই মুক্তবোধের সূত্রে কুদ্রা অর্থাৎ নীচাশয়া বুঝাইলেই এর বা আর প্রত্যয় হয়। অতএব কৌলটিনেয় এই পদ প্রয়োগ থাকাতাই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলটা শব্দের অসদর্থ ছিল না অর্থাৎ এক সময়ে বাহারা বেড়াইয়া বেড়াইত তাহারা নিন্দনীয় হইতনা।*

* কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রম্যতি ইতি প্রাচীন ব্যুৎপত্তি কুলমটতি ভ্রাজতি ইতি নূতনব্যুৎপত্তি। কুলটাশব্দ সত্য

[স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা শিক্ষা।]

“কত্ৰাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া-
তিব্রতঃ “যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আব-
শ্যক সেই রূপ স্ত্রীলোক দিগেরও শিক্ষা-
দান আবশ্যক। এই শিক্ষা কি রূপ?
দুই শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল
শাস্ত্রেই অধিকারিণী। কিন্তু আমরা
দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও
সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়া ছিলেন।

এবং একস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-
লোক দিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন।
বেদ দুই প্রকাব, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড।
ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুর্লভ কিন্তু
গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই
উপদেশ পাইয়া ছিলেন। ভবভূতি
প্রণীত উত্তর চরিত নাটকেও দেখা
যায় যে এক জন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ
বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য
বাস্তবিক মূনির আশ্রম হইতে আশ্রমাস্তর
গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবি
আর এক খানি নাটকে কামন্দকী, তুর্-
বপু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ
অমাত্যের সচাধ্যায়িনী ছিলেন। এতলে
সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ
ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন
লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি
বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মাল-
বিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী
স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি
অর্থে ব্যবহৃত হয় রামভর্কবাগীশ মুখ
বোধের টীকায় লিখিয়াছেন।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যশা কালে
হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ
হইতে পারে না। স্বহস্তে বোধ হই-
তেছে অতি প্রাচীন কালী পীঠোক্ত ও
গুরুত্ব উভয়েই সমান রূপে বিদ্যাভ্যাস
করিতে পারিতেন। অসামান্যের
দেশে যে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয়
তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায়
না। পার্শ্ববর্তী বাল্য কালেই নানা
বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া ছিলেন। বিদ্যা
বিষয়ে জীলোভেরা যে কত দূর উন্নতি-
সাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা
হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা
যায়।

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক এক
খানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী
দেবীর প্রণীত মিতাক্ষর নামক অদ্যাপি
প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্যের পাটী-
গণিত ও বীজগণিত লীলাবতীকে সম্বো-
ধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। উদয়নাচার্যের
কাব্যে আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবতী
ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে
শঙ্করাচার্য কলিঙ্গদেশে একটি জীলো-
কের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
কর্ণাট দেশীয় বাজার মহিষী কালি-
দাসের কবিত্ববিষয়ে প্রসিদ্ধাঙ্গিনী ছিলেন।
বমানসেনের পুণ্ডরীক কবিতা রচনা
করিতে পুণ্ডরীক বলাইয়া প্রসিদ্ধ আছে।

[স্বীকৃতকর বিবাহ।]

পিতা উপযুক্ত পাত্রের কন্যা সম্প্রদান

করেন। এইটাই সকল মুনিব্রত
কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা
বিবাহ দিবাব কোন উদ্যোগ না করেন
তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনো-
নীত করিয়া লইতে পারিবে। (মহা)
উপযুক্ত পাত্রের কন্যাদান করিলে অক্ষয়
স্বর্গ লাভ হয় নচেৎ নবকে ঘাইতে হয়
এই নিয়ম থাকার অমুপযুক্ত পাত্রের কন্যা
সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ
বরের গুণাণ্ডে সন্দেহে বাজবন্ধা যে রূপ
কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা-
তেও অপাত্রের কন্যাদান ঘটিয়া উঠা
ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,
এতৈরেব শুণৈবৃজঃ সৰণঃ শ্রোত্রিয়েবরঃ।
বহ্নাৎপরীক্ষিতঃ পুংস্তে যুবা ধীমান্ জন-
প্রিয়ঃ ॥

বাজবন্ধা সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতা-
ক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটীর বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা
আছে যথা, “যুবা,” অর্থাৎ পিতা
অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান
করিতে পারিবেন না “ধীমান্” অর্থাৎ
জড়মতি বেদার্থ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি
বিবাহের উপযুক্ত নহে “জনপ্রিয়”
অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান
নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বর
পরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়।
যদি বর সর্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয়
তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে
পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মহা আরো
বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুসারিত বর না
পাওয়া যায় তবে বরং কন্যা বাবজীবন

পিতৃগৃহে বান করিবে তথাপি অল্পযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত না করিয়া লইলে অনেক সময়ে পতি পত্নীর অপ্রণয় নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং ইংরাজ আত্মশ্রমে যেকোন কোর্ট সিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এরূপ বলা একান্ত ভ্রমের কর্ম। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার যে প্রথা ছিল তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর। প্রথমতঃ কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং যদি বাগদানের পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয় তবে কন্যার সম্মতি অপেক্ষা কবিত। দ্বিতীয় গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কন্যা ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেই বিবাহ করিতে পারিত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই বিবাহ অপ্রশস্ত। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অপ্রশস্ত হইবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণদিগের চতুর্বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। গান্ধর্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। আর ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযম ও নিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছা-

মত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নির্দিষ্ট বয়সের পর তাহারা শাস্ত্র-সম্মত কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন। তৃতীয়তঃ অতি প্রাচীন কালে বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চরংকার প্রণালী ছিল। কন্যার পিতা বিবাহযোগ্য কালে কন্যাকে আহ্বান করিয়া কহিতেন বৎসে তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত। তুমি আমাব বিদ্রুত লোকের সহিত গমন কর। তোমার যাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুলশীলে আমাদের অপেক্ষা নীচ না হয় তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। পতিপর্যায় সাবিজী এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না কিন্তু সাবিজীর পিতা অশ্বপতি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৎসে এইটাই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বহুতর কন্যা মনোনীত পতিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা পরিণামে স্বয়ম্বর রূপে পরিণত হয়। পুরুষেও কন্যা মনোনীত করিবার জন্য বহির্গত হইয়া ইচ্ছানুসারে মনোনীত কন্যা বিবাহ করিতেন। দশকুয়ারচরিতে তাহার এক সুন্দর উদাহরণ আছে। ৪র্থ স্বয়ম্বর প্রথা। এরূপ সর্কাসুন্দর প্রণালী বোধ হয় আর কোথাপি প্রচলিত ছিল না। কস্তারবিবাহ সময় উপস্থিত হইলে সমান কুলশীল ব্যক্তিমাঝকেই আহ্বান করা

হইত। সকলে উপস্থিত হইলে মহা সমাবেশে এক সভা হইত। কল্যাণ শিবিকায়েতন পূর্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন। একজন প্রগল্ভা স্ত্রীলোক একে অত্যন্ত ব্যক্তির সম্মুখে শিবিকা লইয়া তাহাদের গুণাগুণ কীর্তন করিত এবং শেষে ক্ষিপ্রস্রা কথিত “কেমন. এবর তোমার মনোনীত হয়!” মনোনীত হইলে কল্যাণ আপন গলাদেশ হইতে মালা লইয়া বরের গলায় অর্পণ করিত। অনেক স্থলে স্বয়ংবরের পূর্বেই সকলের গুণাগুণ কল্যাণকে শুভান থাকিত। বড় স্বয়ংবরস্থলে যে কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহে নিরাশ্বাস হইয়া কোনরূপ উপাশ করিবেন তাহার যো ছিল না। কারণ স্বর্গপতি ইন্দের মহিষী স্বয়ংবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এক্ষণে হইলেও বহুলোকসমাগম প্রযুক্ত নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত এজন্য পূর্ণপূর্বক বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়। উহাতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রুত কার্য করিবে সেই বিবাহ করিবে এই পণ থাকিত। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপেও নাইটেরা লেডিদিগেব সম্ভটির অন্য নানাবিধ দ্রুত কার্য সাধন করিতেন। এষ্টরূপ নানাবিধ বিবাহ থাকিতেও মুনি ঋষিরা ও রাজাবা ঈচ্ছামত নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কন্যা মনোনীত করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্যা একটি ঋতু বৎসরব্যস্তা কল্যাণকে লইয়া একজন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন তুমি ইহার লালনপালন ও

শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিবে। পরে সে কল্যাণ বিবাহযোগ্যবয়স্ক হইলে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন বর কল্যাণ পবম্পর মনোনীত করিবার প্রথা ছিল না! সেই কেবল উহাদের জনমাত্র।

[ডাইভোস বা পরিত্যাগ।]

স্ত্রী যদি শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হন, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত হইতে হইবে। বাস বলিয়াছেন, “অতুষ্ঠাং পতিতাং ভাৰ্য্যাং ত্যক্তা পতিতি ধৰ্ম্মতঃ” বসুন্ধরনও শুদ্ধচারিণী স্ত্রী ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পতিত হওয়ার অর্থ আমরা এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পূর্বকালে পতিত ব্যক্তির সহিত কেহ আলাপ করিত না, কেহ উহার মুখ দেখিত না, উহাকে এক প্রকার জীবন্ত মৃতের ন্যায় থাকিতে হইত। স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহার ঐক্লপ ভরানক অবস্থা হইত। কিন্তু ঋষিরা নানা কারণে স্ত্রী ত্যাগের বিশেষ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, সুরাপী ব্যাধিতা ধৃত্তা বক্ষ্যার্থপ্রিয়মদা স্ত্রীপ্রহৃশ্যধিবৈবস্তব্য পুরুষদেবিণী তথা ॥

মদ্যপায়ী ব্যাধিতা ধৃত্তা বক্ষ্য অমিতব্যয়কারিণী অপ্রিয়বাদিনী কন্যাপ্রসূত্বিনী পুরুষদেবিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। মনু প্রভৃতিবও ঐক্লপ বচন আছে। এই সকল কারণ বশতঃ বাহাদিগকে ত্যাগ করিবে,

তাহাদিগকে আত্মবিশ্বাস প্রতিপালন করিতে হইবে; যেহেতুক যাক্সবক্য বলিয়াছেন, “অধিবিস্তারিত ভর্তৃব্য মহাদেনো-নাথা ভবেৎ” তাহাদিগকে ভরণ না করিলে বড় দোষ হয়। মিতাকরা বলিয়াছেন, ঐ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না এবং গৃহ-কর্ত্তী হইতে পারিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এষ্ট জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যতিচারিণীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া না দিয়া, উহাকে নানাবিধ প্রকারে কষ্ট দিয়া বাহাতে উহার চরিত্র সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

কৃত্যধিকারঃ মলিনাং পিওমাত্রোপ-

জীবনীঃ।

পরিভ্রাম্যঃ শম্যাং বাসয়েদ্যতিচারিণীঃ॥

এটিও যাক্সবক্যের বচন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী কিন্তু পতিত কুষ্ঠ-রোগী স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেবল পতিত হইলে যত দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহার সহবাস করিবে না “আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ।” এ সকল সত্য জ্ঞেতা স্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষাস্ত্রকে বিবাহ করিতে পারিবে।

নষ্টে মৃত্যুতে প্রযজিতে স্ত্রীবেচ পতিতে পতৌ পঞ্চরূপং নারীণাং পতিরন্যো বিধী-

য়তে।

অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণ

বশতঃ স্ত্রীত্যাগ কবিয়া বিনাশ কবিতে পাবেন, স্ত্রীও যেমনি কারণবশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন।

[স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।]

“পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি উহালোকে সম্মান উচ্চা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন। এবং তাহাদিগের বেশ ভূষা করাটয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয় সেখানেই দেবতার সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীরা শোক করে সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহার সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতীতীচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সংকার্য্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের “পূজা” করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ হয়।” ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন তাহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন। মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ। অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোন রূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রজ-পুত্রদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মধু বলিয়াছেন, “কন্যাপোষঃ পালনীয়। শিক্ষণীয়। যত্নতঃ।” আর এক জন বলিয়াছেন, কস্তা পুস্ত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাট এবং কন্যা সংপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। জীলোকের শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গুরুভূ পূর্বাণে আছে “অবধ্যাক্ষ স্নিগ্ধঃ প্রাহ তিথ্যাক্ জাতিগতেষুপি” মধু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপত্তি বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে। জীলোকের প্রতি বিরূপ ব্যবহার করার প্রথা ছিল, তাহার এক প্রকার উল্লেখ করা হইল।

উপর লিখিত প্রবন্ধে বোধে হইবে যে, সভ্যজাতির লোকেরা জীলোকের প্রতি যেরূপ সম্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব শিতামহগণও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানা স্থানে দেখা যায় “জীলোক অতি হেয় পদার্থ উহার সঙ্গ সর্বদা পরি-ভ্যাগ করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা যুগে মধুভাবিণী জীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস

করিবে না।” (ব্রহ্মাণ্ড পূর্বাণ) এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রকৃতি লোকের উক্তি; তাহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, জীলোক পাছে তাহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাহারা বনে বাস করিতেন, অথবা তাহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্বকালের মত পুরুষেরা জীলোকদিগকে হুণা করিতেন অথবা তাহাদিগের প্রতি অসম্ব্যবহার করিতেন এরূপ বলা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা জীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, “যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই আমি পবিত্র-কারিণী হইলাম।” (কাশীখণ্ড) কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর জী লোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। “সোম তাহাদিগকে শোচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ক তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন; পাবক তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব ষোড়শগণ সর্বপ্রকারে পবিত্র হইল।”

ক্রমশঃ



ভারতমহিলা।

[স্রীলোকের কর্তব্য কর্ম।]

স্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্তব্য। স্বামী কাণা চুটন গোঁড়া হউন অকর্মণ্য হউন দুষ্ট হউন তথাপি স্রীলোকের তিনিই গুরু, পুত্র ও ইষ্ট দেবতা তাঁহার চরণ সেবা করিলেই স্রীলোকের পরকালে পরম গতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্রদ্ধা শ্রুতির পিতামাতার সেবা দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্যে দক্ষ হইবেন। বায়ে সর্বদাই কুঞ্জিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না—আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত ধর্ম উপাসনা উপবাস কিছুই নাই। শিষ্যাদি কার্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। কিন্তু তাহা দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য। সে সকল গৃহ কর্ম কি বহি পুরাণে তাহার এক সংগ্রহ পাওয়া যায় যথা—

“সাঁ শুদ্ধা প্রাকৃত্যায় নমস্তুতা পতিং

স্বয়ং।

প্রাপ্তনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন

জলেনবা ॥

গৃহকৃতাং চ কুত্वाচ স্বাভাগস্বাগংসতী।
স্বয়ং বিপ্রংপতিং নত্বা পূজয়েৎ হৃদেবতাং ॥
গৃহকৃতাং স্নানবৃত্তা ভোজয়িত্বা পতিং

সতী।

অতিদীন পুত্রয়িত্বাচ স্বয়ং ভুক্তো স্ত্রুং
সতী ॥

এইস্থলে সংক্ষেপে স্রীলোকদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব। স্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি করনা করা হইয়াছিল জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যক কারণ তাঁহারা ঐ গুলি যদি স্মরণরূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার পর অমায়িকতা সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায় সেই সকল গুণ থাকিলেই তাহাকে অতি উন্নতচরিত্র বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় সেই সকল কর্তব্য বিস্তার বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

[স্রীর ধনাধিকার।]

স্রীলোকের সামাজিক অবস্থা যে তঁত ভাল ছিল না তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে স্রীলোকের ধনাধিকার নাই।

নিজ উপার্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কণ্ঠার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহাব আপনাব। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নিগূঢ় স্বহ নাই অর্থাৎ দানবিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র। সে ভোগ আবার স্বল্প বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্ত্যস্ত্র সংকাগ্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌতিজ্ঞ থাকে তবেই পাটবেন বন্ধা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধনাধিকার ও ধন উপার্জনে বঞ্চিত। তথাপি তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজ ধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে স্ত্রী দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। আর সচ্চরিত্রা বিধবার প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে রাজা তাহার শাস্তি দিবেন। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ তাহার স্বাধীনতা নাই।

[বিধবার কর্তব্য।]

মহুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী লোকে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কাধ্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীর দিগকে ধনদান করিবে

না। স্বামীর বংশ নিশ্চল হইলে পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণ প্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডু মহিষী মাত্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পব, মৃত বীরেন্দ্র বৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস এমন কি মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমতাদিগের বিস্তার প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন “যে স্ত্রী সহমৃত্যু হয় সে স্বামীর সহজ পাপ সহ্যও স্বামীর সহিত সাক্ষি ত্রিকোটি বৎসর স্বর্গ বাস করিবে।” পরাশর(কেহ কেহ বলেন তদ্বিরা) আর একজন বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃত্যু নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আনোদ প্রমোদ করে। (দক্ষ ।) কিন্তু সহমরণ স্ত্রী লোকদিগের অবশ্য কর্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও একবার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য বটে ছুট লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জলচ্চিতায় নিঃক্ষেপ

করিত। কিন্তু এই প্রথা যাহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জমা, পরলোকেও যাহাতে স্বামী সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্ত, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পাবিবেন ব্যবস্থা আছে।

[ছোট চারিজনাদের দণ্ড,]

পূর্বেই উক্ত হটয়াছে অগ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদাঃ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্যে অবহেলা করিত বা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিত স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্য। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দাবাস্তুর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ভে গর্ভিতা হইয়া স্বামীর অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুকুব দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন। স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে না। ব্যভিচারিণী দিগের ইহকালও নাই পর কালও নাই তাহারা জারজ পুত্র উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে।

স্ত্রীষু ছুটাস্ত্র বামের জায়তে বর্ণসংকবঃ।
সংকবো নমকায়ৈব কুলয়ানাং কুলস্যাচ ॥

পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্ত পিণ্ডো-

দকক্রিয়াঃ। ভগবদগীতা

স্ত্রীলোক যদি সমাজনিবিদ্ধ কোন কর্ম করে তাহা হইলে সে ইহকালে পুরুষের জায় দণ্ড পায়। আর পরলোকে পুরুষাপেক্ষা দ্বাবিংশতি গুণ অধিক যন্ত্রণা ভোগকবে। কুতিবাস নরকবর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন “এহতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা” মনু স্ত্রীলোক দিগের অনেক স্থানে অন্ন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু দুই একস্থলে অধিক ব্যবস্থাও দিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে এবং উহাদিগকে পলোভন দেখাইয়া অধর্ম পথে আনয়ন করিবার জন্ত চেষ্টা করে তাহাদিগের “উত্তম সাহস” দণ্ড হয়। প্রাচীন কালে যত শাস্তি ছিল উত্তম সাহস দণ্ডই সর্বাপেক্ষা ভয়ানক।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মন্তব্য কথা।]

পূর্ব প্রস্তাবে স্ত্রীলোকের কর্তব্য কর্ম সকল এক প্রকার সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে এক্ষণে বিস্তাররূপে ঐগুলির নির্দেশ করা আবশ্যক। এল্‌ফিন্‌ ষ্টোন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধিই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। কার্যকারিণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিধায়িতাহাদের তাদৃশ আস্থা ছিলনা। সর্বপ্রকারে শাস্তিসুখ অনুভব করা এবং প্রাণিসাত্ত্বিক

দুঃখবিমোচন করাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেন; প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্র মাত্রেই এইদোষ। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রেও স্বদেশোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে নির্দোষ নিষ্কল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকেনা। তাঁহারা যত নিয়ম করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কিরূপে পাপ স্পর্শ নাহয় তাহারই জন্ত। এখন যেমন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে স্বদেশের বা মনুষ্য সমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হয় সেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে অতিবিরল, তাঁহারা জীলোক দিগের যে সকল কর্তব্য কর্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই দোষ। জীলোক সর্ব প্রকারে পাপশূন্য হইবে, স্বামীপুত্রের অধীন হইবে, ইত্যাদি শত ২ নিয়ম কেবল তাঁহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামনায় মাত্র। এই সকল নিয়ম এক্রপ কঠিন যে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত দুর্কর। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যাহারা এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া উঠিতেন তাঁহাদের গুরুতর দোষ সত্ত্বেও প্রশংসা হইত। তাহার এক প্রমাণ অহল্যা। তিনি চিরদিন স্বামিভক্তা এবং গৃহকার্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহাব পর ইচ্ছাপূর্বক ব্যভি-

চাঃ পক্ষে নিপত্তিতা হন।* কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আবার দেখা যায় অনেকে এই দুর্কর নিয়ম সকল যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন করিয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাদি গুণে আরো অনেক সংকর্ষণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সেবা ও সমস্ত গৃহকার্য করিয়াও পাণ্ডব দিগকে সর্বদাই নীতি শাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। বাস্তবিকও পাণ্ডবদিগেব বনবাস সময়ে কৃষ্ণার ত্রায় বিচক্ষণ মন্ত্রী আর কেহই ছিল না।

[সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ।]

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাহারা সেই সকল নিয়ম স্কন্দরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের প্রথম চিত্র। যাহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাহারা মানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে এই জীবনভাবের উৎ-

*রুতিবাস বলিয়াছেন অহল্যা নির্দোষী; সমস্ত দোষ ইজের। কিন্তু বান্দীকি তাহা বলেন না। যদিও বান্দীকির কবিতা দ্বার্থ করা যায় কিন্তু টীকাকারেরা অহল্যাকেও দোষী করিয়া দিয়াছেন।

কষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডববধু দ্রৌপদী রাম-
গেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান
রূপে গণনীয়। সাবিত্রী শকুন্তলা প্রভৃতি
মহিলারা চরিত্র রক্ষার জন্য নানাবিধ
কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের
প্রলোভন সামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা
প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন
পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত
শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন। গ্লাড-
ষ্টোন ইংলণ্ডের একজন সুদক্ষ মন্ত্রী
হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা অনেক
নিম্ন শ্রেণীর লোক; কারণ পিট অনেক
প্রলোভনেও ভুলেন নাই। গ্লাডষ্টোনেব
সময় সে সকল প্রলোভন একেবারেই
নাই।

জীলোকদিগের প্রধান কর্তব্য কর্ম
পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্বস্ব
তাঁহাদিগের দেবতা তাঁহার সেবাই
তাঁহাদিগের প্রধান কর্তব্য। তাঁহাদিগের
দ্বিতীয় কর্তব্য গৃহকর্ম। গৃহস্থের যত
কর্ম আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রী
লোকের হস্তে। সন্তানপালন জীলো-
কের কর্তব্য কর্মের মধ্যে কোন স্থলেই
উল্লেখ নাই কিন্তু মনু বলিয়াছেন,
উৎপাদনমপত্যস্ত ভ্রাতৃস্য পরিপালনং।

প্রত্যহং লোকযাজ্ঞায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী

নিবন্ধনং ॥

অতএব পুত্রের পালনভারও জীলো-
কের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার পর
কবিদিগের সময়ে জীলোকের আরো
একটি কর্তব্যকর্ম হইয়া উঠিয়াছিল।

কবিত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মহি-
লাবাই উহা শিক্ষা কবিতেন। উহার
নাম কলা শিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে
লোক সকল সবল ছিল। বাবুগিরি
উচ্চাদের তত মনোমত ছিল না।
প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে জীলোকের যে নৃত্য
গীতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন
উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসাদিব
সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্বভাব পরিভাগ
কবিতা বিলাসস্থখে মগ্ন হইয়াছেন তখন
নৃত্যগীত ভদ্র মহিলাদিগের নিত্যকর্ম
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস
লিখিলেন,

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা

ললিতে কলাবিধৌ।

করণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং
ন মে হৃতং ॥ রঘুঃ

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায়
লিখিয়াছেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মত্ব।

দাসীবাদিষ্টকার্য্যেবু ভার্য্যাভর্ত্তুঃসদা

ভবেৎ ॥

এই দুইটি বচনের মধ্যে প্রথমটিতে
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ এই বিশে-
ষণটি অধিক আছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল
ঋষিদিগের সময়ে নৃত্যগীত শিক্ষা চলিত
ছিল না। অশ্বার দ্বিতীয়টিতে “ছায়ে
বানুগতা” এই বিশেষণটি আছে।
তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঋষি-
দিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত
সকল গমনাগমন কবিতেন।

একণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা গৃহ কার্যা, এবং ঋষিদিগের পব, নৃত্যগীতা-দিও, জীলোকের কর্তব্যমধ্যে পবিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশ খনি সংহিতার মধ্যে ৮৯ খনি অতি স্নায়তন তাহাতে জী চবিত্তেব কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেকপ বৃহৎ গ্রন্থ উহাতে জীধর্ম্য তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কয়েকটা নাত্র কবিতা গৃহস্থ ধর্ম্যেব মধ্যে বলিয়া ক্রান্ত হইয়াছেন। দক্ষ ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তাররূপে জীধর্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। এই তিন খানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্কাপেক্ষা প্রাজ্ঞ। বিষ্ণুর বচনে অর্থ ঘটত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণু সূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুর্লভ অপুত্র-ধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। জীধর্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা

১ম। জীলোক স্বামীর সমান ব্রত-চারিণী হইবেন। বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দ পণ্ডিত লিখিয়াছেন স্বামী যে সকল বিষয়ে সংকল্প করিবেন জী লোকেরও সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এবং স্বমত সংস্থাপন জন্য কাশীপও হইতে “বত্র বত্র রুচির্ভুক্ত সূত্র

পেমবতী সদা” এই বচনটা উদ্ধাব করিয়াছেন। গোত্রম বলিয়াছেন ধর্ম্য কর্মে স্ত্রী স্বাধীন নহেন। বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন এবং এতৎসমর্থক আবার এক বচন আছে যথা স্ত্রীভিঃ ভর্তৃ-বচঃ কার্যামেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥

২য়। শ্রদ্ধা শ্রুতির দেবতাতিথিদিগের সেবা। টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনা দ্বারা সন্তোষ সম্পাদনই মেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন কারণ জীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটির সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা “সৌভাগ্য দাত্রী গোষ্ঠাদিঃ।” সৌভাগ্যই জীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; বলেক্ত্রিয়ের। সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর জ্যেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে জীকে ভাল বাসেন তিনিই জ্যেষ্ঠ।

৩য়। অতিথি সেবা। মনু গৃহস্থের যে সকল প্রবান কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটা। উহার নাম ন্যজ্ঞ, উহাতে দেবতাবাও সম্ভুক্ত হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুন্দর রূপে অতিথি সেবা করিতে

পারিলেন সে তাঁহার অন্ন প্রশংসাবিষয় নহে। পূর্বকালে গৃহস্থ মহিলাবা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভাল বসিতেন। এক দিন দুর্কাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ঠোঁট প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে পাওয়াটয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল তথাপি তিনি কোনরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্কাসা তাঁহাকে বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার। কেশব বৈজয়ন্তীকার এই হৃত্রের পৌষক শংখলিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রুংখের বিষয় এই যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটা পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এট।

প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন সামগ্রীর যত্নপূর্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান। ইত্যাদি। পূর্বে অধ্যায়ে আমরা বহুপুরাণের একটি বচনোদ্ধার করিয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ।

৫ম ৬ষ্ঠ। অমুক্ত হস্ততা ও সুগুণ ভাঙতা। পূর্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে জীলোকের ধনাদিকাব নাই। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামি সঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয় বায়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন জীলোকে ব্যয়কৃৎ হইবেন। “ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া” “ব্যয়বিবর্জিতা” “ব্যয়পরায়ুখী” সকল সংহিতা মধোই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য জী বিবাহ করিবেন। ঋষী বলিয়াছেন আমি ব্যয় কৃষ্টিতা জীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কৃৎতা জীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যগুণিত হইবে। বাস্তবিকও বাঁহারা অন্ন আয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে জীলোকের ব্যয়কৃৎতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৭ম। “মূল ক্রিয়াস্বনতিক্রিঃ। এই বচনটির প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন মূল ক্রিয়ার অর্থ বশীকরণাদি কার্য্য বাহাকে আমরা এক্ষণে ডাকিনীর কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তত্ত্ব ও পুরাণ ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি উহা দ্বারা

অথর্ষ বেদোক্ত মাঘাদি কার্য বুঝাইবে? তাহা হইতে পারে না, স্ত্রীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাস্বপ্ন স্ত্রীগণের কর্তব্য নহে করিলে দোষ হয়। বিষ্ণুর বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে।

৮ম। মঙ্গলাচারতৎপরতা। মঙ্গলা জব্য হবিজ্ঞা কুকুমাদি ব্যবহার করিবে। এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের নিকট যেসকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে সর্বদা যত্নবতী হইবে। এষ্ট আচার গুলি শংখ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা না বলিয়া কাতারও বাটী ঘাইবে না। কোথাও ঘাইতে হইলে উত্তরীয় চাড়িয়া ঘাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। বণিক, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যকে নাতি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনারুত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

৯ম। স্বামী বিদেশে গেলে শরীর-সংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এঙ্কলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। প্রোষিত ভর্তৃকা নারী শরীর সংস্কার বিবাহ ও উৎসবদর্শন হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন:—

যদি স্বামী কোন রূপ বনোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন। তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্প কার্য দ্বারা জীবন নির্বাহ করিবে। এই শৃঙ্গের

ব্যাখ্যায় টীকাকার শংখলিখিতের একটি সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে সেটির অনুবাদ কবিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা মাতা ভ্রাতা স্বভূ-রাদিব গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। স্তুরাং স্বামী স্বদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকে বা-থা ইচ্ছা গমন করিতে পারিত তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রোষিত ভর্তৃকাদিগের কি কর্তব্যাকর্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসেব মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন তিনিই সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎ-সব পর্য্যন্ত একবেণী ধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণ রসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রাম গিরিতে মেঘকে বলিতেছেন—

“আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-
ব্যাকুলাবা

মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগমাং

লিখন্তী।

পৃচ্ছন্তী বা মধুববচনাং সারিকাং পঙ্ক-

রস্বং

কচ্ছিত্ত্বর্জুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তন্ত্র

প্রিয়েতি।”

কখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষ পথে বলিব্যাকুলা দেহলী-দত্ত পুন্স-গণনা-তৎপর আধিক্যামা সেই যক্ষ পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর ক্লেশ তিনি বিস্তৃত শয্যার এক

পার্শ্ব শরানা আছেন বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে এক খণ্ড চন্দ্রকলা রহিয়াছে। উহাতে আকাশের বিশেষ শোভা হইতেছে না, কিন্তু দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ শোকে আপ্ত হইতেছে।

১০ম। দ্বারদেশ গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা স্ত্রীলোকদিগের অনাধ। কাশীধণ্ডে ইহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১শ। কোন কৰ্ম্মে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। মল্ল বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন কৰ্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থার পিতা ভর্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

১২শ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কেশব বৈজয়ন্তী প্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপনার্থ কাশীধণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন। কাশীধণ্ডের ব্রহ্মচর্য্যে ও স্মৃতিকারদিগের ব্রহ্মচর্য্যে অনেক প্রভেদ। ঋষিরা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কর্ম্মগুলিকে ব্রহ্মচর্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠ্যবস্তুর ব্রাহ্মণেরা যেকোন শুদ্ধাচারে থাকে বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ শুদ্ধাচারে থাকিবে, এই তাঁহাদের অভি-

প্রায়। কিন্তু কাশীধণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহাব করিবে। পবিত্রস্থি করিয়া আহাব করিলে, তাহাদিগের নবক দর্শন হইবে ইত্যাদি। ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য নহে। ইহাকে সন্ন্যাস বলিণেও বলা যায়।

বিষ্ণুসংহিতা প্রায়ই সবল গদ্যোক্তি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখা যায়। জীপন্য নির্ণয়ে উপসংহারে নিম্ন লিখিত শ্লোকত্রয় দেখা যায় যথা:—

নাতি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং
নাপ্যাপাসনং।
পতিং শুশ্রুতে যেন তেন স্বর্গে মর্ত্যীয়তে॥
পতৌ জীবতি যা যোষিছুপবাস ব্রতং
চরয়েৎ।

আয়ুঃ সা হরতে পত্নার্নরককৈঃ গচ্ছতি॥
মুতে ভর্তারি সান্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বয়ং গচ্ছতাপ্তাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

এই পর্য্যন্ত বিষ্ণুসংহিতার জীপন্য প্রকরণ শেষ হইল। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা দক্ষ ও ব্যাস তিন আর সকল সংহিতারই সমালোচন করিলাম। দক্ষ সংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্তব্য নির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাস সংহিতা যদিও বিষ্ণুর ন্যায় প্রাঞ্জল নহে, তথাপি বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক বিস্তার ক্রমে জীচরিত্র বর্ণনা আছে। আমরা এই দুই সংহিতার বচনগুলি অনুবাদ করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও

কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাভ্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অক্ষুট, কাভ্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় বাহার উল্লেখ নাই, কাভ্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। জীর কৰ্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিবক্ষা একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই জীলোকে জ্যেষ্ঠতা লাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিবক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। ছুৰ্গাব মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে লক্ষ্মী! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর। এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ জীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন।

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু
প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্ত হস্তাসু স্তন্যদাতাসু স্তম্ভভাণ্ডাসু
বলিপ্রিয়াসু।
সম্মুখবেশ্যাসু জিতেন্দ্রিয়্যাসু বগিবা-
পেতাষু বিলোলুপাসু
ধৰ্ম্ম ব্যাপেক্ষিতাসু দয়াদিতাসু হিতা
সদাহং মধুহৃদনে হ।

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রাদিতা, অর্থসঞ্চয়ে

যত্নবতা, দেবতাদিগের, পূজাপ্রিয়া গৃহ পরিমার্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিবর্তা, বিলে লুপা, ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়াদিতা নারীতে আমি বাস করি। যেনন মধুহৃদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে জীচরিত্রের এক অতি সূক্ষ্ম চিত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে জীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কৰ্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে কলহবিবর্তা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংবরণবতী, দয়াদিতা হইলে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকি বেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন জীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সভ্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার জীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদৃশ আস্থা না করিয়া, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসম্মত উন্নত চরিত্র জীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্যে থাকিতে পারে। রক্ত মাংসময় সংসারে সেরূপ রমণী থাকিতে পারে না।

স্মৃতিসংহিতায় আর একটি উৎকৃষ্ট জীচরিত্রের বিবরণ ব্যাসলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাহার

সবিস্তার অনুবাদ কবিতা দিব।

“পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা, বয়স, বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বয়ে কন্যাসম্প্রদান কবিবেন। পূর্বে পূর্বের অভাবে পর পর বাক্তি দান কবিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বব কবিবেন। * * * পূর্বকালে স্বয়ম্বু আপনার দেহকে বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই ক্রটি আছে। যত দিন পর্যন্ত বিবাহ না করা যায়, তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধ কলেবর বলিতে হইবে। ক্রটি আছে অর্দ্ধ দেহ জন্মে না কিন্তু ভ্রাতৃত্ব পাঠে। * * * বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, গৃহনির্মাণ কবত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্বাহ হইতে দিবে না। ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী পুরুষ সর্বদা একমনা হইবে। এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতি ঘৃণ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামী পূর্বে শয়্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয়্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নি পরিচর্য্যা করিয়া কবিবে ও গৃহ সামগ্রী সকলের

তত্ত্বাবধাণ করিবে * * * এইরূপে পূর্বাঙ্ক কৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা কবিবে এবং গুরুজন পদতল বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ কবিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপর হইবে। নির্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীকে অশ্রুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, অদৃষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপর হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন কবাটবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় বায় চিন্তায় নিবৃত্ত থাকিবে। এইরূপ প্রতাহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহ নীতি বিধান করিবে এবং সাধু শয়ন আন্তরিক করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহারই নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।” এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিন্দা কন্ম গেল। ইহাতে পূর্বে প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহা পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে; যথা—“স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন যেন থাকে তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয় সংযমে তিনি যেন সর্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি

কখনই উচ্চস্থরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা পুরুষ বাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কথা তাঁহার পক্ষে দূষণ-বহ। তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য ব্যবহার না করেন বায় অধিক না করেন এবং ধর্মার্থ বিরোধী কোন কার্য না করেন। সাধবী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উদ্ভাদ, কোপ, দ্রব্যা, বকনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাস্তিক্য সাহস, চৌর্য ও দস্যু পরিবর্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপর হইলে ইহকালে যশঃ ও পর কালে স্বামীর সহিত ব্রাহ্ম সালোক্য প্রাপ্তি হয়।”

বাস সংহিতায় এই স্ত্রীর পরিষ্কার দীর্ঘবর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বুঝা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতি সংহিতা কারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কত দূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট রূপে স্ফুটমান হইবে। এরূপ সর্বগুণ সম্পন্ন রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারত বর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না স্মরণঃ এতকাল স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও

কলঙ্ক করিয়া সময়ান্তিপাত করিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাস সংহিতার বচন কয়েকটা পাঠ করা কর্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্য মাত্রের ভার ছিল না তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাস সংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্যন্ত সকলেরই কার্য করিল পুরুষের কার্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বাধ্য করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ কবায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুর্লভ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা হুন্সাহু-হুন্সরূপে স্ত্রীলোকের কর্তব্য বা গুণ নির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধানতঃ গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটি উদাহরণ দিয়াছেন। “পত্নী যদি স্বামীৰ মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশাহুগা হন তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম আর নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যদি বর্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ

* D. N. Bose's Lecture in the Student's Association.

স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছাক্রমে ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।” স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখ সংহিতায় আছে। যথা—“লালনীয়া সদা ভাষ্যা তাড়নীয়া তথৈবচ। লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নানাথা।” এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কঠব্য। “অমুকুল কারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাক্ষী পতিব্রতা জিতে-ক্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।” “সাহার রমণী অমুকুলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ * * * এইরূপ পরস্পর গাঢ়ামুরাগ স্বর্গেও হ্রলভ। কিন্তু যদি একজন অমুরাগী ও আর জন অন-ভুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস স্ত্রের জন্য সে স্ত্রের পত্নীই মূল। সেট পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশাহুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্বদা খিদ্রা হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয় তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * * জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীৰ্য্য, স্ত্র শোষণ করিতে থাকে। বলাকালে শাসক, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধ পতিকে তৃণতৃণ্য জ্ঞান করে। অমুকুলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা,

সাক্ষী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য কষ্টমন হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভাষ্যা। ইতরা জরা।”

[২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ]

এতদুরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম সমালো-চনা সমাপন হইল। এই সমুদায় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কি রূপ সামাজিক অবস্থা ছিল এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয় হইতে পারিতেন তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কালে বিবাহের নিয়ম ছিল না। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ ধৃত শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের সে কণার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহার আলোচনা করি নাই। বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত কন্যার উপব বর মনোনীত করিবার ভার থাকিত। এবং যদিও পিতা যাকাকে হয় কন্যা দান করিতে পারিতেন তাহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্ভাদান করিতে হইত। অতীতে দিলে তাহাব পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। * স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্য কার্য্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে গৃহস্থের যে

শুক্রতর কার্যা, সাংসারিক শাস্ত্র ব্যয়চিহ্না ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীব অগ্নি রক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদি স্থলে যাইতে পারিতেন। তাঁহারা যদিও সর্বত্র দায়াদিকারিণী হইতে পারিতেন না তাঁহাদের নিজেব ধন কেহই কোশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; কবিলে চোরের ছায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহাটলে স্ত্রীদণ্ড টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্র কোনস্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ড, একপ্রকাল বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য বলিলেই হয়। কালিকা-পুরাণে চন্দ্রের রাজ যক্ষা রোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্যা মাত্র বাবস্ত। পৌরানিক ঋষিরা এবং সংহিতা সমূহের টাকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের দে কঠোর ব্রত নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন প্রাচীন ঋষিরা তাহাব দিক্ দিয়াও যান নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়

না যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে। বোধ হয় সতীদাহ অনার্যাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ী মিথিলায়, মিথিলায় অদ্যাপি অনার্য জাতির ভাগ অধিক। তিনি যে দেশের জন্য সংহিতা রচনা করেন, তথায় উহার প্রচার দেখিয়া, উহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীসমেত দেবদেবীমণ্ডো গণ্য হইয়াছেন। মনুর সময়ে বা বেদে বিষ্ণুর নামও নাই। সুতরাং বোধ হয়, মনুর অনেক পরে বিষ্ণুসংহিতা রচনা করা হয়, যখন রচনা হয়, তখন আর্য জাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্যাদিগের আচাব ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যে লেখা পড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মানের করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসম্মানবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয় স্মৃভোগের জন্য, আর্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভ মাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকার উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইহারা কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

[স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী চরিত্র।]

বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরু-

যের সহবাস করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে হ্রস্ব শাস্তি-ভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। জ্ঞীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসংকার, দেব-পূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে গুরু কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুকুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া জ্ঞী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী পুত্রাদিতে গ্ৰেহ-শালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি জ্ঞীলোকদিগের মধ্যে প্রধানা ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য জ্ঞীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকী দিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে হেতু-বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধু জ্ঞী সর্ব্ব-তোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোন রূপ সাহসকর্ম্মে জ্ঞীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামী পুত্রাদির হস্ত হ-ইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী

অর্থাৎ স্বৈচ্ছাচারিণী এবং বাঙিচারিণী এক পর্যায়ের শব্দ। কুন্টা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি অধুনা উহার অসদর্থই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভি-নিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই জ্ঞীলোক জগতের মাননীয় হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, জ্ঞীলোকের সর্ব্ব-প্রকারে পরিহার্য্য। লজ্জা জ্ঞীলোকের ভূষণ, পরহুঃ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দাশুবর্তন করা জ্ঞীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরি-ষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভাল-বাসিতেন। তাহাদের ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর ও গৃহদ্বার ও তৈজস পত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অপরি-ষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। জ্ঞীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সমাক্র-রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি জ্ঞীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কা-রাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, জ্ঞীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুষ্ঠতা জ্ঞীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামী ও জ্ঞীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়।

যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহাইলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ঘটবে এদেশীয় কাহারই অবদিত নাই। একন্যাস্থিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম স্ত্রী এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপর পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধা ও বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গেও মর্ত্যেও প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সংস্কার শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, সন্ধ্যাবহার দ্বারা, বাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে স্থনীতি শিক্ষা দিতে পারে? “কায়মনোবাক্যে বিস্তৃতা রমণী চায়ার নায় স্বামীর অঙ্গ গমন করিবেন সখীর নায় হিত কশ্মে তৎপর হইবেন দাসীর নায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।” কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আত্মদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য সেটা তাঁহার

অন্য বলি হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহ-বিষতাদিগের ভূরি ২ প্রশংসা গুণিতে পওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহ-শূন্য রমণী লক্ষীর আবাস ভূমি।

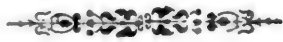
পূর্ব্বের উক্ত হইয়াছে আত্মদের দেশে অদ্যাপি ভোগের জন্য বিবাহ করা হয় না। বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রিগণ স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ আরো দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। একরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই। নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। “অস্থিতিরস্থিনি মাংসৈর্মাসানি” এই শ্রুতি। স্বামীর স্মৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হইবেন স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

[তুলনা।]

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারী চরিত্রের উৎকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে স্মৃতিকার দিগের নারী-চরিত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। স্নেহ প্রবৃত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দয়া, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে স্ত্রিগণ কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাঁহারা সংসারের আয়বায় চিন্তার ভাব

জীলোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং বহুতর উহাদিগের কর্তব্য কর্মের মধ্যে নির্দেশ করিয়া উহাদের কর্মক্ষমতা বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু জীলোক দিগের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয় তাহার একটাও উহাদের নাই। এমন কি ধর্ম বিষয়েও জীলোকেবা আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। সুতরাং যে ধর্মনিষ্ঠতার জন্ত বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাত।

ইহা হইয়াছে যে প্রবৃত্তি উহাদের প্রবল হইতে পার্য নাই। জন হাউডের গৃহিণী স্বামীর সহিত দেশে ২ ভ্রমণ করিয়া যেরূপ পরহিত ত্রুটে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটাও দেখা যায় না। আমাদের দেশের জীলোকেরা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল গুণে কুইন এলিজাবেথ বিখ্যাত ইহা হইয়াছে আমাদের দেশীয় রমণীদিগের সে গুণ থাকা অসম্ভব।



বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দিকে স্তবিরমণ্ডলী তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্তি প্রশান্ত ও গভীর-দৃষ্টি দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দিক গভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমনত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন “ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সত্ত্ব এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও,” ভগবান বারম্বার এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার

প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্বার বলিলেন, “হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু কলভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্জ্ঞান কামনায় জীবনক্ষেপকর।” তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হত গণ কহিলেন বুদ্ধদেব নির্জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন মগলাধিপতি মহারাজ মিনিককে* কহিলেন “বহুগুণসম্পন্ন ভগ-

* ইনিষোন বা যবন রাজা মিনিক (Bactrian king Menander) ভারত-বর্ষীয় কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০

বান্ জীবিত আছেন।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “তবে তিনি কোথায়?” আচার্য্য নাগসেন কহিলেন “ভগবান্ নির্ক্ষাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্তমান নাই। অগ্নি নির্ক্ষাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ক্ষাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অন্তগত হইয়াছেন, আর উদ্ভিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মচক্রে বর্তমান আছেন এবং তাঁহাব সেই প্রদর্শিত ধর্ম মধোই তিনি সজীব রহিয়াছেন।” আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্যঃ বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী† তথা হইতে তিনি সকল

বৎসর পূর্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানসিয় (Demetrius) ইহাব পাবিবদ ছিলেন। মিনিক্কের সহিত নাগসেনের ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষাব “মিনিক্কপছে” লিখিত আছে।

† মহাভারতে লিখিত আছে শ্রাবস্তী ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী।

লোককে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, একত্র উহাব অপর নাম ধর্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশ কদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তি দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন।

“উৎপন্নো লোক প্রদ্যোতো লোকনাথঃ
প্রভক্ষরঃ।”

“অকীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা
রগঞ্জহঃ।”

“ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পূর্ণ্যঃ পূর্ণ
মনোরথঃ।”

“সম্পূর্ণৈঃ গুরুধর্মৈশ্চ জগন্তি তপস্বিয্যসি।”

“চিরম্ হৃষ্টমিমং লোকং তমঃকন্দা-
বশুস্তিতং।”

“ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃপ্রতি-
বোধিতুং।”

“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেষব্যাদি-
প্রপীড়িতে।”

“বৈদ্যারাট্ তং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাদি
প্রমোচকঃ।”

মহাপুত্র ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্মাতা যথা মহু—ইক্ষাকু—নাশক—ককুৎস্থ—আননাঃ—পুথু—বিশ্বগম্ব—অদ্রি—যুবনাস্ত—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করেন। “অদ্রেস্ত যুবনাস্ত শ্রাবস্তস্তাত্মজো-
ভবেৎ।”

তস্ত শ্রাবস্তকো জেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন
নির্মিতা।” (বনপর্ব)

“ভবিষ্যন্তাক্ষণাঃ শূভাশুচি নামে
সমুৎপত্তে।”

“মমুখ্যা শৈব দেবাস্ত ভবিষ্যন্তি সুখা-
নিতাঃ।”

“পণ্ডিতাশ্চাণ্যযোগাশ্চ ধর্ম্মশ্রেষ্ঠস্তি
চেপিতে।” ইত্যাদি

অর্থাৎ “আপনি লোক ভাস্কর, লোক-
নাথ এবং অক্ষীভূত লোক সকলের চক্ষু-
দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি
যদৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ মনোরথ,
এবং আপনি এই জগৎ শুদ্ধধর্ম্ম* দ্বারা
পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল
পর্য্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত আছে,
তমঃ রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—
আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার
দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীব
লোক ক্লেশ ব্যাধিতে প্রীড়িত আছে
দেখিয়া আপনি বৈদ্যবাক্ত হইয়া উৎপন্ন
হইয়াছেন আপনাব দ্বাবাই এই জীব-
লোকেব সকল পীড়াব অন্ত হইবে,
এই জীবলোক এককাল চক্ষুহীন হইয়া-
ছিল, আপনি উদ্ভিত হওয়াতে তাহাবা
সচক্ষু হইবে, কি দেব, কি মনুষ্য সকলেই
সুখী হইবে। যাহাবা আপনার এই
ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত
হয় এবং গতিব্যাধি হয়।” ইত্যাদি

* শুদ্ধধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম।
অহিংসা ধর্ম্মের শুদ্ধ সংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষাব
অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষাব
অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া
প্রথমতঃ বাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার
ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ধ্যান নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্য-
সিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই
জীবলোক কেবল কষ্টময়। জন্মাইতেছে
—বাচিতেছে—মরিতেছে—চূত হইতেছে
ইত্যাদি—লোক সকল এই মহা দুঃখ
ক্লেশের মধ্য হইতে নিম্নত হইতে জানে
না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ
নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর
চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন “কি
হেতু জরামরণ হয়? জরামরণ কিং
মূলকং?” এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই
উদয় হইল “জাতিপ্রত্যয়ং হি জরা-
মরণং।” জাতি সত্তাই জরামরণের কারণ।
“কিং মূলকং জাতিঃ?” জাতির মূল কি?
“জাতির্ভবতি ভব প্রত্যয়া।” ভব অর্থাৎ
উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎ-
পত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী
ধাতাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা—তৃষ্ণার
মূল বেদনা—বেদনার মূল স্পর্শ—স্পর্শের
বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নাম
রূপ—নামরূপের বীজ বিজ্ঞান—বিজ্ঞা-
নোৎপত্তির বীজ সংস্কার—সংস্কারের বীজ
অবিদ্যা।* দুঃখ ক্লেশের এই হেতু ভাব

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানেব মতও
এইরূপ যথা “অবিজ্ঞা পস্সেয় সন্ধ্যাব,
সন্ধ্যাব পস্সেয় বিজ্ঞানম্, বিজ্ঞানপস্সেয়
নামরূপম্, নামরূপপস্সেয় ষড়ায়তনম্,
ষড়ায়তন পস্সেয় ফাস্সো, ফাস্সোপস্সেয়
বেদনা, বেদনা পস্সেয় তিষিণা, তিষিণা
পস্সেয় উপাদানম্ উপাদান পস্সেয়
ভাবো, ভাবপস্সেয় জাতি, জাতিপস্সেয়
জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখ” ইত্যাদি

অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু ভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে “অবিদ্যায়া মসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যা-নিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কার নিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতি নিরোধাজ্জরা মরণ শোক পরিদেব দুঃখ দৌর্দ্যনস্ত্রোপায়াংশ! নিরুপান্তে। এবমন্ত কেবলন্ত মহতো দুঃখ স্কন্দন্ত নিরোধো ভবতীতি। ইতিহি ভিক্ষবো বোধি সবন্ত পূৰ্ব্ব মশ্রতেষু ধর্মেষু যোনিশো মনশিকো বা ঘহলোকারাজ্ঞান মুদপাদি চক্ষুরুদপাদি—বিদ্যোদপাদি ভূবিরুদপাদি—মেঘোদপাদি প্রজোদপাদি আলোকঃ প্রাচুর্ভব—অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপ ক্রমে সমস্ত দুঃখ স্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখ নিরোধের নাম নির্ঝাণ। নির্ঝাণ হইলে জুখ দুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্য সিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি “জরা মরণ বিঘাতী ভিষথর” বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আখ্যা দার্শনিক দিগের মধ্যে যেমন জগতের মূল তত্ত্ব কোনমতে ২৫, কোন মতে ১৬, কোন মতে ৭—তেমনি গুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব ২, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্ফটিক চৈতন্যপদার্থ, ভূত

হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহু ও অভ্যন্তর ঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিম্পন্ন হইতেছে।

“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈতন্যকং”

(শঙ্করাচার্য্যদ্ব্যত বুদ্ধ বাক্যঃ)

“খর মেহোক্ষেরণস্বভাবান্তে পৃথিবী

ধাষাদয়শ্চত্বারঃ”

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টা, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণু সত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিনা জন্মে। আপ্যধাতু মেহ স্বভাবাপন্ন তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব বায়বীয় পরমাণু দ্রব অর্থাৎ চলনশীল। “অন্যদপি স্বভাব্যমস্তরা ক্রতেষাম্” উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন ৪ প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্মবস্তাদি অনেক প্রকার। এই ৪ প্রকার পরমাণু রাশির নানাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত

ভৌতিক সমুদায় ভগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈতন্যপদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

“রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংস্কার সংস্কারাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত চৈতন্যাকাঃ”

(শঙ্করাচার্য্যাবৃত্ত বৃদ্ধ বাক্য)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপ স্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরি নাম এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

“অহমহিমিত্যালয় বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ”

আমি আমি, আমার আমার, এবং প্রকার অহং ভাবাপন্ন সর্বদা উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নাম বিজ্ঞান স্কন্ধ। স্মৃতি ভুংখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনা স্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিম, উহা অখ, এই প্রকার ভেদ ব্যবহার সম্পাদক নাম বিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংস্কার স্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইত্যাদি আস্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধ মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কার মাত্র)

“বিজ্ঞানস্কন্ধাশ্চিত্ত মায়াচ অন্যান্যদ্বারস্কন্ধা চৈতন্যচ সকললোকষাত্রা নির্বাহকাঃ”

উক্ত পঞ্চস্কন্ধেব মধ্যে যেটি বিজ্ঞান স্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর ৪ স্কন্ধের নাম চৈতন্য।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থির-তাও নাই। জগতের সকল ভাবই

ক্ষণিক, তবে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রবাহের শক্তিতে। বর্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই শ্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহাইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

“ত্রয়োদন্যং সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ”

(শঙ্করাচার্য্যাবৃত্ত বোধিচিত্ত বিবরণ)

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাব বিকার ৬, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা

“অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং ভবোজগতি জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা হুংখং দুর্ম্মনস্তাইতোবাং জাতীয়কাইতরেতর হেতুকাঃ—(শঙ্করাচার্য্যাবৃত্ত বৌদ্ধ সূত্রম্)

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু ৩ ১০০ বৎসর ও ১০ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আত্মাদের অবিদ্যা (এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত করে তাহাবা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ

নিম্পত্তি অর্থাৎ শুক্ল শোণিতের নিম্পত্তি হয়। এইরূপে নামরূপ শব্দে গর্ত্ব সকল বুদ্ধবুদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত প্রচণ্ড ক-
রিতে হইবে। তৎপরে যড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান ৪ ধাতু ও রূপ এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাব নাম যড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে স্খাৎকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তিঅনুসারে ধর্ম্মা-
ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানা দেহোৎপত্তি। এতদ্বরে পঞ্চস্কন্ধ উৎ-
পত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্কিকা (ঠিকাকৈ জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতু মাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহ জন্মে। এই অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে “হা পুত্র!” বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্ম্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যাধি জন্মে। এতদ্বিন্ন মান অপমান প্রভৃতি বিকারাত্মক জন্মিয়া থাকে।

এই সকল গুলি পরস্পর পরস্পরের হইবা হেতু সদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে

অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যাস্তর উৎপত্তির হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর একগতে নাই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন	আর্য্যদর্শন (গৌতমাদি)
ধর	কাঠিন্য
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয়বিজ্ঞান	গর্ত্বস্থজীবের
	প্রথম জ্ঞান
পূদগল	দেহ
প্রতীত্য	} কার্য্য
প্রতীয়হেতুক	
ভাব উৎপাদ	উৎপত্তি
নিরোধ	ক্ষয়
প্রতিসংখ্যা	} হনন
নিরোধ	
অপ্রতিসংখ্যা	} স্বয়ং বিনাশী
নিরোধ	
আবরণভাব	আকাশ

সন্তানী	হেতুক ফলভাব
সমিশ্রণ	অধিকরণ
জীব	.
অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিসয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বদ্ধ	কর্ম
মোক্ষ	কর্মনাশ
অন্তিকার	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি
	ইত্যাদি

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্ম গ্রহণের পূর্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক সূত্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই “রত্ন ত্রয়ে” শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ জিতয়েব প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধ ঘোষ করেন “এসকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটা বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।” এই “রত্নত্রয়” সূত্র, নিয়ম,

অভিধর্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে, পালিভাষায় উচ্চাব নাম “ত্রিপিটকম্।” ভিন্সান্তপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধাবণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্মপিটক বোধিসত্ত্ব গণকে বলা হইয়াছিল, উহা সম্মত ভাষায় রচিত হয় : কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধ দেব মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন “আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষাগ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।” সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন “বুদ্ধবাক্য সকল সকল নিকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।” মহাবংশের লিখনানুসারে স্তূভূতিনামক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল তৎপরে অনুমান খৃষ্ট জন্মের ১০০ একশত বৎসরের পূর্বে ভট্ট গমণীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খৃঃ পূঃ মহাবাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ

কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার কবেন এবং তিনি সাধাবণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অমুবাদ কবিরাজিগেন এই সিংহলীয় ভাষায় অমুবাদ এক্ষণে স্বপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খৃষ্টাব্দে ইহাব পুনরায় পালি অমুবাদ কবিরাজিগেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্ম দেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দেব নিমিত্ত সর্বসংকল্প-পদ্ধতি লিখিত আছে, সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পবিপূর্ণ এবং অভিধর্মপিটকে বিজ্ঞানাদি ঘটত বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিকপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থ বিভাগ যথা।

বিনয় পিটকম।

পরাক্রি, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, সুলবগ্গো, পরিবাবপাঠো।

সূত্র পিটকম।

দীঘঘ নিক্কয়, মঝ্জিম নিক্কয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তব নিক্কয়, ক্ষুদ্দক নিক্কয়,। শে-ষোক্‌ গ্রন্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্ উদানম্ ইতিবুত্তকম্-সুত্তনিপাত, বিমানবাথু, পেট বাথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসমভিদ মাগ্গ, আপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্ ॥

অভিধর্ম পিটকম্।

ধম্মসঙ্কনিধি, বিভাঙ্গম, কথাবাথু, পুগ্গল পানুত্তি ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্ ॥

নির্কারণ কামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য

উদ্দেশ্য। এই নির্কারণ প্রাপ্তির জন্যই তাহারা শাবীক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার কবিরাজি থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ জন্ম গ্রহণের কষ্টইহতে পবিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে এক মাত্র নির্কারণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণই কষ্টদায়ক। সাংকার্য্য দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্কারণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরমসুখ। বৌদ্ধ শাস্ত্রকহে—“জিঘৃষা চরম রোগ সঙ্খাব পরম দুখ। এতম্ নন্ত্য যথা ভূতম্ নির্কারণম্ পরমম্ সুখম্”। অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেই মত জীবন দুঃখ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক কিন্তু এক মাত্র নির্কারণই পরমসুখ। নির্কারণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক যথা দানশীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বন, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পাবমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্য গ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ তাহাব অর্থ ঈশ্বর অনুমান কবেন কিন্তু সেটা ভ্রম, উহাব অর্থ পূর্ব পূর্ব কল্পেব দীপঙ্কারাদিবুদ্ধ। বুদ্ধেব নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমং, যেসকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্য সিংহের মুখইহতে সহস্র বৎসব পূর্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ

ধর্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় “ভুঁ মণি পদ্মেছ” এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদের এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধ-শিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদের নিকট বৌদ্ধধর্মের দীক্ষিত হইয়া এই ধর্মের উন্নতি সাধন করিতেন।*

আমরা সেই আৰ্য্য জাতি। এবং ভারত বর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞান বীজ-অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কো-থায়! তেহি নো দিবসা গতাঃ” সেদিন গত হইয়াছে! আমাদের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চির কালেব জন্য বিলীন হইয়াগিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আশ্রুত হইয়া উঠিল স্তবরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত!—

শ্রীরামদাস সেন

* যোনধর্ম্য রক্ষিত অল সেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খৃষ্ট জন্মেব পূর্বে সিংহল দ্বীপে ধর্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন

যথা মহাবংশ “যোনান গরল সন্দ যোণ মহাধর্ম্য রক্ষিতো” ॥*॥—



প্রেম নিমজ্জন।

রম্য উপবনে রম্য জলাশয় ধারে
দেখিছু কে যেন এক রয়েছে বসিয়া
পাগলের মত বেশ
পাগলের মত কেশ
পাগলের মত কর ভূতলে পাতিয়া
একদৃষ্টে বারিপানে রয়েছে চাহিয়া।
কভু কাঁদে কভু হাসে
কভু বা করুণ ভাষে
অমুরাগে গলে যেন সন্তাষি কাহারে
আপন মনের কথা—
আপন মবম বাণী—
কত মতে কত ভাবে জানায় তাহারে।

সহসা সে ভাব গত,
আবার পূর্বের মত,
একদৃষ্টে বারিপানে চাহে হেরিবারে—
না জানি কি খনি-যোনি
অমূল্য রতন-মণি—
নাজানি কি বিধি-নিধি সেজল মাঝারে;—
না নিলে ডুবিলে যাহা সংসার পাথাবে।
বিজন প্রদেশ সেই বিজন কানন!—
সকলি পাদপময়—অতি সুশোভন!—
বিটপে বিটপী নত, ১০
তাহে পুষ্প নানা মত,
একটীও ফল কিন্তু না করে ধারণ

একটি মুকুল নাহি হয় কদাচন।
 কেবলি কুসুম ফুটে,
 কেবলি সুবাস ছুটে,
 কেবলি ঝরিয়া পড়ে বনেন বডন
 কে করে গোবষ তার—কে করে যতন।
 বসি পাখী ডালে ডালে
 এক সুরে একতালে
 মধুর করুণ কণ্ঠে গায় অমূল্য
 বিচিত্র বিহঙ্গ তার। বন অভরণ!—
 বন ছাড়ি নাহি যায়,
 বনেতেই সুখ পায়,
 বনেন বরণ পাখী বনেন মতন,
 সেই তাব সুখ-ধাম—সেই নিকেতন।
 তথ্য সমীপ অতি করুণ নিশ্বন।—
 অবিবত কাঁপাইছে তরুলতা গণ;—
 অবিবত বহিতেছে,
 সুসৌভতে ভবিতেছে,
 গুরুপত্র উড়াতেছে,—
 অবিবত নাচাতেছে তড়াগ-জীবন;—
 জলজসুন্দরীদলে দিয়া আলিঙ্গন।
 জলেব শব্দ তথা,
 বিতঙ্গ অক্ষুট কথা,
 সমীর নিশ্বন যথা—
 নহে ত স্বতন্ত্র কেহ গুণায় কণন,—
 এক শব্দে পরিণত—চিত বিমোহন!
 বস্মা উপবনে এই জলাশয় ধাবে
 দেখিছে রয়েছে যুবা একাকী বসিয়া;—
 স্থিরভাবে নত শিবে,
 ঐকদৃষ্টে দেখে নীরে,—
 জগত সংসার যেন জলে পাসবিয়া
 পাগলের মত তথা ব্যেছে বসিয়া।

বড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তখন
 জিজ্ঞাসিলু যুবাববে কবি সম্ভাষণ—
 “কহ কে সৃজন তুমি
 “আসি এ বিজন ভূমি
 “একাকী সবসী তীরে বসিয়া এমন
 “একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জীবন?”
 সুধাইলু বারম্বার,
 তবু কথা নাহি তার,—
 তবু না উত্তর মোষে করিল অর্পণ
 ভাবিলু পাগল বুঝি হবে সেটজন।
 তাই ভাবি পুনরায়
 জিজ্ঞাসিলু ডাকি ভায়
 “কেন এ বিচিত্র ভাব করি বিলোকন?—
 কেন এ নিরর্থ কানো মুগ্ধ তব মন?
 অমনি ক্রকুট করি
 ধ্যান-দম্ম পরিহরি
 বোম-বিস্ফারিত নেত্রে করি নিবীক্ষণ
 দাক্ষিণ মনেব ভাব জানায় আপন।
 কণপরে পুনরায়
 চিত্রিত পুত্তলি প্রায়
 সরসী-সলিল ধ্যানে হইল মগন,—
 আবার ভুলিল সব জগত-সৃজন।
 ক্রমে মম কৌতুহল
 হৈল অতি সুপ্রবল,—
 উক্রেঃস্বরে ডাকি তারে কহিলু বচন;
 অমনি গজ্জিয়া উঠি সরোষে সে জন
 ধাইল আমার পানে,
 অকারণ শত্রু জানে;—
 নিকটে আইল যবে করি আশ্ফালন
 কহিলু ভাষারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ,—

নহি তব বিপু আমি
 আমি তব শুভকামী—
 আমি তব অভিলাষ করিব পূরণ,—
 কহ মোরে কিবা তব মানস মনন।
 উচ্চ হাসি হাসি যুবা কহিল তখন
 “তুমি মোর অভিলাষ করিবে পূরণ!—
 “তুমি সে রতন দিবে?
 “কহ কত মূল্য নিবে?
 “কোন সিঁছু মাঝে কহ তাহার জনন?—
 “কাহার কিরীট পবে
 সেরস্ত স্রুমা ধরে,—
 “কোন ভাগ্যবান ধনী-হৃদয়শোভন!
 “সেরস্ত আকাশে জলে!—
 “কিসা থাকে বন স্তলে?—
 “অথবা অতল তলে লুকাই বদন!—
 “কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন?
 * * * *
 “গগন সাগরে পশি—
 “তুলিয়া গগন শশী—
 “কখন কি তুমি মম করে আনি দিবে!—
 “এমনের সাধ তবু
 “নারিবে প্রাতে কভু—
 “এ বাসনানল তবু কভু না নিবিবে।
 সেরস্ত নাহিক নভে,
 “সেরস্ত নাহিক তবে,
 “সেরস্ত রতনাকবে নাহিক মিলিবে!—
 “শুদ্ধ এ আঁখীর পাশে—
 “ভুবন মোহিনী হাসে,—
 “আর ওই জলাশয়ে বামার হেরিবে।
 “সেমণি জলিছে যাই—
 “জলাশয়ে শোভা তাই—,

‘তার অদর্শনে সব আঁধার হইবে!—
 “কুমুদ কল্লার যত
 “রক্তপদ্ম শত শত
 “আর এ সরজে নাহি কখন ফুটিবে
 “আর না মরাল কুল কভু সঞ্চারিবে”।
 “এত বলি ধরি করে
 “লয়ে মোরে সরোবরে
 কহিলেক, “ওই দেখ সবসী-বাসিনী!—
 “ওই দেখ হাসে জলে,
 “ওই যে কি কথা বলে
 “ওই দেখ অশ্রু ধারা ফেলে বিষাদিনী—
 বলিতে বলিতে তার
 আঁখি জল আপনার
 বেগেতে বহিল বক্ষে যেন প্রবাহিনী;
 বিষাদে ডুবিল চিত আঁধারে মেদিনী!
 “কহ প্রিয়ে কিবা হুঃখ!—
 “কেন আজি মান মুখ?—
 “কে ডুবালে স্রুতবী বিষাদ সাগরে?
 “যখনি যে ভাবে চাই;
 “তখনি দেখিতে পাই;
 “হাসির হিল্লোল সদা খেলে বিষাদরে!
 “সে হাসি কোথায় আজি
 “কোথা কুন্দ দন্ত রাজী—
 “কি জ্বালা পশিল প্রিয়ে মরম ভিতরে?—
 “কহ গোবে রূপা করি
 “এ হুঃখে কেমনে তরি,—
 “কোন মন্ত্রে আনি তোমা হৃদয় উপবে?”
 “জগত সংসার আমি করিছু ভ্রমণ—
 “কোথা না পেলাম প্রিয়ে তব দর্শন!
 “তবে এ জীবন ভার
 “কিকাজ বহিয়া আর

“আজি এই বারি মাঝে দিব বিসর্জন”!

এত বলি যুবা জলে হইল পতন ।

* * * *

কাঁপিল প্রকৃতি কায়া—

সুন্দর প্রকৃতি মায়া—

দেখিতে দেখিতে সব হইল স্বপন!—

বন শোভা লুকাইল,

জলাশয় শুকাইল,

মক্ক সম হ'ল সেই রম্য উপবন ।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ ।

॥



নীতিকুসুমাজলি ।

দ্বিতীয় অঞ্জলি ।

১

কার্যকালে জানা যায় ভূত্যা-পরিচয় ।

কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময় ॥

মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে ।

ভাৰ্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ॥

২

চক্ষুর বাহির হলে্যে কার্য্য ক্ষয়কারী ।

সম্মুখেতে কথ' গুলি মধুমাখা ভারী ॥

গরলেতে ভরা কুস্ত্র মুখে মাত্র ক্ষীৰ ।

হেন মিত্রে পরিহার করিবে স্ত্রধীর ॥

৩

অকালে না মরে জীব, শত শরপাতে ।

কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে ॥

৪

বহুগুণ সত্ত্বে এক দোষের কারণ ।

নিমজ্জিত শিশধর, বহেন যেজন ॥

কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয় ।

দবিজ্ঞতা দোম, গুণরাশি-নাশী হয় ॥

৫

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক করণ ।

মৃত বেই তার পুন নাহিক মরণ ।

সেইরূপ গত বিষয়ের নাহি শোক ।

এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক ॥

৬

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সমুত ।

তরুণ কখন স্বভাব নহে চাত ॥

প্রণমি মলয়াচলে, বাহার রূপায় ।

শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায় ॥

৭

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ ।

বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস ॥

৮

যদি উচ্চ পদলাভে হয় অতিমত ।

তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত ॥

কেশরী প্রণমে নত করিয়া শরীর ।

মহা তেজে উঠে গিয়া সন্তকে করীর ॥

৯

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পবিগত।
অলদ অঙ্গাব, বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পবিগত ॥

১০

সজ্জনের গুণবুদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুম সুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তরে ॥

১১

শীলতাই সদগুণের শোভার ভবন।
মৌবনই ঘোষাদের ভূষণ শোভন ॥

১২

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চক্রে উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে ॥

১৩

কারু প্রীতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রীতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ নানকর ॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান্।
সর্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান ॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে ॥

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয় ॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন।
ওধু বড় জাতি নহে পূজার ভাজন ॥
ফাটকের পাত্র যবে চুরমার হয়।
পাঁচগুণা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয় ॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
ছরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর ॥

১৮

যাতে সমুদ্রব দোষ, তাতেই নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিক্ষোভক মারে ॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান্ বলি তার কেন অভিমান ॥
অঙ্গে ধনি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার ॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাতে তাঁর নাহি যায় মান।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্ ॥

২১

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমেরা ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে ॥

২২

পরান্নে জীবন, করিতে বাপন,
বিরত মনস্বির।
বায়স আবলী, লুটে থায় বলি,
পিক তাহে রত নয় ॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাসিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায় ॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্যে, কভু স্বর্গে যান।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান ॥

২৫

নিজাশয় যে প্রকাব, অপরের তদাকার,
জ্ঞান কবে গন্ত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসী,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ ॥

২৬

পণ্ডিত সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে তিমির, আগতে মিহিব,
দীপপ্রভা কভু রয় ॥

২৭

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর ॥

২৮

স্বকার্য উদ্ধার ভবে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে ॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়ান্তে নহে তাহা সে রসবিশিষ্ট ॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সূন্দর।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর ॥

৩০

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার তেজিয়া পরদারে মজে নর ॥

৩১

যেই ধন আহবণ ধর্মের কারণ।
কিহা পোষাগণের ভরণে প্রয়োজন ॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সুব ধন সদা হয় ধর্ম-ধন ॥

৩২

রূপ, কুণ্ডল, বিদ্যা, বস, যৌবন বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ মদ, মদিরা সমান ॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীকৃত্য বিষম।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম ॥

৩৪

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় ॥

৩৫

তীব্রভয় দেখাইয়া মূঢ়রূপে সাজা।
হেন যুক্ত* দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা ॥

৩৬

করী জানে কেণরীর বল কতদূর।
সেবল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর ॥

৩৭

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ ॥
বিদ্যা স্তম্ভভোগ প্রদা, যশোবিধায়িনী।
বিদ্যা গুরুর গুরু, কল্যাণ দায়িনী ॥

* যুক্তিবিশিষ্ট।

বিদ্যা হন বহুজন বিদেশ গমনে।
 গুজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি সননে ॥
 পরম দেবতা বিদ্যা, সর্বধন সার।
 বিদ্যাহীন যত নর পশুর আকার ॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
 গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন ॥
 বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
 দুর্বল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥
 কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।
 সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স ॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ রয়।
 নিগুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয় ॥
 স্নমধুব জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
 সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি ॥

৪০

কি আশ্চর্য সাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,
 দুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
 সাগরের লোণা জল, মিষ্ট করে মেঘ দল,
 ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বরিষয় ॥

৪১

বিবাদের জন্তু বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
 শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ ॥
 খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।
 পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে ॥

৪২

জ্ঞাতি ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ।
 দানে ক্ষয় হীন বিদ্যা রত্ন মহাধন ॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।
 পুষ্পরাজ* মণি বটে গন্ধ নাহি তায় ॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
 বিদ্যা আর ধন চিন্তা কবিরেক নর ॥
 কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
 এই ভাবে ধর্ম লাখে যত সুধিবর ॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বৃদ্ধিবল।
 তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হৃদিদল ॥
 মাহতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
 এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে ॥

৪৬

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
 করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥
 পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
 শরীরের শোভাবুদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥

৪৭

কুলের কল্যাণে একজনে পরিহর।
 গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর ॥
 জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জন।
 পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ ॥

৪৮

স্বজাতীয় বধে মানুষের বাড়ে রক্ষ।
 শিক্রে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভূজঙ্গ ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
 পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
 দুষ্কের কারণ, সহিত যতন,
 গোধন পূজন, ধর্মহেতু নহে ভাই ॥

* পোপরাজ হিন্দী।

<p>৫০ মত্ত মাতঙ্গের কুন্ত দলনে চতুর। কিষ্ণা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর। কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন। অশক্ত কন্দর্প দর্প করিতে দলন ॥</p>	<p>৫৩ শ্রুতিতে মুখব, পণ্ডিত নিকর, কেবল বচনে পটু। কহে ছাড় সঙ্গ, নারী রতিরঙ্গ, বার্য্যকালে কিন্তু হটু ॥ নীলাজ্ঞ নয়না, জঘন শোভনা, রসনা† মণিমণ্ডিত। করে পবিহার, শক্তি কাহার, কে আছে হেন পণ্ডিত ॥</p>
<p>৫১ যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপেতে দহে গাত্র, দেখা মাত্র উন্মাদ বাড়য়। পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়, তাহাবে দয়িতা* কেন কয় ॥</p>	<p>৫৪ বিজাতীয় বাজ্ঞা কভু শোভিত না হয়। বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥ অধবে অজ্ঞান-বেথা কেবল দূষণ। নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ণ ভূষণ ॥</p>
<p>৫২ তদবধি কৃতীদের হৃদয়কন্দরে। বিমল বিবেক দীপ চাক প্রভাধবে ॥ যদবধি কুবঙ্গনয়না বালা গণ। চঞ্চল অপাক্ষ নাহি করে সঞ্চালন ॥</p>	<p>† চন্দ্রহার।</p>

* দয়াবতী।

† চন্দ্রহার।

চৈতন্য।

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহে নামসংকীর্তন।

চৈতন্য যে সময় পুরীবরের নিকট
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার
বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র।

শিষ্যদিগেব অনুবোধে চৈতন্যদেব
গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।
বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যারপর
নাই প্রীত হইলেন। শচী পুত্রকে
দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। আত্মীয়
বন্ধুগণ তীর্থযাত্রার বিবরণ জিজ্ঞাসা কবি-

লেন। চৈতন্য আদ্যোপান্ত সমুদয়
বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণন করিতে
করিতে ঈশ্বরপুত্রীর নাম উল্লেখ করা-
মাত্র ভাবসংসর্গ গুণে কৃষ্ণপ্রেমে বিগ-
লিত হৃদয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হা কৃষ্ণ!
হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।
সকলেই বিস্মিত হইলেন। কেহ ভাবি-
লেন বায়ুৰ কার্য্য। কেহ ভাবিলেন
অপদেবতার দৃষ্টি। বৈষ্ণবগণ তখনই

বুঝিলেন, চৈতন্যোব জীবনসম্বন্ধে এক-
বারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্য
কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তদীয় * প্রাপ্ত
হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ॥
চতুর্দিকে নয়নে বহুয়ে অশ্রুধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমন ইহারে কভু না দেখি যে আর ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে ॥

প্রভু + বৈষ্ণবদিগকে আগামী কল্য
শুক্লাব্দ চক্রবর্তীর গৃহে সমাগত হইতে
অনুরোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ নিত্যকৃত্য
সমাপন করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে শুক্লাব্দ চক্রবর্তীর গৃহে
সমাগত হইলেন। শুক্লাব্দ তাঁহাদিগকে
বলিলেন, নিম্নাঞ্জে পণ্ডিত গয়া হইতে
পরম বৈষ্ণব হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন।
ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বারপার নাই
প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে
একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন

* বেদান্তসারে ইহাকেই জীবমুক্ত বা
জীবিতাবস্থায় কর্মজাল সূত্র হইতে মুক্ত
বলে। বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা প্রেম
ভক্তিতে হয়, পক্ষান্তরে বেদান্তের মতে
ইহা জ্ঞানে হয়।

+ বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে আমরা
চৈতন্যদেবকে প্রভু অথবা মহাপ্রভু
বলিব।

আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দ্বিজ-
রাজ চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগ-
বতদিগকে একত্র সমাগত দেখিয়া প্রেমে
অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।

আনি দেহ মোরে নন্দদোষের নন্দন ॥

বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রেম ও সাহিত্যিক ভাব
দেখিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাবেশে অশ্রু-
জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-
মণ্ডলী বিদায় হইলে, শিষ্যগণ অধ্যয়ন
করিতে আসিল। তাহাদিগের মধ্যে
যে মে শ্লোক উচ্চারণ করিল, চৈতন্য
প্রেম-বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণপক্ষে তাহার
ব্যাখ্যা করিলেন।

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।

খণ্ডক আগার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥

পরং ব্রহ্ম বিশ্বস্তর শব্দ মূর্তিময়।

যে শব্দেতে যে বাথানে সেই সত্য হয় ॥

চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড পৃ ১২৮।

ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান লাভ
করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন
এজন্ত গঞ্জিত হইলেন। সে দিবস
অধ্যাপনকার্য বন্ধ করিয়া শিষ্যে গঙ্গা-
স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে আত্মিক
সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন।
শচী অনব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, বৎস! অদ্য কি বিষয়ের ব্যাখ্যা
করিতেছিলে?

চৈতন্য বলিলেন—মাত! আমার কৃষ্ণ
নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কবিতোছিলাম
মাতঃ ভাগবতে লিখিত আছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিঃ
দৃশ্যতে ।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্ম স্বয়ং
বদেৎ ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাস্থাপনা ন সাধবো
ভাগবতান্তদাশ্রয়াঃ ।
ন বক্ত যজ্ঞেশকথা-মহোৎসবা সুরেশ
লোকোপাশ্রয়ৈ ন সেবাতাং ॥
সদাঃ সন্তিঃপথিপুনঃ সিন্দোদর কতো-
দ্যৈমঃ ।
আস্তিতো মরমতে যজ্ঞবেক বিংশতি
পূর্ববৎ ॥
অনার্যসেন মৰণং বিনা দৈতেন জীবনং ।
অনাবাসিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥
মাতা চণ্ডাল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে
চণ্ডালঃ † অতিক্রম কবে এবং বিপ্র
কৃষ্ণনামবিহীন হইলে বিপ্র হইয়া যায় ।
কালচক্র কৃষ্ণ লেবকের নিকটে যায় না ।
কৃষ্ণসংক কৰ্ম্মফল-হৃদয়জিত পুনঃপুনঃ
জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাতীত* কৃষ্ণভক্তি বিহীন
মমুষ্য স্বীয় কৰ্ম্মফলে পুনর্বার গর্ভযন্ত্রণা
সহ কবে; গর্ভে সপ্তম মাসে তাহাব

† “চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ * *”

এইরূপ শাস্ত্রবাক্য চৈতন্য এতদিনে
জীবন পরিণত করিতে আরম্ভ কবিতা
ছিলেন ।

*চৈতন্যের এই বাক্য বেদান্ত বিবোধী
বৈষ্ণবদিগের এই মূলমত ভাগবতমূলক ।
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন “ভক্তি
পরিভ্যাগ করিয়া যে জ্ঞানমাত্র লইয়া
ব্যস্ত, সে যে কষ্ট তত্ত্বল পরিত্যাগ করিয়া
তৃষণাত গ্রহণ করে তাহাব তুলা ।”

জ্ঞানোদয় হয় এবং তখন বৃথা ধারাস্রুতের
জন্য জীবনে পাপানুষ্ঠান কবিতাছে এতজ্ঞ
অনুতাপ করে † কিস্তি ভূমিষ্ঠ হইলেই
মায়াতে সমুদয় বিমূর্ত হয়, পুনর্বার কৃষ্ণ-
বিহীন জীবন যাপন কবিতা গর্ভযন্ত্রণা
সহ করে ‡

অতএব মতিঃ ।

—ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি ।

মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥

ভক্তিহীন কৰ্ম্মে কোন ফল নাহি পায় ।

চৈতন্যের মাতা ও শিষ্যবৃন্দ এইরূপ
ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ
করিয়া তাদৃশ জ্ঞান ও কৰ্ম্মকাণ্ড প্রধান
সময়েও ভক্তির পক্ষপাতী হইলেন ।
এবং অনতি দীর্ঘকালে চৈতন্যের আলয়
এক নবীন বেশ ধারণ করিল । অনবরত
বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন ।
কেহ বা ভাগবতাদি গ্রন্থ তাললয়যুক্ত
স্বরে উচ্চারণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমো-
হিত কবিতেন । কেহ বা হরিনাম
কীর্ত্তন করিতেছেন । কেহ বা প্রেম
পুলকিত হৃদয়ে লোমাক্তিত শরীবে নৃত্য
করিতেছেন ।

এইরূপে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসে বিগলিত
হইয়া হৃদয়েব আনন্দে হরিনাম*কীর্ত্তন
করিয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন ।
চৈতন্য কৃষ্ণ ভক্তিরসে অভিযুক্ত হইয়া
তদ্ব্যয় প্রাপ্ত হইলেন । সকল বস্তুতেই
কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, সকল কথা-

† এটী পৌরাণিক মত ।

‡ চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ।

বই উত্তর কৃষ্ণ। শিষ্যগণ পাঠ লইতে আসিল, প্রভু প্রত্যেক শ্লোক ও কথার অর্থ কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার ভাবিল প্রভু বাতিকাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে সমবেত হইয়া পরম গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের* নিকট গমন করিয়া সমুদয় নিবেদন করিল।

গঙ্গাদাস অপরাহ্নে চৈতন্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, বৎস! অজ্ঞানচ্ছন্ন ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার পূর্বপুরুষেরা পণ্ডিত অথচ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ধভক্তিপরবশ হইয়াছ, অত্যন্ত বয়সে ব্যাকরণ মাত্র সমাপ্ত করিয়া চতুশ্চাঠী পরিত্যাগ করিলে। তোমার এক্ষণে জ্ঞানোপার্জনের সময় যায় নাই, তুমি অধ্যয়ন কর। চৈতন্য তাঁহার ভৎসনে ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “গুরুদেব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অদ্য হইতে জ্ঞানোপার্জনে মনোভিনিবেশ করিব, দেখিব নবদ্বীপে কে আমার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে।”

* পূর্বেই বলা হইয়াছে ইনি চৈতন্য দেবের শিক্ষক।

চৈতন্য ক্রমাগত ২৩ বার একথা বলিলেন। ইহার অর্থ কি? তিনি তরুণ-বয়স্ক। নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমাজ। এক একজন আজন্ম বৃদ্ধকাল শাস্ত্রালোচনার কাটাইয়াছেন। চৈতন্য কি সাহসে তাদৃশ পণ্ডিতগণের সহিত আপনাকে সমকক্ষ মনে কবিয়াছিলেন। বোধ হয় ইদানীং তিনি সত্য সত্যই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহসে এরূপ অসমসাহসিক উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। অজ্ঞানচ্ছন্ন-অন্ধ বিশ্বাসী লোক যখন কল্পনাবলে ধর্ম্মজগতে বিচরণ করে, তখন কল্পনা তাহাদিগের নিকট যে চিত্র আঁকে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে। চৈতন্যও হয় ত এইরূপ কল্পনাপরায়ণ হইয়া বলিয়াছিলেন “দেখিব নবদ্বীপে কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করে।” কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সত্য সত্যই ঈশ্বর ধার্মিক লোকদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যা-দেশ করেন বা না করেন, তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিতে করিতে মনোবৃত্তি যেকপ পরিচালিত হয়, তাহাতে অশেষ উন্নতি হয়।(১)

(১) সার আর্থর হেলস্ সংসারী লোক (Man of business) শীর্ষক প্রস্তাবে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে झल আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য স্মৃতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। স্মৃতি কুমতির বিবাদ বিষবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু স্মৃতি কুমতির সম্ভাব অতিশয় বিপত্তি-জনক। তখন স্মৃতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি স্মৃতির রূপ ধারণ করে। স্মৃতি কুমতির কাজ করে, কুমতি স্মৃতির কাজ করে। তখন কে স্মৃতি কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে স্মৃতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক, কুমতি হউক স্মৃতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অঙ্ককার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অঙ্ককার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্ আমার পুবা-তন কথা তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে, অতি গোপনে প্রণয়সক্ত হইলেন।

কেন যে এতকালের পর, তাঁহার এ দৃশ্য হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি

না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বাণককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্র আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহাৎ ঘট-য়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি—সেই ছুট কোকিলের ডাকাকাকি, সেই বাপী-তীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্তরাচারণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যা-পিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীব মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না,—আমি যেমন ঘটনাতে তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, এক বাবেই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দ-লাল যুগান্তে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখন তাহার জায়া মাড়াইবে না। হয় ত প্রাণেব বাহির করিয়া দিবে। কাহাও কাহাও, এ কথা বলিবার নহে! রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুকায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবন ভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্ট-

দায়ক হইল। রোহিণী মনে২ রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা বাথে? আমাব বোধ হয়, যাহাবা সুখী, যাহারা দুঃখী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক সবলতার সহিত মৃত্যু কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখ নয়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখিজনে মৃত্যু কামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কাব কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, সে মরিতে চাহে না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহাব চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে, মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীবিদ্রোহ, অকস্মিক ঔষধভ্রঞ্জে, এ নম্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিষ কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধ বিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কর

হইল—হরলালের বশীঃ ৩ ২০০ গো-বিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ কবিয়া তাহার সর্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পাবে না—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে কি কাহারও দয়া বলাইলেই হইল যে মহাশয়েন উইল চুরি গিয়াছে—দেবাজ থুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেগুন। বোহিণী যে চুরি কবিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই • জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি বক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে কে উইল চুরি কবিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবে যে ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেবাজে যে জাল উইল আছে ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব অর্থলোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্টসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুদাতাত্তে বক্ষামু-রোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল

চুবি কবিতা জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে। এইরূপ অভিসন্ধি কবিতা, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হবি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেষ্ট স্থানে সুপাহুসন্মানে গমন করিল। নির্দোষ কালে, রোহিণী সন্দর্ভ, প্রকৃত উইল খানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কী দ্বার বন্ধ; সদর ফটকে যথায় দরবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে অর্দ্ধ বুদ্ধকণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দরবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুই?” রোহিণী বলিল “সখী।” সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, স্ততরাং দরবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নিক্ষিপে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, পূর্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—হরির কণায় পথ সর্বত্র মুক্ত। প্রবেশ কালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল, যে অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ কবিতা প্রথমেই দীপ নিক্ষেপিত করিল। পরে পূর্বমত চাবি সংগ্রহ

করিল। এবং পূর্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেবাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, চক্ষু অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি কিবাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, যে কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন, যে নাসিকা গর্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “কে ও?” কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার করা হয় না। রোহিণী মনো ভাবিল, “দুষ্কর্মের জন্ত সে দিন বে সাহস কবিতা ছিলাম, আজি সংকল্পের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।” রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া উপাধানতল

হইতে অগ্নিগত দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেবাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি কে?”

বোহিনী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, “আমি বোহিনী।”

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?” বোহিনী বলিল

“চুরি করিতেছিলাম।”

কৃষ্ণ। রজ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, একথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

বোহিনী বলিল, “তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার সম্মুখেই কবি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধবা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।”

এই বাক্যে বোহিনী, দেবাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেবাজ টানিয়া খুলিল। তাহাব ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড করিয়া ফাড়া ফেলিল।

“হা ও কি ফাড়া দেখি দেখি।” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিল কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে, বোহিনী সেই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “ও কি পুড়াইবে?”

বোহিনী, “একখানি কৃত্রিম উইল।”

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল। উইল। আগাব উইল কোথায়?”

বো। আপনার উইল দেবাজের ভিতর আছে আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত।”

কৃষ্ণকান্ত তখন দেবাজ খুলিয়া, দেখিলেন একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চসমা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিলেন, তাহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি পোড়াইলে কি?”

বো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল? জাল উইল কে করিল! তুমি তাহা কোথা পাইলে?

বো। কে করিল তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেবাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান আনি-

লে সে দেবরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে!

বো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কু। কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎ কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন,

“যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল বক্ষা করিব কি প্রকারে! এজাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পব ধরা পড়িয়া, ভয়ে জাল উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিয়াছ? ঠিক কথা কি না?”

বো। তাহা নহে।

কু। তাহা নহে? তবে কি?

বো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার বধে চোবের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কু। তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই। নহিলে এপ্রকারে চোবের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিবনা কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজি তুমি কয়েদ থাক।

বোহিনী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

বেদ ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং তাহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র সংকলিত হইয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমাত্য করিলে হিন্দুধর্মের জীবন নাশ করা হয়, তরাং সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বিগণের বেদ অমাত্য করিবার অধিকার নাই। জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবেল, কি খ্রীষ্টীয়ানি, খৃথিবীর সকল প্রকার ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয়

পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্বারা তাহাকেই বেদ কহে। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই ৩ বেদের উল্লেখ আছে যথা—

অহে বৃষ্ণি মন্ত্রংমে গোপায়া য মৃষয়
ত্রয়ী বেদা বিহুঃ ঋচো যজুংষি সামানি ॥

ভগবান্ মহু কহেন—

অগ্নিবায়ু রবিভাস্ত্র ত্রয়ং ব্রহ্মা সনাতনং ।

হৃদোহ যজ্ঞ দিক্কার্থ যুগ্মযজুঃ সামলক্ষণং ॥

অর্থাৎ—“তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য
সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্
বেদ, যজু হইতে যজুর্বেদ, এবং সূর্য্য
হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।†

উপনিষদেব সময় চাবি বেদ প্রচলিত
ছিল. যথা

“তস্মৈত্যস্য মহতোভূতস্য নিবসিত

মেতদাদৃগ্বেদো

যজুর্বেদঃ সামবেদো ঋক্, অরস ইত্যাদি”

অর্থাৎ

প্রস্তাবিত পবমান্না হইতে নিখাস
যেমন পুরুষেব প্রযত্ন বাতীত বহিগত
হস্ত, সেইকপ ঋক, যজু, সাম, অপর্কাদি
রস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম
অথর্ব চাবি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য
মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
ভাগবত, হবিষংগ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চাবি
বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাঙ্ক। মন্ত্রগুলি
সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট
ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্য ও ব্রাহ্মণভাগ
গদ্যে বচিত। ব্রাহ্মণ শব্দেব অর্থ বেদেব
ব্যাখ্যা যথা পানিনি “ব্রাহ্মণো বেদস্য
ব্যাখ্যানম” এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীক্ষমান
হইতেছে, অণে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে
ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না
ব্যাখ্যা পবেই হইয়া থাকে।

† পণ্ডিত ভবতচন্দ্র শিবোমনি কর্তৃক
অনুবাদিত। মনু সংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

বেদবাণী সকল তিন শ্রেণীভুক্ত।

লৌকিক বাকা সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য,
গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চাবি প্রকাষ
নাই। বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত
এই তিন শ্রেণীেব রচনা আছে। পদ্য
গুলি ঋক, গদ্য ভাগ যজুঃ, ও গীত
ভাগ সাম যথা—ঐমিনী হৃজ “তেষা
যুগ্মযজুর্ভবশেনপাদবাবস্থা” “গীতিষু
সামাখ্যা” “শেষে যজুঃ শব্দঃ।” যজুঃ
আব একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য।
অথর্ব বেদেব স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই,
অপর তিন বেদেব কোনও অংশ লইয়া
অথর্ব নামক ঋষি ঐহা প্রচার করেন।
এই বেদ যাগ যজ্ঞেব উপকাযী নহে, ইহা
সাংসাযিক ব্যবস্তার উপকারী “অথর্বো
দেবানাং প্রথমঃ সন্তুভ” ইত্যাদি উপ-
নিষৎ চর্চা করিলে প্রতীত হইবেক।

ঐমিনী বেদকে পৌরাষের অর্থাৎ
পুরুষ নির্মিত বলেন না, ঈশ্বর নির্মিতও
নহে। তাহাব নতে বেদের নির্মাতা
কেহ নাই। শব্দ অর্থ ও তদুত্তরের সম্বন্ধ
(বোধ্য বোধক জাব) নিষ্ঠ্য। মনুষ্যের
কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনি মাত্র, তাহার
নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য।
আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপ বিশেষ
আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া
থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও
প্রযত্ন ভেদে, মনুষ্যের বাক্ যন্ত্রের তার-
তম্যাহেতু, শব্দ প্রকাশক সঙ্কেতে ধ্বনি
ভিন্ন প্রকাষ হইয়া যায়। আমি বলি-
লাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর

একজন ধ্বনি কবিতা দ্বারা সক্ষম
লেবই এক। একজন নন্দিত মাতব
একজন বলিল ম', আর একজন বলিল
“মাতাবি,” অপবে বলিল “মাদাব,”
উহাত সবলেবই সেই জননীবোধক শব্দ
প্রকাশ করিব প্রয়াস পাঠিল। এই মর্মে
জৈমিনী মীমাংসাব প্রমাণ পাদে কহিয়া-
ছেন “ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্যার্থেন সঞ্চ-
স্তস্যন্তান মুপদেশোহবাতিরেকস্চার্থেভূপ-
লজ্ঞে তৎপ্রমাণং বাদবায়ণস্যানপেক্ষ-
ত্বাৎ,” (১ম পাদ ৫ সূত্র) এই সূত্র হইতে
উহাব অনন্তব ৩১ সূত্র পর্যন্ত সমুদায়
সূত্র শব্দ সম্বন্ধে বিচার কবিয়াছেন।
অপিচ উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ
কবিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত
কল্পনা কবায়, লৌকিক শব্দ অনেক
বাল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোক
কৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই।
লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না
পুরুষে উহাব সঙ্কেত কবিয়াছে। বৈদিক
শব্দ বাহ্যেও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত
হয় নাই, কেন না উহাব সঙ্কেতকর্তা
কেচ দৃষ্ট হয় না, অস্মিতও হয় না।
“বেদান্তৈশ্চৈকৈ সন্নিবর্ষ্য পুঙ্খাখ্যা (২৭
সূত্র) “অনিত্য দর্শনাচ্চ” (২৮ সূত্র)
সাবস্বতং সূত্রং (অর্থাৎ সবস্বতী প্রণীত)
কঠ শাখা—কঠ নামক ঋষি প্রণীত
শাখা, এইরূপ পৈপল্যাদিক, মোচল,
প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবচনা এবং
“ববব প্রবাহনী ববাময়ত,” “ঔদ্ধালকি
বকাময়ত,” এই সকল ব্যক্তি ষড়িত

সাংখ্যিকা দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষে
বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্র
দ্বারা বেদ, পুরুষনির্মিত এবং বেদেব
বিষয় বিশেষ ও অনিত্য অর্থাৎ নৎকিঞ্চিৎ
ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব পক্ষ
কবিয়া পরিশেষে “উক্তস্ত শব্দ পূর্বতঃ
(২৯) “আখ্যা প্রবচনাৎ” (৩০) ইত্যাদি
সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসেব ব্যাখ্যাত
জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারেব সং-
ক্ষেপ মর্ম্ম এই যে কঠিক প্রভৃতি আখ্যাম
কেবল কঠাষি উক্ত প্রথমে বা প্রাধান্য
ক্রমে অনুষ্ঠান কবিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ
সমাখ্যান হইয়াছে। সাংখ্যিকার কপিল
“নত্রিতিবপৌরুষেষয়ত্বাদেদস্য তদর্থশ্রী-
তীজ্রিয়ত্বাৎ” (৫ অ ৪১ সূত্র) এই সূত্রে
আবল্ল কবিয়া “ন পৌরুষেষয়ত্বং তৎ
কর্তৃঃ পুঙ্খস্য সন্তবাত্” (৫ অ ৪৬ সূত্র)
এবং অজ্ঞাত বহুতব সূত্রদ্বারা নানা প্রকার
আশঙ্কা উদ্ভাবন কবিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত
কবিয়াছেন, যে বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধি
দ্বারা নির্মাণ কবে নাই, চিবকালই আছে
—তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম
শরীরী হন অর্থাৎ হিবণ্যগর্ত বা ঐক্ষা
প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রতি-
বুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্বার তাহার জাগ
তিক পদার্থ ভাণ হয়, সেইরূপ বেদ
তাঁহাব ভাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ যেমন
শ্বাস প্রশ্বাস উচ্চারণ এবিতে বুদ্ধি বা
যত্ন অপেক্ষা কবে না, সেইরূপ বেদ
উচ্চারণ কবিতও তাঁহাব বুদ্ধি বা যত্ন
অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ

বলেন গৌতম বশেন বেদ জন্য রটে
কিন্তু তাহা প্রমাণ অযোগ্য নহে, কেন
না ভ্রম প্রমাদাদি বহিত আপুরুষ ইহার
বক্তা। ‘মন্ত্রাযুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ
প্রামাণ্যম্’ এই ক্ষুদ্রাক্ষরী বেদের প্রা-
মাণ্য পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। “মন্ত্র
ও আযুর্বেদ” গৌতম যদিও স্পষ্টাভি-
ধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে
তাঁহার ঈশ্বর প্রণীত বলা হইয়াছে।
তাঁহার মতে তাদৃশ আপুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত
আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিরও
এই মত। আন্তিক আর্ঘ্য গ্রন্থকার
দিগের মতে আপৌরুষেয় বাক্যের নাম
বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার
করেন না।

এসকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া
যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক
বৈদিক ঋষিগণই স্তোত্র প্রণেতা। তাঁহা-
রাই আপনার অভীষ্ট সাধনের জন্য
দেবতাদিগের নিকট চন্দ্রোযুক্ত স্তোত্র
লইয়া গমন করিয়াছিলেন যথা—“অর্থ
পশ্যাব ঋষয়ো দেবতাশ্চন্দ্রোভিরভ্য-
ধাবন্।” বৈদিক স্তোত্রানিচর এক সম-
য়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে ঋষিগণ
দ্বারা এক এক অংশ রচিত হইয়াছে।
বর্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করি
তেছি, বাসেব পূর্বে তাহা একপা ছিল
না। পবানব নন্দন কৃষ্ণ দৈপায়ন কুরু
পাণ্ডব দিগেব যাক্রব পব সমুদায় বেদ
সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন,
এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে।

তিনি চারিজন শিষ্য ১০০০ বেদ উপ-
দেশ দিয়াছিলেন যথা—বহুব্রূচ নামক
ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজু-
র্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, চন্দ্রোম
নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনীকে,
এবং আঙ্গীবসী নামক অথর্ক সংহিতা
হুমন্তকে, শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে
লিখিত আছে “পৈল স্বীয় সংহিতা দুই
ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাঙ্কলকে
কহিলেন এবং বাঙ্কল তাহা চূতর্ধা বিভক্ত
কবিবা বোধ্য, যাজুবক্য, পরাশব ও অগ্নি
মিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন
এবং ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডকেয়
ঋষিকে ও মাণ্ডকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র
সৌভর্যাদিগকে অধ্যয়ন কবাইলেন।
পরে মাণ্ডকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সং-
হিতাকে পাঁচভাগ করিয়া বাস্য, মুদগল,
শালীয় গোথল্য, ও শিশির নামক পাঁচ
শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের
শিষ্য জাতকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচভাগ
করিয়া নিরুক্রের সহিত বলাক, পৈল,
জাবল, ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা
দিলেন। পবে বাঙ্কলের পুত্র বাঙ্কলি
উক্ত সর্ক্সাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক
খানি বালখিন্য নামক সংহিতা প্রস্তুত
করিলেন, এবং বালায়নিভজা ও কাশার
এই তিন দৈত্য তাহা ধাবণ করিল”†
ঋগ্বেদ সংহিতার সাকল্য শাখা প্রচলিত।

† পণ্ডিতবর ৬ আনন্দচন্দ্র দেবদাস-
বাগীশেব অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুন্যায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১ ৪১৭ খণ্ড দৃষ্ট হয়। অনামত ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অম্ববাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সতস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্বশুদ্ধ ১৫০৮২৬ পদ বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত “চবণ-বৃহ” গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এসময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সূতবাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাখ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ৫ টি কবিষা অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাখ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য।

যজুর্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। হঠাৎকৈ তৈত্তিরীয় ও বাজসেনেয়ী সংহিতা কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যান্নিন ও কশ্যপ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্বেদের ৭৩ পথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যান্নিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত, ও ইহার ব্রাহ্মণের টীকা-কার মায়নাচার্য্য।

সামবেদ গংহিতা পুষ্ক ও উত্তর ভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রানায়ন। সাম বেদের ৮ খানি ব্রাহ্মণ আছে তাহার নাম যথা—প্রৌঢ় বা পঞ্চ-বিংশ, ষড়্ বিংশ, সাম বিধান ব্রাহ্মণ, আর্গেষ, দেবতাধায়, বংশ, এবং সংহি-তোপনিষদ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই ৮ খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হিন্দু সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় ১২ স্বন্ধে লিখিত আছে “অথর্কবিৎ স্মমন্ত কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন কবাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ কবিয়া পথ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিষ্য-দ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চাবিশিষ্য মৌকায়নি, ব্রহ্মাবলী, মোদোষ পিপ্পসনি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও ভাজলি ইহা বা সকলেই অথর্ক বিৎ। অঙ্গিবার পুত্র শুনক স্বীয় সং-হিতাকে দুই ভাগ কবিয়া বক্র ও সৈন্ধ-বায়নকে প্রদান কবিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সার্বণি প্রভৃতিবাও পবে তাহা গ্রহণ কবিলেন। পবে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যাপ ও অঙ্গীদস প্রভৃতি সকলে অথর্কবেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।”† অথর্কবেদের সৌনক শাখা মাত্র বর্তমান আছে। ইহার ২০ কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত

† শ্রীমদ্ভাগবত ৬ আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশের অনুবাদিত।

হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাক্ষের নিরুক্ত অমুসাং বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত বিরুক্ত বেদ ব্যাখ্যা বৃহ মণ্ডলীর অপাঠ্য। যাক্ষেব পূর্বেও বেদ শব্দের নিরুক্ত বর্তমান ছিল, তাহা যাক্ষই বলিয়া গিয়াছেন যথা— “স্বলোষ্ট্রীর্গুরুপয়তি ন স্নেহয়তি—ত্রিভা আখ্যাতোভ্যো জায়তে ইতি শাক পুনিঃ—উর্ণনাভনামকো মুনির্জুহোতি ধাতো-ক্লেপন্নো হোতৃশ বেদা মন্যতে” স্বলোষ্ট্রীবি, শাক পূর্নি, উর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকায় যাক্ষের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আমবা যাক্ষ মুনির নিরুক্তেব সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা—প্রথমতঃ দেবতা ছই শ্রেণী—যাগাক্ষ দেবতা এবং স্তোত্রাক্ষ দেবতা। স্তোত্র বা শব্দ + যাত্রার ঞ্ণ মাহাত্ম্যাদি বর্ণনা পূর্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাক্ষ দেবতা। যজ্ঞ কালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি বাহ্য দেব উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাক্ষ দেবতা। ঋক্ সং-হিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও

+ স্তোত্র এবং শব্দ উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ, যে গীতের উপযুক্ত মন্ত্র দ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসা কবা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র আব যাহা গীতের অমুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শব্দ।

বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম কণ মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শব্দাক্ষ না যাগাক্ষ, কেবল পূজা বা উপাসনার অমুকমজ প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত পৌরানিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ কবিরাব আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতেই পাঠক বর্গ বৃত্তিতে পারিবেন।

অগ্নি, + বায়ু, ইন্দ্র বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, ঐবশ্বদেব, সাবস্বত, মরুৎ, অগ্নি বিষোষ, (সুসমিক্ত, ইতীশ্ব, সমিক্ত বাগ্নি, তনুনপাৎ, নবশংস, ইল, বহি দেবী, দ্বার, উজাসো, নক্তা.) *দৈব্যা, হোতৃবৃগ-ন, প্রচেশা দ্বয়, সবস্বতী, লান্তা-রতা, দ্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহারুতি, বৃহ-স্পতি, মিত্রাগ্নি, পুষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্য বিশেষ) মরুদগণ, ত্রক্ষাগস্পতি, সোম, সদ সম্পতি, নারায়ণী, দক্ষিণা, ঋতু, সবিতা, দ্য, বিষ্ণু ‡ অপ, ইন্দ্রানী,

+ “অগ্নিবৈদেয়া তদৈত্যানি নামানি—সর্ব ইতি প্র চা অচক্ষত-তব ইতি যথা বাহিক পশুমাংসপতি রুদ্রোহগ্নিরিতি তাত্ত স্যাসক্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্ত্যাত্ম ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

‡ অহো দেবা অবন্তনো যতো বিষ্ণু-বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তরামতিঃ। ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমুত মসা পাংসুবে। ঋক্বেদঃ ১৩, মণ্ডলং। এই স্তোত্র পৌরানিক চতুর্ভূজ বিষ্ণু বুঝা ইতেছে না। যাক্ষ ঋষি ইহাব অর্থ করিতেছেন “বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি

পৃথিবী, অঙ্গারী, বক্রগানী, লৈঙ্গবী, প্রজা-
পতি, উলুখল, মূবল, হবিশ্চন্দ্র, অধিবন,
উনঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে।
এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ,
বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, গুনঃশেপ,
হিৰণ্য তুপ, সবা, গোতম, অশ্বিনস,
প্রসন্ন, কন্ব, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুংস,
প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক গায়ত্রী, উষিক,
অমৃৎপ, ত্রিকুপ, জগতী, অবজ্রোবৃহতী,
প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হই-
য়াছে। ঋকবেদের একটা স্তোত্র নিয়ে
অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্দ্র ।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব গুণাকর।
তব স্তুতিচয় যোরা নিরন্তর
মধুব সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুব, নবীন গাণায়
বাতংবে দেবের মানস ভুলায়,
—সহজে বুড়'য় তাপিত প্রাণ।

২

এস ১ দেব ছাড়ি স্বব পূব
সুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুব
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—

সপাচকঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিবন্তে পদং
নিধানং প।”

১৮

এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অত্রি উৎসেয় সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
সুদ - করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস ১ ইন্দ্র এমর্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমান পথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিশ্বয় উৎফুল্ল লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণ রথে।

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্ন বাজনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধ দ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার—
(দেবের হুল্লভ অপূর্ব ধন)
করযোড়ে যোরা তোনারে আহ্বান,
করিতেছি শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমবা এখন
লয়েছি তোমার চরণে শ্রবণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোম রস করিয়া পাণ।
জয়ং দেব বজ্রনাদ কর
বিপক্ষের ভয় আমাদের হয়—
তব বশ যোরা করিব গান।



কালিদাসের উপমা ।

রঘুব পুত্র অজ, ঠিক পিতাব মত
হইলেন ।

রূপঃ তদোজ্জ্বলি তদেব বীৰ্য্যঃ
তদেব নৈসর্গিক মুদ্রতত্ত্বম ।
ন কাবলং স্বাদ্বিভিদে কুমানঃ
প্রবর্তিতোদীপতৈব প্রদীপাং ॥

সেই উজ্জ্বল রূপ, বীৰ্য্যও সেই,
নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে
উৎপাদিত প্রদীপের ন্যায় কুমার পিতা
হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন নহে ।

ইন্দুমতী স্নেহে, দোবাবিকী ইন্দু-
মতীকে এক রাজার নিমিত্ত হইতে অন্য
রাজার কাছে লইয়া যাঠেছে ।

তাং মৈব বেজগ্রহণে নিযুক্তা
রাজাস্তরং রাজসুতাং নিনাম ।
সমীরণোথৈব তরঙ্গলেখা
পদ্মাস্তরং মানসরাজহংসী ॥

সেই বেজ গ্রহণে নিযুক্তা (দোবাবিকী)
ইন্দুমতীকে সমীরণে উথিত তরঙ্গলেখা
যেমন মানস রাজ হংসীকে পদ্মাস্তরে
লইয়া যায় তদ্রূপ অজ রাজার কাছে
লইয়া গেল ।

সেবাব স্তনন্দা ইন্দুমতীকে অঙ্গেশ্বরের
নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয়
দিতে লাগিলেন ।

অনেন পর্য্যায়তাপ্রবিদ্ধন
মুক্তফলস্থলতমান্ স্তনেষু ।
প্রতাপিতাঃ শক্রবিলাসিনীনা
মগাচ্য স্ত্রেণ বিবেব হারাঃ

ইনি শক্র-...

ফলসং স্তনঃ

কবিষাং চেন । যেন ...
কাড়িয়া লইয়া স্ত্রবিলাসী প্র-
সাছেন ।

স্তনন্দা ইন্দুমতীকে যে বাজার বাজ
লইয়া যান, ইন্দুমতী তাহাকেই পরিভাগ
করিয়া যান ।

সঞ্চারিণী দীপশিখৈব বাত্রৌ
যং যং বাতীযায় পতিষ্ববা সা ।
নরেন্দ্রমার্গাটু ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ১

কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে পাজ-
পথস্থিত প্রসাদাবলীর নিকট দিয়া
বাইলে স্তনন্দার প্রদীপের সহিত ইন্দু-
মতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন ।

বাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা বাজ
মার্গস্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন
করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন স্তান
দেখায়, পতিষ্ববা ইন্দুমতী যে যে বাতাকে
অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, সেই সেই
বাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব ধারণ করিলেন ।

পরে ইন্দুমতীর সহিত অজের পরিণয়
হইবে, তাঁহারা অযোধ্যাগমন করিলেন ।
কালক্রমে ইন্দুমতীর মৃত্যু সময় উপস্থিত ।
রাজা অজ এবং বাক্তী ইন্দুমতী পুষ্পো-
দ্যানে বিহাব করিতেছিলেন ।^১ এমন
কালে দেবযি নাবদ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে
বীণাবজ্রযোগে মহাদেবের স্ততি, ... ক-

কণিকা গমন করিতোছেন। অর্গীর
কুমুদাদ্যে তাঁহার বীণাদয় শোভিত
ছিল। দৈববাৎ পবন চালিত হইয়া সেই
দিবা মালা বীণাহৃতে স্থলিত হইয়া
ইন্দুমতীর স্তন্যগ্রভাগে পতিত হইল।
সেই মালাঘাট্টে ইন্দুমতীর মৃত্যুর কারণ
হইল।

ক্ষণমাত্র সখীঃ সজাতয়োঃ

স্তনয়ো স্তামবলোক্য বিহ্বলা।

নিমিষমীল নরোত্তমপ্রিয়া।

দ্রুতচক্রে তমসেব কৌমুদী ॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী
সেই মালা দৃষ্ট করিয়া বিহ্বলা রাজমহিষী
রাজগ্রন্থ চক্ষুরিরণের দ্বারা নিমীলিত
হইলেন।

বপুষা করণোজ্জ্বলতেন সা

নিপতন্তী পতিমপাপাতয়ৎ।

নমু তুলন নিবেক বিন্দুনা

সহ দীপ্তার্চি কপৈতি মেদিনীং ॥

ইন্দুমতীর ইঞ্জিয়চেষ্টাশূন্য শরীর প-
তিত হইল এবং স্বামীকেও পাতিত
করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখায় নিষিক্ত
তৈলবিন্দু দীপ্তার্চি সহিতই ভূতলে পতিত
হইয়া থাকে।

ইন্দুমতীর মৃতদেহ অজের ক্রোড়ে পতিত
রহিয়াছে।

পতি রক্ষনিষল্লয়া তয়া

করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।

সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং

মৃগলেশ্ব নৃষদীব চক্রেমা ॥

প্রাণবিনাশ হেতু স্নান, ক্রোড়স্থিত সেই
ইন্দুমতী কর্তৃক অজ উষাকালে স্নান

মৃগচিহ্নধারী চক্রেমন্যায় দৃষ্ট হইয়াছি-
লেন।

অজ ইন্দুমতীজন্য বিলাপ করিতে ২
বলিহেড়েন।

অথবা মৃতবস্ত্র হিংসিতং

মৃত্তনৈবারভতে প্রজাপ্তকঃ।

তিনবেক বিপত্তি রত্নমে

নলিনী পূর্ব নিদর্শনং মতা ॥

অথবা প্রজানাশক কাল কোমল বস্ত্র
হিংসাজন্য কোমল বস্ত্রই অবধারিত করি-
য়াছেন। হিংসাপাতে বিনশ্বর কমলই
আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মমভাগ্য বিপ্রবাৎ

দশনিঃ কল্লিত এষ বেধসা।

যদনেন তরুণপাতিতঃ

ক্ষপিতঃ তদ্বিটপাশ্রয়ালতা ॥

কিষ্ণা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধাতা
এই পুষ্কলালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়া-
ছেন। যে হেতু এই বজ্রদ্বারা আশ্রয়
রক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা
লতা বিনষ্টা হইল।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং

তব বিশ্রান্তকথং জনোতি নাং।

নিশি স্তপ্ত মিবেকপঙ্কজং

বিরতাত্যস্তর ষট্পদস্বনং ॥

বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হই-
তেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ
রাত্রিকালে প্রমুদিত স্তম্বরং অভ্যন্তরে
ভ্রমর গুঞ্জনরহিত একটা পদ্মের ন্যায়
আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

ক্রেমশঃ

বেদ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। “ইন্দ্র” এই শব্দই দেবতা। তত্ত্বিন্ন “ইন্দ্র” এই শব্দের অর্থ সহস্রাঙ্গাদি যুক্ত কোন জীব নাই। যাগ কালের দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যে ভূত দেবতাব “ঈন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র মাত্র। মীমাংসা দর্শনের যষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে। “ফলার্থত্বাৎ কৰ্ম্মণঃ শাস্ত্ৰং সৰ্ব্বাধিকারং জ্ঞাৎ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। স্বত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তজ্জপ একটি বাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজ্ঞমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অশ্বাদিদের অপ্ৰত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার অন্যত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্বত্রই অধিষ্ঠান থাকা

উচিত কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, “ঈন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। “বজ্র হস্তো পুরন্দরঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য সকল স্ততিবাক্য মাত্র। জৈমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বেদ পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পবমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতাব রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা ‡ পার্শ্বতীয় লতা বিশেষ। সামবেদীয় ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম যাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনঃ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত

‡ *Asclepias acida*.

বিদ্যাভিষারদ হোগ সাহেব এই লতার
আম্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং
মজ্জতাকারক লিখিয়াছেন + কিন্তু বেদে
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দষ্ট হইয়া
থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোম-
লতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত
হর্ষজনক যথা ঋগ্বেদ—“সৎসালোঃ সালু-
মাক্ষংভূর্য্য স্পষ্টে কত্বং। তদিক্কোচর্গং
চেততি যুথেন বৃষ্টি রেজতি।”

যৎকালে যজ্ঞমান সকল সোমবল্লী
আহরণের নিমিত্ত এক পর্ত্তশিখর হুই-
তে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই
তাহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়।
ইন্দ্র তৎকালে যজ্ঞমানের প্রয়োজন বুঝি-
য়া তাঁহাদেব যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।
“প্রবো মিরন্ত ইদং বোমৎসয়া মাদ-
য়িক্সবঃ।

স্পা গধ্বশ্চ মূষদঃ।” (১ম, ২৬ ব, ৪

অনুবাক ১৪ সূক্ত)

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের
নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে সোম সম্পাদন করা
হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের
হেতু, বিন্দু করিয়া নিষ্কাশিত, অতি
মধুর এবং চমু অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অব-
স্থিত আছে। পুনশ্চ “অশ্বিনৌ পিবন্তঃ
মধু” অর্থাৎ হে অশ্বিনী কুমার মধু মাধুর্য্য
গুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ
সর্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা
আছে, বিশেষ ১৯ বর্গ সোমসূক্ত নামক
ঋক্ সমুহে, সোমের মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা

হইয়াছে। সোমের রস হৃৎকের ন্যায় ও
গাঢ় যথা “সন্তে পয়াংসি সমুচন্ত বাজা”
অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্বোক্ত গুণ
যুক্ত পয় অর্থাৎ কীর সকল তোমাকেই
প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্গ সম্বন্ধে এই
মাত্র উক্ত হইয়াছে “বাজোমুতে বরুণস্ত
ব্রতানি বহস্পাতবং তব সোম ধাম—”
অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের
ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং
গাভীর্ঘ্যযুক্ত। ইহাতে এই মাত্র অনুভব
হইতেছে যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায়
শুদ্ধ। সোমলতার আকার পুতিকা †
(পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার
সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে
পুতিকা লতার বিধান আছে—“সাদৃশ্যে
প্রতিনিধিঃ” শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর
অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্তুজরের গ্রহণ
বিধান করিয়াছেন। সোমভাবে পুতিকা
বিধি যথা—

“সোমভাবে পুতিকানভিযুজ্যং”

(শ্রুতিঃ)

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে
সোমভাবে স্থলে পুতিকা বিধানের অনেক
বাক্য আছে।

সোমতত্ত্ব অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা

যথা—

আপ্যায় স্বমন্দিম সোম বিম্বেন্ভিবংভতিঃ।

ভরানঃ সূক্ষ বস্তমঃ সথাবুযে।

(১৪ অ. ১২ সূক্ত)

† Ant. Br. vol. II, p. 49.

† Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ অতিশয় মদযুক্ত সোম। তুমি তোমার সমুদায় তত্ত্ব দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টি-কারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে যথা—

“গয়ঙ্কানো অমিহা বহুবিন্ধুপুষ্টিবন্ধনঃ”

(১৪ অ, ১১ সূ)

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধি করী, রোগ সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ কবেন যথা—

“স্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষা
মহুনেষি পথাং”

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বৃদ্ধি দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটির। অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাশন করা হইত। ইহা রাধিবার পাত্রকে চমু কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্ম নির্মিত হইত। উহার বস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজা-দিগের নাম পাওয়া যায় যথা “মহুয্য দগ্নে অজিবন্দাজিষো যযাতি বৎসদনে পূর্নবচ্ছুভে।”

বেদের সংহিতা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা

যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদাভ্যুচারী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা পার্থিব অবস্থা, মহুযাগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্তনশীল। সুতরাং সহ-জেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবিস্কৃত হইলে অনির্লক্ষণীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধান বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টা বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১) পার্থিব অবস্থা (২) জীবপ্রকৃতি (৩) তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি (৪) ইহার স্পষ্টতার জন্যে ৪টা কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১) আর্যকাল (২) আচার্য্যকাল (৩) পরাভূত কাল (৪) যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য।

* “ঋচঃ সামানি চন্দাংসি পুরাণং বজ্রম্ সহ” অথর্ক বেদ।

আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (শর্তাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুৰাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূত-কাল, বর্তমান কাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই ৪টি কালের সহিত উপবোক্ত ৪টি বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তন্নিম্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কিনা? অস্তু সন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতার কিস্বা আখ্যেয়া যাহাকে “গো” বলিতেন; তৎকালে অস্তুরেরা তাহাকে “গাবী” “গৌনী” “গোপোংলী” ইত্যাদি বলিত। তাহার শব্দদিগকে “হে অবয়!” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অস্তুদের “হে লয়” বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অস্তু, তাহারাই মধ্য কালের স্নেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি

“চোদিতস্তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা স্নেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞ কার্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্বোক্ত অস্তুরিক বাক্যকে স্নেচ্ছ বাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। “পিক” “নেম” “সত” “তানবস” প্রভৃতি অনেক গুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্বকালের অস্তু-র বা স্নেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহার কৌকিলকে “পিক,” নামকে ও অর্দ্ধ ভাগকে “নেম,” পদ্যকে “তানবস” বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অস্তু বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে স্নেচ্ছ বলা হয়, তদন্তে স্নেচ্ছ ও অস্তু একপ্রকার অবস্থাস্থিত বলিতে হইবে। তবে “স্নেচ্ছ” এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, “তেহস্তুনা-হেলয় হেলয় ইতি কুর্কস্তুঃ পরাবভূব স্তয়া দ্ব্যাক্ষণেন ন স্নেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ স্নেচ্ছোহবা যদেব অপশব্দঃ” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অস্তু, তাহারাই স্নেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। “না যজ্ঞিরাং বাচং বদেৎ” ইত্যাদি মন্ত্র কাণ্ডে ও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ী-

ভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহাব কয়েকটা নিগূঢ় কাবণ আছে। প্রথমতঃ বর্তমান কালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পাবে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার সংস্থান একক কাব অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আব সেই সকল শব্দদ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধ ঘটনা একক-কার রীতি বহির্ভূত। মনে করুন—“সত্যং তেষা অমবন্ত ধম্বন্ধিদা কদ্রিয়াসঃ। মিহ কৃষন্ত বাতাং।” (ঋগ্বেদ ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠ মাত্রে বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না, না বুঝি ম অন্য কিছু কাবণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐকপ বীতি আমরা কখন অহুভব করি নাই। “সত্যং” এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে “তেষা” বুঝিলাম না। আমাদের বুজিত + এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধ্যাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে “দ্বিষ্” শব্দের ব্যবহার কবি—তেমনি স্থলে “তেষা” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। “তেষা”

ঐ দ্বিষ্, শব্দই। “অম বন্তঃ” অম শব্দে বল বুঝায়। “অম” এইটী বলব একটী নাম, তাহা আমরা আব শুনিতে পাঠি না ততবাং বুঝিতেও পারি না। “ধম্ব-ন্ধিদা” “ধম্বন্” মরুভূমি “চিৎ” প্রাযশঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু “চিদা” এই চিৎ শব্দের পরে আকাব থাকতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত “অবাতাং” শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমস্তাং। এইরূপ অর্থ হইবে। ইত্যাদি পূর্বে ব্যাকরণে ছিল না।

“বৃহস্পতি রিদ্ভার দিবাং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচনাস্তং জগাম।” এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্বেকালে চীন দেশীয় বর্ণমালাব ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কোশল সম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—জর্গং নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই ৪ জাতি শব্দ। “চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো-হস্য পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোহস্যা। ত্রিধা বন্ধো বৃষভো বার বীতি মহো দেবো নর্ত্তাং আবিবেশ।” শব্দ সমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দেব সহিত পাঠ করিয়া-ছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলিকে উহাতে বৃবরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই ৪ প্রকাব

পদসমূহ ঐ প্রথম শব্দ। ১৮টি কাল তাহাব পদ। সুপ ও ৩৩ তাহাব মন্তক। ৭টি বিভক্তি তাহাব হস্ত। উরঃ ৭র্থ ও মূর্ক। এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দ কার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানা প্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছু কাল পবেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং “ব্যাকরণ” এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্ত গ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষ গ্রন্থ, এ সকলের পূর্ব্বোক্ত ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাক্ষ মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্ব “বৃহৎপলিনী” “উৎপলিনী” প্রভৃতি কোষ গ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। “ব্রাহ্মণ সর্কষ” প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পথায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিনিাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বনেব নাম ২৮ সংগ্রামের নাম ১৫, অপতোব নাম ১৫, বাক্যের নাম ৫৭ ধনেব নাম ২৮ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর

ব্যাবহাব করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম ১০ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম ৫০টি ছিল এখন ৫০টি নাই, এতদূর বিপর্য্য ঘটয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি স্লেচ্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। স্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্ততঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিহুর স্লেচ্ছ ভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিহুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল স্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে যেরূপ আখ্যা শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এই রূপ অর্থ দাঁড়ায় যে স্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই স্লেচ্ছ ভাষা। স্লেচ্ছ ভাষাসম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া স্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্য বশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্য বশতঃ কোথাও বা বর্ণলোপ বশতঃ—স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া স্লেচ্ছ ভাষা নামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাশ্যত পথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন,

তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর স্বেচ্ছাদিগের কথাবার্তা বিভিন্ন। কাল শত পথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়া মিষ্টকামুপধাস্যে”—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ঠট্টকা অধিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল “উপহি” এটা উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত কিন্তু বর্ণ লোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া স্বেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ “তেহসুরা হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ” এস্থলে “হেলয়” এই শব্দেব স্থানে দেবতার বা আর্যেরা “তহমবয়ঃ” প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্যয়ানুসারী স্বেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিককাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্বেও ব্রাহ্মণ ভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্বে বৈদিক-মন্ত্রের বক্তা বুঝাইত, এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। যাহারা যজ্ঞন যাজ্ঞন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্মের প্রচার করিতেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন, পরে

ক্রমে উহা পুত্র পৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় “তব-মুজের বোঁটা সম টাকিশোভে শিরে” ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এষ্ট শাস্ত্রীয় টাকির নাম “বেড়ী।” ইহা ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন প্রকার শিখা রাখাও পদ্ধতি ছিল যথা—

দক্ষিণ কপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়্যাস্তি

কপর্দিনঃ।

আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভগবঃ

শিখিনোহন্যে ॥

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন “নসম্মা বৃত্তাবপেযু বন্যএ বীহারাদিতোকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এব রিক্তোবাণপিহিতস্ত-সোব তদেব পিধানং যচ্চিমো।” অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তি মস্তক আবরণ শূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণ স্থানীয়।

বৈদিককালের আর্যেরা কৃষিকার্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ

আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দুই হস্ত, যজুবেদী ইষ্টকে বিদিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নিৰ্ম্মিত হইত, আদিম কালে অশ্বরেবা অসভাজাতি দৌৰাশ্রয় করিত এবং আৰ্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৰ্কদা যুদ্ধ করিতেন, আব কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজাব দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাষা প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আৰ্য্যজাতির ত্রীহি (ধং) যব, মাষকলাই তিল, ওষধি (শস্য) বীৰুং (লতা) কবস্ত্র (ফল) (“ত্রীহি মথো যব মথো মাস মথোভিলং”) প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল সময়েই তাঁহারা অপূর্ণ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেঘ, মহিম, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোম রস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরা বিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদ

মধ্যে আযাজাতির নানা প্রকার ব্যবসাব উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকই ব্যবসা কার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিম কালে মনুষ্যের আয় ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন সত্য যুগে মনুষ্যের আয় ৪০০ বৎসর, ত্রেতাযুগে ৩০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০ বৎসর কলিতে ১০০ বৎসর; এসকল কল্পনা মাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুরুষের আয়ু শত বৎসর—“ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ঃ পুরুষঃ”—পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে—দেখা যায় আৰ্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন “জীবেমঃ শরদঃ শতম্, অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীৰ্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন “দাতা শতং জীবতু, —দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আৰ্য্যজাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য তৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শ্রীরাম দাস সেন।—

গঙ্গা স্তব ।

ভাগীরথী উপকূলে, আছি গো সকল ভুলো,
ছাড়ি দেও মোবে কলিকাতা ।
তোমায় স্মরণ হ'লে, অঙ্গ মোর জায় জলে,
গঙ্গৈ তুমি নিস্তারিণী নাতা ॥
পরমা প্রকৃতি তুমি, তোমা-কূল পূণ্য ভূমি,
পাপ যায় তোমা দরশনে ।

তাজিৰ যখন প্রাণ, পাদপদ্মে দিও স্থান,
তোমা কূলে কি ভয় মবণে ॥
লক্ষ্মী ত্যজিয়াছে বঙ্গ, তুমি ত্যজ নাই গঙ্গে
তুমি মাতঃ অগতির গতি ।
সন্তান স্নেহের লাগি, দারুণ দুঃখের ভাগী,
বন্দি কৈল কলির ভূপতি ॥

দোধারি তোমার কূলে, তকবাজি হেলে ছলে,
 দেবালয় শোভে জরাজীর্ণ।
 ঘাটে ঘাটে দ্বিজগণ, তপ জপে নিমগন,
 দুই সন্ধ্যা লোকে লোকাকীর্ণ ॥
 বারেক পশ্চাৎ ফিবি, ঘাটে নামে ধীরি ধীরি,
 কুলবালা সলজ্জ বদনে।
 স্নান কবি কেশ ঝাড়ে, হেলায় হৃদয় কাড়ে,
 আড়ে আড়ে চাহে কত জনে ॥
 চরণে হৃদয় দলি, যুবতী গেল ত চলি,
 পদচিহ্ন রহিল যা পড়ি।
 শত শত মনো অলি, বিরহ অনলে অলি,
 তাহে যায় খেদে গড়াগড়ি ॥
 কিকাগু হতেছে পিছু, জানিতে যদি গোকিছু
 কোন্ প্রাণে না চাহিতে ফিরি।
 ভুরুবও ভঙ্গিমাটি, মরণ বাঁচন কাটি,
 গৃহ হাসি বিষের মিছরি ॥
 এসব থাকে না আর, কলে কলে একাকার,
 হইয়াছে গঙ্গাব হুধার।
 গর্জ্জানি ফোঁসানি আর, কালো ধূম উদগাব,
 দশদিক্ করিল আঁধার ॥
 এই ত গঙ্গার কূলে, মহোচ্চ পাদপমূলে,
 বসিয়াছি পূর্বে এক কালে।
 ও পারে জ্বলি দীপ, যেন কনকের টিপ,
 শৈলজার ভুরু অন্তরালে ॥
 সন্ধ্যা ঘুনাইয়া এল, নীল অম্বরের তেলো,
 বিক্ মিক্ করিতে লাগিল।
 কুটির যতেক তরী, সট্ সট্ সট্ করি,
 অমনি চলিতে আরম্ভিল ॥
 সে যে শনিবার রাত্রি, যত কুটিয়াল যাত্রী,
 ছয় দিনে যাপে ছয় বর্ষ।
 পাইয়ে স্নেহের রাত্রি, বেড়েছে বুকের ছাতি,
 ধরায় ধরে না আর হর্ষ ॥

দিব্য তানমান ছাড়ি, স্নেহে ষাইতেছে বাড়ি,
 দাঁড় পড়ে ঝপাস ঝপাস।
 মনেব বেগের কাছে, নৌকাবেগ কোথা আছে,
 হাঁকে মাঝি “সাবাস সাবাস ॥”
 নাক্ত্রীব গীত।
 ওই যে দাঁড়ায় বাই তোমাব শ্রাম
 চাঁদ। ওই সে অধবে হাসি মদন ব্যাধের
 ফাঁদ ॥ আমাপানে কেন ফেরো, আপন
 সম্মুখে হের, প্রেমের ববিষা-নদে সাজে না
 লাজের বাঁধ ॥ এমন নহে ত কালা,
 হাতে লয়ে ফুল-মালা আসিতেছে দেখ
 অই ঘটাইতে পরমাদ ॥
 ওদিকে মেঘের ঘটা, এ দিকে বিজলি
 ছটা। মিলনে কি হয় শোভা দেখিতে
 গিয়াছে সাধ ॥
 এসকল গীত গানে, আর শুনিবনা কাণে,
 ফুরিয়েছে স্নেহের বসন্ত।
 জিনিষে করাল কাল, এসেছে কনের কাল,
 গীত-স্বরে পড়েছে হসন্ত ॥
 অমিত্র অক্ষর চন্দ্র, রসের কপাট বন্ধ,
 করিয়াছে কবিত্ব-কাননে।
 অমিত্রের কষাঘাতে, গেল দেশ অধঃপাতে,
 হাসি নাই ভাবের আননে ॥
 এতক দুশ্চিন্তা যত, সকল করিব হত,
 দুই বেলা গঙ্গাস্নান করি।
 সেবিলে তোমায় গঙ্গে, বল পাই ক্ষীণ অঙ্গে,
 মনোহুত সকল পামরি ॥
 তোমার সলিলে নাবি, পৃথিবীকে স্বর্গ ভাবি,
 এমনি শীতল কর দেহ। ১০
 তোমার কূলেতে আমি, পোহাই দিবসযামী
 দীন দ্বিজে এই ভিক্ষা দেহ ॥

ভারতমহিলা ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। বাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তম রূপে আপনাদিগের কর্তব্যাকর্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর বাহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্তব্যাকর্মে অমু্যাত্র অনাস্ত্রা প্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাষ্ট সর্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটি প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতি মধ্যে ঋষিবা উদাহরণ স্বরূপে একটিও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। স্মৃতির প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলি হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বায়ীকি ও বেদব্যাস;— পরাশরী, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্তী। স্মৃতির প্রাচীনতা তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়।

পুরাণ অনেক পেরের লেখা; পুরাণ রচনা সময়ে আখ্যায়িকার সে তেজস্বিতা ও সেরূপ চরিত্রের গুণত্ব ছিল না। পুরাণ হস্ত-আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর বৈশেষিক চরিত্র (Idiosyncrasy) ও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্বল্পপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, বাহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগুড়ম বাগুড়ম লিখিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এখানে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্র নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরস্কী (মেট্রন) অধিক। কয়েকটি পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। পুরাণমতে স্ত্রীলোক, প্রকৃতির অংশ, সৎসত্ত্বগুণিক। প্রকৃতি হইতে সাধী

দিগের উৎপত্তি। রক্ষোণ্ডগাঙ্গিকা হইতে
ভোগ্যাদিগের এবং তমোণ্ডগাঙ্গিকা হইতে
কুলটাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত
দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আমাদিগের বর্ণনীয়
নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে
কতকগুলি প্রধান প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে। যথা সৃষ্টি ক্ষমা প্রকৃতি
অদ্বিতি প্রভৃতির নামোল্লেখের পর নারা-
য়ণ বলিতেছেন—

উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতান্চ প্রকৃতেঃ

কলাঃ।

কলাশচান্যাঃ সন্তি বহ্বাঃ তান্মু কান্চি

নিশাময় ॥

- ১। রোহিণী চন্দ্রপত্নীচ
- ২। সংজ্ঞা সূর্যাস্য কামিনী।
- ৩। শতরূপা মনোভার্যা
- ৪। বশিষ্ঠস্ত্রাপ্যরুদ্রতী ॥
- ৫। অহল্যা গোতমস্তী চ।
- ৬। প্যমুসুম্যাজিকামিনী।
- ৭। দেবহূতি কর্দমস্ত্র
- ৮। প্রমুতী দক্ষকামিনী ॥
- ৯। পিতৃণামানসী কণ্ঠা মেনকা

সাম্বিকাগ্রহঃ।

- ১০। লোপামুদ্রা তথাহুতী ১১
- ১২। কুবেরকামিনী তথা ॥
- ১৩। বরুণানী যমস্তীচ ১৪
- ১৫। বলেবিন্দাবনীতিচ।
- ১৬। কুন্তী চ দময়ন্তী চ ১৭

* ব্রহ্ম বৈবর্ত পুৰাণ প্রকৃতি খণ্ড—
১ম ও ২য় অধ্যায়।

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষ্ণুপুরাণ (৩)
শ্রীমদ্ভাগবত (৪) কালিকাপুরাণ ও বামা-
য়ণ (৫) (৬) রামায়ণ (৭) ভাগবত (৮)
(৯) কালিকাপুরাণ (১০) কাশীখণ্ড (১১)

- ১৮। যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৯
- ২০। গান্ধারী দ্রৌপদী শোষা
- ২১। সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া। ২২
- ২৩। বৃকভামুপ্রিয়া সাক্ষী
- ২৪। রাধামাতা কলাবতী ॥
- ২৫। মন্দোদরী চ কোশল্যা ২৬
- ২৭। হৃতদ্রা কৈটভী তথা। ২৮
- ২৯। রেবতী সত্যভামা চ ৩০
- ৩১। কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ৩২
- ৩৩। জাম্ববতী লায়জিতী ৩৪
- ৩৫। মিত্রবিন্দা তথাপরা।
- ৩৬। লক্ষ্মাচ রুক্মিণী ৩৭ সীতা
- ৩৮। স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
- ৩৯। কলা যোজন গন্ধাচ
- ৪০। ব্যাসমাতা মহাসতী।
- ৪১। বাণপুত্রী তথোষাচ
- ৪২। চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥
- ৪৩। প্রভাবতী ভামুসতী ৪৪
- ৪৫। তথা মায়াবতী সতী।
- ৪৬। রেণুকা চ ভৃগোস্মাতা
- ৪৭। হলিমাতাচ রোহিণী ॥

উপরি উক্ত গণনায় সকল সাক্ষী
দিগের নামোল্লেখ নাই কারণ শ্রীবৎস
পত্নী চিত্তা, শকুন্তলা, ও বালীরাজমহিমী
তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে
পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে
দেবতা ও মানুষীর কোন ইতর বিশেষ
নাই। এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইহাদের সক-

মহাভারত (১২) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড
(১৫) ভাগবত ও রামায়ণ (১৬) (১৭)
মহাভারত।

লের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইহাদের কয়েক জনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং জিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

অহল্যা। গোতমের পত্নী অহল্যা। তিনি পতিপ্রাণা ও সকল বিষয়ে পতি নিদেশানুগামিনী ছিলেন। ইনি যেক্রমে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হয়েন তাহা আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অবগত আছেন। গোতম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ বর্ণনা করিলেন। গোতম বহুকাল উঁহাকে কষ্ট দিয়া পরে রামচন্দ্রের সাহিত সাক্ষাৎ কারের পর উঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উঁহার নাম প্রাতঃ-স্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন কি আশ্চর্য্য প্রাতঃকালে যে কয়েকটি জী লোকের নাম করিতে হয় সকল কয়েকটিই ব্যভিচারিণী। কিন্তু তাঁহাদিগের বৃথিব্যার ভুল। পুরাণ কর্ত্তাদিগের শ্রায় বাধা বাধি করিতে গেলে সব আলগা হইয়া পড়ে। মনুষ্য-স্বভাব দুর্বল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া একেবারে তাঁহার রাশীকৃত সদগুণ বিস্মৃত হওয়া কি ন্যায়ানুগত কার্য্য? বিশেষতঃ অহল্যাদির দোষোদ্ধারের পর তাঁহারা অতি সাধু আচারে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ

হয় যে যদি মন বিমুক্ত থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। কেহ বৃথিতে না পারিয়া অথবা হঠাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া উৎপীড়ন করিলে তাহার পাপ প্রবৃদ্ধি দৃঢ়ীভূত করা হয় মাত্র।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিবা স্ত্রী লোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডীয় লোপামুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাত্র অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন “হে মুনে তোমার তপোলক্ষ্মী আছে— তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কন্যাগণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। ইহার কথা অন্যকে পবিত্র করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনুসুয়া, সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা, লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদা-

গত হইলে নিদ্রাগত হইয়েন এবং তোমার
অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে
তোমার আয়ু হ্রাস হয় এই ভয়ে কখন
তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না;
পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন
না। তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি
চীৎকার করেন না। তাড়না করিলে
বরং প্রসন্ন হন। এই কর্ম কর বলিলে
তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, স্বামিন্
ক্ষমা কর বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ
করিয়া সত্ত্বর গমন করেন এবং বলেন,
নাথ! কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন।
দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্বদা
দ্বারে গমন করেন না তুমি আজ্ঞা না
করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি
বলিবার অগ্রে সমস্ত পূজার উপকরণ
সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্ন ভাবে অতি হৃষ্ট
হইয়া যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া
সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত
করেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি
ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহা-
প্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন।
দেবতা অতিথি পবিবারবর্গ গো ও
ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন
না। সর্বদা তৈজস পত্র পরিষ্কার
রাখেন। সকল কশ্মেই দক্ষা। সর্বদা
হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাক্ষুণী। তোমাকে
না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতা-
চরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত

সমাজ ও উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে
পরিত্যাগ করেন। বিবাহ প্রেক্ষাদি
এবং তীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি
বিনা প্রবৃত্ত হইয়েন না। তুমি যখন
সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন
করিয়া থাক বা ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর
তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি
তোমাকে কিছু বলেন না। জীর্ধশ্লিগী
হইয়া ত্রিরাত্রি স্বামীকে আপন মুখ দেখান
না এবং যাবৎ স্নান করিয়া না শুদ্ধ
হইয়েন তাবৎ আপনার বাক্যও শ্রবণ
করান না। (মূলে অনেক ক্ষণ হইতে
আর লটের ব্যবহার নাই এক্ষণে বিধি-
লিঙেব ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপা-
মুদ্রার সকল কথাই লোপ হইয়া যাইবে
স্ত্রীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে। সহস্রাব্দে
প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক কথা
কহিতে২ অন্য কথা উত্থাপন করা পুরাণ
রচনার এক মহদোষ। কবি গায়কেরাও
এইরূপ এক কথা কহিতে২ অন্য কথা
পাড়িয়া ফেলে।) স্নান করিবার পর ভর্তৃ-
বদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও
মুখ দেখিবে না। যদি স্বামী নিকটে
না থাকেন মনে২ তাঁহারই ধ্যান করিবে।
পতিব্রতা নারী হরিদ্রা কুঙ্কুম সিন্দূরাদি
মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করিবে
না করিলে স্বামীর আয়ু হ্রাস হইবে।
রজকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত
সাক্ষী কখন বন্ধুতা করিবে না। যে
স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখদর্শন করিতে
নাই। কোন স্থানে একাকিনী থাকিতে

নাই । নগ্ন হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই । উদ্বৃথল মৃষল বর্ষণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট জীলোক সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা সে সকল স্থলে সামীর উপবেশন করিতে নাই । স্বামীর সহিত প্রগল্ভতা করিতে নাই । যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি সেই সেই দ্রব্যেই সর্বদা প্রেমবতী হইবেন । জীলোকদিগের এই এক যজ্ঞ এই এক ব্রত এবং এষ্ট এক দেবপূজা যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না । স্বামী ক্লীব হউন চুরবহু হউন ব্যাধিত হউন বৃদ্ধ হউন সুস্থিত হউন বা হুঃস্থিত হউন তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না । স্বামী হুঃ হইলে হুঃ হইবেন বিষম হইলে বিষম হইবেন । সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপ হইবেন । স্ত্রীতুল্যবর্ণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই একপ বলিবে না । এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্যে নিযুক্ত করিবে না । তীর্থ স্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবেন । জীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক । যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন তিনি স্বামীর আয়ুর্গাণ করেন এবং মরিয়া নরক গমন করেন । ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধাস্বিতা হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তদ্রূপ কুকুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয় । জীলোকের এই ধর্ম যে স্বামীর চরণ সেবা করিয়া আহার

করিবে । কখন উচ্চ আসনে বসিবে না পরের বাটী যাইবে না লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না । কাহারও অপবাদ করিবে না । দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে । যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে সে বৃক্ষকোটর বাসিনী উল্লুকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যে তাড়িত হইয়া স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয় ।” এইরূপ নানা প্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া পরে মুনি আবার আরম্ভ করিতেছেন, “দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ভরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন তাষূল ব্যঞ্জন পাদসংবাহনা ও চাটু বচন দ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে সেই ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছে । পিতা অন্ন পরিমাণে দেন ভ্রাতাও অন্ন পরিমাণে দেন পুত্রও অন্ন পরিমাণে দেন স্বামী যাহা দেন তাহার পরিমাণ নাই; অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিয়া । অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে । জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয় স্বামিহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি । সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল । বিধবাকে দেখিলে কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না । মাতা ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বেষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে ।” ইহার পর বিধবার নিন্দা সহমরণের প্রশংসা ও হৃদয় বিদারিণী বৈধব্য যন্ত্রণার

বর্ণনা। তাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ “গৃহে কি রূপলাবণ্যসম্পন্ন গর্ভিতা রমণী নাই? তথাপি কেবল বিশ্বেশ্বরে ভক্তি থাকিলেই পতিব্রতা নারী লাভ হয় যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহস্থ।” ইত্যাদি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিপুল ও নির্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনী গণের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প গুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তিনিই আদর্শ (Type) তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শকটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ যশস্বিনী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

এস্থলে পুরাণ ও স্মৃতিকথিত জীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতি, যত পারেন, অধিক গুণ থাকিলেই প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক চান না। একটা বা দুইটা গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকিলেই প্রশংসা করেন। স্মৃতি অনেক দূর ক্ষমা করেন। পুরাণ দুর্বাসা মূনি, তাঁহার ক্ষমা নাই। যদি একটুকু ব্যত্যয় হইল, যদি একদিন রাগ করিয়া স্বামীকে মূখ করিলেন অমনি তাঁহার সহস্র গুণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুণ্যের বলে যদি

গ্রামে জন্মিলেন কুকুৰী হইলেন। না হয় ত শূণালী হইলেন। পূর্ণাণব বাধাবিধি অনেক অধিক। সামাজিক অবস্থাগত যে কত প্রভেদ তাহা এই কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবরোধ প্রায়ই মুসলমানদিগের হায়ে হইয়া উঠিয়াছে। জীলোকের স্বামীর সখিত্ব আর নাই এখন কেবল মাত্র দাসীত্ব হইয়াছে।

মহাভারতীয় শকুন্তলা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন জীচরিত্রের একটি উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গাঙ্কর বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার গুণসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচবৎসর সহ করিয়া তাহার পব সন্তান ক্রোড়ে রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিন্তু হুঁততা করিয়া কহিলেন তুই কুলটা আমি তোকে কখন চিনি না। শকুন্তলা তখন রাজাকে আত্মপূর্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে! শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার বক্তক গুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে

সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। বাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকাব করিলেন। আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও বামায়ণে সাধবীস্বীগণের এক্রূপ অপূর্ণ সাহস দেখা যায় যে তাহা পাঠকরিলে তৎকালীন বমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহস সহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং ছুট লোক দিগকে ভৎসনা করিয়াছেন। এক্রূপ সাহস দূষণাবহ নহে বরং তাঁহাকে একটা গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপ স্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই এক্রূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ও রূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পাতি ব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটা অধ্যায় আছে। জীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পতিব্রতোপাখ্যান দেখ।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্বপ্রধানা রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। ইনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজা অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্ক দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি

যাহাকে আপন পতিজ্ঞে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এই রূপেই অনেক রমণী অভিনবিত পতিলাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ রাজ্যভ্রষ্ট দ্রামৎসেনের পুত্র সত্যবান্কে তপোবন মধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্রামৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনেঃ স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন তোমার কন্যা সত্যবান্কে বিবাহ করিবার জন্ত মনন করিয়াছে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে তুমি সত্যবান্কে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী বলিলেন।

দীর্ঘায়ুর্থবান্নায়ুঃ সন্তোণোনিঃসংগোহথবা ।
সকৃদৃতো ময়াভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং ॥
সকৃদংশো নিপততি সকলং কন্যা প্রদীয়তে ।
সকৃদাহ দদানীতি জীণ্যোতানি সকলং ॥

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধ স্বপ্তরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপর হইলেন। এবং নিরন্তর

দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সৰ্বদা প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অমৃত্যু হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফল মূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্রুত ও শ্বশুরের অমুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পৰ্য্যটন করিলেন। সায়াংকালে সত্যবান ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর। আমি তোমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী সেই শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধবীর ক্রোডদেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূত দিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন সাবিত্রি তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে।

তুমি আমাব কর্তব্যকর্ম্ম কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোডদেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নিভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্ধর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অমৃতবর্তন কবিতেছ ইহাতে তোমাব কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মান। তখন সাবিত্রী কহিলেন।

“শ্রমঃ কৃতো ভর্তৃসমীপতো মে

যতো হি ভর্ত্তা মম সাগতিঃ”

যতঃ পতিং নেযাতি তত্র মে গতিঃ সুরেশ”

কিয়দূরে যমরাজ বলিলেন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর। যদি কোন পৌরাণিক সাবিত্রী চরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। এবং সাবিত্রীকে আর থানিক কাঁদাইতেন কিন্তু সাবিত্রী পৌরাণিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ। তিনি বলিলেন যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয় করুন। যমরাজ তথাস্ত বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহাব পশ্চাদ্ধর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য প্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন।

সাবিত্রী তথাপি অসন্তোষে দেখিয়া
যমরাজ কহিলেন তুমি বাটী ফিরা যাও
সেখানে তুমি রাজ্যভোগ কবিত্তে পাবিবে।
তুমি কেন যথা কষ্ট পাইতেছ। সাবিত্রী
তখন পুনরায় কহিলেন স্বামীর সহিত
গমনে আমার শ্রম কোথায় আর আপনি
যে রাজ্যভোগেব কথা কহিতেছেন
আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য স্থণা
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য শ্রিয়
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য দিবং
ন ভর্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতং ॥

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী
সামান্য রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর
পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া
উহার স্বামীর জীবন উদ্ধাকে অর্পণ
করিলেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ কর্ত্তা এই
সংযোগে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর
অবতার বলিয়া লইয়াছেন এবং বিষ্ণুসমুদ্র
প্রচারণের পথ কবিত্তা লইয়াছেন। তিনি
বলেন যমরাজ সজ্জ হইয়া সাবিত্রীকে
সাবিত্রীর অবতাব জানিয়া উদ্ধাকে মুক্তির
প্রধান উপায় বিষ্ণুসমুদ্র প্রদান করেন।)
সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ
করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হই-
লেন, এবং কহিলেন উঃ অনেক রাজি
হইয়াছে। পিতামাতা অত্যাচারভাবে
অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই বলিয়া
সম্ভব পদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে
লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া

তর্পদ্বিগুণিত বেগে তাঁহার অনুগমন
কবিত্তে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস এই উপাখ্যানটি
মহাভারতীয় বনপর্বে বর্ণনা করিয়া-
ছেন। বাল্মেয় ভাষ্যে সন্দেহ প্রবন্ধটি অনু-
বাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহ
মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত বহিলাম। কিন্তু
যে কেহ মহর্ষির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন
তিনিই জানেন উহা অনুবাদ করিতে
পারা যার না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে
উহাব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল
স্থানে সন্দেহের গভীর ভাব ব্যক্ত হই-
তেছে তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম
না মহর্ষির বাক্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীন
কালের রমণীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র
কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার
বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদে-
শান্তমারে অভিমত পতিলাভ করিবার
জন্য পিতার এক জন সারথির সহিত
বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি
যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্লুণ-
সম্পন্ন। ইচ্ছাতে সাবিত্রী লোকব্রতান্ত
বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বোধ
হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য রূপ বা বল
দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই।
সত্যবান তখন একজন্ম অন্ধ মুনির পুত্র,
নিজে বন হইতে ফলমূলাহারণ করিয়া
পিতামাতার ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার
অবস্থায় এমন কিছুই ছিলনা যাহাতে
রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু

সাবিত্রী এন্ জেলিনার ন্যায় পবিত্র-
স্বভাবা ছিলেন এন্ জেলিনা বলিয়াছেন;
“In humble simplest habits clad
No wealth or power had he;
Wisdom and worth were all he had
And these were all to me.”

একবার সত্যান্বেষণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ
করিয়া সাবিত্রী তাহাকে চিরদিনের জন্য
পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ
ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন
শুনিলেন না। বলিলেন এসকল কাজ
একবার ছাড়া হুই বার হয় না। বিবা-
হের পর স্বশ্রুতালয়ে গমন করিয়া অন্ধ
স্বস্তুরের সেবার ও গৃহকার্যে ব্যাপৃত
হইলেন। তিনি যে স্বামীব মৃত্যুতিথি
জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা এক দিনের
তরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না।
কিন্তু সর্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে
লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম
ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু
দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না
শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সে
খানে যাহা ঘটিব পূর্বে উক্ত হইয়াছে।
যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনু-
গমন করিতে লাগিলেন। যমরাজবর
দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সু-
যোগে পিতা ও স্বস্তুরের শুভ বর প্রার্থনা
করিলেন। তিনি স্বামিবিয়োগে অধীর
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল।
ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে
প্রাকৃত বমণীরা কখনই সাবিত্রীর জায়

দক্ষ্যণ সহিত কাহা পাবেন
না। স্বামী তাঁহার সর্বস্ব তাঁহার জ্ঞান
প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া
পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম তিনি
এক বারও বিস্মৃত হয়েন নাই (পুরাণ
মতে পরলোকে বও উপায় করিয়া লইয়া-
ছিলেন) তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন
সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের
উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন তাহা
হইলেও তিনি বমণীকুলের শিরোভূষণ
বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত
পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জলন্ত চিতার
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর
ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয় হইতেন
নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন
তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার
অনন্যনারীসাম্প্রদায় অনেক গুণও ছিল।
এবং সেই জন্যই এতদৈশ্বর্য রমণীরা
জ্যোষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন।
কোন রমণী একবৎসরের মধ্যে পতির
মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে
বিবাহ করেন। কোন রমণী বৎসরাবধি
সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে
পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোব বিপৎ-
পাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিল-
ষিত সিদ্ধিতে দৃঢ় নিশ্চয়া হইতে পারেন
এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার
সকল কর্তব্য কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
চলিতে পারেন?

স্মৃতি সংহিতাদিতে যত গুণ থাকা
প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি

ছিল। তাহার উপর উঁচাব পৃথক্বে ন্যায় নির্ভীকতা সত্যনিষ্ঠতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সভা বটে তাঁহাকে সীতা দ্রোপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষায়ও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব। তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাব কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বলিয়া দিতে পারি না। মেকলে তাদৃশ কার্য্যকে জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Invidious office.) আমরাও তাহাই বলি। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম প্রথম শ্রেণীবও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন।

সাবিত্রী চরিত্র বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রোপদী দময়ন্তী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা গিয়া গেল কিন্তু কেহই সাবিত্রী চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়েন নাই। বায়ীকির পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই

সম্যক্ কৃতকায্য হইয়েন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হইবে না ইহা সীতা চরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রী-চরিত্র আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে। যে হেতুক কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অম্লকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায় ।

তৃতীয় শ্রেণীকৃত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রোপদী দময়ন্তী ও সীতা সর্বপ্রধান। শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিশুশ্রবা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের স্কলেই সহগমন করিল। শোকজর্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে বাইয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ কবিলেন

এক বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদবণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পাবে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপবি উক্ত দুইটা কার্য্য দ্বারা তাঁহার চরিত্রের গুণত্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও, যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎসরাজার জীতিস্তাব চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর মত। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীমধ্যে একটি প্রশংসনীয় কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বাহাদিগকে বিবাহ করিলেন তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুন্তকাবের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার ঋণবালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজপুত্র যজ্ঞ হইল ইহাতে তিনি লোকের সহিত একরূপ ব্যবহার করিলেন যে সকলেই তাঁহাকে স্তুতি্যতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্-

থের দোষে রাজ্য গেল ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন। সভাব মধ্যে দুরাশ্বাসা তাঁহার যারপর নাই অবমাননা করিল। এমন কি কেশাকর্ষণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহাকে চাড়াইয়া লইলেন। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জুনের আরও ভাণ্ডা ছিল, ভীমের ছিল, সকলেই আপন-বাটা রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন। যুধিষ্ঠিরের সহস্র মাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক রাক্ষসে স্বয়ং ভোজন করিতেন। সর্কদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জুনকে ইন্দ্রসন্ধিবানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যে যুত্র-পাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্কদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। এক দিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর জ্ঞান ধর্ম্মপরায়ণা ও সর্কগুণসম্পন্ন কামিনী কি আর আছে? যদিও কোনরূপে অসহ্য বনবাস যন্ত্রণা সহ করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে বিরাটবাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। এই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন

প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বক্র বাহন হস্তে অর্জুনকে বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ কহিতে লাগিলেন এবং ত্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহা প্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব প্রথমই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন।

“দ্রোণদীপ্ত সাতীশ্রী ছিলেন। মাতৃ আজায় তাঁহার পক্ষ স্বামী হইয়াছিল। তিনি সেই পক্ষস্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ইহা তিল তিনি অতি ধর্মপারায়ণ পতি-ব্রতা দরশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।”

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শাস্ত্রস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্বদা স্বামিগুণে ব্যাপৃত থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেকূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্বদাই সেইরূপ বিগুণ আনন্দ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কের্মীর গৃহস্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে

উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্তা হয় তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আত্মত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন রাম তাহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম কর্ম করিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, “স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতু মইষি। তপোবা যদিবারণ্যং স্বর্গোবা স্ত্রীত্বয়া সহ ॥ নচ মে ভবিता কশ্চিত্ত্ব পথি পরিশ্রমঃ। পৃষ্ঠত স্তব গচ্ছন্ত্য বিহারশয়নেশ্চিব ॥ কুশাকাশ শরেষীকা যেচ কঠকিমো ক্রমাঃ। তুলাজিন সমস্পর্শা যার্গে মম সহ স্বরা ॥

এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না তিনি তাঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অস্বীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সাধনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত স্বশ্রম স্বশ্রুদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ জটা ও বকুল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা বকুল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্বন্ধে নিষ্কেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং

অপ্রতিভমুখে সাক্ষনঘনে রামকে কহিলেন, স্বামিন! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌশল বস্ত্রের উপরি চীরবস্ত্র সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহাব পর সীতা স্বামীর সহিত বনো নানা কষ্ট পাঠিয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্যা বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণ-শয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমন সময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীরাও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগাল স্বরূপ দাঁড়কাক স্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমার হরণ করিতেছ ইহার জন্ত তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে তাঁহার পায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে তাঁহার

প্রীতি উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা করে, সীতা কেবল বলেন,

রামো নাম সদম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিখ্যতঃ।
দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম ॥

অনেক দিন এককপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আর বার মাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস ভোজন করিয়া মন-স্বামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,
ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা যা তস্যস্ববা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি

রাক্ষস ॥

হনুমান্ আসিয়া অশোকবন মধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার নায় শোকভারে আক্লান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন, রাবণ তাহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষস পুরী মধ্যেও ত্রিভুটা ও শরমা নামী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে মাঝনা করে। হনুমান্কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন তিনি হনুমানকে আশীর্বাদ করিলেন রামকে আপন মনের কথা বলিলেন।

তখন তাঁহার ভরসা হইল রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন ।

রাবণবধেব পর বিভীষণকে বাঞ্ছা অভিসেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবাব জন্য লোক পাঠাইলেন । সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন সীতে আমি তোমার উদ্ধাবসাধন করিয়াছি শক্রনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি । আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল । এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল ; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল । তখন রাম কর্ণশ্রবণে কহিলেন জানকি ! আমারে কন্ম আমি করিয়াছি । কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না । তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ । আমি সংকুলশ্রুত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র । অতএব তোমায় অমুমতি দিতেছি তোমাব যাহাকে ইচ্ছা হয় আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর । সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাস্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন স্বামিন্ আপনি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেন । আমি লক্ষ্মীপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমাব দূত হনুমান্ সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে । অতএব এক্ষণে আমাকে এক্ষণে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে । নশ্রমণীকৃতঃ পানি বাল্যে মম নিপীড়িতঃ । মম ভক্তিক শীলঞ্চ সর্বন্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতং ॥

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্বসমক্ষে বহু মধ্যে প্রবেশ করিলেন বহু প্রবেশ সময়ে দেবতা ব্রাহ্মণ দ্বিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে বলিলেন, যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসপতি রাঘবাং তথা লোকস্ত সাক্ষী মাং সর্বতঃপাতু পাবকঃ । যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দৃষ্টু । জানাতি রাঘবঃ তথালোকস্ত সাক্ষী মাং সর্বতঃপাতু পাবকঃ । কৰ্ম্মণামনসা বাচা যথানাভিচরাম্যাহং রাঘবং সর্বধর্ম্যস্তং যথা মাং পাতু পাবকঃ ।

অগ্নি প্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না । সকলে ধন্য বুলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল ।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা কবে । রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ তাঁহার ধর্ম্মনীতে বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন “তুমি আশ্রম গমন ব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস । লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন । সীতা নিদারুণ পরিত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতনা হইয়া রহিলেন পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, নিতান্ত নিরস্তর দুঃখভোগের অন্তই আমাব দেহ-স্থিতি হইয়াছিল আমি পূর্জন্মে যে কি

পাপ করিয়াছিলাম, কোন পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়া-ছিলাম বলিতে পারি না নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।”

পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষণ তুমি আৰ্য্য-পুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সৰ্ব্বদা আপন কর্শে অবহিত হইতে বলিও। এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণেব সহিত পতি-কল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং দুঃপনেষ অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথিনী সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনঃগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সৰ্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত। তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুঃকর। তাঁহার অলৌকিক অনির্কচনীয় প্রণয় পূর্ববৎই আছে কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজ ও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না কিংক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থা-

কিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী মাধবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার শোক দীন বচনাবলী পাঠ করিলে পাষণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয় হৃদয়ে গভীর শোকমাগরের উদগূর্ণ হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন, যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহঁসি॥ মনসা কর্শ্বেণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহঁসি॥ যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্বিরামাংপরং নচ। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহঁসি॥

সভাস্তব্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন রামচন্দ্র মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্ত-জ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবিভূত হইলেন এবং সীতাকে সন্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সৰ্ব্বপ্রধান। সীতা সৰ্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতি পরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়া ছিল কোনকালে কোন নারী তাদৃশ-প্রলোভনে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সঙ্গার ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার

জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্ৰহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যা পবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ কালে তিনি সশরীরে ভগবতী পূর্ণিমীর সহিত বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন।

তুলনা।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় বমণী। পূর্ণিমীর কোন দেশেব কোন কবিত স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উঁহাদের নায় সর্বগুণসম্পন্ন রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহ-প্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীব প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন তথাপি উঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণয় করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার মিলক্ষণ পরিচয়

দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্মক্ষমতার অনেক উৎকৃষ্ট। বন্দীকি কোন স্থলেই সীতার কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে শাস্ত সুশীলা ও একান্ত সুদীর্ঘজীবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও দীর্ঘজীবী সন্দেহ নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন প্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট নাই যে সীতা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিজয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতক গুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভার-

তবর্ষেব অবস্থাগত নানা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্মের লোপ হইয়াছে পৌরাণিক দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্থাগণ বিলাসী হইয়াছেন কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীৰ্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্যাগি চারি আশ্রম পালন কবেন না তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। একরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের অল্প জেনানা মহল সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় বমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন কেবল দাসী মাত্র। রাজারা পূর্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। কতকগুলি ভোগ্য স্ত্রী তাঁহাদের অস্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দশকুমার চরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নান্দ মহাভারত বা রামা

য়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকল গুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদের দিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্র, মুচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমার চরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যে গুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাম্পীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা ভিন্ন সময়ের লোক। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর। ঋষিপ্রণীত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের রচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

*** The Mahabharata tells the story in simple but vigorous and noble language. It is full of powerful description of passion. The poet no where pays any undue attention to mere forms of words. His chief exertion is devoted to attract our sympathy to the qualities and passions which he describes. Refer for example to the deep pathos in the description of the grief of Damayanti when abandoned by her husband in the solitude of the forest.

Instead of ennobling the affec-

tions and appealing to the tenderest and most sacred feelings of man the love which the poet describes (poet, one like shre-harasa) is earth born in a degree far exceeding the lasciviousness of some of the Roman poets.

যাহা হউক আমরা কাব্যগ্রন্থ হইতে কতকগুলি সাধুশীলা রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ মুচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে একটি বেশ্যা ও একটি পতিপ্রাণা রমণী চরিত্র বর্ণনা আছে। উভয়েই চারুদত্তের প্রতি সমান প্রণয়বতী—উভয়ের চরিত্রই বিস্তৃত নির্মূল্য এবং উন্নত। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সহ করিলেন কত প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং শেষ একটান রোধের হস্তে তাঁহার জীবন পর্যন্ত গেল। তথাপি তাঁহার প্রণয় অবিচলিত। তিনি শুদ্ধ নিজেই প্রণয়বতী এমন নহেন যেখানে বিস্তৃত প্রণয় সেইখানেই তাঁহার প্রীতি। তিনি শর্কিলকেব প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। আপনার কণ্টক স্বরূপ চারুদত্তের মহিষীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাকে ভূরিং প্রশংসা করিলেন। বেশ্যালোকের ওরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই তাঁহারা অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু বসন্তসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়া জানিতেন এবং ঘৃণা করিতেন, তিনি সাহসপূর্বক চারুদত্তের

বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন না বলিলেন সেখানে প্রণয়বতী ধর্মপত্নীর অধিকার। চারুদত্তের স্বাক্ষরীও স্বামীকে অগ্রাসক্ত জানিয়াও তাহাতে অসুখ হইয়াছে হইলেন না বরং যখন গুলিলেন চোরে বসন্ত সেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহহুঁত্রে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং চারুদত্ত “কথংনামঃ” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যা-পরাদে বধাস্থানে নীত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ন্যায্য বিস্তৃতস্বত্বাবা কামিনী অতি বিরল।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি-গণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দম্ভাহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালের লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি তাহাতেই নিপুণ। পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহাব প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। পরে কোন দিন বিদূষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সে আবার সভ্যমধ্যে। মালবিকা গীতিচ্ছলে

এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আপন মনের ভাব রাজাকে জানাইলেন। পরে গান্ধর্ব বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না তিনি সুন্দরী নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। নৃত্য করিতে পারেন গান করিতে পারেন অভিনয় করিতে পারেন কৌশল পূর্বক হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি চতুরা ও প্রণয়িনী—তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন সমুদ্রগর্ভে বন্দী রহিলেন মহারাণীর বিরাগভাগিনী হইলেন তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে ভাদৃশ সক্ষম নছেন তাঁহার। মালবিকার নায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অনায়াস কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্তাদিগের লোপামুদ্রা ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অভাস্ত আদরणीয়া। যেমন পুরাণকর্তাদিগের লোপামুদ্রা বালিকাদিগের শিলা যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্দারবস্ত্র নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এ স্থলে বর্ণিত হইল।

ধারিণী রাজার মহিষী। তিনি যতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত

রাজার যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু বিদূষকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন রাজার মন টলিবার নহে তখন তাঁহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল। জঘন্যস্বভাবা ইরাবতীর অনু-রোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী। বর্কিম বাবুর স্ত্রীমুখীর সহিত ধারিণীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা সাবিত্রী শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জন। মালতী মাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের দ্বীলোক আছেন। ইহার নাম কামন্দকী—ইহার সংসার কার্য্যচাতুর্য্য বুদ্ধিকৌশল শাস্ত্রজ্ঞান কর্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা স্তম্ভগর্ভের প্রতি অনুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি স্নেহ অলৌকিক। ইহার সাহস পুরুষের ন্যায় মনের জোর পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্থীর সহাধ্যায়িনী বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাদের সমতুল্যা। দুইজনেই তাঁহাঙ্গে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে

বিরাগিণী বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কোষিকী এবং মালতী মাধবের কামন্দকী কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কোষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্বদা তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হবদন্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি, যতদিন আপনাদিগের হ্রবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাহার জাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাহারই রাজকন্যা রাজাব প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কোষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ পণ্ডিত কোষিকীচরিত্র বিগুপ্ত কামন্দকী তাহাতেও আবার কম্বুকুল। তিনি আপন কাষো অমুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কোষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস সহকারে কাল কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার হ্রভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কোষিকী দল্লাহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ

উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইহার দুইজনেই একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই ঋষিদিগের সময়েও ছিল না। বৌদ্ধেরা মঠ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া যখন চীন ও সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখিয়াছেন এবং তথায়ও দুইএকটি ঈদৃশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল পণ্ডিত কোষিকীও বিবল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণী কুলের বিভূষণ স্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্বস্ব গেল তিনি দক্ষিণার জন্ত আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তখনও শৈব্যা তাহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, “অজ্ঞ উত্তো মকথু অন্তস্তবো হোহি। তা পদীদ মংজেব্ব ইমথিং কজেজ্জ আবোবেহি। অবচ্ছিমো দে দানিং পণয়ো।” এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন “কিনব কিনবমং অজ্জা পরপুসিস পজ্জপাসনং পরচ্ছিট্ট ভোজণ অ স্বাবিহরিয় সব্ব ংম কারিনীত্তি।” যখন এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন, “দিটিয়া অদ্বাবশিট্ট পডিরাভারো দানিং

অজ্ঞউত্তো কিদমস্মি।” আর্ধ্যপুত্রের
প্রণয় অর্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হই-
লেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চির-
কালের জন্ত যে দাসী হইলেন সেটী
তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু তাঁহাতেও
বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার এক
মাত্র সন্তানও কিছুদিনপরে সর্পাঘাতে
প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্য উদ্ভ্রমে দেহ-
ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃ-
স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন সে স্বর শ্রবণও
বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয়
হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া
দিলেন।

পার্কর্তী—ইনিই পূর্বজন্মে স্বামীর নিন্দা
শ্রবণে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন
এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি
অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য
নহেন দেবতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে
হইলে তপস্যা আবশ্যক করে ও পূজা
আবশ্যক করে। পার্কর্তী প্রথমতঃ পূজা
আরম্ভ করিলেন। নিতাই মহাদেবকে
স্বহস্তপ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং
নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করেন।
পার্কর্তী বিদ্যাবতী পিতার প্রিয়পাত্রী
এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প কিন্তু
তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়।
তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ
নহে উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন
প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন কালি-
দাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে
পারেন বটে কিন্তু সে প্রণয় বাস্তবিকর ভ্রাম্য

নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই
অধিক। কিন্তু যে কবি পার্কর্তী প্রণয়
বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয়
বর্ণনা করিতে পারেন না এরূপ বলা
অসঙ্গত। পার্কর্তী মহাদেবের প্রণয়বতী;
মহাদেব যোগী; তিনি অপব উপাসকের
যে রূপ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, পার্কর্তী
পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার
মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাক্ষুশ্য
বিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল
কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখন
সে ভাব নিগ্রহ করিয়া কোপ কটাক্ষে
মদনকেই ভ্রমসাং করিয়া ফেলিলেন।
এবং ক্রীসম্মিকট পরিহারের জন্য সেখান
হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্কর্তী ভ্রম-
মনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট
তপঃসমাধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা
করিলেন এবং যোরতর তপস্যা করিতে
আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিন শরীর
ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যে সকল
নিয়ম পালন করিতে অক্ষম পার্কর্তী
সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগি-
লেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ
বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং
প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করি-
লেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া
দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ
নিন্দা অসঙ্গ। তিনি সেখানে হইতে
উঠিয়া বাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব
নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে!!!

তখন কোপ প্রণয় বিষয় পাঠ শুনান।
বুদ্ভি যুগপৎ সমুদগত হইয়া তাঁহার নেকপ
চিন্তাবিকাৰ জন্মাইয়া দিল তাহা কালিদাস
ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে
পারেন কি না সন্দেহ। সেক্ষপিয়রের
মিবন্দা যেমন সরলস্বভাবা পার্শ্বতীও
সেইরূপ। তিনিও মিরন্দার কায় পিতার
নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন
নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে
মিবন্দা সামাজিক অবস্থা জানে না পার্শ্বতী
জানিয়াও ভাবিলেন বিমুদ্র প্রণয় প্রথা-
পণে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম
চতুরা, নানা বলি কর্মে তাঁহার নিত্য
আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার
প্রণয় বিচলিত হইবার নহে মন টলিবার
নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন
তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধি-
পতি যদি দেবতা তোমার কামনা হয়
বল। পার্শ্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর
দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন
মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্শ্বতী
একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব
দিলেন পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা
উঠিল তখন নীলাকমলপত্রের গণনার
তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকে
সংসর্গ ভাল বাসেন না গুরুজনের নিষ্কা
তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান
দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র
উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই তাঁহাতে আছে।
রমণীকুলের তিনিই গর্ভস্থেতুভূতা। তিনি
যেখানে তপস্বী করিয়াছেন তাহা এখনও

তীর্থ। তাহার নিকট সিত শ্রদ্ধা স্বাধি-
গণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার
চরিত্র তপস্বীদিগেরও উদাহরণস্থল।
তাঁহার চরিত্র প্রশিধান পূর্বক পাঠ করিলে
বিশ্বয়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়।
কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার
বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিক-
তার লেশ মাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায়
ধর্ম্মে ভক্তি দেবতায় ভক্তি মনু প্রভৃতি
মুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ তাঁহার
সরলতা পিতৃভক্তি স্বামিভক্তি সখীগণের
প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা
লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল।
নারীচরিত্র বিষয়ে কবিবা কতদূর উন্নতি
কল্পনা করিয়াছিলেন পার্শ্বতী চরিত্রে
তাঁহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া
বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করি-
য়াছেন বাম্বীকির রামায়ণ হইতে আখ্যা-
য়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক
রচনা করা হইয়াছে তাহাতে রাম ও
সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই।
ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু কালি-
দাসের রাম ও সীতা বাম্বীকির রাম ও
সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের
অপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে।
বাম্বীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার
বাল্যকালের কোন কথাই লিখেন নাই।
কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাম্বীকির
সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে
পরভূত হইতে হইবে। এই জন্যই

তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাণ্ড কিকিঙ্কা
কাণ্ড স্তন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক
সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন ।
ঐ সর্গও নীরস কিন্তু তাহার বিদ্যাস্বরিত
গতি বর্ণনা উহার একটি আশ্চর্য্য শোভা
হইয়াছে । তিনি চতুর্দশে সীতাচরিত্র
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । বিদ্যাসাগর
মহাশয় এই সর্গ হঠাতে তাঁহার সীতার বন-
বাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ।
যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আ-
দেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন
সীতা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । কিয়ৎ-
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনঃ ২ স্থি-
ত হুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে
লাগিলেন । লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্ত
প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া
কহিলেন, বৎস! তুমি সেই রাজাকে
বলিও “যদি অন্তঃস্বস্তা না হইতাম
তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে
প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম । তুমি
তাঁহাকে বলিও,
“সাহংতপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টি রুদ্ধঃ প্রসূতে
শরিতুং বতিষ্যে
ভূয়ো যথা মে জননাস্তরেপি স্ময়েব ভর্ত্তা-
নচ বিপ্রয়োগঃ ।

তিনি আবার বলিলেন “তাঁহাকে
বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভাৰ্য্যাভাবে
আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন
সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই । তিনি
সমাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর । যেখানে যাই
তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি ।”

মহর্ষি বায়ীকি যখন তাঁহাকে আপন
আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি
অতিথি সেবা নিরন্তর স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য
করিয়া সময়োচিত করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল যখন
শুনিলেন আজিও রাম তাঁহা তিন্ন আর
কাহাকেও জানেননা এবং তিনি হিবন্ময়ী
সীতা প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন তাঁহার অনেক শমতা হঠল ।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপনান্তে
পৌরবর্গকে একত্রিত করিয়া সীতা পরী-
ক্ষাব কথা উত্থাপন করিলেন । সীতাও
আচমন করিয়া কহিলেন,
বান্ধনঃকন্দ্বতিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো •

যথা ন মে ।

তথা বিশ্বস্তরে দেবি মামস্তর্জাতু মর্হসি ॥

ভগবতী বিশ্বস্তরা সীতার কথা শুনি-
লেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্ত-
র্হিতা হইলেন । প্রধান কবির পুজামু-
পুজারূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন না ।
কালিদাস সীতা চরিত্রের হুই একটি
অতি বিগুহ্ণ নিশ্চল ও ভাব পূর্ণ অংশের
পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন ।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা
অনেক । সেই সমুদয় হইতে স্ত্রীচরিত্র
সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া
পড়ে । সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ রত্না-
বলী বাসবদত্তা প্রসন্নরাসব প্রভৃতি গ্রন্থের
নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিগুল-
চুড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্ব-
ভূত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তররাম

চবিত হইতে শকুন্তলা ও মীতাচরিত্র সং-
গ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটা বম-
ণীয় চরিত্র বর্ণনে কবিবা আপনঃ কল্পনা-
শক্তির পবাকষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।
এই দুইটা রমণীর অবস্থাগত অনেক
প্রভেদ। মীতার বিবচ, শকুন্তলাব পূর্ব-
রাগ, মীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা।
মীতা বাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবন
প্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান
প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃ-
পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই চরিত্র
কীর্তিবিভেব উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবতা
ও ঋষিবা উভয়েই ভূঃস্থেব সময়ে
সাক্ষ্যনা করিয়াছেন এবং স্বামীব সহিত
মিলন কবিবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা
পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল
বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু বনলতা
বনময়ব বনমৃগ উভয়েই প্রিয়পাত্র উভ-
য়েই হৃদয় সর্বল ও প্রণয়প্রগাঢ় বনবাস-
সখী দিগের সতি উভয়েরই সমান
সখ্যভাব। মীতা বাবণকর্তৃক পীড়িতা
হইয়া এক্ষণে পুনরায় বাজধানীতে প্রত্যা-
গত হইয়াছেন, বাজবাণী হইয়াছেন কিন্তু
তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ববৎই আছে।
চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁহার সকলভাবই
ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে
স্বখেব চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন।
শূর্ণনথাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত
হইল আর্ধ্যপুত্রের ভূঃস্থ দেখিয়া তাঁহার
অশ্রুপাত হইল তপোবন দেখিয়া পুনর্বার
তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি

রামকে বলিলেন তোমাকেও আমাব
সহিত যাইতে হইবে। রাম কহিলেন
অরি মুগ্ধে একথাও কি বলিতে হয়।
তিনি রামবাহু আশ্রয় কবিয়া শয়ন
করিলেন কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকবণে
চিত্র দর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনও
শান্ত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া
উঠিলেন “আর্ধ্য পুত্র এই তোমার সহিত
শেষ সাক্ষাৎ। রামচন্দ্র সেখান হইতে
চলিয়া গেলে নিদ্রা ভঙ্গানন্তর উঠিয়া
বলিলেন, “ভোহুকুবিশ্বঃ,” তাহার পরই
বলিলেন “যই অতনো পতবিশ্বঃ” লক্ষণ
রথ আনয়ন করিলে আর্ধ্যপুত্রের ভূয়সী
প্রশংসা করিতে তাঁহাতে আরোহণ
করিলেন। যখন লক্ষণ প্রস্তুতবৃষ্টির ত্রায়
রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন তখন
মীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না
পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার
পুত্রদ্বয়কে পৃথী ও ভাগীরথী বাহ্মাকির
আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি
ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস
করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তম
সারসহিত মীতাকে পঞ্চবটী বনে পাঠা-
ইয়া দিলেন। যেখানে আগ্যপুত্রের
সহিত নানা সুখভোগ করিয়া ছিলেন
যেখানে “সরসী আরসী” তে আর্ধ্য-
পুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করি-
তেন আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও
কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়া-
ছেন সঙ্গে কেহই নাই। মীতা রান্নের

গম্ভীর স্ববর্ণকূহবে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পবন যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্ঘ্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন এবং একতানমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন রামচন্দ্র তাঁহারই জ্ঞাত শোক করিতেছেন তখন বলিলেন অজ্ঞ উত্তরাসরিসং কথ্য এদং ইমম্বুদন্তস্য। তাহার পর বলিলেন আর্ঘ্যপুত্র তুমি আজিও সেইটাই আছ। রামচন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্ত্রিব হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন যা হবার হউক আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব। যখন রামচন্দ্রকে বাসস্তীতির স্মার করিতে লাগিলেন তখন তিনি কহিলেন “সখি তুমি ভালবাসনা বলিতেছ বটে কিন্তু দেখিতেছনাকি উঁহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে।” সখি তুমি বিরত হও। তাঁহার প্রিয় হস্তী বিপদগ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতাবাসন চঞ্চল হইল উঁহাকে রুষ্ট পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাহার হর্ষ হইল এমন নহে তাঁহার ক্রোধ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রণচক্র দেখা যাউতে লাগিল ততক্ষণ কাহার সাধ্য সেদিক্ হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর নমো নমো অজ্ঞ উত্তর চরণ কমলাগং নমো

অপূর্ব পুঙ্গব গিরি দংশনানং বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বাব পবীক্ষার সময় যখন সীতা সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অমৃতব হইতে লাগিল তিনি বিস্মিত চরিত্র। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্ণেব মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপবায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টি-বিষয়ে বা ক্ষতিগোচরে পতিত হয় নাট। তিনি স্বীয় বিস্মিত চরিতে পতিপরাক্রান্তা গুণেব একপ পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে বোধ হয় বিধাতা মানব জাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্ন কামিনী কোন কালে ভ্রমণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অপনো তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পলিত করিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন একপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার গুণ মুগ্ধবভাণা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গুহ কাব্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিপিতে পড়িতে শিখিয়াছেন তপোবন বৃদ্ধদিগেব পাটী কবিতা তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালীন

বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভাব দিয়া গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহাকে ভাল বাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে পুষ্প-বৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিবাহ আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অমৃত্যু চিন্তা নাই তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাঁহারা দুর্কাসারশাপ মোচন করিল তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক। তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকেই বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরল হৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পিতৃ সেবায় তৎপর ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবন্ধবিরোধী ভাব; এবং তাঁহার পক্ষে অমুচিত ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা

পাইলেন কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তিনি ম্রিয়মান হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার জন্য রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সম্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈব দুর্ভিক্ষপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয়হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। কন্যমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং সম্বর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালীন আপন হরিণ শিশুটিকেও বিশ্বৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অন্তিমক্ষেত্রে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

(বেদব্যাস সাধবী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাসেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভাল বাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।)

রাজা দুর্কাসার শাপে সমস্ত বিশ্বৃত

হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা कहিলেন তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু অরুণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃ সংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার অরুণ হইল না। তাহার পব শাস্ত্রবর তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত গৃহ গমন কালীন কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাঁহাকে লইয়া তিরোভূত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্তৃকাবেশে ধর্ম কর্ম কবিতা পতিব্রতা ধর্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়ান্ধিত করিতে লাগিলেন। দৈবামুগ্ধ হইয়া যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত অরুণ হইয়াছে—শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা

করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন “নুনং মে সূচরিদ পভিবন্ধ অং পূর্ব্ব কিদং তেহু দিয়সেহু পবিণাম সুহং আসী বেন সাহুক্কোশেবি অজ্জ উত্তো মহ বিব-লোসংবুত্তো।” রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অনুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন তখন ভীক্স্বভাবা শকুন্তলা कहিলেন “নসেবিস্বসিমি” এবং যখন শুনি-লেন শাপ প্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন “দিট্টিয়া অআবণ পচ্চদেসীন অজ্জউত্তো।” আর্ধ্য-পুত্রের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্ধ্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্কীতী এবং ভবভূতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে ভারত-বর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাউবে। এই সকল রমণীই নারীকূলের রত্ন। ইহারা সক-লেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহা-শয় বলিয়াছেন সীতা পতিপূরণতা গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী পার্কীতী শকুন্তলা প্রভৃতি কাগি-

নীবাও তাহাট করিয়াছেন। উহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেবই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাঠিয়াছে মাত্র। দয়া দাক্ষিণ্য সোজনা প্রভৃতি যেসকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার সেই গুণ উহাদের সকলেবই অধিকপরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যজন্মের মতাই রত্ন উহা বা সেই প্রণয়ের আধার ভূমি। স্মৃতি শাস্ত্রকাবেবা স্ত্রীলোকের যেসকল কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কবির। সে নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের তাঁহারা যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন কবাইয়াছেন। কোন নারীবই প্রমাদ, উন্মাদ কোপ ঈর্ষ্যা বঞ্চন, অভিমান খলতা, হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার পূর্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন “ভদ্র কুবিন্দু” তাহাব পর-ক্ষণেই বলিলেন “যদি অন্তনোপহবিন্দু” মাধু রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। কাশী রাত্রুহিতা তাহাব প্রধান দৃষ্টান্ত। ধারিণী কৌশল্যা চারুদত্তবণিতা ইহাবাও এই শ্রেণীভুক্ত। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগের নিন্দা কবিতো লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুন্তলা একে বারেই ঈর্ষ্যাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী বাগ করেন এই ভয়েই ব্যাকুল হইলেন। দক্ষ

প্রজাপতি বলিয়াছেন সাধু রমণী পাঠিলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলাব ন্যায় ভাৰ্য্যা লাভ হয় না।

উপসংহার ।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্যাপ্ত বা Highest ideal হইবে। এবং আবে বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থা জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটি প্রভিন্দী কারণবশতঃ কেহই ঈর্ষ্যা উন্নত চরিত্রা রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর কবিদিগের পৌৰাণিক দিগের ও কবিদিগের সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় বিশেষকণে পর্যালোচনা করিলে বোধ হইবে বাস্তবিক প্রভৃতি কবিগণ আপন২ অঙ্কিত কল্পনাশক্তি বলে যেসকল রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন পূর্বোক্তিত সামাজিক অবস্থার তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র মনে ধাবণা করাও যায় না। সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা সাবিত্রী পার্শ্বতী ও শকুন্তলা সর্বপ্রধান। শকুন্তলা স্নেহপ্রবৃত্তির মূর্তিমতী প্রতিকৃতি। উহাব স্নেহপ্রবৃত্তি সর্বতোমুখী

সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। শকুন্তলা ও পার্ক-
তীর যেমন সর্বভূতে সমান স্নেহ একরূপ
বোধ হয় জগতের আর কুত্রাপি দেখা
যায় না—কি পশু কি পক্ষী কি চক্রবাক্
দম্পতী, কি মনুষ্য, কি সখী, কি স্বামী,
কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাদের স্নেহ
যেন উৎলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পার্কতী
অপেক্ষাও শকুন্তলার স্নেহপ্রবৃত্তি অধিক-
তর বলবতী—কালিদাস তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি
ও কর্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ
যত্ন করেন নাই। তাঁহার হৃদয় স্বরূপ
নন্দনকাননে যত কিছু অমৃতময় ফল বা
পুষ্প ছিল সমুদয়ই শকুন্তলার অঙ্গশোভা
সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ভব-
ভূতির সীতা শকুন্তলাব ছায়া মাত্র।
যদিও শকুন্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা
তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাঁহার
কোমলতর বৃত্তিসকল এত সুন্দররূপে
অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা পূর্বোক্ত
অভাবদ্বয় অমৃতবই করিতে পারি না।
তাঁহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষ্ণুতাই আমা-
দের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে।

সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্নেহপ্রবৃত্তি দুই
টাই বলবতী, তাঁহার কর্মক্ষমতা তাদৃশ
প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা
আমাদিগেব মনোরঞ্জন করে। কিন্তু
তাঁহার পতিপবায়ণতা সকলের অপেক্ষাই
অধিক। সীতা যে আমাদের দেশে
আবালবৃদ্ধবর্ণিতা সকলের প্রিয়পাত্রী
তাঁহার কারণ কেবল তাঁহার সরলতা
এবং তাঁহার স্বভাবের গুণ। তিনি

নিদোষী হইয়াও এবং সর্বগুণসম্পন্ন
হইয়াও নামাধি কষ্টভোগ করিয়াছেন
এই জন্যই তাঁহার চরিত্র পাঠে আমাদের
সহানুভূতি উদ্ভিক্ত হয়।

সাবিত্রীচরিত্রে বৃত্তিভ্রমেরই উচিত মত
সমুন্নতি দেখা যায়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন
স্নেহ প্রবৃত্তি এবং কর্মক্ষমতাও তেমনি;
কিন্তু স্নেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রাধান্য থাকা
আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে তাহা নাই।
আমরা পূর্বেই তাঁহার চরিত্র সমালোচনা
করিয়াছি।

পার্কতীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তিই প্রধান।
মহাদেব তাঁহার অবিচলিত প্রণয়ের
অধিকারী। হিমালয় ও মেনকা ভূক্তির
অধিকারী। আশ্রম বৃক্ষ মৃগ রথাসদম্পতী
—জয়া বিজয়া এমন কি স্বাবব জঙ্গমা-
য়ক সমস্ত জগৎই তাঁহার স্নেহের অধি-
কারী। তিনি চূপ করিয়া বসিয়া থাকি-
বার পাত্র নহেন। তাঁহার ন্যায় অবস্থায়
শকুন্তলা, অননুয়া ও প্রিয়দার মুখ
চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু পার্কতী অগ্নি
বুদ্ধি স্থির করিলেন যে তপস্যা করিবেন,
এবং কালবিলম্ব না করিয়া কঠোর তপ-
স্তায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি
ও কর্মক্ষমতা বিলক্ষণ তেজস্বিনী।
প্রায়ই দেখা যায় আর্ষ গ্রন্থাবলী হঠাৎ
প্রবন্ধ লইয়া কাব্য রচনা করা হইলে
জীচরিত্র বর্ণনা মন্দ হইয়া পড়ে কিন্তু
আশ্চর্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং
পার্কতীচরিত্র বর্ণনা করিয়া উহার অধিক-
তর মৌল্য সম্পাদন করিয়াছেন।

পার্বতীর চরিত্র পাঠে আমাদের যেরূপ নিম্নমিশ্রিত অদ্ভুত বসেরা আবির্ভাব হয় সংস্কৃত কবিদিগের আর কোন নারী চরিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না।

এই চারিজন রমণীই আর্য্য কবিগণের কল্পনারূপের অমৃতময় ফল। ইহাদের চরিত্রগত যদিও কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই। আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্রের ইহারাই প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal। ইহাদের চরিত্র পাঠে যে কেবল কাব্য পাঠজনিত আনন্দ লাভ মাত্র এরূপ নহে—উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্ম্ম মতি হয়, হৃৎকের সময় সহিষ্ণুতা জন্মে এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়।

প্রাচীন কালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল। স্মৃতিকারেরা যেরূপ জীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া স্কটিন। কোন দেশীয় স্মৃতিকারেরাই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। স্মৃতিকারেরা যাহাই করুন কবিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ নারীচরিত্র অতি বিরল। আমরা হয় ত দময়ন্তী শকুন্তলা হৃৎকট পাইতে পারি কিন্তু সীতা পার্বতী ও সাবিত্রী মিলিয়া উঠা ভার। বোধ হয়

† Sublimity.

বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই এরূপ বর্ণনা করিয়া রুতকার্য্য হইতে পাবেন না।

যখন আমরা কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখনও আমরা এতদেশীয় রমণীগণের সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই হৃৎকজন রমণী পণ্ডিত মণ্ডলীর রত্ন স্বরূপ। হৃৎকজন সংগ্রাম কার্য্যেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং হৃৎ চারিজন রাজনীতিতে সম্যক্ দক্ষ ছিলেন। কর্ণাটী বাজমহিষী, বিশ্বদেবী লক্ষ্মীদেবী খনা, লীলাবতী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। হৃৎগাবতী লক্ষ্মীবাই বশোবন্ত বায়ের রমণী—স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারাবাই অহল্যা বাই সাণ্ডীবাঈ তুলসীবাঈ অনেক দিবস ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অহল্যা বাঈ সর্ব্বগুণবিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার দয়া দানশক্তি রাজনীতিচাতুর্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাস মাঝেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। আমাদের দেশে রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমণীগণের মধ্যে এক জন। এবং এখনও আমরা সর্ব্বদা সংবাদ পত্রে নানা গুণবতী রমণীব নাম শুনিতে পাই।

মধ্যকালে ভাবতবর্ষের যেরূপ হুবহু ইহা ছিল তাহাতে জীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য নানা

বিধ চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় এক শতাব্দী মধ্যে আমরাও আমাদের দেশে আরো অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্র নারীর নাম শুনিতে পাইব। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উন্নতি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন তিনি পলিটিকাল ইকোনমি প্রণয়নেব নম্র তাঁহার স্ত্রীর নিকট অনেক সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও ভরসা করি অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওরূপ গুণবতী দেখিতে পাইব। সমাজের স্ত্রী অর্ধেক ও পুরুষ অর্ধেক। যদি অর্ধেক অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে তবে অপর অর্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে একুপ কামনা কখনই করিতে পারা যায় না।

নীতি কুসুমাজলি।

৫৫

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে ছুট স্বভাব আপন ॥
দেপহ প্রথরতর দিনকর কর।
অমৃত ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর ॥

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর ॥
পূর্বে বারিধরে যেই ছিল জলকণা।
শুক্লিগর্তে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা ॥

৫৭

ঋণ-শেষ অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ।
বিচক্ষণ গণ কভু না রাখেন শেষ ॥
পাকিলেই পুনর্বার সংবদ্ধিত হয়।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয় ॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরজব্দা, পরদার।
গুরু স্থানে পরিহাস কর পরিহার ॥

৫৯

যার বশে থাকে দারা, স্ত্রুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষতার ধরাতেল স্বর্গ ॥

৬০

এক পদে রাখি ভর, অত্র পদে অগ্রসর,
করেন যাত্রা বুদ্ধিমান।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
পরিত্যজ্য নহে পূর্বস্থান ॥

৬১

দানকর্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিস্তি তিথারীর দল ॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধুলার ত সংখ্যা নাহি হয়।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
হতাশনে দক্ষ বজ্রচয় ॥

শূরত্ব বীরত্ব যত, পৈরিকৃত সব হত,
আপ্ত প্রপতিত বজ্রানলে।
একা দনাতাব জন্য, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে ॥

৬৩

বিষ-দস্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে স্পীড়িত গাত্র ॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয় নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর ॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্গতি ॥
ক্ষুধানলে প্রজলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির ॥
কাটুশ কুটুর রবে গর্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে ॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ।
অতএব গুন ভাই কথা সাবধানে।
গুণগুণ সকলই বিধির বিধানেন ॥

৬৪

কন্দুকে* আছাড়ি মার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অধরে ॥
সেকরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুখিত তাঁরা ॥

৬৫

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান।
যেমন পতন-প্রাপ্ত, অমনি উত্থান ॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পাড়ে।
ইতব বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥

* বঙ্গ বা চন্দ্রাদি নির্মিত গোলা (Bull)

৬৬

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত কোমল ॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ ॥

৬৭

পূর্ব হৃৎক রূপাধান, উদকেরে দিল স্থান,
দুই তনু এক তনুতায়! ॥
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ নাহি হয় নীরে
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায় ॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্ত-প্রায়, হৃৎক নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে। ॥
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই ত মিত্রতা ভূমণ্ডলে ॥

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বশাতে মলিন।
কিন্মা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন ॥
প্রাপ্ত হয়ে কুকুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত ॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্ন মত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্কগত ॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুস্ত বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি ॥
অতএব স্মীয় সত্ত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টস্থষ্টে অবৈষিয়া লয় জীবদল ॥

৬৯

মৃগ মীন আর সাধু সজ্জন নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে, জীবিকা নির্ভরে ॥
নিষাদ, ধীবর, আর পিশুন দুর্জনে।
অকারণে ইহাদের পৈর-পরায়ণ ॥

৭০

সন্তাপে বিকৃত বাৰি প্রথর অনলে ।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে ॥
সাগরের শুক্তি মধ্যে পতনে তাহার ।
অপরূপ মুক্তাকপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গগুণে জানিবে নিশ্চয় ।
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায় ।
বাচাল বাতুল বলে বাক পটুতায় ॥
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীক নাম হয় ।
সহ গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয় ॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয় ।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় স্নানিচয় ॥
অতএব সেবা ধর্ম পরম হুর্গম ।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম ॥

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয় ।
ক্রুরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন ।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ পর্যটন ॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষ্ণু, কিম্বা পশুপতি ।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি ॥
হয় বাস নগবেতে, কিম্বা বাস বনে ।
বিবাহ স্ত্রীরী সনে, কিম্বা দরী* সনে ॥

৭৪

তৃণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর ।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর ॥

* পরিতের গুহা।

সাধুর চরণচিহ্নে কএক পয়ান ।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান ॥
বিদ্রোহীকে বশীভূত কব অমুনয়ে ।
স্বমুখে করোনা ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে ॥
হুংখিতেবে দয়া কর কীর্তির পালন ।
এই সব সাজন গণের আচরণ ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেব মতি ।
সম্মানে-উন্নতি করে কলুষে বিরতি ॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্তির সঞ্চয় ।
সাধুসঙ্গে মামুষের কি না লাভ হয় ॥

৭৬

মুকুরে বিদিত মুখ যথা ধৃত নয় ।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুনারী হৃদয় ॥
পরিতের স্তম্ভ পথ যেকরূপ বিষম ।
সেইরূপ হয় তার ভাব স্তম্ভগম ॥
চিত্তটা তরল যেন পদ্মপত্র জল ।
যারে হেরি বিদ্বানেয়ো মানস বিকল ॥
কুনারী লতিকারূপ গরল-অকুব ।
দোষরূপ পক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর ॥

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজন ।
যাহার দ্বারায় হয়, সাধু সেই জন ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজন ।
সচেষ্ঠে যে নহে, সেই সামান্য গণনা ॥
স্বার্থ হেতু পবহিতে বিয়কাবী যেই ।
মামুষ রাক্ষস দুই নরাধম সেই ॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে ।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহাবে ॥

৭৮

দোষগুণ সব কার্যে আছে বিদ্যমান ।
পরিণাম চিন্তি কার্য্য কবেন ধীমান্ ॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর ।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের শোষর ॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে অনলে ।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মন্তক-মণ্ডলে ॥
প্রাপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে ।
পূর্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে ॥*

৮০

পূর্ব পুণ্যবল যার আচয়ে যথেষ্ট ।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্চেষ্ট ॥
হুর্জন, অজুন হয় যাহার সদন ।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্বক্ষণ ॥

৮১

বরং ঘোর বনে জন্ম বনচর সহ ।
সুরেন্দ্রভবনে মূর্খ সংসর্গ দুঃসহ ॥

৮২

ধনের তৃতয় গতি দান, ভোগ, নাশ ।
দান ভোগ হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্যাস ॥

৮৩

ধন যার আছে স্কুলীন সেই নর ।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর ॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয় ।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয় ॥

৮৪

ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টি, নিত্য ভীত, রাগী ।
পরভাগ্য-স্বামী, এই ছয় দুঃখ ভাগী ॥

* এই নীতি সকলনকারীর অনুমোদ-
নীয় নহে ।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষে, কি ব্যাসনে ।
যশস্কর কর্ম্মে আর মিত্র সংগ্রহণে ॥
প্রাণ প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন ॥

৮৬

সর্বস্ব নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা ।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা ॥
ভিক্ষায় পৌরব, আত্মস্তরিতায় গুণ ।
চিন্তা করে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, নান ॥

৮৭

অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয় ।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক তাব নয় ॥
ধনলুকে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল ।
ব্যসনীর বিদ্যা ফল ব্যাসনে নির্মূল ॥
রূপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার ।
মাতাল মস্ত্রীর দোষে রাজ্য ছার খার ॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর ।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর ॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর ।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার ॥

৮৯

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্ম্মে রত ।
মন্তকের শ্লাঘা যদি গুণপদে নত ॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সূনিশ্চয় ।
ভূজের প্রতিষ্ঠা বীৰ্য্যবিভাত বিজয় ॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ ॥
প্রকৃতি-মহৎ ধারা, সেই সব নরে ।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে ॥

৯০

আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর ॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবছত্র নবনারী রতন।
সর্বত্র নূতন, হয় স্মরণোভন,
সেবকান্ন পুরাতন ॥

৯২

কভু ভূমিশয়া, কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন-ভোজন ॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা, কভু বিনোদ বসন।
ইথে স্থখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন ॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বনি গেল পাতাল ভবন।
ছাত্ত শরা করি দান, কোন এক তপস্বান,
স্বর্গপুরে করিল গমন ॥
আবালা অবধি যার, কৃত কত হৈল জার,
সে কুস্তীর স্বর্গেতে বসতি।
আহা পতিপ্রাণা সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্মের স্মৃতি গতি ॥

৯৪

কানীন আপনি মুনি, পুন পুরাণেতে শুনি,
লাতুবধু বিধবারমণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাচজন,
কুণ্ডবলি আছে বিঘোষণ ॥

সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম,
মরি কি ধর্মের স্মৃতি গতি ॥

৯৫

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সুধার ধার,
গৃহাভাবে পরধরে রয়।
মমতা বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময় ॥
এতগুণ সেই ধরে, তাজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি।
খঞ্জরীট কুমিভূজে, মানব মণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্মের স্মৃতি গতি ॥

৯৬

কপোতিনী সকাতরে কাস্তপ্রতি কয়।
আজি নাথ অন্তকাল হইল উদয় ॥
ধনু শর করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ফিরে তাগে তাগে ॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর।
শ্যেনেয়ে আহত করে নিষাদের শর ॥
উভয়ে তথনি গেল যমের বগতি।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি ॥

৯৭

পারীক্ষের পরাজয়ে, সুরভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইলু কুকুরের কায়।
দিলাম শাল্যর দধি, পায়সায় নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তার ॥
কিন্তু সিংহ রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় একি সর্বনাশ, হত যত অভিনাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল ॥

৯৮	৯৯
চন্দন চম্পক বন, রসাল রসাল গণ, কাটি কাটা করীর রক্ষণ। হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল, কাকলয়ে ক্রীড়া আকুঞ্জন ॥ করি করি বিনিলয়, গর্দভ ক্রয়িত হয়, কার্পাস কর্পুরে এক দাম। গুণিপক্ষে এ প্রকার, যথা ভয় অবিচার, সে দেশের পায়েরে প্রণাম ॥	পুরোভাগে রেবা পার, শোভিতেছে পরে তার ছুরারোহ পর্বত-শিখর। পশ্চাতে সবার বর, ধনুশর যুক্তকর, ধাইতেছে অতি দ্রুততর ॥ দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর, দাবাদাহ তাহে তপ্তকায়। পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে, ভৃগুশিশু কঁাদে হায় হায় ॥ ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি।
† কইক বৃক্ষ বিশেষ।	

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি বাক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অবাক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অবাক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বাক্তব, আর্গাদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূর্ণিত হইবে। অতএব

বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আশ্বাসিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ পূর্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এ কথা বলায় আশ্বস্তিয়ার বিষয় কিছুই নাই। কেন না এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অজরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন, যে বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার

প্রতি আমাব এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই, যে যতদিন বাঁচিব তাঁই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রত-বিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেক গুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্ত কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে, যে তাহাতে এষ্ট জীবন মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাহারা ইহাতে আক্লা-দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ স্তব্ধ করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ শালের বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। নইহার জন্ত আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্যা সুলেখক দিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যা-নিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃ-

* বাহুল্য ভরে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃত্ব, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশ নাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু

তিব নিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তালভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প স্নান্যার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার স্নেহ হুংখের ভাগী—তাহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুকে না। আমার যে হুংখ কে তাহার ভাগী হইবে? তাহার কাছে দীনবন্ধু জন্ত কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু স্নেহক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শতং ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা, বাঙ্গালী সাময়িক পত্রের বড়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমাব কৃতজ্ঞতাভাজন।

ধবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাত্ম ইণ্ডিয়ান অবজর্জবর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্জবর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্জবর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তরুণ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতোও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবজর্জবর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমন নহে। দেশী সম্বাদ পত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ার্ট এবং হিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তরুণ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সম্বাদান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্ত, আমি শতং ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবৃদ্ধ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবৃদ্ধ জলে মিশাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

সন ১২৮০ শালের মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগানীচরণ সেন নস্বর-
পূব ... ২০/১০

সন ১২৮১ শালের মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস চট্টোপা-
ধ্যায় ঘাটভোগ ... ৮/০
,, গুরুদাস মজুমদার বন্দে-
বন ... ১৫/০
,, হেরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোহাটি ... ২৫/০
,, শবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কাটালপাড়া ... ২/০

সন ১২৮২ শালের মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ উপাধ্যায়
কলিকাতা ... ৩/০
,, রাসবিহারী বসু হাওড়া ৩০/০
,, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
ঘাটভোগ ... ৩০/০
,, জয়কুমার দে কাছাড় ... ৪৫/০
মুন্সি ছমিরুদ্দিন গোলাপ
নগর ... ৩০/০
,, প্যারিমোহন দত্ত ধুবড়ি ৩০
,, গুরুদাস মজুমদার বন্দে-
বন ... ৩০
,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিটল ... ৩০/০
,, রাজমোহন চক্রবর্তী
ভাঙ্গা ... ১৫০/১০
রাজা রাধাগ্রামানন্দ বাহুবলৈজ
বাহাহর ময়নাগড় ... ১/০

শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টোপা-

ধ্যায় রুড়কী ... ৪৫/০
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
মেকনিগঞ্জ ... ৩০/০
,, রসিকলাল দাস জাগুলি ৩০/০
,, মহিমাচন্দ্র রায় কুলকুমার ৫/১০
,, রাজকুমার ঘোষ কাটিপাড়া ৩০/০
,, হেরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোহাটি ... ২/০
,, পোপালকৃষ্ণ মিত্র লক্ষৌ ২৫/০
,, রাজনারায়ণ বসু মেদিনী-
পুর ... ৩৫/০
,, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
মজফরপুর ... ৩/০
,, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য জামাল-
পুর ... ৩০/০
,, রাধিকাপ্রসাদ মল্লিক
তালগ্রাম ... ৩০/০
,, নীলমণি ভট্টাচার্য মেহের
পুর ... ১২/০
,, বনওয়ারিলাল নন্দী চৌ-
ধুরী বৈদ্যপুর ... ৪১৮/০
,, গোবিন্দচন্দ্র রায় কুচ-
বেহার ... ৪৫০/১০
,, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য
কাঁদি ... ২/০
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কাপাসীয়া ... ১/১০
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তেলিনিপাড়া ... ৩/০
,, কৃষ্ণচন্দ্র সাঁই কলিকাতা ৩০/০

মহম্মদ আজি মোল্লা থা।	৪১১/০	শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীকিশোর সেন	
শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ সান্যাল		নন্দরপুর ...	৩১/০
বহরমপুর ...	৩১/০	„ পারিমোহন দত্ত খুবড়ি	১৫/০
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত কালীহাটি	৩১/০	„ রাস্তামোহন চক্রবর্তী ভান্ডা	১২/১০
„ মথুরানাথ মজুমদার		রাজা রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলেজ	
সনাতনপুর ...	২৫/০	বাহাজুর ময়নাগড় ...	৩১/০
„ বৈকুণ্ঠনাথ সন্নকায় মুন্সারি	৩১/০	শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টো-	
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ভবানী-		পাধ্যায় রুড়কী ..	১/১০
পুর ...	১১/০	„ কালীপ্রসন্ন সান্যাল	১/১০
„ প্রমথনাথ বসাক		দিনাজপুর ...	৩১/০
বরাহনগর ...	৫/১০	„ অক্ষয়কুমার মিত্র কহর-	
„ নন্দলাল মিত্র ভবানীপুর	১১/০	বালি ...	৩১/০
„ মহেন্দ্রনাথ বসু ঐ	৩	„ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা	৩১/০
„ দক্ষিণাকুমার বসু ঐ	৩১/০	„ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		বরাইচ ...	২/১০
কলিকাতা	১/১০	মেঃ এফ গেঃ মিলিন কৃষ্ণনগর...	৩১/০
„ মহেন্দ্রনাথ সোম ঐ	৩১/০	মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি ...	৩১/০
মেঃ ডবলিউ সিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	৩১/০	মহারাজা শিনকালেন কটক ...	৩১/০
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাইন ঐ	৩	শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসাদ মল্লিক	
„ গগনচন্দ্র দাস ঐ	৩১/০	তালগ্রাম ...	১১/১০
„ উমাকালী মুখোপাধ্যায় ঐ	৩	„ কুমুদবসু বসু নড়াণ ...	৩১/০
„ গোপালসঙ্কর হড় ভবানী-		„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র লক্ষ্মী	৩১/০
পুর ...	২/১০	রাজা প্রমথভূষণ দেব কলিকাতা	৩১/০
„ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সেন জয়পুর	২৬/০
আলিপুর ...	৩/১০	„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
„ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী		বোয়ালিয়া ...	৩১/০
কলিকাতা ...	১১/০	„ ভুবনমোহন মিত্র চৈতলা	১১/০
„ বনোয়ারিলাল বসু লাহোর	৩১/০	„ কৃষ্ণচন্দ্র সাঁই কলিকাতা	৩১/০
সন ১২৮৩ শালের মূল্যপ্রাপ্তি।		„ মথুরানাথ মজুমদার	
মুন্সি তবারকউল্লা বড়বাড়ী ...	৩১/০	সনাতনপুর ...	২১/০
শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল সিংহ রায়		„ শীতলচন্দ্র মিত্র আগরা	৩১/০
হুগলি	১/১০	„ বনোয়ারিলাল বসু লাহোর	৩১/০

ডাকের টিকিট আমাদিগকে এক আনা কমিশ্যন দিয়া বিক্রয় করিতে হয়, অতএব ডাকের প্যাম্পে বাহারা মূল্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেরিত টাকায়, টাকা প্রতি এক আনা বাদ দিয়া স্বীকার করা গেল।

মূল্য প্রাপ্তি ।

সন ১২৮০ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চক্রবর্তী
ভাগলপুর ... ১০০
, উমাশঙ্কর সান্যাল সলপ ৩১০
, অন্নরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জনাই ... ৪৫০

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন
কলিকাতা ... ৩১০
, মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বশড়া ... ২০
বহরমপুর নন্দ্যাল স্কুল ... ২
, শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দ-
পুর ... ৩১০
, রঘুনাথপ্রসাদ ভবানীপুর ১০
, যজ্ঞনাথ সেন জয়পুর রাজ-
পুতানা ... ১০
, হারাণচন্দ্র বসু ভাগলপুর ৩১০
, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাগলপুর ... ৩১০
, অতুলচন্দ্র মল্লিক ভাগলপুর ৩১০
, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ভাগলপুর ... ৩
, স্বর্য়ানারায়ণ সিংহ ভাগলপুর ৩১০
, কেদারনাথ চক্রবর্তী ঐ ... ৩১০
, নগেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী
দড়িকুন্দি ... ১০০
, উমাশঙ্কর সান্যাল সলপ ৩১০
, গোবিন্দমোহন রায় হুগলী ১১০

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ সেন
কালিয়াচক ... ১,
, চণ্ডীচরণ রায় বরিশাল ... ৩১০
, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য ত্রিবেণী ৩১০
, মন্থনাথ চট্টোপাধ্যায়
হুগলী ... ১,
, তারাচরণ সেন ভবানীপুর ৩১০
, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় আলিপুর ১১০
, মথুরানাথ মজুমদার
সনাতনপুর ... ১১০
, বি, এন, মিত্র বিশ্বনাথ
আসাম ... ৪৫০
, সর্বেশ্বর মিত্র কলিকাতা ৩২০
, দ্বারকানাথ সান্যাল সাহা-
জাদপুর ... ১০০
, বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুতোফি কলি-
কাতা ... ১০

সন ১২৮২ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপা-
ধ্যায় বিটল ... ৩১০
, বিপিনবিহারী বসু বাঁকীপুর ৩১০
, বসন্তকুমার গুহ কলিকাতা ৩১০
, রমণীমোহন চৌধুরী তুষ-
ভাণ্ডার ... ৩১০
, আশুতোষ মৈত্র হলদীবাড়ী ৩১০
, কালিপ্রসন্ন সেন উকীল
যশোহর ... ৩১০
, প্রসন্নকুমার সেন কলি-
কাতা ... ১১০
, কালিদাস চক্রবর্তী সরবদি ৩১০

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র রায় দ্বার-	
ভাঙ্গা ...	৩/০
, রামজীবন ঘোষ ঐ ...	৩/০
, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	
দ্বারভাঙ্গা ...	৩/০
, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	
দ্বারভাঙ্গা ...	৩/০
, ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
এনাহাবাদ ...	৩/০
, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
পাবনা ...	৩/০
, হরিমোহন দাস উকীল	
নওয়াখালি ...	৩/০
, রজনীকান্ত গুপ্ত কুমিল্লা...	৩/০
, ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ বালুভবা	৩/০
, যোগেশ্বর রায় চকদিঘী	৩/০
, রাজকুমার রায় নড়াল	৩/০
, শ্রীমাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দ-	
পুর ...	১৥০
, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
রাউলপিণ্ডি ...	৩/০
, যদুনাথ সেন জয়পুর রাজ-	
পুতানা ...	১৥০
, কেশরনাথ চক্রবর্তী	
ভাগলপুর ...	৩/০
, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভা-	
গলপুৰ ...	৩/০
শ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ী কাশিম-	
বাজার ...	৩/০
শ্রীযুক্ত বাবু রায় রাজীবলোচন রায়-	
বাহাদুর কাশিমবাজার	৩/০
, শৈবকুমার দাস মহাধর্ম-	
পূব ...	৩/০

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকান্ত সান্যাল	
দিনাজপুর ...	৩/০
, কৈলাসচন্দ্র রায় দেহুড়া	৩/০
, ভবানীনাথ রায় সাহাজাদ-	
পূব ...	৩/০
, যোগেন্দ্রনারায়ণ বায়	
রায়েরকাটি ...	২/০
, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
তেলিনীপাড়া ...	২/০
, মদনমোহন চৌধুরী চুড়া-	
মনগ্রাম ...	৩/০
, উমাশঙ্কর সাত্তাল সলপ...	৩/০
, গঙ্গানারায়ণ প্রধান দেভোগ	৩/০
, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী জন-	
পাইগুড়ি ...	৩/০
, গোপালকৃষ্ণ সেন কালি-	
চায়ক ...	৩/০
, উমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	
মহেশতলা ...	৩/০
, শিবচন্দ্র দেব কোননগর...	৩/০
, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
বাকসাড়া ...	৩/০
, চণ্ডীচরণ রায় বরিশাল ...	১৥০
, চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	
লক্ষণপুৰ ...	১৫১০
, প্রসন্নকুমার চৌধুরী বহরম-	
পুর ...	৩/০
, প্রক্লচন্দ্র ভট্টাচার্য সারদা	৩/০
শ্রীমতী জ্ঞানেন্দ্রসুন্দরী বন্দ্যোপা-	
ধ্যায় গোয়ালপাড়া...	৩/০
শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ দত্ত উত্তিগ্রাম	৩/০

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বাবকানাথ বায় লক্ষী ৩৯০	শ্রীযুক্ত বাবু ভগীন্দ্র দাস ৩৯০
, গঙ্গানাবায়ণ গুপ্ত চিলমাঝি ৩৯০	, গোলকচন্দ্র বায় বহুতপুৰ ৩৯০
, চন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ৩৯০	, বামাখ্যাপ্রসাদ বায় কুড়ুল
, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ ... ১০,	গাছি ... ৩৯০
, সীতানাথ চক্রবর্তী সহ-	, ব্রজমোহন মিত্র মিবাট ... ৩৯০
কাবী সম্পাদক খুলনা ৩৯০	, মহাবাজ কমান্ডার সিং
, শ্রীমাচরণ মুখোপাধ্যায়	বাহাদুর মুসল্লিগাপুর ৩৯০
চাকদা ... ৩৯০	, বসিকলাল বসু শিবানন্দহ ৩৯০
, গগনচন্দ্র ভৌমিক পুৰাইন ৩৯০	, চন্দ্রনাথ বায় উকীল কালনা ৩৯০
, ত্রৈলোক্যনাথ বসু মোজ	মেদিনীপুর পবলিক লাই-
ফবপুৰ ... ১৯০	ব্রেবি ৩৯০
, কালীকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	, মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বাদাইপাড়া ... ৩৯০	যশডা ... ১
, অক্ষবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মুন্সী তবারক উল্লা খয়েবপুৰ ৩৯০
মেহেবপুৰ ... ১৯০	শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দনাথ সেন
, অতুলচন্দ্র মিত্র ছাপবা ৩৯০	কলিকাতা ... ৩৯০
, সূর্যকুমাৰ গঙ্গোপাধ্যায়	, মধুহৃদন সেন কাশী ওলা ৩৯০
কটক ৩৯০	, গোবিন্দব চক্রবর্তী ঐ .. ৩৯০
, বাজকুমাৰ ঘোষ কাটীপাড়া ৩৯০	, আনন্দচন্দ্র সেন ববিশাণ ৩৯০
, যদুনাথ শাহা বাণীগঞ্জ ... ২,	, কীৰ্ত্তিচন্দ্র বাব আলিপুৰ ... ১৯০
, শব্দচন্দ্র দাস তাঁতীকোনা ৩৯০	, মণুবান্যথ মজুমদার
, দেবীপদ বায় কানপুৰ ... ৩৯০	সোনাভনপুৰ ১৯০
, বোনওয়াবিলাল চট্টোপা-	, ভুবনমোহন বসু আদম
ধ্যায় হেজপুৰ ... ৩৯০	ওয়াহন ৩৯০
, সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী	, এজন্য কৃষ্ণ চৌধুরী
কলিকাতা ... ৩৯০	কলিকাতা ৩৯০
, বোনওয়াবিলাল বসু লা-	, পীতাম্বব চট্টোপাধ্যায়
হোব ৩৯০	মোতামপুৰ ... ৩৯০
, অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য	, বদিকানাথ মুখোপাধ্যায়
অযোধ্যাপুৰ ৩৯০	খুলনা ৩৯০
, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়	বদিকানাথ দাস ৩৯০
মুন্সীগঞ্জ ৩৯০	চৌধুরী ... ৩৯০

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন ঘোষ	
সদরঘাট ...	৩১/০
, ধর্মদাস দত্ত বিনপুর্ন ...	৩১/০
, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
তৃষভাণ্ডাব ...	৩১/০
, বাজাধিনকালেন কটক	
ভদ্রক ...	৩১/০
, বটকৃষ্ণ মল্লিক কলিকাতা	৩১/০
, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপা-	
ধ্যায় সিমলা ...	৩১/০
, কুমার মহেন্দ্রলাল ঙা	
নারাজোল ...	২১/০
, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
কলসকাটিঙ্গুল ...	৩১/০
, অক্ষুপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
জনাট ...	০/০
, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ভদ্র-	
বিলা ...	৩১/০
, দ্বারকানাথ মজুমদার	
রাধানগব ...	৩১/০
, ভুবনমোহন গুপ্ত সক্রি-	
গলি ...	৩১/০
, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	
মেকনিগঞ্জ ...	৩১/০
, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	
কুমিল্লা ...	৩১/০
চন্দ্রকুমার রায় দালালবাজার	৩১/০
, রসিকলাল মল্লিক মানিক-	
তলা ...	৩
, বনুন্দন ঠাকুর কলিকাতা	৩১/০
, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	
দাউদকাঁদি ...	৩১/০
, অন্নদাপ্রসাদ বকসি নাও	
ডাঙ্গা ...	৩১/০

শ্রীযুক্ত বাবু গুণচরণ ঘোষ, ঠাকুরগাঁ ৩১/০	
, মুখুন্দন সরকার, জিয়াগঞ্জ	৩১/০
, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ,	
কলিকাতা ...	৩১/০
, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, প্যার-	
পুর্ন ...	৩১/০
, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
কলিকাতা ...	৩১/০
, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ	৩১/০
, নয়নচাঁদ দত্ত ঐ	৩১/০
, হরবিলাস আগরওয়ালা	
তেজপুর আসাম ...	৩১/০
, অক্ষুপল গঙ্গোপাধ্যায়	
তুগুলা ...	৩১/০
, বাকিপুর্ন বেঙ্গালিস্কুল ...	৩১/০
, কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাকিপুর্ন ...	৩১/০
, বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তোফি কলি-	
কাতা ...	৩১/০
, রামগোপাল ঘোষ বাবুগঞ্জ ৩	

সন ১২৮৩ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
সারদা ...	১১/০
, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপা-	
ধ্যায় সিমলা ...	১১/০
, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	
দাউদকাঁদি ...	১১/০
, অক্ষুপল গঙ্গোপাধ্যায়	
তুগুলা ...	১১/০
, বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তোফি কলি-	
কাতা ...	৬/০

ডাকের টিকেট আমাদিগকে এক আনা কমিস্যন দিয়া বিক্রয় করিতে হয়, অতএব ডাকের ষ্টাম্পে যাঁহারা মূল্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেবিত টাকায়, টাকা প্রতি এচ আনা বাদ দিয়া স্বীকার কবা গেল।